জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

নির্বাচিত গল্প

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
নির্বাচিত গল্প

সম্পাদনা ও ভূমিকা
ডঃ নিতাই বসু

দে'জ পাবলিশিং। কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

নীতাকে

সহযোগিতায়
শ্রীমতী পারুল নন্দী

সূচীপত্র

ভূমিকা

নির্জনতা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বরাবরই প্রিয় ছিল, আবাল্য নিঃসঙ্গ এই শিল্পী অন্তর্মগ্নতায় আবিষ্ট হয়ে দিনরাত্রি চুপ করে বসে-বসে ভাবতে ভালোবাসতেন। শখ ও শৌখিনতা বলতে তাঁর প্রায় কিছুই ছিল না। পঞ্চাশ বছর ধরে লিখেছেন কিন্তু কোনো গোষ্ঠীতে তিনি কখনও সংযুক্ত হন নি। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা সত্তরের ওপর কিন্তু চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে মাত্র একখানি। তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে অথচ আজ পর্যন্ত কোনো বাণিজ্যিক মঞ্চে স্থান পায়নি তাঁর কোনো উপন্যাস বা গল্প। কলকাতার সব কয়টি প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে লিখলেও এখনও পর্যন্ত মাত্র একবারের বেশি পুরস্কৃত হন নি।

তাঁর সাহিত্যের অবয়বে আদ্যন্ত জড়ানো রয়েছে প্রকৃতির আবরণ আর সেই প্রকৃতিকে পটভূমিতে রেখে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করেছেন তিনি বারবার। অনেকগুলো হত্যার সঙ্গে সুন্দর ফুল ও চমৎকার পাখির সহবাস ঘটিয়ে, কখনও বা অনেকগুলো অপরিণত মৃত্যুর সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের সংগ্রামের বিশ্বস্ত দলিল রচনা করে জ্যোতিরিন্দ্র পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করেন। কাচের পাত্রের মতো স্নেহ-মায়া-মমতা গুঁড়িয়ে দিয়ে যারা ঈপ্সিত জগৎ গড়ে তোলে, তাদের সামনে প্রতিবাদী মূর্তির মতো ভালোবাসার ভেলায় ভাসতে ভাসতে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে-যাওয়া অজস্র চরিত্র সৃজনেও তিনি ক্লান্তিহীন। একদিকে প্রচুর হত্যা, অনেক মৃত্যু, অবিমিশ্র বীভৎসতা, অবিরত ক্রন্দন—অন্যদিকে ফুল-পাখি-সমুদ্র-জ্যোৎস্না ও বৃষ্টির সমারোহ; আদিম মানুষ ও আদিম প্রকৃতির দ্বৈত সমাবেশ।

দ্বিতীয় বিধাতা রূপে আত্মপ্রকাশের আগে নিতান্ত শৈশব থেকে কৈশোরের স্বপ্নরঙিন দিনগুলোর গণ্ডী না পেরোনো পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্র প্রকৃতির রূপ-রস-সুধা আকণ্ঠ পান করতেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। নিতান্ত শৈশবে ধনু নামক যে-শিশুটি মেঘলা আকাশের মতো মুখভার করে ঘুরে বেড়াত, যাকে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দৃশ্য বা তিতাসের জলে নৌকো-বাইচের সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আকর্ষণ করত না অথচ যে আকর্ষণ বোধ করত খেজুর আর ডালপালা-ছড়ানো একটা শ্যাওড়া গাছের পিছন থেকে লাল টক্‌টকে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে, তেমনই গভীর-গম্ভীর ধনু ওরফে জ্যোতিরিন্দ্রকে নিয়ে কারও কোনো আগ্রহ ছিল না।

আট

জ্যোতিরিন্দ্র প্রকৃতিকে প্রথম জীবনে ছবিতে ধরতে চেয়েছিলেন কিন্তু সময়ের হাত ধরে যতই তিনি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলেন ততই ধীরে ধীরে তিনি রঙ-তুলির জগৎ থেকে সরে গেলেন। কৈশোরে বাবার কাছে চমৎকার আবৃত্তি শিখেছিলেন ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়, কিন্তু পরবর্তীকালে আবৃত্তিচর্চা তাঁর মনোহরণ করেনি। এমন কি, বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রায় তিন শো ছেলের অভিভাবকদের বিরাট সমাবেশে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করলেও কবিতা তাঁর শিল্পীমনে কোনো গাঢ় বা গূঢ় ছাপ রাখে না। কবিতা পড়তে পড়তেই কবিতার রসাস্বাদনের সূত্রপাত ঘটল, কাব্যচর্চাও শুরু হল, তাঁর কবিতা পরিচিত মহলে তাঁকে কবি-হিসেবে কিঞ্চিৎ স্বীকৃতিও দিল এবং জনৈক স্কুল-শিক্ষকের সস্নেহ পৃষ্ঠপোষণাও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। সেই শিক্ষক স্নেহার্থী ছাত্রকে অনেক কবিতা লিখতে দেখেছেন কিন্তু তাঁর অনুপ্রেরণা জ্যোতিরিন্দ্রকে কবিতা থেকে ছুটি নিতে আটকাতে পারেনি। 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে কবি ও কবিতার সপক্ষে সন্ধিহীন যুদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও, স্ব-রচিত ভাষার শরীরে কবিতার স্নিগ্ধ সুষমা মাখিয়েও অদ্যাবধি প্রকাশিত তাঁর পুস্তকাবলীর তালিকায় সংযুক্ত হয়নি কোনো কাব্যগ্রন্থের নাম।

কলকাতার সুবিশাল অট্টালিকাসমূহ তাঁর চোখে কোনো সম্ভ্রম জাগায় না অথচ একটা ছোট্ট চারা কীভাবে বিশাল বৃক্ষ হয়ে ওঠে তা তাঁর ভাবনা-চেতনাকে দিনরাত্রি দখল করে থাকে। হাওড়া ব্রিজের নির্মাণশৈলী সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আদায় করলেও জ্যোতিরিন্দ্র তা নিয়ে মোটেই অভিভূত হন না। তিনি তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের মতোই প্রকৃতির বুকে বারংবার আশ্রয় পেয়ে খুশি হন। অথচ প্রকৃতি তাঁকে দিয়ে কখনও কবিতা লেখায় না, প্রায়ই তাঁর গদ্যের পোশাক তৈরি করিয়ে নেয়।

তিনি কখনও কারো কাছে বিশেষভাবে উৎসাহিত হন নি, প্রবীণতর বা সমকালীন কোনো সাহিত্য-সহযাত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতার কোনো ঋণ নেই তাঁর। যখন তিনি পূর্ব বাংলার একটি প্রাচীন শিক্ষায়তন, অন্নদা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন ওই বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক সাহিত্যরসিক হরেন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে মেহরকালীবাড়ির মেলায় ভ্রমণ করা সম্পর্কে এমন মনোজ্ঞ একটি রচনা পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে উপহার দিয়েছিলেন যেটি হরেন্দ্রবাবু ক্লাসে এনে সবাইকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং উদ্ভাসিত প্রশংসা করেছিলেন। তখন থেকেই সুনিশ্চিতভাবে তাঁর সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত ঘটল।

ইতিপূর্বে কবিতা লিখে বা কবিতা পড়ে তাঁর মন তৃপ্ত হচ্ছিল না। একদিন বাবার টেবিলে আইনের বইয়ের পাশে মলাট-ছেঁড়া 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'মাধবী

কঙ্কন' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' পেয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল 'চারু-হারু', 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদার ঝুলির' সঙ্গে, এইবারই, মাত্র এগারো-বারো বছর বয়সে রমেশচন্দ্র দত্তকে নিয়ে তাঁর সাবালক সাহিত্যপাঠ শুরু হল।

শুধু পাঠ নয়, তিনি নিজেকে উপন্যাসগুলোর নায়ক অথবা নায়িকা ভেবে তৃপ্তি পেতেন। মাত্র কয়েক বছর পরে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত বহু নাটকে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। অভিনয় করা দূরে থাক, পরবর্তীকালে তিনি অভিনয় দেখাও সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। সমগ্র জীবনে তিনি মাত্র দশ-বারোটির বেশি সিনেমা দেখেন নি যদিও তিনি চলচ্চিত্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প হিসেবে স্বীকার করেন। তিনি থিয়েটারও দেখতেন না তবে থিয়েটারের প্রভাব সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই 'একটি একাঙ্ক নাটক'-এর মতো গল্প লিখতে পারেন।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস পড়ার সময় তিনি পাহাড় ঝর্ণা গুহা বা গিরিবর্ত্ম নিয়ে পরিবেশ কল্পনা করতেন। পরিবেশের কল্পনা ওঁকে বাধ্য করল রঙ তুলি ও কাগজের জগতে ডুবে যেতে। ওঁর ছবি আঁকার সঙ্গী হিসেবে উনি পেয়েছিলেন চিত্রাঙ্কনবিদ্যায় দক্ষ ওঁর ছোটমামাকে।

ছবি আঁকার সঙ্গে সাহিত্যপাঠও চলতে লাগল। রমেশচন্দ্র দত্তের পর জলধর সেন হয়ে যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা'য় পৌঁছলেন। জ্যোতিরিন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে থাকলেন, চরিত্রগুলো ওঁর একান্ত পরিচিত। উপন্যাসটির নায়ক উপীনের মতো উনি ওঁর জীবনের ধ্রুবতারা কোনো নায়িকাকে খুঁজতে লাগলেন। তরুণটির হাব-ভাব বাবার উকিল বন্ধুর চোখে স্বাভাবিক লাগত না, তিনি ছেলেকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতে বাবাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বাবা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদারতার জন্য ছেলের সাহিত্যপাঠ, ছবি আঁকা বা কবিতা লেখার ব্যাপারে কিছুই বললেন না।

জ্যোতিরিন্দ্র সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় আবৃত্তি করে একখণ্ড 'গল্পগুচ্ছ' উপহার পেয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়ে তিনি আবিষ্ট হয়ে যান, ক্রমশ প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র তাঁর প্রিয় লেখকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন। কিন্তু ভাবলেও অবাক হতে হয়, তাঁর এই প্রিয়তম লেখকগোষ্ঠী তাঁর রসাস্বাদ মিটিয়েছেন, চিত্তকে নন্দিত করেছেন কিন্তু শিল্পভাবনাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের বিষাদব্যাকুল বৈরাগ্য, প্রভাতকুমারের তরলমধুর হাস্যরস এবং শরৎচন্দ্রের বাঙালিসুলভ ভাবালুতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাঁর রচনা। তাঁর গল্পে বিষাদ আছে কিন্তু বৈরাগ্য নেই, হাস্যরস পরিবেশনায় তাঁর কোনো আগ্রহ নেই এবং ভাবালুতার তিনি ঘোরতম শত্রু। তিনি পাঠকদের ভাবিয়ে

তোলেন কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে যান না। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হয়নি, বিরল ব্যতিক্রম হয়ে বেঁচে থাকে তাঁর মাত্র একটিমাত্র উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন', যেটি প্রায় আধ ডজন সংস্করণ পেরিয়েও এখনও বাঙালি পাঠকের ঔৎসুক্য জাগায়।

'গল্পগুচ্ছ'-এর মাত্র একটি খণ্ড তিনি উপহার পেয়েছিলেন, বাকি খণ্ডগুলো সংগ্রহ করতে কুমিল্লা শহরের সেই আধা-মফস্বলী আবহাওয়ায় এই উদ্যমী তরুণকে আরো প্রায় দু'তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 'গল্পগুচ্ছ' ওঁকে উপন্যাস পড়ার নেশা কাটিয়ে দিল। পনেরোয় পা দেওয়ার প্রাক-মুহূর্তে, বয়ঃসন্ধির সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ওঁকে ছবি আঁকা ছাড়িয়ে ছোটগল্প লিখতে প্রেরণা দিল। মফস্বল শহরগুলোর বিভিন্ন হাতে-লেখা পত্রিকায় তাঁর ছোট-গল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে মেটাতে তিনি নবম শ্রেণীর সিঁড়ি পেরিয়ে দশম শ্রেণীতে পৌছে যান। উত্তেজনার দুর্বার ঝোঁকে এই দৃপ্ত তরুণ প্রচণ্ড দাপটে এমন একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন যেটির প্রথম সংখ্যাই অন্তিম, যদিও পত্রিকার সেই সংখ্যাটিতে সঙ্কলিত হয়েছিল একমাত্র ওঁরই লেখা কবিতা ও গল্প, ওঁরই আঁকা ছবি।

যখন তিনি মাত্র আঠারো বছরের তরুণ, তখন কুমিল্লায় যুব সম্মিলনে উপস্থিত হয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সঙ্গে ছিলেন শরৎচন্দ্র। ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হাতে-লেখা পত্রিকা বের করলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্রের সাহিত্যজীবনের অন্যতম সুরকার। ওই হাতে-লেখা পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রের যে-গল্পটি প্রকাশিত হয়, তার পাশে শরৎচন্দ্র স্বহস্তে প্রশস্তিসূচক মন্তব্য লিখে দেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের বাংলার অধ্যাপক সুধীর সেনের সস্নেহ আনুকূল্যে গল্পটি নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'কলেজ ক্রনিকল'-এ ছাপা হয়। গল্পটির নাম 'অন্তরালে'।

সক্রিয়ভাবে তখন লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত হতে চান নি জ্যোতিরিন্দ্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লায় তিনি তখন সব কাজেই প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা অনুভব করতেন। ওখানকার তদানীন্তন বিখ্যাত নেতা ললিত বর্মণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ সঙ্ঘের হাতে-লেখা মুখপত্রের পরিচালনা করেছেন, প্রচুর বই পড়েছেন এবং নাট্যাভিনয়ে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন।

প্রথম যৌবনে তাঁর যাবতীয় সামাজিক সংযোগ সম্ভবত তাঁকে রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয় এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তপ্ত হাওয়ায় উত্তপ্ত এই যুবকটিকে পুলিশী নির্যাতন সহ্য করে ছ'মাস কুমিল্লা জেলে বন্দী থাকতে হয়। অতঃপর আরো এক বছর স্ব-গৃহে তাঁকে অন্তরীণ থাকতে হল এবং এই সময় তিনি স্নাতক হলেন। জীবনের ওই রাজনৈতিক পর্বে তাঁর অন্তর্গত রক্তের ভিতরে বাসা

বেঁধেছিল ভাবী লেখক জীবনের গূঢ়-গোপন স্বপ্ন। গোপনে সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে লেখার চর্চা শুরু করলেন 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্মনামের আড়ালে। প্রকৃতিপ্রেমিক এই শিল্পীর উপযুক্ত ছদ্মনামে তিনি 'সোনার বাংলা' ও 'বাংলার বাণী'তে অনেক গল্প লিখলেন।

২

এই সময় থেকেই তাঁর কলমে মূলত লেখার ঢল নামে। এক-একটা দুপুরে এক-একটা গল্প লিখে ফেলতেন তিনি। কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংবাদ' ও 'আত্মশক্তি'তেও লিখতে শুরু করলেন। 'সংবাদ'-এর সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র-সম্পাদিত 'নবশক্তি'তেও তিনি লেখার সুযোগ পান। বেঙ্গল ইমিউনিটিতে কাজ করার সময় প্রচার সচিব প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়, প্রেমেন্দ্র তাঁকে লিখতে উৎসাহিত করেন। ইতিমধ্যেই 'বাংলার বাণী'তে 'জার্নালিস্ট' গল্পটি লিখে তিনি পাঠকদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। দেশভাগের পর তাঁর অনেকগুলো ছবির সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বের সমস্ত ছোটগল্পগুলোও হারিয়ে গেছে।

ওঁর ওপর থেকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হল। উনি 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখলেন তাঁর প্রথম সাড়া-জাগানো গল্প, 'নদী ও নারী'। গল্পটি পাঠকমহলে তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। অতঃপর, সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তৃতীয় বছরেই ওখানে লিখলেন 'রাইচরণের বাবরি'। সহ-সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে সোৎসাহে পৃষ্ঠপোষণা করতে থাকলেন। তখনও তিনি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন নি, তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে তিনি মফস্বল শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন, লোকনাথ দীঘির টলটলে কালো জলে বিকেলের সূর্যাস্তের রঙ দেখে ভাবী জীবনের কথা ভাবতেন।

জীবিকার অন্বেষণে তাঁকে অতঃপর কলকাতায় আসতেই হয় এবং এই জনাকীর্ণ মহানগরী ওই নির্জন শিল্পীকে আমৃত্যু সম্মোহিত করে রাখল। তিনি আর কুমিল্লায় কখনও ফিরলেন না, কলকাতার এক মেসের ক্ষুদ্র পরিসরে দীর্ঘদিন বাস করেছেন, স্থান বদলও করেছেন কয়েকবার। বেলেঘাটার বস্তি, বাগমারি রোডের ভাড়া বাড়ি, তিলজলার সরকারী ফ্ল্যাট তাঁর জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি দারিদ্র্য, নির্জনতাপ্রিয়তা, অন্তর্মগ্নতা। তিনি চিরকাল কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকতেই ভালোবাসতেন, রাজনৈতিক হট্টগোল ও চিৎকারের চেয়ে পাখির ডাক ও বৃষ্টির শব্দ তাঁকে সম্মোহিত করত, কখনও বা আকাশবাণীর কার্যক্রমে

রবীন্দ্রসংগীত শুনতেন। মহানগরীতে সুদীর্ঘকাল বাস করেও এর দ্রষ্টব্য স্থানগুলো তিনি কখনও দেখতে .চাইতেন না। বাড়ির বারান্দায় নির্জনে বসে জ্যোৎস্নার খেলা, রৌদ্রের রঙ ও রামধনুর রূপমাধুরী উপভোগে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। সারা জীবনে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন পুরী, দীঘা, কাশী, গয়া, শিমূলতলা ও ঘাটশীলা।

জীবিকার অন্বেষণে এক সময় তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল বটে কিন্তু চাকরি খোঁজার মেজাজ তাঁর ছিল না। একটা পাইস হোটেলে থাকা-খাওয়া চলত। গোটা দুই ট্যুইশনি করতেন। সারা দুপুর গল্প লিখতেন। সিনেমা বা খেলা দেখার নেশা ছিল না। থাকা-খাওয়া ও টুকিটাকি খরচ বাবদ মাসে কুড়ি-বাইশ টাকা রোজগার করে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখে রাতদিন কেবল লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন।

কিন্তু এমনিভাবে তাঁর দিন গেল না। তাঁকে নিরন্তর চাকরির সন্ধানে বেরোতে হয়েছে, অথচ কোথাও তিনি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকতে পারেন নি। বেঙ্গল ইমিউনিটিতে তিন মাস হিসাবপত্র দপ্তরে কাজ করলেন, পুরো তিন বছর চাকরি করলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যলগ্নে টাটা এয়ারক্রাফ্‌টের স্টোর ডিপার্টমেণ্টে, আংশিকভাবে পাঁচ বছর যুক্ত ছিলেন বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান জে. ওয়াল্টার এ্যাণ্ড টম্‌সন্‌-এ। ভ্যান্‌সিটার্ট রো থেকে 'দৈনিক যুগান্তর' বেরোতে আরম্ভ করলে সেখানে সাব-এডিটারের চাকরি পান কিন্তু একদা এক প্রবল বর্ষণের দিনে অফিসের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে তাঁর শিল্পীসত্তা আলোড়িত হয়ে উঠলে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। আর কখনও ওমুখো হন নি।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল 'যুগান্তর' পত্রিকায় ন' মাস কাজ করার পর। জীবন যতই অনিত্য হোক, যতদিন তার ভারবহন করতে হবে ততদিন জীবিকা ছাড়া গতি নেই। তাই, জ্যোতিরিন্দ্রকে অতঃপর সহ-সম্পাদক হিসেবে তিন বছর 'আজাদ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখি, তাঁকে ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'মজদুর' পত্রিকা সম্পাদনা করতে হয়, প্রতিষ্ঠাল থেকেই 'জনসেবক' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকা আবশ্যিক হয় ওঠে। এইসব স্বল্পকালীন ও স্বল্প বেতনের জীবিকা তাঁকে দারিদ্র্য থেকে টেনে নিয়ে কখনও পৌঁছে দিতে পারেনি স্বচ্ছলতার নিরাপদ আশ্রয়ে এবং সাহিত্যের আয়ের ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকা এদেশে নন-কমার্শিয়াল লেখকদের মধ্যে এ-ব্যাপারে সম্ভবত একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে।

তেরো

'নদী ও নারী' এবং 'রাইচরণের বাবরি' প্রকাশের ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্র প্রখ্যাত পত্রপত্রিকাগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। তখন 'পূর্বাশা', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'ভারতবর্ষ', 'মাতৃভূমি', 'পরিচয়' ইত্যাদি কাগজে তাঁর একের পর এক গল্প বেরোতে থা.ক। কিন্তু তিনি তখনও উপন্যাস লেখায় হাত দেন নি। 'দেশ' পত্রিকার তদানীন্তন সহ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ একদিন ওঁকে ডেকে বললেন, 'এবার তুমি উপন্যাসে হাত দাও।' লেখা হল 'সূর্যমুখী' এবং 'দেশ' পত্রিকায় সেটি ধারাবাহিক ছাপাও হল। অতঃপর তিনি লিখলেন 'মীরার দুপুর' ও 'বারো ঘর এক উঠোন' থেকে শুরু করে প্রায় ষাটখানি উপন্যাস, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

প্রয়াণের আগের কয়েকটি বছর তিনি চোখের অসুখে ভুগছিলেন। তার আগে, সারা সকাল তিনি বই পড়তেন। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, তাঁর পাঠ্যসূচিতে বিদেশী সাহিত্যও ছিল। এইচ. ই. বেট্স-এর গল্প তাঁর প্রিয়, সমারসেট্ মম-এর 'রেন' ও 'রেড' পড়ে অস্বাভাবিক তৃপ্ত, হেমিংওয়ের 'নো উইদাউট উইমেন' বইটির প্রতি তিনি বোধ করেন প্রবলতম আকর্ষণ, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী' লিখতে বসে তিনি স্পষ্টতই স্টেইনবেকের 'প্যাশ্চার্স অফ হেভেন'-এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন। স্টেইনবেকের চেতনার সঙ্গে তাঁর মানসিক সাধর্ম ছিল— উভয়ের রচনাতেই কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা আর অবাধ যৌন আবেগের সমাবেশ; উভয়েই নিছক বেঁচে থাকার আনন্দে যেন উদ্ভাসিত। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি প্রচুর কাফ্‌কা পড়ছিলেন, সম্ভবত সেই কারণে বিমূর্তাশ্রয়ী কিছু গল্পও লিখছিলেন তখন। অস্তিত্ববাদী দর্শনের জটিলতা বাদ দিলে সার্ত্রের জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনাও তখন তাঁর খুব ভালো লাগছিল কিন্তু উপকরণ ও উপস্থাপনায় স্বদেশে-বিদেশে কারো কাছে কোনো প্রকার ঋণ স্বীকারে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। গোত্রে ও ধর্মে তিনি চিরকাল নিঃসঙ্গ; স্বপ্নে ও সাধনায় মূলত তিনি আদিম প্রকৃতির পটভূমিতে আদিম মানুষের হৃদয় রহস্যের অনুসন্ধানে মগ্ন।

৩

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে ঘটনার ঘনঘটা নেই, নাটকীয়তার চিত্তচাঞ্চল্যকর চমক নেই। সস্তা রোম্যান্টিক প্যানপ্যানানির জোলো আবেগসর্বস্বতা কিংবা মিলন-বিরহের হাসি-কান্নার উচ্চ রোল কখনও শিল্পীর মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তাঁর অন্তর্লীন চেতনা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মানসিকতার বিকাশ ঘটায় নিপুণ

শিল্পীর মতো অত্যন্ত বিলম্বিত লয়ে—গল্প-উপন্যাস যতই পরিণতির দিকে এগোতে থাকে, ততই শিল্পী যেন একটার পর একটা পর্দা সরিয়ে পাঠককে একটা গভীর রহস্যের অন্তরালে নিয়ে যান। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর উৎকৃষ্ট রচনা সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে ছবি হয়ে যায় কিন্তু ছায়াছবি বা মঞ্চের আশুতোষ জনগণের কাছে সেগুলো গৃহীত হয় না।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ ও বর্ণ উপভোগ করে জ্যোতিরিন্দ্র যে প্রকৃতিবিষয়ক গল্পগুলো লিখেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হয়ে রয়েছে। কিন্তু নারী যখন তাঁর শিল্পীমনে প্রকৃতিরই অভিন্ন সত্তা হিসেবে ধরা দিয়েছে তখন মানবচরিত্রের বিশ্লেষণে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা পাঠককে অভিভূত করে। তিনি সেখানে নারীকে নিছক নারী হিসেবেই দেখেন, পুরুষের কাছে তার দেহের বস্তুতান্ত্রিক উপস্থানা রীতিমতো অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই 'নদী ও নারী'র মতো স্বর্গীয় প্রেমের গল্প তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে এমনই ব্যতিক্রম হয়ে বেঁচে থাকে, যে-গল্পটি শিল্পীমনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন ছাড়া সুধী পাঠকেরা তাঁর উৎকৃষ্ট গল্পমালায় স্থান দিতে দ্বিধা করবেন। গল্পটির নায়িকা আধুনিকা তরুণী, 'ফ্যাশানের ফানুস', তার দীর্ঘছন্দ শরীরের গড়ন নিটোল নিভাঁজ, হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে সে যেন সত্যিই একটা চিতা বাঘিনী। সে গানও গায়, বন্দুকও চালায়, তার কণ্ঠে রূপোলি হাসির বানও ডাকে, ঘাড়ের রেখায় কখনও কখনও সতেজ ভঙ্গিমাও ফুটে ওঠে। পদ্মার চরে বেড়াতে গিয়ে সুরপতি-নির্মলা এই নারীকে পণ্যাঙ্গনা ভেবে বসে। কিন্তু অসীম কৌতূহল নিরসন করতে গিয়ে সুরপতি-নির্মলার ভুল ভেঙে যায়। যাকে ওরা পণ্যাঙ্গনা ভেবে বসেছিল সেই মেয়েটি বেহুলা বা সাবিত্রীর ঐতিহ্য বুকে বহন করে নিয়ে চলেছে। সে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসকের নির্দেশে প্রায় তিন বছর ধরে নদীর বুকে ভেসে আছে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে লেখা 'বন্ধুপত্নী'ও দাম্পত্যপ্রেম-বিবর্জিত নয়, কিন্তু ততদিনে জ্যোতিরিন্দ্র সাহিত্যগত পূর্ণরসসিদ্ধি নিয়ে স্ব-মহিমায় স্থিত হয়েছেন। সুবিনয়কে অরুণা যথেষ্ট ভালোবাসত বলেই সে সুধাংশুকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিল। সুধাংশুর স্ত্রী কার্যত তাকে পরিত্যাগ করেছিল আর সুধাংশু নিজের অসুস্থ বিবর্ণ জীবনটাকে কোনোরকমে টেনে নিয়ে চলেছিল। তাই, সে তার বন্ধু সুবিনয়ের দারিদ্র্যপীড়িত সাংসারিক পরিবেশে অনাহারক্লিষ্ট বউ-বাচ্চাদের মাঝখানে যেতে আপত্তি করেনি। স্বামীর সঙ্কীর্ণতা ও নীচতা সহ্য করেও অরুণা সুবিনয়ের শারীরিক আকাঙ্ক্ষা হাসিমুখে মেটায়। হয়তো প্রেম ও মাধুর্য ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে কিন্তু সুবিনয় ও অরুণা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে

জীবনটা একভাবে গড়ে নিয়েছিল। ওদের সম্পর্ক উপোসী সুধাংশুর কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে। তাই, রাত্রির অন্ধকারের সুযোগে সুধাংশু অরুণার কাছে আসে এবং অরুণা তার গভীর কালো চোখ-জোড়ার নিস্পলক দৃষ্টি দিয়ে, সন্তানসম্ভবা নারীর কোমল রূপ নিয়ে, ওর দিকে তাকালে সুধাংশু 'হিংস্র উন্মত্ত পশু' হয়ে 'ওর অনাবৃত সাদা বাহুটা সজোরে চেপে' ধরে। সুধাংশুর কাঙ্ক্ষিত সময়ের চেয়েও বেশ অতিরিক্ত কিছুক্ষণ তার বজ্রমুষ্টির মধ্যে অরুণা ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধরে রাখতে দিয়ে সরিয়ে দেবার ন্যূনতম চেষ্টা না করে ধীর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এ-মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড করতে হবে, ছি ছি কী ছিরি হয়েছে পোশাকের, এই নিয়ে তো ও আপিস-কাছারি করছে।'

অরুণার এই বিস্ফোরক উক্তির পর সুধাংশুর বজ্রমুষ্টি অনিবার্যভাবেই শিথিল হয়ে পড়ে।

প্রেমের চেয়ে প্রেমহীনতার গল্প জ্যোতিরিন্দ্র অনেক বেশি লিখেছেন এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে তিনি এমন অনেক গল্প লিখেছেন যেখানে নারী বা পুরুষ, কারো কোনো পৃথক স্বাতন্ত্র্য নেই, তারা কোনো একটা বিষয় বা চেতনার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। তাঁর শিল্পীমন বহুধা বৈচিত্র্যে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মে অসংখ্য অভিনব রূপকল্প সৃষ্টি করেছে; গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজতে তাকে ছুটতে হয়নি কখনও বিভিন্ন জনপদে, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের খোঁজে। মূলত চার দেওয়ালের চিত্রকর হলেও তাঁর এমন একটা সূক্ষ্ম মৌলিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যা তাঁর নিত্য নতুন পরিক্রমায় তাঁকে শ্রান্ত হতে দিত না। প্রেম, প্রেমহীনতা, সংগুপ্ত যৌনবাসনা, তীব্র যৌনাবেগ, মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিক মহিমার বিভিন্ন আস্বাদন থেকে শুরু করে শোচনীয় দারিদ্র্য যা মানুষের অস্তিত্ব ধরে নাড়া দেয়—সেইসব বিষয়বস্তুব বিচিত্র প্রয়োগ আমরা তাঁর গল্পে সার্থকভাবে দেখেছি কিন্তু কত সাধারণ, কত অকিঞ্চিৎকর উপাদান একটা উৎকৃষ্ট গল্পের কাঠামো নির্মাণ করতে পারে এটা জানতে গেলে তাঁর 'রাইচরণের বাবরি', 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', 'পার্বতীপুরের বিকেল', 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' এবং 'জ্বালা' গল্পগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

'রাইচরণের বাবরি' গল্পের নামকরণ প্রমাণ করে, রাইচরণ নিজে নয়, এই গল্পের উপকরণ তার দৃষ্টি নন্দনকারী কেশবিন্যাস। রাইচরণের ধারণা, পূর্বজন্মের তপস্যার ফলেই তার চুল 'কোঁকড়া, লম্বা, চিকণ, সাপের মতো ঢেউখেলানো'। তার মুখের হাসিও বাহারী বাবরির মতোই। কিন্তু মানদা বঁটি দিয়ে চুলের গোড়াশুদ্ধ কেটে সাবাড় করে দিতে চায়, রাইচরণের অসুরের মতো চুলের ঝাড়

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পুড়িয়ে দিতে চায়, 'যত সব অনাছিষ্টি, চুল না চিতাবাঘের জঙ্গল-মাগো, ছিরি দেখলে অঙ্গে ঘেন্না—গন্ধে বমি আসে।' তবু রাইচরণের চুলের নিরলস পরিচর্যা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে উৎসাহের অভাব নেই, তার বাবরি যেন সেলাইয়ের দোকানের বিজ্ঞাপন হয়ে পথিকের আকর্ষণ করে। বাবরির সুযোগে সে মাসিক একশো পঁচিশ টাকা বেতনে থিয়েটারে অভিনেতা হিসেবে কাজ করার মর্যাদা পায়। নাটকে তাকে একজন ডাকাতের ভূমিকায় অভিনয় করতে বললে রাইচরণ তা প্রত্যাখ্যান করে কারণ দর্শকমণ্ডলী তার সাধের বাবরিটা নকল বলে ভুল করতে পারে। মাসিক একশো পঁচিশ টাকা মাইনের চেয়ে তার বাবরির মায়া অনেক বেশি। মানদা তা বুঝতে চাইবে না বলে রাইচরণ কলেজ স্ট্রীটের একটা দেকোন থেকে একজোড়া হাল ফ্যাশনের স্কার্ট-পাড শাড়ি কিনে বাড়ির রাস্তা ধরে।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্বের জন্যই জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে অনেক সময়েই কাহিনী-বিন্যাসের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যেমন 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গল্পের সুন্দরী যুবতী কুন্দকে কেন্দ্র করে রেবা ও তার স্বামীর মধ্যে একটা ত্রিকোণ সম্পর্কের গল্প জ্যোতিরিন্দ্র অক্লেশে লিখতে পারতেন, বিশেষত রেবার সুখী দাম্পত্যজীবনের প্রেক্ষাপটে স্বামী-পরিত্যক্তা কুন্দকে নিয়ে একটা আবেগঘন পরিবেশ-সৃষ্টির অবকাশও ছিল কিন্তু লেখক তার প্রতি পাঠকের মনে সহানুভূতি উদ্রেক করিয়েছেন এমনভাবে যখন তার যাবতীয় চপলতা-চটুলতা এক গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে যায়।

এমনই, আর একটি গল্প 'পার্বতীপুরের বিকেল'। এই গল্পটি একটি রাজনৈতিক গল্প হয়ে উঠতে পারত কিন্তু সময়ের কিছু বিবর্ণ দাগ রেখে যাওয়া ছাড়া তাঁর গল্পে রাজনীতি বা ইতিহাস কখনও সচেতনভাবে উত্থাপিত হয় না। পার্বতীপুর একটি নির্জন গ্রাম, চারিদিকে ঘিরে রয়েছে নৈঃশব্দ্যের ম্লান ছায়া। হাঁস হরিয়াল তিতির মেরে শিকারের শখ মেটাতে শহর থেকে শৌখিন মানুষেরা সেখানে যেতেই পারে কিন্তু যখন জানা যায় ওই কলকোলাহল বিবর্জিত গাছপালা-ঢাকা গ্রামে অপরাহ্নের বিষাদখিন্ন ছায়ায় আবৃত হয়ে জনৈক সন্তান শোকাতুর বৃদ্ধটি বিয়াল্লিশ সাল থেকে পড়ে আছেন তাঁর ছেলের সমাধির প্রহরী হয়ে কারণ ছেলেটি শিকারের শখ না মিটিয়ে 'যারা গরীব চাষী মজুরকে ঠকিয়ে খায়, মাঠের ফসল তুলে নিয়ে কালোবাজারে চালান দেয়, চালে পাথর মেশাচ্ছে, তেলে আটা ভেজাল দিচ্ছে', দেশের ও মানুষের সেই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়ে ওখানকার একটি সমাধির নিচে শায়িত রয়েছে তখন পার্বতীপুরে সূর্যাস্ত না হলেও লেখক ও তার বন্ধু অবিনাশের মনে অন্ধকার নেমে আসে। কোনো

সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ নয়, দেশপ্রেমের প্রতি অপ্রমেয় শ্রদ্ধাই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র বিশ্বাস করতেন, মানুষের জীবনের সঙ্গে যৌনচেতনা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। শিক্ষার অভাবেই যৌনচেতনা রুচিবিকারে পরিণত হয়। 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' উমেশ যখন নিজের পরিচয় গোপন করে খালপোলের ওপর ইঁটের গুঁড়ো কিংবা কাঠ কয়লা ঘষে-ঘষে লতাপাতা ফুল মাছ পাখির ছবি আঁকে অথবা চন্দ্র সূর্য সমুদ্র ও পর্বতের প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলে তখন সেগুলো দর্শকমণ্ডলীর বিস্ময়বিমুগ্ধ আলোচনার খোরাক হয় কিন্তু এই শিল্পীই যখন আঁকল চোদ্দটা সাপ, আটাশটা ব্যাঙ, তিনকুড়ি আরশোলা আর বাইশটা টিকটিকি তখন কেউ ভাবে লোকটা পাগল, কেউ ভাবে ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভাবান শিল্পী। এই বিচিত্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্র ইঁট-চূণ-সুরকি-লোহা-সিমেণ্টের সেতুটার মধ্যেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন—'দুপুরের গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে নিঃসঙ্গ ব্রীজটা মানুষের স্বভাবের কথা চিন্তা করে ঠোঁট টিপে হাসছিল হয়তো।' শিল্পী এবার আরো এক ধাপ এগিয়ে এসে সেতুটার দেয়ালে এধারে কুড়িটা আর ওধারে কুড়িটা মেয়ের মুখ আঁকল। ছবিগুলো দেখে তরুণ-তরুণীরা হেসে লুটোপুটি, পরিণত বয়স্কেরা ক্ষুব্ধ ব্যথিত বিরক্ত ও উত্তেজিত। কিন্তু সেতুটা? 'পড়ন্ত রোদের আভা গায়ে নিয়ে ব্রীজটা যেন আলস্যের হাই তোলে।' কিন্তু এইবার একদিন উমেশ বিস্ফোরণ ঘটাল। দেয়ালের গায়ে আঁকল উলঙ্গ নর-নারীর মিছিল। অতএব যে-মুহূর্তে উমেশকে উত্তেজিত জনতা পেল, তখনই তাকে অশেষ নিগ্রহ ভোগ করতে হল। উমেশ তখন বাঁচার সঞ্জীবনীমন্ত্র পেয়ে যায়। সে পুনর্বার নিজের আঁকা ছবি নিয়ে আবার এক পড়ন্ত বিকেলে খালপোলে যাবার জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং কালী দুর্গা, কিছু ল্যাণ্ডস্কেপ 'পরমহংস-টংস' ছাড়া 'মেয়ে-ছেলেটেলের' ছবিও সঙ্গে রাখে। কারণ, উমেশ জনতার যাবতীয় উত্তেজনার উৎস জেনে গেছে, অতএব বাণিজ্যিক চাবি-কাঠিও।

'জ্বালা' গল্পটিও জ্যোতিরিন্দ্র একটি অদ্ভুত উপকরণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। প্রথমে এক নারীর জীবনে উপস্থাপনা করেছেন প্রাকৃতিক উত্তাপের। দুঃসহ গরম হাওয়ায় উত্তপ্ত দীর্ঘ দুপুর যেন আর কাটে না নীরার। জ্যৈষ্ঠের রোদ যেন আগুনের শিখা হয়ে শিস দিয়ে-দিয়ে বেড়ায় রাস্তায়, চারিদিকে সুগভীর নৈঃশব্দ্য আর আলস্যমন্থরতা আরো আগুন, আরো জ্বালা বাড়িয়ে তোলে মানুষের মনে। এর সঙ্গে আর এক জঘন্য জ্বালা যুক্ত হয়েছে চিলের চাপা ডাক-মেশানো শব্দে যা অনন্তকাল ধরে যেন মানুষকে পুড়িয়ে মারছে, মানুষের হাড়-মাংস নিংড়ে নিচ্ছে।

শুধু প্রকৃতি নয়, এবার নীরাকে জ্বালাতে এল এক ভয়ঙ্করতম কুৎসিত পুরুষ,

ছুরি-কাঁচি-বঁটি শানওয়ালা। লোকটা কী খুনে না ডাকাত? নীরার ছোট্ট মেয়ে পিণ্টুরাণী সেই শানওয়ালাকে ভয় করে না, তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের কথা শোনে। কিন্তু নীরার চোখে লোকটা তো শয়তান পাপী নিষ্ঠুর। তার পাকা ভুরুর নিচের থেকে ঠিকরে-আসা দৃষ্টির জ্বালায় সারা অঙ্গ জ্বলে যায় নীরার। শানওয়ালার চেহারা, তার বিকট যন্ত্র ও ধারালো অস্ত্রপাতি দেখে নীরা যখন সংশয়বিদ্ধ হয়ে পিণ্টুরাণীর জীবন সম্পর্কে একটা অস্থির আতঙ্কে কাঁপতে থাকে তখন শানওয়ালার চোখ দুটোও যেন আগুনের ডেলার মতো ফেটে পড়তে চায়, রাগ হিংসা আক্রোশ ও দুরন্ত ঘৃণা নীরাকে বিদ্ধ করতে থাকে। জানা যায়, শানওয়ালার ঘরে সুন্দরী বউ ছিল যাকে সে অভাবের তাড়নায় হত্যা করেছে। তাই তার বুকে এত জ্বালা।

যে-অভাবের তাড়নায় শানওয়ালা তার বউকে হত্যা করে, সেই অভাবের রূঢ় বাস্তব ছবি জ্যোতিরিন্দ্রের অসংখ্য গল্পের উপকরণ। কিন্তু গল্পগুলো শেষ পর্যন্ত কোথাও প্রকৃতি বিষয়ক, কোথাও যৌনতাভিত্তিক, কোথাও বা মনস্তত্ত্বমূলক হয়ে ওঠে। ওঁর গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই শ্রেণীগতভাবে বিত্তহীন কিন্তু রাজনৈতিক অপশাসন বা অর্থনৈতিক শোষণ নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র কদাচিৎ নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। যিনি অননুকরণীয় শিল্পনৈপুণ্যে এমন একজন নিঃস্ব মানুষের ছবি আঁকতে পারেন যে প্রতিবেশীদের অবান্তর কৌতূহল এবং মুদিওয়ালা কয়লা-ওয়ালা ও গয়লা-বউয়ের তীব্র অপমানজনক প্রতিরোধের বেড়া ভেঙে, ভদ্র পাড়ার মাঝখানে উলঙ্গ লজ্জা ছিঁড়ে-খুঁড়ে জীবনে শেষবারের মতো জ্বলে উঠতে গিয়ে অনন্তকালের মতো নিভে গেল, সেই সর্বগ্রাসী রিক্ততার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রের পরিচয় ছিল ওতপ্রোতভাবে। 'তারিনীর বাড়ি-বদল' হয়ে গেল এই লোক থেকে অন্যলোকে, নিঃশব্দে, যেন গাছের পাতা ঝরে যাবার মতো একটা তুচ্ছ ঘটনা ঘটল। শান্ত সমাহিত নৈঃশব্দ্যই জ্যোতিরিন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের মূল সুর।

৪

জ্যোতিরিন্দ্র কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষ কিছু লেখেন নি, কিন্তু তাঁর অনেক গল্পে এরাই মুখ্য চরিত্র। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বয়ঃসন্ধির সচেতনতায় তাদের মনের গহন কোণে যে আবিলতা এসে বাসা বাসা বাঁধে, জ্যোতিরিন্দ্রের প্রায় সমস্ত কিশোর চরিত্র তার প্রমাণ। কিশোর-মনের নিছক দুষ্টুমি, বোহেমিয়ান এ্যাডভেঞ্চার-বিলাসিতা, নতুন পৃথিবীর প্রতি অপরিসীম কৌতূহল, ভাবপ্রবণ কান্না, স্নেহকাতরতা অর্থাৎ যাকে চিরন্তন

উনিশ

কৈশোরক বলে, পৃথিবীর প্রতিটি কিশোরের সেই সংক্রামক অবস্থাগুলো থেকে জ্যোতিরিন্দ্রের কিশোরেরা মুক্ত। তাঁর 'নীল পেয়ালা' গল্পের বৈদ্যনাথের মতো তাঁর চোখে পৃথিবীর প্রতিটি তরুণ যেন জীবন সম্পর্কে প্রচণ্ড অভিজ্ঞ, জীবনের গোপনতম ঘটনাও তার কাছে অজানা নয়। তাঁর সৃষ্ট সমস্ত কিশোর-চরিত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিমজ্জন ঘটেছে নারীদেহে, নারী দেহ ভাবনায়, নারীসঙ্গ কামনায়, অন্ততপক্ষে রমণীর প্রশ্রয়সূচক দাক্ষিণ্যে।

তাই, 'শ্বাপদ' গল্পের নামকরণ যে ছেলেটির চেহারা ও চরিত্র নিয়ে, শেষ পর্যন্ত সেই বন্য শ্বাপদপ্রতিম ছেলেটিই ছিনিয়ে নেয় শহুরে ছেলেটির তরুণী বান্ধবীকে তার রঙ স্বাস্থ্য শক্তি সাহস এবং অসংস্কৃত মন দিয়ে। শহুরে মাসতুতো ভাইয়ের নির্বুদ্ধিতায় বুনো ছেলেটি গরু গাধা বানর শিম্পাঞ্জী বা গাড়লের স্তর থেকে কবে যে যৌনতায় দীক্ষিত হয়ে উঠেছিল তা জানা না গেলেও শহুরে ছেলেটির বিশ্বাসের ভিত টলে যায়। সে ভাবে, গণেশ 'আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।'

যৌন-উত্তেজনা একজন নিরীহ সরল তরুণকে কী ভয়ানক হিংস্র করে তুলতে পারে, 'পতঙ্গ' গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র একটা অদ্ভুত মুন্শিয়ানায় তা বিশ্লেষণ করেছেন। ডক্টর চক্রবর্তীর সি. আই. টি. রোডের ফ্ল্যাটের উলটো দিকের সবুজ মাঠে গোলমোহর ফুলের গাছ থেকে দিনরাত ফুলগুলো সোনার মতো ঝরতে থাকে। নিরিবিলি শান্ত সুন্দর ফ্ল্যাটে, কোকিলের কূজন-মুখরতার মধ্যে, সোনাঝরা সকাল-বিকেলের আশ্চর্য স্বপ্নালু-রমণীয়তায় পলাশ ডুবে থাকতে চায় কারণ সেখানে ডক্টর চক্রবর্তীর রূপসী যুবতী স্ত্রী রূপা আছে। রূপার পিঠময় ছড়ানো চুলের অরণ্যে তার স্বামী, ইতিহাসের অধ্যাপক, হয়তো অরণ্যমর্মর শোনে কিন্তু পলাশের সতেরো বছরের টগবগে তুরন্ত যৌবনে আগ্নেয়গিরির জন্ম দিতে থাকে রূপার যৌবনিত তনুর কামনাকুটিল ইশারা। একদা রূপাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে পলাশ ওদের দাম্পত্য বাদানুবাদে জানতে পারে, ওর স্বামী অঞ্জন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র নিশীথকে রূপার কাছ থেকে প্রশ্রয়চ্যুত করতে চায় এবং রূপা প্রতিশ্রুতিও দেয়। পলাশের মূলধন ছিল অঞ্জনের বিশ্বাস। তাই সে রূপার রূপের আগুনে পতঙ্গ হয়ে পুড়ে মরল একদিন। রূপা যখন তার কুড়ি বছরের দেহ দিয়ে পলাশকে উন্মাদ বানিয়ে ছাড়ল তখন সরল পলাশ বুঝতেও পারেনি রূপার রূপশিখায় সে-ই একমাত্র প্রমত্ত পতঙ্গ হয়ে পুড়ছে না। তার আরণ্যক প্রবৃত্তির লীলায় আমন্ত্রিত নিশীথ রূপার ফ্ল্যাটে গোপন অভিসারে গেলেই পলাশের সামনে রূপার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। রূপাকে হত্যা করে সে আলিপুর জেলের একটা অন্ধকার সেল্-এ দিন কাটায়।

জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প লিখতে বসে লেখক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। এই সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রশ্নে অর্থনীতি বা সামাজিক পদমর্যাদার বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। 'সিঁধেল' গল্পের চাকরটাকে তার মনিব ঘড়ি চুরির অপরাধে যতই সন্দেহ করুক না কেন, সে যে মনিবের প্রতি তার মনিবাণীর ভালোবাসা ও বিশ্বাসের শিকড় কেটে দিয়েছিল তার যৌক্তিকতা কি? কোনোদিন সারা আকাশ জুড়ে গভীর নীল প্রশান্তি থাকলে, সবুজ ঘাসের বুকে বিরলবিন্দু কখনও সোনালী কখনও বেগুনি নীল দ্যুতি নিয়ে জ্বললে আর সেই ঘাসের শিশির ঘিরে হলদে প্রজাপতিরা দল বেঁধে নাচলে কেন 'চন্দ্রমল্লিকা' গল্পের নায়ক তার বিধবা বন্ধুপত্নীকে স্মরণ করে, কেনই বা তার বুকে আকাঙ্ক্ষা জাগে বন্ধুপত্নী বিনুর মুখ থেকে বিষণ্নতা দীর্ঘশ্বাস শোকম্লান গাঢ় ধূসরতা মুছে ফেলে ওকে হাসাতে?

একই প্রশ্ন তোলা যায় 'গিরগিটি' গল্পের মায়ার সম্পর্কে। তার কচি পেয়ারার মতো ছোট্ট সুগোল মসৃণ থুতনিটা স্বামীর খুব প্রিয় অথচ স্বামীর মুখে রাতদিন তার রূপযৌবনের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনে-শুনে মায়া ক্লান্ত হয়, বিরক্ত হয়। স্বামী হিসেবে প্রণব তার কাছে ক্রমশ একঘেয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। তার আবেগ উল্লাস আদর চুম্বনে মায়া দিশাহারা হয় না। বিছানার গন্ধ, প্রণবের গায়ের গন্ধ, চটচটে ঘাম আর গরম সরিয়ে রাত্রির অন্ধকারে জানলার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখে। প্রণব ওকে সব সময় ভাবে বলেই মায়ার মনের যন্ত্রণা বাড়ে, অরুচিকর গল্প অশ্লীল বলে মনে হয়। মায়া জানে প্রণবের চাঁদ দেখার চোখ নেই, পাখির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ শোনার কান নেই। মায়া তাই তার রূপ আকাশকে দেখায়, বাতাস এসে তার গায়ের গন্ধ শোঁকে, গাছ পাতা শালিক বুলবুলিরা তার যৌবন দেখে। সে কোনো পুরুষকে তার রূপ দেখায় না। প্রণবকে দেখে-দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে মায়ার। মায়া যৌবনের সম্ভোগ চায় কিন্তু এ-ব্যাপারে প্রণবের সঙ্গে প্রক্রিয়াগত পার্থক্যের জন্য এই রূপসী তার বিড়ম্বিত যৌবন নিয়ে যেন অচরিতার্থতার বেদনায় আক্রান্ত হয়ে যায়। ছোটবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রদের বাসার কাছে যে মিষ্টির দোকানটা ছিল সেই দোকানের হালুইকরের গিন্নী ছিল পরমা সুন্দরী। 'জোছনা ছাঁকা গায়ের রঙ। টানা-টানা চোখ। হাঁসের গায়ের গন্ধ, খানা-ডোবার গন্ধ, স্যাঁতসেঁতে উঠোন আর ওদিকে হালুইকরের কড়াই থেকে উঠে-আসা খাঁটি ভয়সা ঘিয়ে লুচি-পান্তুয়া ভাজার গন্ধের স্মৃতি দীর্ঘকাল আমার নাকে লেগেছিল। সেইসব গন্ধের সঙ্গে হালুইকরের যুবতী স্ত্রীর অপরূপ রঙ, ছিমছাম কাঠামো ও অনিন্দ্যসুন্দর চোখ দুটির স্মৃতি পরে একদিন আমাকে দিয়ে 'গিরগিটি' গল্প লিখিয়েছিল কিনা কে জানে।'

সুতরাং লেখকের জবানবন্দীর অনুসরণে জানা যায় কোনো কল্পনাসম্ভূতা নারী নয়, বাস্তবেও তার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এই সৌন্দর্যময়ী নারী স্বামীর যৌন-কাতরতায় সাড়া না দিয়ে এক বৃদ্ধকে তার চুলে দোপাটির মালা পবাবার অধিকার দেয়। সেই বৃদ্ধের সরল স্বীকারোক্তি, 'পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরাবিত্তি নেই।' নিছক একটা জংলা ছিটের শায়া পরে মায়া সেই বৃদ্ধের কাছে এলে তার চোখে মায়া একটা চিতাবাঘিনী হয়ে যায় কারণ বৃদ্ধ যে তার ভেতরে 'রসের বাল্ব' জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটা আয়নার মতো ঝকঝকে করে রেখেছে, ছানি পড়তে দেয়নি। সে মায়াকে অবলীলাক্রমে, বলতে পারে, 'বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘষা কোমর দিদির।' মায়া ভয় পেয়ে আঁৎকে ওঠে, সাময়িকভাবে তার কান্নাও পায় কিন্তু যে-পুরুষ তিনবার বিবাহ করেও বৃদ্ধ বয়সে প্রবৃত্তির তাড়নায় পুনরায় বিবাহে উদ্যোগী হয়েছে সেই বৃদ্ধের পৌরুষদৃপ্ত অনুভূতি মায়ার কাছে তার যুবক স্বামীকে ভুলিয়ে দেয়। চিতাবাঘিনী মায়া তার উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের মতো ভুবনের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে হাসে।

'গিরগিটি' গল্পের বৃদ্ধের চোখে মায়া চিতাবাঘিনী, 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পের প্রৌঢ় কুলদারঞ্জনের দৃষ্টিতে লীলাময়ী 'মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিণী কোনো বাঘিনী।' কিন্তু বৃদ্ধের সঙ্গে মায়ার সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল সংগুপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষার ওপর, 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পের লীলাময়ীর সঙ্গে কুলদারঞ্জন পাইনের সম্পর্ক কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। কুলদারঞ্জনের সংসারে ছিল অহরহ শোক তাপ অভাব অনটন আধি-ব্যাধি, অর্ধাঙ্গিনী হেমলতার অব্যক্ত অসন্তোষ, প্রীতি-বীথির মতো 'ধুমসি' দুটো আইবুড়ো মেয়ের যন্ত্রণা ও লেখাপড়া অমনোযোগী ছেলের জন্য বিরক্তি। বাড়িটার ইট-সিমেন্ট খসে পড়ছে, ওঠা-নামার সময় দুর্বল হৃৎপিণ্ডের সিঁড়িটা কাঁপে, একটু বৃষ্টি হলেই ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ে। পার্কার এ্যাণ্ড পার্কার কোম্পানীর সিনিয়র গ্রেড ক্লার্ক কুলদারঞ্জন পাইন কেরানিগিরির একঘেয়েমিতে ক্লান্ত, হেমলতাও বাতব্যাধিতে গুরুতরভাবে আক্রান্ত। ঘরে-বাইরে সর্বতোবিধ্বস্ত কুলদারঞ্জনের প্রতিবেশী হয়ে নতুন ফ্ল্যাটে এল এক নতুন দম্পতি। দেখা গেল, শাড়ি-গয়নার ঝলক, সাবান পাউডার দামি সিগারেটের গন্ধ, ঘি গরমমশলা মাংসের রসনা লোভন সুবাস, লাল আলোর উজ্জ্বলতা। বিধ্বস্ত কুলদারঞ্জনের চোখে স্বপ্ন মাখিয়ে দিল সেই ঘরের নারী। রূপসী যুবতী লীলাময়ীর ছলাকলায় বিভ্রান্ত প্রৌঢ় তার ক্রীতদাস হয়ে যায়। সেই রূপসীর স্বামী যখন কুলদারঞ্জনের দুর্বলতার সুযোগে তাকে দিয়ে কাঠ কাটিয়ে নিতে পরামর্শ দিল তখনও তাঁর ব্যক্তিত্ব তাকে ফুঁসে উঠতে দেয় নি কারণ আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে

গেলে সে কখনও ওই রূপসীর এতটা সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারত না সেখানে দাঁড়িয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে ওর গাল থেকে মাছের রক্তের দাগ মুছে দেওয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্র মনস্তত্ত্বমূলক গল্প রচনা করতে গিয়ে কিশোর চরিত্র নিয়েও নানাভাবে ভেবেছেন এবং 'চোর' গল্পটি এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। একটি তুচ্ছ পেঁপে গাছের চারা এই গল্পের তরুণ নায়কের প্রিয়তম বস্তু। তাদের বাড়ির প্রাক্তন চাকর অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী মনিবের বাড়িতে চাকর হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর এই গাছটি চুরি করে নিয়ে যায় এবং ছ'মাস পরে এই ঘটনাটি জানতে পেরে এই গল্পের নায়ক তীব্রভাবে মর্মাহত হয়। তার মনে হতে থাকে, 'মদন পেঁপে চাকরটা চুরি করে নিয়ে যায়নি। আমার বারবার মনে হচ্ছিল পেঁপে চারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কেবল মদনকে না, আমাকেও, না হলে আমাদের ছোট উঠোন, টিনের ঘর ছায়া-ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ স্নকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।' তার কান্নাভেজা মুখ দেখে মায়ের প্রশ্নের উত্তরে তার স্বগতোক্তি আরো তীব্র ও সঙ্কেতময়, 'আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা-কাপড়-পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে গিয়ে ও বাড়ির শাড়ি-গয়না-পরা, প্রগল্‌ভ-স্বাস্থ্য স্নকুমারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কখন তিনি সাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও স্নকুমারকে আপেল আনারস কেটে দেবেন সেই সোনা-ঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি শুকিয়ে থাকতাম-থাকতে আরম্ভ করেছি। আর কোনোদিন আমি ও বাড়ি যাইনি।'

৫

প্রকৃতি-নির্ভর গল্প রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ মর্যাদার আসন দাবি করতে পারেন, তার প্রধান কারণ লেখকের ইন্দ্রিয় সচেতনতা। তিনি আজীবন প্রকৃতির রূপ রস শব্দ ও গন্ধের মধ্যে আগুন্ত নিমজ্জিত ছিলেন। নিতান্ত শৈশবে ঠাকুর্দার সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে তাঁর অতি-মাত্রায় সজাগ-সচেতন নাকে লেগে থাকত জলে-ডোবানো পাটের পচা গন্ধ, অঘ্রাণ মাসে পাকা ধানের গন্ধ কিংবা বর্ষার দিনে পুঁটি-মৌরলা-খলসে মাছের আঁশটে গন্ধ। তাঁর স্মৃতিচারণার সূত্রে জানা যায়, তাঁর জীবনে প্রথম চমকপ্রদ দৃশ্য ও গন্ধের স্মৃতি হল, হেলিডি সাহেবের বাংলোর লাগোয়া ফুলবাগানে গিয়ে একটি গাছের দুটো ডালে প্রথম সূর্যের রক্তরাঙা আলোর ঝকমকে ছটায় উদ্ভাসিত দুটো সদ্য ফোটা গোলাপ দেখা। ফুল দুটির শিশির ভেজা পাপড়িগুলো সূর্যের কিরণে হাসছিল।

তেইশ

গোলাপের সেই দৃশ্য ও মৃদু কোমল গন্ধ ছেলেটির মন ভরিয়ে দিয়েছিল।

মাত্র সাড়ে চার বছর বয়সে মামার বাড়ি বেড়াতে এলে রঙিন পাখির পালক, ছোট-ছোট বালি-পাথর এবং বাসি বকুল ফুল জ্যোতিরিন্দ্রের মনোহরণ করেছিল। তিনি তখন পাখির পালক দেখে এবং শুকনো বকুল ফুলের গন্ধ বুকে টেনে মুগ্ধ হতে শিখেছিলেন।

কৈশোরে তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় আরো সজাগ ও প্রখর হয়ে উঠল। শুধু ধানের ঘাসের বা ফুলের গন্ধ নয়, পাখির বা পোকা-মাকড়ের গায়ের গন্ধ, মূলো শশা থেকে শুরু করে খড়কুটো, কাঁকড়ার মাটি, এমন কি মাকড়সার জালের গন্ধও অহরহ তাঁর নাকে লাগত। বাসার কাছেই ছিল ভুবন পণ্ডিতের বাসা। সেই বাসায় রান্নাঘরের পিছনে ছিল প্রকাণ্ড বাতাবি লেবুর গাছ। সেই লেবুর লোভে তিনি ওদের বাড়ি গেলে পণ্ডিতের দুই মেয়ে বড় বুড়ি ও যমুনার গায়ে পেতেন বাদ্‌লা দিনে মাটির খোলায় কাঁঠাল বিচি ভাজার গন্ধ। কৈশোরে সেই গন্ধের স্মৃতি ওঁকে দিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে 'বুটকি-ছুটকি' গল্প লিখিয়েছিল। তেমনি শিশুকালে নিত্য যার সঙ্গে প্রত্যূষে বেড়াতে বেড়োতেন, ওর সেই রসনাচেতন দীর্ঘায়ু ঠাকুরদার গায়ের পাকা আমের গন্ধের মতো নিবিড় মদির গন্ধ ও হেলিডি সাহেবের বাংলোর গোলাপের টাটকা গন্ধ মিলেমিশে একদিন ওঁর কলম থেকে 'বনের রাজা' বেরিয়ে এল।

'বনের রাজা' হওয়ার আগে মতির ষাট বছর বয়সের দাদু সারদা একসময় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কলকাতার বাড়ি-গাড়ি ও ভোগবিলাসের জীবন ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে বাগান পুকুর ও মাটির মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়ে জীবনে যেন প্রকৃত চরিতার্থতার সন্ধান পান। তিনি গাছের সঙ্গে কথা বলেন, বিশাল ছায়ার জগতে ঘুরে ঘুরে তার দিন কাটে। প্রকৃতির শব্দ গন্ধ বর্ণ রঙ ও বর্ণবাহারী লীলাবৈচিত্র্যে তিনি নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর দশ বছর বয়সী নাতি মতি প্রতিমুহূর্তে দাদুর বৈপরীত্যে বাবা-মায়ের কৃত্রিম জীবনযাপনের ত্রুটিগুলো যেন পড়ুয়া ছেলের মতো পড়ে নেয় এবং দাদুর সঙ্গে সঙ্গী হয়ে গাছপালার, ফল-ফুলের ও প্রজাপতি-ফড়িংয়ের জগতে বিচরণ করতে করতে ক্রমশ সম্মোহিত হয়ে পড়ে। নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আয়েষ তার মন থেকে ক্রমশ খসে পড়তে থাকে। তাই, শেষ পর্যন্ত, দাদুর নির্দেশে নিরাবৃত হতে তার আটকায় না। তারই চোখের সামনে দাদু নগ্ন হয়ে পুকুরে সাঁতার কাটার সময় হঠাৎ উপস্থিত হয় স্থানীয় এক কিশোরী। মতির অনুরোধে দাদু তাকে লাল শাপলা সংগ্রহ করে দিলেন। কিশোরীটি চলে গেলে দাদু যখন জল থেকে উঠে আসেন তখন তাঁর 'উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে মতির

মনে হচ্ছিল একটা পুরোনো গাছ। অনেকদিন জলের নিচে থাকার পর এখন উঠে এসেছে। গাছের রাজা তো গাছই হবে, মতি ভাবল। দাদুর গায়ের সাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের গায়ের শ্যাওলা। শ্যাওলা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে।' বাড়ি ফেরার পথে মতির কাঁধের ওপর দাদু যখন হাত রাখেন তখন দাদুর গায়ের চামড়ার গন্ধ তার নাকে লাগে। 'মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম-জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না। কোমল মিষ্টি ঠাণ্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। মতি বুঝল। মতি বুঝল না আয়ুর ফিতে লম্বা করতে এই গন্ধও শরীরে ধরে রাখার দরকার আছে কিনা। বুঝতে না পেরে সে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগল।'

চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা ও ত্বকের দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রের অনেক আপাত-অচরিতার্থ চরিত্র জীবনকে উপভোগ করেছে। জীর্ণ-মলিন বেশবাস ও রুগ্ন বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে পথে হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র এই রকম একজন মানুষকে 'সামনে চামেলি' গল্পে চিত্রিত করে দেখিয়েছেন, নানারকম ফুলের গন্ধ ও বিবিধ শব্দ লোকটাকে উন্মন করে তুলত। জীবনের যাবতীয় অচরিতার্থতার টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো তাকে বেদনাবিধুর করে তুললেও সে যখন রাধাচূড়া, যে-ফ্লাওয়ার ইউক্যালিপটাসও দেবদারু বেষ্টিত ব্যালকনি থেকে নয়নবিমোহন পোশাক-পরিহিতা যুবতীকে দেখে তখন সে ক্ষণিকের জন স্বপ্নাবিষ্ট হয়। স্বপ্নভঙ্গের পরে সেই বিপন্ন আর্ত যুবকটি পুনশ্চ অনুভব করে সামনে কোথাও চামেলি ফুটেছে কিনা তার সন্ধানে নিরন্তর এগিয়ে চলা ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর নেই। 'আম কাঁঠালের ছুটি'তেও এক জরাজীর্ণ বাড়িতে বসে এক জরতী বৃদ্ধা যখন তার বৃদ্ধ বৃদ্ধ পুত্রের কাছে পুরোনো দিনের কথা বলতে থাকে তখন বোঝা যায় কেন তার রসনা সারাক্ষণ রসসিক্ত হয়ে আছে। একদা এই বৃদ্ধার জীবনে সব কিছু ছিল—উলুর শব্দ, শাখের ফুঁ, ঢাকের বাদ্যি, আতুড়ের ট্যাঁ ট্যাঁ, অন্নপ্রাশনের রান্নার ঘটর-ঘটর আওয়াজ, আত্মীয়কুটুম্বের আনা-গোনা, হই-চই, হাঁচি-কাশির পুঞ্জিত শব্দমালা। কিন্তু এখন সব নীরব, নিথর। বৃদ্ধারও শ্রবণেন্দ্রিয় এখন অকেজো, দৃষ্টিশক্তিও ক্রমক্ষীয়মাণ। রসনা তৃপ্ত করাই যেন এখন তার জীবনের পরম সার্থকতা।

প্রকৃতিনির্ভর গল্প লেখায় জ্যোতিরিন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্য বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পাঠকেরা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক গল্পগুলোর ভাষা কিঞ্চিৎ কাব্য-অনুসারী, কাঠামো মনস্তত্ত্বমূলক এবং চরিত্রগুলো একটা প্রচণ্ড অসহায়তায় ভোগে। প্রকৃতি 'পার্সোনিফায়েড' হতে-হতে এমন একটা উত্তুঙ্গ স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে সেই অভ্রভেদী পটভূমিকায় চিত্রিত নর-

নারীরা তাদের যাবতীয় অসহায়তা নিয়ে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। তরুণ-তরুণীর অবৈধ প্রেমের ফসল যখন তাদের গোপন লজ্জা হয়ে মাটির নিচে শায়িত থাকে তখন 'বৃষ্টির পরে'র প্রভাত তার পুত্রের আচরণে গভীর অসহায়তায় ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু বাইরের উত্তপ্ত বাতাস যখন শীতল হয়ে বৃষ্টি ঝরে পড়ল তখন তার যাবতীয় অসহায়তা, বিপন্নতা ও ক্রোধ উবে গেল। শেষ পর্যন্ত সে একজন বিমর্ষ দুঃখী মানুষে রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টির জলে স্নান করে-করে গাছের রঙ ফেরার উল্লাস দেখল। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ঋতু পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের জীবনচক্রের বিবর্তনের ধারা কোথায় যেন কেমন ভাবে লুকিয়ে আছে, এই ধরনের একটা উপলব্ধিতে প্রভাতের মন আশ্রয় পায়।

'গাছ' গল্পটিও প্রকৃতিকেন্দ্রিক কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র এই গল্পটিতে একটি গাছের প্রতীকী ব্যবহারে চূড়ান্ত রসসিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। গাছের মনে গাছটা দাঁড়িয়ে থাকে। 'বর্ষায় পাতাগুলি বড় হয়, পুষ্ট হয় ; শরতে পাতাগুলি ভারি হয়, মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ সেই সবুজ-কালো গভীর ধূসর হয়ে ওঠে তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নিরক্ত প্রসূতির পাণ্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝড়ে পড়ে। গাছ রিক্ত হয়। তখনও গাছ গাছই থাকে।'

দু-তিনটে বাড়ির মাঝখানে এক ফালি পোড়ো জমির ওপর গাছটা দাঁড়িয়ে ছিল ওটাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকদের সুখ-দুঃখের নানা আবর্ত ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকে। পাশের বাড়ির সবুজ জানলা দিয়ে যে-যুবতীকে দেখা যায় তার ঘৃণা গাছটাকে যেন শয়তান বানিয়ে ছাড়ে, ওটার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কিন্তু লাল রঙয়ের জানলার মানুষটির স্নেহ প্রেম মমতা সহানুভূতি সবাইকে বুঝিয়ে দেয়, ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত মানুষগুলোর জীবনে গাছটি একটি কবিতার মতো। সাময়িক উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে গাছের মনে গাছটি আবার দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু গাছটি বিনাশ করতে যখন স্বয়ং উদ্যত হল সে সবিস্ময়ে দেখল তার প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সেই ক্ষমাসুন্দর পুরুষ যে সেই যুবতীকে প্রেমের দীক্ষা দিল। সেই মুহূর্তে গাছটির ভূমিকা কি ছিল? বাংলা সাহিত্যে একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রই লিখতে পারেন সে কথা, আঁকতে পারেন সেই ছবি : 'গাছ চোখ বুঝল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমাতে পারেনি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।'

জ্যোতিরিন্দ্রের চোখে মানুষ প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র। প্রকৃতি তার সর্বগ্রাসী

ছাব্বিশ

ছায়া বিস্তার করে নর-নারীকে আলিঙ্গন-আশ্লেষে বদ্ধ করে রাখতে পারে আবার বিশাল অস্তিত্ব নিয়ে নর-নারীকে আর্ত বিপন্ন ও অসহায় করে তোলে। সামান্য একটি গাছ তার অসীম ক্ষমতায় একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়েকে একই সূত্রে বেঁধে দিতে পারে আবার দিগন্তপ্রসারী নিঃসীম সমুদ্র যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনতিক্রম দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে তা বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সমুদ্রভিত্তিক গল্পের রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর 'সমুদ্র' গল্পে দেখিয়েছেন। দূর সমুদ্রের গভীর নিঃস্বন, তীরগামী সমুদ্রের উত্তাল উল্লাস লেখকের কানে সৃষ্টি ও লয়ের গূঢ় গম্ভীর শব্দ বলে মনে হত। জীবনে প্রথমবার পুরীতে যাবার অভিজ্ঞতা লেখক এই গল্পে উত্তমপুরুষের জবানিতে ব্যক্ত করেছেন। কখনও তারাখচিত আকাশের নীচে দিগন্তবিসারী অন্ধকারের ভয়ঙ্কর আলোড়ন, কখনও স্পন্দমান কম্পমান অন্ধকার ফেটে ফেটে রাশি রাশি ফুলের স্তবক হয়ে তীরের দিকে ছুটে আসা—সমুদ্রের এই অগাধ উত্তাল ফেলেছিল ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য লেখকের প্রণাম আদায় করে। কখনও সীসার রঙ হঠাৎ দিগন্ত ঘেঁষে গাঢ় নীল রঙ ধরে, মাঝ-সমুদ্রের জলে সবুজের ছোপ যেন বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির রঙ, আর একটু কাছের জল গৈরিক। গল্পের নায়ক ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তিনি আকাশের কোল ঘেঁষে শুয়ে-থাকা শান্ত গম্ভীর নীল রহস্যে ভরা দূরের সমুদ্রকে বেশি ভালোবাসেন অথবা তীরের কাছের তরল হাস্যোচ্ছল শুভ্র ফেণাবিকীর্ণ খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত মুখর তরঙ্গমালা তাঁর বেশি প্রিয় হবে। পুরীর সমুদ্রতীরে তিনি স্ত্রী হেনাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিতে 'ছোট' হয়ে গেছে এখন। তাঁর মনে হতে থাকে, হেনাকে না আনলেই ভালো হত। তাঁর সমগ্র চেতনা জুড়ে সমুদ্র তার রহস্যময় ভয়ঙ্কর বিশালতা নিয়ে উপস্থিত থাকে, হেনা যেন ক্রমশ হারিয়ে যায়। সমুদ্র তাঁর অতীতকে তুচ্ছ করে দেয়, ঝামাপুকুর লেনের দোতলার কোনো ফ্ল্যাটের এক তেজস্বিনী মহিলা হেনা এখন যেন লেখকের কাছে নিতান্তই এক ঘুমন্ত খরগোস। তাঁর অনুশোচনা হয়, তিনি এতদিন হেনার দেহ-সমুদ্রদর্শনের উৎকট কামনায় কত মূঢ় উল্লাস, বিবর্ণ ইচ্ছার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। এখন হেনাকে লেখক নিছক একটা মাছি বলে ভাবতে পারেন যখন সে বালুকার ওপর দিয়ে ছুটে-আসা সমুদ্রের জুঁইফুলের মতো ফেনার সামনে ছুটোছুটি করে। একদা সমুদ্রের উন্মত্ত উত্তালতায় বিধ্বস্ত হয়ে হেনাকে তার স্বামী সমুদ্রের কাছে উপহার দিতে উদ্যত হয় কারণ সমুদ্রপাগল এক ব্যক্তির দুর্নিবার প্ররোচনা তাঁর চোখের সামনে সমুদ্রকে এক ভয়ঙ্কর লুব্ধ দানবের প্রতিকৃতি হিসেবে গড়ে তুলেছিল। বিপর্যয়ের হাত থেকে হেনা শেষ মুহূর্তে উদ্ধার পেলে জানা যায়, সমুদ্র পাগল ব্যক্তিটি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় তার স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছিল। পাঠকের তখন আর অজানা থাকে না—তার মামার

শখের এ্যালসেশিয়ানটাকেও সে-ই সমুদ্রগর্ভে বিসর্জন দিয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্র মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড সর্বত্র বজায় রয়েছেন—শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য কোনো তারতম্য নেই। স্বপ্নস্বরূপা যুবতী এবং মৃত্যুপথযাত্রিনী বৃদ্ধার হৃদয়ের রঙ-এ রয়েছে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য—এই মানদণ্ডের নাম যৌনবাসনা। সৃষ্টির রহস্য, নর-নারীর দেহজ সম্বন্ধ জ্যোতিরিন্দ্রের শিল্পী সত্তাকে তীব্রতম আকর্ষণে আসক্ত করেছে। তাঁর সাহিত্যের ভূগোল খুবই সংকীর্ণ, রচনায় আঞ্চলিকতার স্বাদ নেই, রাজনীতি ও অর্থনীতি তাঁর গল্পে মুখ্যভূমিকা পালন না করে নেপথ্যে পড়ে থাকে। শুধু মানুষের যে অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলো পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে উপস্থিত, মানুষের রক্তের তথা অস্তিত্বের সঙ্গে যেগুলো ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, সেই চিরন্তন প্রবৃত্তির রহস্য-উন্মোচনেই জ্যোতিরিন্দ্র চিরকাল আবিষ্ট থেকেছেন। তিনি মানুষ ও প্রকৃতির সহজ সরল বন্য ও অসংস্কৃত রূপের চিত্রকর।

৭২/৪ বারুইপাড়া লেন
কলকাতা ৭০০০৩৫

নিতাই বসু

নদী ও নারী

জায়গাটা সুন্দর।

রাক্ষসী পদ্মার এমন ছায়ানিবিড় শ্যামল সমতল তটরেখা সহজে চোখে পড়ে না। কথামতো তীরের প্রকাণ্ড অশত্থ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে লক্ষ্মণ মাঝি নৌকা বেঁধে ফেললে।

নির্মলা যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কটা দিন একটানা নদীর উপর ভেসে ভেসে অরুচি ধরে গেছে।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে লক্ষ্মণ বললে, 'ইচ্ছে হলে ছুটো দিন জিরিয়ে নাও না—অসুবিধে নেই, এককোশ উত্তরে গঞ্জ আছে, ঐ হোথা, ওটার নাম নীলগাঁও।'

তীরে নেমে এদিকে ওদিকে একটু পায়চারি করে নির্মলা আবার এসে নৌকোয় উঠল। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর পাড ধরে মাঠের পর মাঠ। পরিষ্কার স্বচ্ছ শষ্পতটের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ গঞ্জে যাবার। এখানে ওখানে ছুটি একটি নারকেল গাছ। চারিদিক নিঃঝুম। নির্মলার শাড়ির খসখস শব্দ ও হাতের চুড়ির আওয়াজ টের পেয়ে একটা মাছরাঙা 'ক্রিক' শব্দ করে উড়ে গেল।

নৌকোর গলির উপর বসে হুঁকো টানছিল লক্ষ্মণ। বললে, 'সইবে না, রাক্কুসী এও একদিন গিলে সাবাড় করে দেবে—'

ছইয়ের ভিতর গুটিসুটি বসে সুরপতি মেঘনাদবধের পাতা উলটোচ্ছিল। নদীতীর সম্বন্ধে নির্মলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং লক্ষ্মণের মুখে পদ্মাগর্ভে এর পরিণতি-সম্ভাবনার খেদোক্তি শুনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

জায়গাটা সত্যিই মনোরম।

একদিকে জল একদিকে মাটি।

পরিব্যাপ্ত অগাধ আকাশের তলে অনন্তের স্তিমিত বিধুর সুরটি এসে কানে লাগে।

ঠিক হয়ে গেল, কাল ছুপুরের পর দিন ভালো থাকলে সন্ধ্যা নাগাদ নৌকো ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু একটা জিনিস সকাল থেকে তারা লক্ষ্য করে আসছে। অদূরে কার

জানি সাদা রঙের একটা বোট চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ওটায় মানুষজন আছে কিনা তাও বোঝা গেল না। বোটটা দেখতে ভারি সুন্দর।

অনুমান করে সুরপতি বলেছিল, 'সাহেব-সুবো কেউ হবে হয়তো—হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।'

গম্ভীর মুখে লক্ষ্মণ বললে, 'কাশীপুরের কুমারবাহাদুর ইদিকে প্রায়ই চরে শিকার করতে আসেন।'

শুনে নির্মলা তো প্রথমে ভয়েই অস্থির।

তারপর আস্তে আস্তে ভয় কেটে যায়।

সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার হলেও সাহেব অথবা কুমারবাহাদুরের নিশ্চয়ই দেখা পাওয়া যেত। সুতরাং ঠিক হল—বোটটা এমনি—ওতে কেউ নেই।

নদীর অপর পারে প্রকাণ্ড চর মরুভূমির মতো ধুধু করে। কোথাও যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে এককালি জলের রেখা রৌদ্রে চিকচিক করে। কথা হল কাল খুব সকালে নৌকা নিয়ে চরের ওদিকটায় একবার বেড়িয়ে আসা যাবে—খুব বেশি দূরে নয় যখন।

একঝাঁক বালিহাঁস সোঁ সোঁ শব্দ করে আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ছুটে নৌকোর ছইয়ের বাইরে এসে নির্মলা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল।

দুপুরবেলা।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুরপতির আলসেমি এসেছে, একটু তন্দ্রার ভাব। হাতের মেঘনাদবধ এক পাশে সরিয়ে রেখে কাত হবে এমন সময় নির্মলা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ওগো দেখো!'

'ব্যাপার কি!' সুরপতি উঠে বসল।

নির্মলার চোখে মুখে বিস্ফারিত বিস্ময়।

সুরপতি জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে শুনি!'

'হবে আবার কি, দেখো না চেয়ে।' ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে হাত-পা ঝাড়া দিয়ে উঠে সুরপতি বাইরে যাবার উপক্রম করছিল, হাত ধরে নির্মলা তাকে বসিয়ে দিল।—'এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।'

ছইয়ের গায়ে ছোট-বড়ো কয়েকটা ছিদ্র ছিল। আঙুল দিয়ে সেই দিকে ইঙ্গিত করে নির্মলা চুপি চুপি বললে, 'সাদা বোট—দেখো কাণ্ড!'

বেড়ার গায়ে সুরপতি চোখ চেয়ে রইল। নির্মলা দেখছিল আর-একটা ছিদ্রপথ দিয়ে।

ব্যাপারটা দুজনের কাছে সত্যি কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল।

তেমনি, অস্ফুট অনুচ্চ গলায় নির্মলা কতক্ষণ পর প্রশ্ন করলে, 'কিছু বুঝলে ?'

'না—'

'একেবারে ফ্যাশানের ফানুস !'

'তাই তো দেখছি ।'

'কত বয়স হবে, উনিশ-কুড়ি ?'

'ঠিক অনুমান করতে পারছিনে'—স্ত্রীর মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে ফের ছিদ্র-পথে চোখ রেখে সুরপতি বললে, 'হ্যা, তার নিচে নয়, একুশ-বাইশও হতে পারে ।'

'মেয়েমানুষ বঁড়শি ফেলে আবার মাছ ধরে নাকি ।'

'তাতে আর দোষ কি'—বললে বটে সুরপতি, কিন্তু তার চোখেও সমস্তটা কেমন বিসদৃশ ঠেকছিল ।

'বিয়ে হয়েছে ? না বোধহয় ।' বেড়ার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটা সূক্ষ্মতর করে চালিয়ে দিয়ে নির্মলা যেন আপন মনেই বললে, 'তা'লে মাথায় কাপড় থাকত ।'

সুরপতি চুপ করে ভাবছিল, সম্রাজ্ঞীর মতো বোটের ছাদ আলো করে ইনি কে ! কি তাঁর পরিচয় । অথচ সঙ্গে ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েটার পরনে ফিকে নীল রঙের শাড়ি—ঘাড়ের উপর দিয়ে মাথার পিছনে খোলা আঁচলটা বাতাসে নিশানের মতো পতপত করে উড়ছিল । বেঁটে ছাতা বাঁ হাতে, রোদের দিকে তেরছা করে ধরা । বেশবিন্যাসে তিনি যে উগ্র রকমের একজন আধুনিকা সে বিষয়ে সুরপতির সন্দেহ রইল না । সুরপতি চেয়েই আছে ।

পিঠে নির্মলা আঙুল দিয়ে খোঁচা দিতে সোজা হয়ে বসল ।

'কানে যায় না কথা, কেমন ?' নির্মলার চোখে দুষ্টু হাসি ।

'কি বলছ ?'

'একেবারে মজে গেলে দেখছি ।'

'অ, সে-কথা ।' সুরপতি হাসল । পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'তা মন্দ কি ।'

'মন্দ আমিই বলছি নাকি'—কৃত্রিম অভিমানে নির্মলার মুখ থমথম করে ওঠে ।

উঠে গিয়ে দড়িতে ঝুলানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট এনে সুরপতি আবার বেড়ার ধার ঘেঁষে বসল । '—দেখো, ওসব ঢের দেখেছি, যাকে বলে ফাঁপা বেলুন ।'

স্বামীর কথায় নির্মলা খিলখিল করে হেসে ফেললে ।

'সত্যি বলছি ওদের কেবল ঠাট আর ঠমক ।' সুরপতি সিগারেট ধরাল : 'অত বড়ো ধিঙ্গি মেয়ের আবার বব্‌ড কাটা চুল, যেন কচি খুকী ।'

'ঢঙ আর কি'—নির্মলা বললে ।

'মেয়েমানুষের বেহায়াপনায় চোখ টাটায়।'

এবং এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে প্রসঙ্গটা কথায় কথায় আরো বিস্তৃত ব্যাপক করে তুলল। বস্তুত তারা কেউ আন্দাজ করে ঠিক করতে পারলে না, মেয়েটা কে।

লক্ষ্মণ সেই দুপুরবেলা তীরে উঠে কোন্ দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে।

পাটাতনের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে সুরপতি গা এলিয়ে দিল।

নির্মলা ঠায় বসে আছে।

বেড়ার ছিদ্র-পথে একটা চোখ তেমনি ঠেকানো। অসীম ধৈর্যসহকারে আশ্চর্য দ্বীপের মতো সেই সাদা বোটের দিকে সে তাকিয়ে দেখছিল। ইতিমধ্যে দু-বার ছাদ থেকে নেমে গিয়ে বোটের ভিতরে ঢুকে কি জানি কতক্ষণ টুকটাক করে মেয়েটা আবার উঠে এসেছে উপরে।

ক্রমে বেলা পড়ে গেল!

আকাশ ও পদ্মার প্রসারিত বক্ষ ছেয়ে নেমে এল দিনাবসানের নির্মল অবসাদ। পরপারে ধূসর বালির বিছানায় আঁকাবাঁকা জলের রেখা অস্তসূর্যের আভা লেগে সোনা হয়ে উঠেছে।

একটা কাণ্ড ঘটল।

বোট থেকে নেমে ডাঙায় উঠে মেয়েটা কি নিয়ে জানি একটা লোকের সঙ্গে রীতিমতো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছে।

কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা না গেলেও মেয়েটার গলার চিৎকার ওখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। হাতমুখ নেড়ে কখনো হিন্দী কখনো বাংলা কখনো বা মিশ্রভাষার শ্রাদ্ধ করে লোকটাকে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে। একটা কথা মুখ তুলে বলবার ফুরসত পাচ্ছে না বেচারা। মেয়েটা তুবড়িবাজির মতো ফেটে পড়ছিল।

সুরপতির মুখের দিকে নির্মলা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

'কি নিয়ে কিছু বুঝলে?'

'না—'

'একেবারে রণরঙ্গিণী!'

'আচ্ছা দজ্জাল মেয়ে।'

ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখবার জন্যে ফের ছইয়ের গর্তে নির্মলা চুপি দেবার চেষ্টা করতেই সুরপতি বললে, 'থাক—ঢের হয়েছে।'

সুরপতির রুচিতে বাধে এসব। বললে, 'উনি উড়নচণ্ডী দলের একজন, বলিনি? শুধু পথে ঘাটে—হাটে গঞ্জেও কোমর বেঁধে ওরা বাইরের লোকের সঙ্গে

ঝগড়া করতে পারে, আবার মস্করাও জানে।'

কিন্তু ছইয়ের ফাঁক দিয়ে নির্মলা তবু চেয়ে রইল। কৌতূহল দমন করতে পারে না।

কতক্ষণ পর লক্ষ্মণের দেখা পাওয়া গেল। মাঠ ভেঙে ওদিক দিয়েই সে আসছিল। আস্তে আস্তে বোটের সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কি শুনে নিয়ে লক্ষ্মণ নৌকোয় ফিরে আসতেই নির্মলা জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে ?'

'সামান্য একটা ডিম নিয়ে।'

'লোকটা বুঝি ডিমের ব্যাপারী ?'

'হ্যা—সকালে দু-গণ্ডা ডিম দিয়ে গেছল, একটা নাকি পচা ছিল।'

'একটা—একটা ডিম পচা ছিল বলে এত ! অমন গলা শাসানি, চোখ রাঙানি —বলিস কি রে !'

নির্মলার ভ্রূযুগল কপালে উঠে গেছে, বললে সুরপতির দিকে চেয়ে, 'শুনলে—শুনলে কাণ্ড ?'

লক্ষ্মণ বললে, 'একেবারে তিরিক্ষি মেমসাহেবী মেজাজ।'

'মেজাজ বলে মেজাজ'—নির্মলা হেসে উঠল, 'মনে করেছিলুম কি না-জানি রাহাজানি হয়ে গেল।'

'মেজাজ না ছাই'—উপেক্ষায় সুরপতি ঠোঁট উলটোল, 'ঐ তো ফড়ফড়ানিটুকু সম্বল, আর আছে লোক-দেখানো ফুটুনি। বোলো না আর আমার কাছে।'

প্রসঙ্গটা তখন সেখানেই চাপা পড়ে গেল।

নৌকোয় আসবার পর থেকে ভাতের হাঙ্গামা হয় না, রুটি চলে। আটার ডেলাগুলো থালায় সাজিয়ে রেখে পাটাতনের নিচে থেকে বেলুন আর চাকতি তুলে নিয়ে নির্মলা রুটি গড়তে বসল।

পাশে বসে সুরপতি গল্প করছিল। ওদিকে গলুইয়ের উপর অন্ধকারে চুপচাপ বসে থেকে লক্ষ্মণ মাঝে মাঝে ঝিমোয়, কখনও বা গুনগুন করে গান গায়, হুঁকোয় দম দেয়!

এক একটা দমকা বাতাস এসে নৌকোটা দুলিয়ে দেয়—ছইটা নড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা কাঁপতে থাকে। তীরে আঘাত লেগে জলের ছলছল শব্দ হচ্ছিল, আর ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে একটানা ডাক! নির্মলার রুটি-গড়া প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ ওদিকের বোট থেকে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী আরম্ভ হল।

উৎকর্ণ হয়ে নির্মলা বললে, 'কে গান গায় ?'

'আবার কে হবেন, উনিই'—সুরপতি সোজা উত্তর দিলে।

'মেয়েটা!'

'আমার তাই মনে হচ্ছে। নইলে কে আর হবে।'

'এই রাতে, নৌকোয়, নদীর উপর!'—নির্মলার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল—'সাহস তো কম নয়!'

'তুমি গিয়ে মানা করে দাও না।'

'কারো মানা শুনতে বয়ে গেছে বড়ো।'

সিগারেট ধরিয়ে সুরপতি বললে, 'যার যেমন রুচি—মরুক গে সারারাত চেঁচিয়ে, আমাদের কি।'

নির্মলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। অজানা অপরিচিত জায়গায় তাতে নৌকায় বসে গলার কালোয়াতি করে এ কোন্ জাতের মেয়েমানুষ। তবু যদি ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত একটা কিছু হত। একেবারে সস্তা থিয়েটারী গলা।

সুরপতির কানে কানে বললে, 'আমার কিন্তু মোটেই ভালো ঠেকছে না।' ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেও সুরপতি চুপ করে রইল।

অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নির্মলা ব্যাপারটার একটা হিল্লে করতে পারলে না। গান থেমে গেলেও গানের রেশটা কুৎসিত সরীসৃপের মতো তার কানের কাছে কিলবিল করছিল।

কথামতো পরদিন খুব সকালে লক্ষ্মণ নৌকো ছেড়ে দিল। দূরে ধূসর নীল আকাশের প্রান্তসীমায় জলের ধার ঘেঁষে একটা বড়ো তারা তখনো দপদপ করছে।

লক্ষ্মণ বললে, 'চর দেখে ফিরে আসতে এক পহর বেলা হবে খুব।'

নির্মলা বললে, 'একটু হাত চালিয়ে বৈঠা ফেলো বাপু—ফিরে এসে আবার আমার রান্না-বান্না আছে।'

ছলছল শব্দ করে একটা জেলেডিঙি পাশ কেটে চলে গেল।

সুরপতি বললে, 'তোমার সব কিছুতেই তাড়া। রান্না-বান্না একদিনের জন্যে বন্ধ থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না—আপাতত চরে পৌঁছোনো যাক—কি বলিস লক্ষ্মণ?'

লক্ষ্মণ সে কথার উত্তর দেয়নি। মৃদু হেসে শুধু মাথা নাড়ল। তার বাঁ হাতে হুঁকো। বৈঠাটা রেখে ডান হাতে হালটা তখন সে সজোরে চেপে ধরেছে। জায়গাটায় একটা পাক আছে।

খানিকক্ষণ পর সুরপতি একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওটা বুঝি লক্ষ্মীপুর-ঝিকড়ছড়া?'

'হ্যাঁ, বদন ফকিরের দরগা ছিল ও গাঁয়ে, কত রাজ্যের লোক এসেছে ওষুধ নিতে, ফকিরের ওষুধ খেয়ে ব্যামো ভালো হয়ে গেছে।' লক্ষ্মণ পুনরায় হাতে বৈঠা তুলে নিল।

'বদন ফকির অনেক দিন মরে গেছে?'

'কবে!' লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বললে, 'সেই বাইশ বাংলায় জলে এক সন্ধ্যায় দরগাটা জলের নিচে তলিয়ে গেল আর এক সন্ধ্যায় ফকিরও চোখ বুজল—একটা গান আছে।'

গুনগুন করে লক্ষ্মণ বদন ফকিরকে নিয়ে রচিত গানের একটা কলি ভাঁজতে থাকে।

গান থামিয়ে লক্ষ্মণও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

ভয়ের কিছু নেই অবশ্য, তবু নৌকোটা তখন নদীর একেবারে মাঝখানে। চতুর্দিকে পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বিস্ফাবিত জলরাশির কলকল শব্দ। ভয়ে নির্মলার মুখ একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে। সুরপতির হাতের মধ্যে নির্মলার একটা হাত। ঢেউয়ের সঙ্গে নৌকো ভীষণ দুলছে, টলছে।

কোন্ দিকে যেন স্টিমারের ক্ষীণ 'ভোঁ' শোনা গেল।

লক্ষ্মণ বললে, 'গোয়ালন্দর ইস্টিমার।'

তারপর ভয়টা কেটে গেল।

দেখতে দেখতে মাঝনদী পার হয়ে নৌকো একদিকে সরে এল।

চোখের সামনে নির্জন নিঃশব্দ বালুচর। পুবদিকে আকাশের রঙ উঠেছে গোলাপী লাল হয়ে।

তীরের বালি ঘেঁষে লক্ষ্মণ নৌকো এনে দাঁড় করালে।

সুরপতি বললে, 'চলো।'

'কোথায়!' নির্মলার চোখ বড়ো হয়ে উঠেছে।

'এই তো চর'—সুরপতি নির্মলার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল—'একটু ঘুরে দেখবে না?'

'তা তো এখান থেকেই দেখা চলে'—ফ্যালফ্যাল করে নির্মলা তীরের দিকে চেয়ে ঢোঁক গিলতে লাগল—'নেমে আবার দেখতে হবে নাকি!'

এবার আর সুরপতি হাসি সংবরণ করতে পারলে না, 'তাই অত তোড়জোড় করে চর দেখতে আসা—এসো, বাঘ কুমীর এখানে নেই।'

লক্ষ্মণ পূর্বেই বলেছিল চর দূর থেকে দেখতে ভালো। কথাটা সত্য। বালির উপর দিয়ে হাঁটবার সময় এমন কোনো নূতনত্ব চোখে পড়ল না। কেবল এখানে সেখানে সাদা আর কালো মাটির ছোপ। কেমন একটা সোঁদা গন্ধ। আর

দেখা গেল রাশি রাশি ঝিনুক, শামুক ইতস্তত ছড়ানো।

নির্মলার আঁচল ঝিনুকে ভারী হয়ে উঠল। হেসে স্নরপতি বললে, 'তবু দেখছি শেষ পর্যন্ত তোমারই লাভ হল।'

কথায় কথায় তারা তখন একটা সরু নালার ধারে এসে গেছে।

মানুষের আওয়াজ পেয়ে ফরফর করে কয়েকটা বন্য হাঁস এদিকে ওদিকে উড়ে গেল। একটা হাঁস নির্মলার কান ঘেঁষে মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

ঠাট্টা করে স্নরপতি বললে, 'হাত বাড়িয়ে ধরলে না কেন।'

সামনে কি যেন দেখতে পেয়ে নির্মলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে স্নরপতিও দাঁড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্মণ এক পাও এগোচ্ছে না। নালার পাশে বালির ঢিবিটার উপর সকলের দৃষ্টি।

সেই মেয়েটা, হাতে বন্দুক।

চোখাচোখি হতেই বালির ঢিবি থেকে নেমে নিকটে এসে ঘাড় নেড়ে ছোট একটা অভিবাদন জানিয়ে উচ্চকিতে হেসে উঠল, 'আমার শিকার তাড়িয়ে দিলেন, মাত্র নিশানা ঠিক করছিলুম।'

বিমূঢ় স্নরপতির মুখ দিয়ে কথা বেরনো দূরে থাকুক প্রতি-নমস্কার জানাতে গিয়ে হাত উঠল না। একপাশে দাঁড়িয়ে নির্মলা কেমন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘছন্দ নিটোল নিভাঁজ গড়ন, কোমরে আঁট করে জড়ানো আঁচলটা, হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল একটা চিতাবাঘের মতন।

রাইফেলটা বাঁ হাতে এনে ডান হাত দিয়ে কপালের চুল কানের ওপিঠে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'অবিশ্যি কাল দু-একবার দেখেছি, ঐ নৌকো তো অশথ গাছে বাঁধা ছিল ?'

স্নরপতি আর নির্মলা তাকিয়েই রইল। চিবুক দু-দিকে ঈষৎ চাপা, পুরুষের মতন, একটু ধারালো, শক্ত। বললে, 'আপনারা এই সবে এলেন তো ? আমি এসেছি অন্ধকার থাকতে—'

অপরিচয়ের কুণ্ঠা এ মেয়ে জানে না। কণ্ঠে রূপোলি হাসির বান ডেকে গেল, 'এসে অবধি একটা হাঁস ফেলতে পারিনি, আর পারব না আজ, রোদ চড়ে গেল।'

একবার থেমে গম্ভীর হয়ে নদীর দিকে তাকাল, ঘাড়ের রেখায় ফুটে উঠল সতেজ ভঙ্গিমা।

'আচ্ছা আসি তবে, বেলা হলে বাবু রাগ করবেন।'

চলতে গিয়ে রহস্যময়ী ফিরে দাঁড়াল, বললে স্নরপতি আর নির্মলার দিকে চেয়ে —'যাবেন কিন্তু আমার বোটে দয়া করে একটিবার।'

মধ্যাহ্নের আকাশের মতন স্বচ্ছ প্রখর চাউনি। শিস দিতে দিতে বালির

উপর দিয়ে তরতর করে সে চরের ওদিকটায় নেমে গেল।

ছোট ডিঙি, কেউ নেই সঙ্গে, নিজের হাতে বৈঠা ফেলে দেখতে দেখতে মাঝনদীতে ভেসে পড়ল।

দেখে নির্মলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গিয়ে সুরপতি ফিরে এসেছে তার সহজ স্বাভাবিকতায়। ঠোঁট উলটে গলায় অদ্ভুত একটা সুর করে বললে, 'একেবারে তয়ের হয়েছেন, অতিরিক্ত নাই পেয়ে যা হয়—আধুনিক—ছোঃ—'

নির্মলা ঠোঁট বেঁকিয়ে নিচু স্বরে একটা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করল। তাই শুনে হো হো শব্দ করে সুরপতি হেসে উঠল—'ঢের দেখেছি, এর এমন লেফাফাদুরস্ত উগ্র সংস্করণটাই বুঝি অ্যাদ্দিন দেখবার বাকি ছিল।'

কাণ্ডকারখানা দেখে বেচারা লক্ষ্মণ বেকুব হয়ে গেছে।

নৌকোয় করে ফিরবার পথে নির্মলা ফিসফিস করে বললে, 'বাবুটি কে, বলে যে গেল ও?'

'হবে আর কি কেউ—দু-একজন ওঁরা সঙ্গে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করেন।' সুরপতির ঠোঁটের ফাঁকে ইঙ্গিতময় গূঢ় হাসি।

নির্মলার মনে পড়ল কাল রাতে গানের কথাটা।

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। লক্ষ্মণ ঝপাঝপ বৈঠা ফেলে। নৌকো চলেছে হেলে-দুলে। পদ্মার বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে তরঙ্গে তরঙ্গে চলেছে প্রভাতসূর্যের কোটি বন্দনা গান।

একটা চিল সোঁ করে লক্ষ্মণের মাথা ঘেঁষে একদিকে উড়ে গেল।

সুরপতি বললে, 'আমরা আধুনিক, সুতরাং মেমের মতো মেয়েদের চুল রাখব, সিগারেট খাওয়াতে শেখাবো, তারা ঘোড়ায় চড়বে, রেস খেলবে, পুরুষ বন্ধু নিয়ে হুল্লোড় করবে—কী কাণ্ড!'

কৌতূহল মানুষের রক্তগত।

বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা যতই পোষণ করুক, বোটের ভিতরে একবার উঁকি না দিয়ে তারা থাকতে পারলে না।

ও পক্ষ থেকে আর কিছু না হোক মৌখিক শিষ্টাচারের অভাব হবে না এ তারা পূর্বাহ্ণেই ধরে রেখেছিল।

বাস্তবিক হল তাই, অভ্যর্থনায় অবারিত হয়ে উঠল মেয়েটা।

বোটের ভিতর এসে নির্মলা ও সুরপতি অবাক হয়ে গেল। ছোটখাটো সংসার—সাজানো গোছানো, মেয়েটির চোখের তারার মতো উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন।

দু-দিকের জানালায় নীল পর্দা প্রশান্তির নীল অঞ্জনের মতো ঘরের আবহাওয়াকে এনেছে নিবিড় করে। সুরপতি ও নির্মলাকে পাশাপাশি দুটো চেয়ার দিয়ে মেয়েটা ওদিকে খাটের শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল।

পাশ ফিরে ভদ্রলোক শুয়ে ছিলেন। ঝুঁকে প্রায় তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে মেয়েটি জোরে জোরে বললে, 'ওঁরা এসেছেন—স্বামী-স্ত্রী।'

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এপাশে, সুরপতি ও নির্মলার দিকে মুখ করে ফিরে, শেষে শোয়া থেকে হয়তো উঠবার চেষ্টা করছিলেন, মেয়েটি তাড়াতাড়ি ধরে সাহায্য করলে। পিঠের দিকে একটা বালিশ দাঁড় করিয়ে দিলে পর ভদ্রলোক তাতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাতে লাগলেন। বলল, 'উনি অসুস্থ'—

ইতস্তত করছিল সুরপতি। কারণটা কথাটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। নির্মলা চমকে উঠল।

লোকটির একটা হাত কাটা, বাঁ পা-টা হাঁটু অবধি এসে থেমে গেছে।

অত্যন্ত অস্পষ্ট, মৃদু কণ্ঠস্বর। বললেন, 'সকালবেলা নীলিমা আমাকে বলছিল—এসেছেন বড়ো সুখী হলুম—পদ্মায় বেড়াচ্ছেন বুঝি ?'

উদাস, নিষ্প্রভ দুটি চক্ষু।

কথার উত্তর দেবার সহজ সৌজন্য সুরপতি ও নির্মলার লোপ পেয়ে গেছে। অসহায় পঙ্গু দেহখানার দিকে তারা তখনও বিমূঢ়ের মতো চেয়ে।

খানিকক্ষণ পর সুরপতি প্রশ্ন করলে, 'কি করে এমন হল ?'

'একটা ক্রেন পড়ে'—মেয়েটিই উত্তর দিলে—'উনিশ শো তেত্রিশ ইংরেজি সেটা, আমরা ভিজাগাপট্টমে। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর ওঁকে ওখানেই প্রথম চীফ ইঞ্জিনিয়ার করে পাঠানো হয়—'

'আর সেটা আমাদের বিয়ের প্রথম বৎসর—'

উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন, মাঝখানে কথাটা জুড়ে দিয়ে ভদ্রলোক দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেললেন।

সুরপতি এবং নির্মলা আবার সমস্বরে অস্ফুট ধ্বনি করল।

'হ্যাঁ, তাই বলি, হয়তো আমিই তোমার জীবনে'—শূন্য, স্থির দৃষ্টিতে জানালার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে নীলিমা বললে, 'অকল্যাণ এনেছিলাম।'

'ছি—' ব্যস্ত একটু বা উত্তেজিত হয়ে ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝোঁকবার চেষ্টা করতেই নীলিমা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

'না, তোমার মাঝে মাঝে ও কথাটা আমায় কী যে বাজে—'

'আচ্ছা আর বলব না।' গাঢ় গদগদ কণ্ঠস্বর।

'না, আর বোলো না।'

'সেই থেকে বুকে একটু দোষ হল। ডাক্তারের আদেশ, গ্রাম, তার চেয়েও ভালো নদীতে গিয়ে থাকুন। আজ তিন বৎসর নৌকায় আছি।' কথার শেষে উভয়ের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি ক্ষীণ হাসল।

ওদিক থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল, 'পদ্মায় ভেসে বেড়ালেই কি শরীর ভালো থাকে, না কেউ বেঁচে ওঠে? ওর অজস্র প্রাণশক্তি আমাকে ধরে রেখেছে।'

মেয়েটি নিরুত্তর।

সুরপতি ও নির্মলা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল।

বিদায় নিয়ে উঠে আসবার সময় বোটের দরজা পর্যন্ত মেয়েটি এগিয়ে এল।

'আপনাদের পেয়ে বেশ কাটল সময়টা, উনি যদি দেখতে পেতেন আরো সুখী হতেন।'

'তার অর্থ?' সুরপতি ও নির্মলা তীব্রভাবে চমকে উঠল।

'নাভে চোট লেগে ওঁর চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে সুরপতি ও নির্মলা একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই সাদা ধূসর বোটটার দিকে আর কান পেতে রইল। নারীকণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীত-লহরী সেখান থেকে তখন উঠে আসছিল। জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে সে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

রাইচরণের বাবরি

রসিকতা করিয়া পাড়ার লোকে আগে রাইচরণ ঘোষকে 'বাব্‌রি ঘোষ' বলিয়া ডাকিত ; এখন ঘোষটাও উঠিয়া গিয়াছে, এখন গলা ছাড়িয়া সবাই ডাকে—'বাব্‌রি।'

হ্যাঁ, বাব্‌রির মত একখানা বাব্‌রি রাইচরণের মাথায় !

তাহার কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া মাথাটার দিকে তাকাইলে রীতিমত ঈর্ষা হয়। মনে হয়—ঈশ্বর একটা লোকের মাথায় এমন অজস্র চুল দান করিয়া অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করিলেন। না জানি ইহার পরিবর্তে আরও ক'টা মাথা একেবারে ন্যাড়া করিয়া তাঁহাকে গড়িতে হইয়াছে।

আর রাইচরণের বাব্‌রিটার বাহার আছে। তাহার চুলের জাতই আলাদা। একটা চুলের গায়ে আর একটা লাগিয়া নাই,—কোঁকড়া, লম্বা, চিকণ, সাপের মত ঢেউ খেলান। এমন সুন্দর, এমন পরিপুষ্ট একখানা বাব্‌রি যার মাথায় আছে সে ভিতরে ভিতরে গর্ব্ববোধ করিবে বৈ কি! রাইচরণও করে। সুতরাং পাড়ার লোকে বাব্‌রি বলিয়া ডাকিলে সে রাগ করে না, বরঞ্চ মনটা তাহার রঙিন হয়, খুসীর চোটে আপন মনে বাব্‌রিটায় একবার জোরে ঝাঁকানি দেয়।

রাইচরণ লোক ভাল, সাদাসিধে। স্বাস্থ্যটি চমৎকার। দিব্য গোলগাল কালো নাদুস নুদুস শরীর। গায়ে একটা হাত-কাটা খাকি শার্ট, পরনে মিলের সাধারণ আধময়লা কাপড়। হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়টা উঠিয়া থাকে। ফলে দু'পায়ের মাংসল গুটি দুটি সারাক্ষণ সকলের চোখে পড়ে। আর স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া মনটাও তাহার বেশ ঝরঝরে। মুখে একটা সস্তা হাসি অষ্টপ্রহর লাগিয়াই আছে। রসিকতা সে পছন্দ করে।

অনেকেই প্রশ্ন করে,—দাদা, অমন বাব্‌রিটা কি ক'রে বাগালে ?

—পূর্ব্বজন্মের তপস্যা। হে-হে! চোখ টিপিয়া হাসিয়া রাইচরণ উত্তর দেয়, তপস্যা না থাকলে কারও এমন তেল চুকচুকে ঝাঁকাল বাব্‌রি হয় ? এই কলকাতা শহরে আর একটা এমন খুঁজে বার কর—বাজি রাখছি।

প্রশ্নকর্ত্তা অবাক হইয়া রাইচরণের মাথার দিকে চাহিয়া থাকে। এবং কলিকাতা শহরে যে এমন আর দ্বিতীয় একটি মাথা কোনদিন কাহারও চোখে

পড়ে নাই তাহা তাহারও মনে হয়।

উৎকট কৌতূহল লইয়া প্রশ্নকর্ত্তা ফের জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা রোজ ক'ছটাক তেল ওটায় মাখ?

—বললুম ত, চুলের আমার জাতই এমন। গম্ভীর হইয়া বাব্‌রিতে আবার একটা ঝাঁকুনি দিয়া রাইচরণ মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলে,—তেলের দরকার নেই—ও এমনই চক্‌চকে। তারপর আর সে দাঁড়াইয়া থাকে না। সরাসরি হাঁটিয়া যায়। হাঁটিবার সময় বাহারের বাব্‌রিটা চমৎকার দুলিতে থাকে। রাইচরণের মুখের হাসির মত তার মাথার বাব্‌বিটাও যেন গলা ছাড়িয়া হাসিতে জানে।

কিন্তু ঐ পথে-ঘাটেই হাসা-হাসি, বাব্‌রি লইয়া বাচনিক রসিকতা বাড়ীতে অন্যরকম।

কথায় বা কাজে একটা চেঁদা খুঁজিয়া বাহির কবা খুব কঠিন নয় আর ইহার স্থত্র ধরিয়া উট্‌কা-ছুট্‌কা সাধারণ ঝগ্‌ড়াঝাঁটি স্বামী-স্ত্রীব প্রাত্যহিক-জীবনে কিছু অপ্রত্যাশিত নয়।

কিন্তু মানদা ঝগড়ার গন্ধ পাইলে ভিতরের সঞ্চিত যত আস্ফালন একেবারে রাইচরণের বাব্‌রিটা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারে—স'র আমার চোখের সম্মুখ থেকে, নইলে বঁটি দিয়ে চুলের গুঁড়িসুদ্ধ কেটে সাবাড় করে' দেব।

ভাল মানুষ রাইচরণ তবু ফ্যা-ফ্যা করিয়া হাসে। মানদা আরও জলিয়া ওঠে: যা দেখতে পারিনে, অসুরের মত চুলের ঝাড়, দেশলাইর কাঠি জ্বেলে পুড়িয়ে দেব একদিন।

—আবার গজাবে। স্ত্রীর আরও কাছে সরিয়া আসিয়া হাত ঘুরাইয়া রাইচরণ বলে,—রক্তবীজেব বংশ—হে—হে, পুড়িযেই দাও আর কেটেই ফেল, চুল ফের গজাবে—ফের দেখতে না দেখতে বাব্‌রি গজাবে।

মানদা খেঁকাইয়া ওঠে,—যত সব অনাছিষ্টি, চুল না চিতাবাঘের জঙ্গল—মাগো, ছিরি দেখলে অঙ্গে ঘেন্না ধরে—গন্ধে বমি আসে।

—পাগল! হাসিয়া গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে রাইচরণ বলে,—বাব্‌রি দেখে শহরের লোকের চোখ টাটায আর তোমার কিনা হয় ঘেন্না,—বমি আসে।

তারপর তেলের বোতলটা একদিক হইতে আনিয়া বাঁ-হাতের তেলোয় যখন এতখানি তেল গবগব করিয়া সে ঢালিয়া ফেলে তখন মানদা স্থির থাকিতে পারিল না। ছোঁ মারিয়া রাইচরণের হাত হইতে বোতলটা ছিনাইয়া আনে: বলি রোজ আধ-পো তেল মাথায় মাখালে ফতুর হ'তে ক'দিন—না, না খেলেও চলবে?

চুলে কেরোসিন মাখতে পার না?

প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে, সুমুখে আরসি লইয়া অন্তত আধঘণ্টা লাগাইয়া রাইচরণ মাথায় তেল মাখে, হাতের ঘষায় যতক্ষণ না চুল গরম হইয়া ওঠে রাইচরণের তৈলমর্দ্দন শেষ হয় না। চুল গরম হইয়া উঠিলেও মাথা তাহার তেমনি ঠাণ্ডা থাকে। রাগের মাথায় মানদা যখন শেষ পর্য্যন্ত আরসিটাও কাড়িয়া লয়, হাসিতে হাসিতে সে বলে: আরে কর কি! দাও আরসি দাও—

—চুপ! বন্দুকের গুলীর মত মানদা ছিটকাইয়া পড়ে,—আমিরি আর করতে হবে না পায়ের ওপর পা তুলে' চুলে তেল মাখালেই সংসার চলে আর কি; ক'পয়সা রোজগার কর,—ক'টা পয়সার মুরোদ শুনি?

এইবার গম্ভীর হইয়া রাইচরণ বলে,—শোন কথা, বলেছি ত আমার বাব্‌রির কল্যাণে সংসার তোমার শ্রীমন্ত হয়ে উঠবে দেখ—

—দেখেছি, ছাই হবে, দেখতে দেখতে দু'চোখে পোকা পড়ে গেল নইলে য্যাদ্দিনেও শশীর বৌর মত একটা স্কার্ট পাড় শাড়ী আর দেখলুম না।

আরসিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দুমদাম শব্দে পা ফেলিয়া মানদা সরিয়া পড়িল। বাব্‌রির ভিতর দু'হাতের সব ক'টি আঙ্গুল ডুবাইয়া রাইচরণ হঠাৎ ভাবিতে থাকে। ছেলে-মেয়ের পাট নাই, বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও রাইচরণ যদি একটা বাব্‌রির জন্য এত করতে পারে তবে মানদার এই বয়সে একটা শাড়ীর সখ হইবে ইহাতে অবাক হইবার কি আছে! শাড়ী দিয়া মানদাসুন্দরীর মান ভাঙ্গাইতে রাইচরণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইল তারপর ফের সে আরসি লইয়া বসিল বাব্‌রি বাগাইতে।

কথাটা রাইচরণ মিথ্যা বলে নাই।

হয়ত শুধু তাহার বাব্‌রির জন্যই রাইচরণের সেলাইয়ের দোকান এমন ভাল চলিতেছিল।

শেয়ালদা'র কাছাকাছি, বৌবাজারের মোড়ের মাথায় রাইচরণের একদরজার দোকান।

তাহার দোকানের সে নিজেই একটা বিজ্ঞাপন, মানে—মাথার বাব্‌রিটা। যত লোক ফুটপাথ দিয়ে চলে রাইচরণের দোকানের দরজার কাছে আসিয়া অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়ায়। অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত ঐ একটা বাব্‌রিই যথেষ্ট। পা দিয়া সেলাইয়ের কল চালাইবার সময় শরীরের মৃদু ঝাঁকুনিতে বাব্‌রিটা যখন কাঁপিতে থাকে তখন কাহার না দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে! আর আজ যাহারা দেখিয়া গেল, কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া না গেলে, আবার কাল আসিবে, হয়ত তারপর দিন

সরাসরি দোকানে ঢুকিয়া পাঞ্জাবী শার্ট, যা হোক একটা কিছুর অর্ডার পর্য্যন্ত দিয়া ফেলিবে অর্থাৎ সেই সূত্রে তাহাদের রাইচরণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া লইবার ইচ্ছা। এমন বাব্‌রি যার মাথায় তাহার সঙ্গে পরিচিত হইবার লোভ সকলেরই হয়, মানদা এই বাব্‌রির জন্য বঁটি তুলিয়া বেচারাকে যতই শাসাক—

একদিন একটা কাবুলীওয়ালা,—বাহির হইতে দেখিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া একেবারে রাইচরণের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা এমন ভাবে তাকাইতেছিল যেন সম্ভব হইলে বাব্‌রিটা মূলশুদ্ধ ছুরি দিয়া উপড়াইয়া সে নিজের মাথায় তুলিয়া বসাইয়া দেয়; কারণ, তার মাথায়ও ছোটখাট একটা বাব্‌রি ছিল। সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া রাইচরণ সোজা হইয়া বসিল। প্রকাণ্ড মুখব্যাদান করিয়া কাবুলীওয়ালা হাসিয়া বলিল: একঠো পয়জামা বনায়েগা।

আর কি, তৎক্ষণাৎ গজের ফিতা ফেলিয়া মাপজোপ লইয়া, থানের কাপড় টানিয়া আনিয়া রাইচরণ কাবুলীওয়ালার পাজামা তৈরী করিতে লাগিয়া গেল।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। প্রত্যহ এমনই আরও অনেক খরিদ্দারের কল্যাণে সেলাইয়ের ব্যবসা বাব্‌রি ঘোষের ভালই চলিতেছিল।

সেদিন দুপুরের দিকে, দোকানটা বেশ নিরিবিলি, ফিটফাট এক ভদ্রলোক আসিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। দুই চক্ষু অনুবীক্ষণের মত করিয়া ভদ্রলোক গভীর মনোযোগের সহিত রাইচরণের বাব্‌রি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

বসুন! বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া রাইচরণও অপেক্ষায় রহিল একটা কিছু অর্ডারের আশায়। আশ্চর্য্য, ভদ্রলোক সে পথও মাড়াইলেন না।

আস্তে আস্তে সরিয়া আসিয়া, রাইচরণের ঘনিষ্ঠ হইয়া মোলায়েম মিহি গলায় আগন্তুক প্রশ্ন করিলেন,

—কদিন আপনার এ দোকান?

—দু' বচ্ছর। রাইচরণ একটু অবাক হইল।

—হুঁ, তাই বলছিলুম, বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া ভদ্রলোক এতক্ষণে একটা চেয়ারে বসিতে বসিতে বলিলেন: লাভ নেই; এসব কাজ ঠিক আপনার মত লোকের সাজে না।

—কেন বলুন ত? রাইচরণ হাসিয়া ফেলিল।

—না, হাসির কথা নয় গলাটা গম্ভীর করিয়া ভদ্রলোক রীতিমত বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন: এমন চমৎকার বাব্‌রি, বলতে কি, কলকাতায় দু'টি নেই, আর এই নিয়ে,—মাপ করবেন, কথাটা কড়ামত শোনাচ্ছে, আপনি এখানে বসে কল চালাতে হিম-সিম খাচ্ছেন। অথচ এই চুল দিয়ে আপনি দেশজোড়া নাম

কিনতে পারেন ; এমন বাব্‌রির যদি যোগ্য ব্যবহার না হয়, উঃ ভারি দুঃখের কথা মশাই ! মাইরি—

পারিলে ভদ্রলোক রাইচরণের বাবরিটা চোখ দিয়া গিলিয়া ফেলেন আর কি একবার থামিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, একবার দরজার বাহিরে তাকাইয়া শেষে আর কোনও ভূমিকা না করিয়া সোজা বলিয়া বসিলেন : চলুন আমাদের থিয়েটারে, আপাতত একশ' টাকা মাস মাস পাবেন।

রাইচরণ এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিতে পারির হাসিয়া বাব্‌রিতে ঝাঁকানি দিয়া বলিল, ও বাপরে,—আমার চোদ্দপুরুষ থিয়েটার কি জানল না মশাই,—মাপ করবেন, ওসব আমা দ্বারা হবে না।

—একশ'বার হবে, আমি বলছি। সেলাইর কলটার গায়ে দুই আঙুলের টোকা মারিয়া ভদ্রলোক বলিলেন,—কার হবে আর কার হবে না আমরা বেশ চিনি মশাই, থিয়েটারের ম্যানেজারী করে এগার বছর কাটল যে। না, আপনার শরীরের টাইপ, চুলের ফ্যাসান,—গলা ছেড়ে বলতে পারি এক্ট করবার জন্যে। রাইচরণ চুপ করিয়া রহিল।

ম্যানেজার তখনও থামেন নাই,—অবশ্যি প্রথমটায়, অভ্যাস নেই একটু কেমন কেমন ঠেকবেই ত পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কত দেখলুম মশাই, তখন আপনি নিজে আলাদা করে নতুন পার্টি খুলে না বসেন—যার নাম বাতিক, একবার পেলেই হল। শেষটায় তাই হয়।

ম্যানেজার হাসিতে লাগিলেন।

রাইচরণ হাসিয়া উঠিল।

ম্যানেজার মনে মনে বলিলেন, এইবার পথে এসেছে। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আচ্ছা আজ আসি—কথাটা চিন্তা করবেন, কাল একবার দেখা পাবেন, নমস্কার।

—নমস্কার !

লোকটা বাহির হইয়া গেলে রাইচরণ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বাব্‌রিতে ঝাঁকানি দিয়া ফের সে সেলাইর কলে ঝুঁকিয়া পড়িল। মনে মনে কহিল, থিয়েটার না কচু। আমার এমন ব্যবসাটা কিনা মাটি হয়ে যাক। আসুক কাল মুখের ওপর বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেব।

রাত্রে খাইতে আসিয়া কথাটা স্ত্রীর কানে রাইচরণ না তুলিলেও পারিত। কে জানে মানদা এমন প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠিবে লোকে তাহার বাব্‌রিটার কেমন কদর করে শুধু ইহাই মানদার নিকট প্রতিপন্ন করিবার জন্য রাইচরণ বাহাদুরী করিয়া কথাটা ভাঙ্গিয়াছিল ফল হইল অন্যরূপ। রাইচরণ নাকালের একশেষ

বনিয়া গেল খাইতে বসিয়া বেচারা ভাল করিয়া খাইতে পর্য্যন্ত পারিল না। মানদার মুখে খৈ ফুটিতেছিল : —নইলে আর খলিফাগিরি করতে যাবে কেন, এমন আহাম্মোক না হলে। এমন আক্কেল না হলে আর কেউ এনট্রান্স পাশ করে কাপড় সেলাই করে খায় ক'পয়সা রোজগার হয় খলিফার দোকান দিয়ে, বড় যে রাজা-বাদশার মত মুখ ঘুরিয়ে 'না' করে দিলে ? ওমা একশ'টাকা মাস-মাস ! র'স, আজ আমি দেশলাইর কাঠি ধরিয়ে বাব্‌রিশুদ্ধ পুড়িয়ে না দিই ত আমার নাম মানদা নয়।

দুপ দাপ পা ফেলিয়া মানদা হয়ত সত্যিই দেশলাই আনিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি ভাতের শেষ গ্রাসটা কোঁৎ করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া রাইচরণ চীৎকার করিয়া উঠিল :—আঃ, কর কি,—বাব্‌রি না থাকলে থিয়েটারই বা কিসের জোরে করব ?

দেশলাই নয়, হাতে বঁটি লইয়া রণরঙ্গিণীর বেশে মানদা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল : তবে বল কাল রাজী হ'বে,—বল নইলে—

বঁটিটা সত্যসত্যই মানদা বাগাইয়া ধরিয়াছে।

—একশ বার, হাজার বার, আমি এই শপথ করছি,—খলিফাগিরি ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে ঢুকব,—কালই।

কারণ রাইচরণ জানিত, নইলে রাত্রিটা তাহাকে বাহিরে বসিয়া কাটাইতে হইবে। মানদা পাত্রী সহজ নয়।

পরদিন আবার ম্যানেজার আসিয়া দেখা দিলেন।

রাইচরণ একশ টাকার উপর বাড়াইয়া আরও পঁচিশ টাকায় রাজী হইয়া গেল। ম্যানেজার বলিলেন তথাস্তু।

দোকানের দরজায় তালা লাগাইয়া রাইচরণ তখনই থিয়েটারের আড্ডায় চলিয়া গেল।

একদিন, দুইদিন,—তৃতীয় দিনের দিন, তখন একটা নবলিখিত নাটকের মহলা চলিতেছিল, রাইচরণের মাথায় হঠাৎ কি এক দুর্ভাবনা আসিয়া বাসা বাঁধল। আড়ালে ম্যানেজারকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল,—আচ্ছা মশাই, এই যে আমাকে ডাকাত সর্দ্দারের পাট করতে হবে আমি ত আর সত্যিকারের ডাকাত নই।

—তাত না-ই, হাসিয়া ম্যানেজার বলিলেন, আপনি সেই রাইচরণবাবুই, শুধু ডাকাতের বেশ নিয়ে একদিন রাত্রে আপনাকে ষ্টেজে নেমে বইয়ের ক'টা কথা

বলতে হবে।

—বুঝলুম, গম্ভীর হইয়া রাইচরণ কহিল এবং আমার এই ডাকাতের সাজ-পোষাক, ডাকাতের মত কথাবার্ত্তা, লুঠতরাজ, মারপিট-করা, এসব কোনটাই সত্যি নয়,—কৃত্রিম, এমনকি দর্শকবৃন্দ পর্য্যন্ত জানবে এগুলো আগাগোড়া মিথ্যা। তারা শুধু সাময়িকভাবে ধরে নেবে যেন সত্যি একটা ডাকাত এসে তাদের সামনে দেখা দিয়েছে।

—হ্যাঁ, তাই ত, তাই নাটক, দরাজ গলায় ম্যানেজার উত্তর দিলেন—নাটকের সবটাই মিথ্যে, একটা গল্প, তবু তা সত্যি করে' দেখবার, সত্যি বলে মেনে নেবার মানে একটা সাময়িক উপভোগ ছাড়া আর কি—

হাতজোড় করিয়া রাইচরণ উত্তর দিল, আমিও তাই ভাবছি, মাপ করবেন, আমি পারব না।

—কেন, কেন? ম্যানেজার আকাশ হইতে পড়িলেন—কি হ'ল আপনার?

—যেখানে সাজ-পোষাক, হাব-ভাব, মায় কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কৃত্রিম, আপনি কি মনে করেন সে-স্থলে কোনও দর্শক আমার বাব্‌রিটা সত্যিকারের বাব্‌রি বলে' ধরে' নেবে? সবাই ভাববে ওটা একটা পর-চুলা—ষ্টেজে নামবার আগে গ্রীণরুম থেকে মাথায় চাপিয়ে এসেছে।

লোকটা পাগল না আর কিছু—ম্যানেজার ভাবিয়া সঠিক আন্দাজ করিতে পারিল না।

রাইচরণ আর বাক্যব্যয় না করিয়া সোজা রাস্তায় নামিয়া আসিয়া মনে-মনে বলিল, বেঁচে থাক আমার সেলাইর দোকান। দোকানে ব'সে পয়সাও রোজগার হবে, বাব্‌রি দেখানও চলবে। ষ্টেজে উঠি আর লোকের চোখে অমন বাব্‌রিটা কিনা পর-চুলা হ'য়ে যাক!

তারপর এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরিয়া আপাতত কলেজ ষ্ট্রীটের একটা দোকান হইতে আগে একজোড়া হাল্‌ক্যাসানের স্কার্টপাড় শাড়ী কিনিয়া তবে রাইচরণ বাড়ীর রাস্তা ধরিল। নহিলে মানদা আবার বঁটি লইয়া তাড়া করিবে। থিয়েটারে মাস-মাস একশ পঁচিশ টাকা মাইনের চেয়ে রাইচরণের বাব্‌রির মায়া অনেক বেশী,—অবশ্য বাঁচিয়া থাকিতে মানদা তাহা বুঝিবে না।

সমুদ্র

সেই রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি। বা বলা যায় আমি ঘুমোতে চাইনি। যেন দু-তিনবার আমার চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল। জোর করে চোখ খুলে রেখেছি। তাতে ফল হয়েছে। আর ঘুম আসেনি। জেগে থেকে রাত্রির ভয়ংকর শব্দ শুনেছি, অন্ধকারের গর্জন। যেন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে একটা মেঘ দূরে কোথাও মাটির কাছে নেমে এসে সারাক্ষণ গুরুগুর করে ডাকছিল। কান পেতে গভীর গম্ভীর শব্দটা শুনেছি। বার বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হয়তো সেই শব্দ শুনতে আমি জেগে ছিলাম। আমার মনে হয়েছে পৃথিবীটাকে কেউ নতুন করে তৈরী করছে ; ঢালাই গড়াইয়ের কাজ চলছে ; বা অদৃশ্য কোন শক্তি এই সৃষ্টি ভেঙে দিচ্ছে—দূর থেকে ভাঙার কাজ আরম্ভ হয়েছে, ভাঙতে ভাঙতে ক্রমে এখানে চলে আসবে সেই শব্দ। এই ঘরের ভিত ভাঙবে, দেয়াল ভাঙবে। ভয়ে বুক কাঁপছিল। বুক কাঁপছিল ; আবার আশ্চর্য এক সুখ একটা নিশ্চিন্ততা নিয়ে আমি কান পেতে ছিলাম। নতুন সৃষ্টির শব্দ শুনতে, নতুন ধ্বংসের গর্জন শুনতে কার না ভাল লাগে। কষ্ট হচ্ছিল, হেনার জন্য। বেচারা সেই শব্দ শুনছে না। অথবা যদি সন্ধ্যার দিকে শুনে থাকে বুঝতে পারেনি এই শব্দ কেন, কোথায়। না হলে তখন আলোর নীচে বসে ভাত খেতে খেতে দুবার চমকে উঠে ও আমার মুখের দিকে তাকাবে কেন? তারপর এক সময় ওর চোখের ঝিলিক নিভে গেছে, ভুরুর বাঁক সোজা হয়ে গেছে ; হেসে বলছিল : 'প্লেন!' উত্তর দিইনি প্রশ্নের। অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে ওর থুতনির রেখা চোয়ালের ঢালুর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল হেনাকে এখানে না আনলেই ভাল হত। বেচারাকে এখন কত ছোট দেখাচ্ছে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে ও। হাত-পা গুটিয়ে পেটের কাছে নিয়ে গেছে। তারপর ওকে ভুলে গেলাম। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম এখানে এসে হেনাকে আমি কত সহজে ভুলে থাকতে পারছি। এখানে, রাত দুটো যখন, সিগারেট ধরাতে দেশলাই জেলে ঘড়ি দেখে নিয়ে ভাবলাম, স্ত্রীকে একলা ঘুমোতে দিয়ে কেমন সুড়সুড় করে বিছানা ছেড়ে আমি জানালার কাছে ছুটে আসতে পেরেছি। অন্ধকার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে দূরের শব্দ শুনছি কাছের শব্দ শুনছি। ভাত খেতে খেতে হেনা বলছিল :

'বিচ্ছিরি বাতাস ! ঘরের পিছনে বুঝি ঝাউগাছ আছে। তাই এত সোঁ সোঁ।' দ্বিতীয়বার ওকে অনুকম্পা করেছিলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, মনে মনে বললাম, এমন চট করে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে আর আমি জেগে থেকে দূর-সমুদ্রের গভীর নিস্বন, নিকট-সমুদ্রের উত্তাল উচ্ছ্বাস শুনব। আমরা যে সমুদ্রের কত কাছে রয়েছি, কথাটা ভুলে গিয়ে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানার গর্তে নিশ্চিন্ত আরামে একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে ঘৃণা হচ্ছিল। বলতে কি প্রথম রাত্রেই মনে হয়েছে আমি বড—অনেক বড ; সৃষ্টি ও লয়ের গূঢ় গম্ভীর শব্দ শোনার অধিকার আমারই আছে, তোমার নেই ; তুমি ছোট—অনেক ছোট ; সমুদ্রকে তুমি বোঝ না, চেন না। প্লেনের শব্দ বাতাসের সোঁ সোঁ—তা বটে ! কেবল কান পেতে শোনা নয়, জানালার বাইরে চোখ মেলে দিয়ে আমি বিরাটের আশ্চর্য রূপ দেখে নিলাম। তারাখচিত আকাশের নীচে দিগন্তবিসারী অন্ধকারের সে কী ভয়ংকর আলোড়ন ! দূরে কি হচ্ছে বোঝা যায় না, দেখা যায় না—এখানে, তীরের কাছে, না আরো দূরে, যেন স্পন্দমান কম্পমান অন্ধকার ফেটে ফেটে রাশি রাশি ফুলের স্তবক হয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসতে চাইছে। কিন্তু আসে কি ? আসে না। আমাদের কাছে আসবার আগে তারা মিলিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন মানুষকে ভয়, অভিশপ্ত মানুষের নিশ্বাসকে ভয়। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে অগাধ উত্তাল ফেনোচ্ছল ভয়ংকর সুন্দরকে প্রণাম করলাম। সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া হেনাকে আবছা অন্ধকারে একটা খরগোসের মতো দেখাচ্ছিল, ও যে মানুষ—কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের দোতলার কোনো ফ্ল্যাটের এক তেজস্বিনী মহিলা, সমুদ্রতীরের এই ছোট ঘরের বিছানাটার দিকে তাকিয়ে সে কথা কে বলবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনায় বুক ভার হয়ে উঠল। যেন আমি নিজেকে করুণা করতে আরম্ভ করলাম। ওই ঘুমন্ত খরগোসের বুকের স্পন্দন দেখতে, হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক শুনতে আমি কত রাত্রে ওর গাত্রবাস সরিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছি, কান পেতে থেকেছি ! দেহ-সমুদ্র দেহ-সমুদ্র ! কত মূঢ় উচ্ছ্বাস বিবর্ণ ইচ্ছার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ তৃপ্তি পায়, আমি তৃপ্ত ছিলাম। চিন্তা করে প্রায় মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। চোখে জল এল। সমুদ্র আমার অতীতকে এমন করে তুচ্ছ করে দেবে কে জানতো। ঘুমের ঘোরে হেনা বিড়বিড় করছিল। ঝামাপুকুরের বাড়িতে আমি তৎক্ষণাৎ আলো জেলে ওর ঠোঁট পরীক্ষা করতাম—দেখতাম হাসি জেগেছে, কি কান্নার বাঁকাচোরা রেখা জেগেছে ঠোঁটে। সুখের স্বপ্ন দেখছে কি দুঃখের। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি সেসব কিছুই করলাম না। বিছানার কাছে গিয়ে একটা পোকা হাঁটকাবার গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে যেন নিষ্ক্রিয় কঠিন থেকে শক্ত হাতে জানালার গরাদ চেপে

ধরে বাইরে চোখ ফেরালাম। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, সমুদ্র উত্তাল হয়েছে; সফেন তরঙ্গ ক্রুদ্ধ গর্জন করে তীরের দিকে ছুটে আসছে—একটা এল ভাঙল, আবার একটা; আবার, আবার, আবার···কত কোটি বছর ধরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এভাবে ছুটে আসছে, গর্জন করছে, হাসছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অতল অন্ধকারে। মনে পড়ল, এই সেই অশান্ত উদ্দাম—স্ত্রীকে উদ্ধার করতে যেতে রামচন্দ্র নিষ্ঠুর তীর মেরে একে শাসন করতে চেয়েছিল। সীতা-উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু শান্তি পেয়েছিল কি শ্রীরাম? কেন পায়নি, কোথা থেকে অভিশাপ এসে লাগল সেদিনের সেই দাম্পত্য-জীবনে? বার বার মনে হতে লাগল প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছিল, সমুদ্র ক্ষমা করতে পারেনি ওদের। হেনার জন্য এমন কাজ করতে পারব কি আমি? শক্তি নেই। কিন্তু শক্তি থাকলেও আমি এ-কাজ করব না। বরং ওই রুদ্রের কাছে নিজেকে কীটাণুকীট—প্রায় একটা বুদ্বুদের মতো ক্ষীণায়ু কল্পনা করতে ভাল লাগছিল। ইচ্ছা করছিল, ঘরের বাইরে ওই বালির বিছানায় একটা ঝিনুক হয়ে আমি অনন্ত-কাল শুয়ে থাকি। হেনা নেই, সংসারে আর কেউ নেই। যেন এমনও ইচ্ছা করছিল, সকাল হতে সরাসরি ওকে জানিয়ে দেব তুমি ফিরে যাও, আমি এখানে থেকে যাব। বলব, তুমি যতক্ষণ কাছে আছ আমার সমুদ্রদর্শন হবে না, সাগরে অবগাহন অসম্পূর্ণ থাকবে। তোমার উপস্থিতি পীড়াদায়ক, একটা অতিরিক্ত বোঝা-বিশেষ। তা তো বটেই, সমুদ্র থেকে হেনা আমার কাছে বেশি প্রিয় না, আমি রাম নই। শুনে হেনা কী বলবে, অভিমানে মুখ কালো হয়ে যাবে—না কি ঠাট্টা ভেবে উচ্চকিত হেসে উঠবে? চিন্তা করতে পর্যন্ত সে-রাত্রে আমার খারাপ লাগছিল।

পরদিন সকাল হতে আবার মামার দর্শন পাওয়া গেল। চোখে সাংঘাতিক পুরু লেন্স, গায়ে আধময়লা খদ্দরের হাফ-শার্ট, পায়ে টায়ারের মোটা চপ্পল। মানুষটাকে দেখেই মনে হল রাত্রে ঘুমোয়নি। চোখের কোলে কালি, কপালে অসংখ্য রেখা, হাঁটা ও কথা বলার মধ্যে ক্লান্তি। আমাদের দুজনকে দেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসছে; মনে হল দাঁতের মাথাগুলি এসিডে খেয়ে ফেলেছে, তার ওপর পান দোক্তার কালো লালচে ছোপ। মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে, অল্পসল্প যা আছে, মাস ছয়েকের মধ্যে সে-কটাও অদৃশ্য হবে অনুমান করতে কষ্ট হল না। মানুষ উপোস থাকলে বা আধপেটা খেয়ে খেয়ে দিন কাটালে যে চেহারা ধরে মামাকে দেখে তা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা নয়। ভাতের অভাব মামার নেই, একটা হোটেলের কর্মকর্তা সে—হয়তো অসুখবিসুখ কিছু থাকতে পারে চিন্তা করলাম। আর এদিকে আমার সব দুশ্চিন্তা ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে যেন

মামা কাছে এসে হেসে আমার কাঁধ ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিল : 'কি মশাই, কেমন ছিলেন, রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলেন ?'

'চমৎকার ঘর হয়েছে আমাদের—আমি তো সেই সন্ধ্যাবেলা চোখ বুজেছি আর এই সকাল হতে চোখ খুললাম।' হাতের বটুয়া দুলিয়ে হেনা হাসছিল। আমি নীরব। যেন হেনার দিকে চোখ পড়তে মামা একটা হোঁচট খেল। অসম্ভব না। কাল গাড়ির রাস্তায় আসতে আসতে বেশবাস প্রসাধনের দিকে নজর দেবার সময় ও সুযোগ ছিল না—বরং ধোঁয়ায় কালিতে কাপড়চোপড় ময়লা হবে আশঙ্কা করে হেনা আধময়লা শাড়ি ও ব্লাউজ পড়ে এখানে এসে নেমেছিল। বলতে কি, ও যখন রিক্সা থেকে নেমে মামাদের হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, ওর আলুথালু চুল ও শুকনো মুখখানা দেখে আমার মনে হচ্ছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে ; না কি সেই চেহারা ওর আসল চেহারা সেই বয়স ওর আসল বয়স ধরে নিয়ে মামা এখন কচিকাঁচামুখ সুবেশিনী হেনাকে দেখে এমন থমকে গেল। যেন ওর কাজল-বুলানো চোখের উজ্জ্বল ধারালো দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মামা সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরাল। কাজেই আমাকে মুখ খুলতে হল—জানি না, হয়তো অপরিচ্ছন্ন চেহারার রুগ্নদেহ ছোটখাটো মানুষটাকে খুশী করতে হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, 'আমি মোটেই ঘুমোতে পারিনি।'

'কেন, কেন মশাই ঘুম হল না ?' মামা আমার চোখ দেখল। 'এমন ভাল ঘর দেখে দিলাম—একেবারে সমুদ্রের ওপর !'

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। অপাঙ্গে হেনাকে দেখলাম। তারপর, যেন হেনা শুনতে না পায় এমন নীচু গলায় বললাম, 'ঢেউ—ঢেউয়ের শব্দে ঘুম হয়নি !' বস্তুত আমার ও মামার কথা শুনতে হেনা এদিকে তাকিয়ে নেই, একটু দূরে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর ঝিনুক ও শঙ্খের দোকান নিয়ে বসেছে লোকটা—একটু একটু করে সেদিকে এগোচ্ছে ও। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এবং অবাক হলাম মামার গলার স্বরটাও সঙ্গে সঙ্গে আবার কেমন ঝরঝরে হয়ে গেছে।

'সমুদ্রের শব্দে ঘুম হয়নি, কেমন না ?' পুরু লেন্সের ওপারে দৃষ্টিটা ঝিকিয়ে তুলে মামা অল্প শব্দ করে হাসল। 'আমিও রাত্রে ঘুমোতে পারি না।'

'কোন দিন না ?'

'কুড়ি বছর !'

চুপ থেকে মানুষটার চোখের কোলের কালি, গালের গর্ত, কপালের কুঁচকানো চামড়া, এমনকি হাত-পায়ের মোটা শিরাগুলি পর্যন্ত নতুন করে দেখলাম।

'অবাক হয়ে গেলেন !' মামার ভাঙাচুরা ময়লা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল, বেশ বড় করে হেসে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে বলল, 'কুড়ি বছর রাত জেগে জলের গুরু-

গুর ঢেউএর আছাড় শুনে আসছি।'

হেনা বটুয়া খুলে টাকা বার করছে। যেন এর মধ্যেই দুটো বড় শঙ্খ ও কিছু ঝিনুক শামুক কিনে ফেলেছে ও।

'যাক গে, আর কোন কষ্ট হয়নি তো।'

'না—' মৃদু গলায় বললাম, 'আর ঘুম হয়নি বলে যে কষ্ট হচ্ছিল বা এখন হচ্ছে তাও না। ভাল লাগছিল শব্দগুলি শুনতে। আমি ইচ্ছা করে জেগে ছিলাম।'

'হুঁ।' মামা আর হাসল না, বরং একটু গম্ভীর হয়ে গেল; পাছে ঘাটের দিকে চোখ ফেরালে আমার স্ত্রীকে দেখতে হয়, তাই সেদিকে না তাকিয়ে ডান দিকের বালির ওপর চোখ রাখল লোকটা, আর কেমন জানি অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন গলায় বলল, 'প্রথম প্রথম ইচ্ছা করে জোর করে রাত জাগতে হয়—তারপর আপনা থেকে চোখের পাতা খুলে থাকে—তখন সমুদ্রের ডা‌ক ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। আর তখন···'

শেষের কথা কয়টা বোঝা গেল না। দূরে একটা রিক্সা দাঁড়িয়েছে। বেডিং স্যুটকেশ দেখে মামা টের পেল নতুন যাত্রী। যেন পড়িমরি করে যাত্রী ধরতে সেদিকে ছুটেছে। অবশ্য একটু দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা হাত তুলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে গেল, আবার দেখা হবে। ঘাড় কাত করে আমি হাসলাম। মামা আবার ছুটছে।

'কি কথা হচ্ছিল এতক্ষণ?'

'কেন?' অবাক হয়ে হেনার মুখ দেখলাম। হাতের শামুক শঙ্খগুলি আমার চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করে ও, কিন্তু উৎসাহ নেই এমন ভান করে আমি জলের দিকে চোখ ফেরাই।

'বাজে লোক, ঐ শাঁখওয়ালা বলছিল; যেমন ওর চেহারা তেমনি চরিত্র।' একটু চুপ থেকে হেনা আবার বলল, 'কেমন বিচ্ছিরি করে তাকাচ্ছিল তখন।'

'কিন্তু একবার তাকিয়েই তো সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে'—আমার বলতে ইচ্ছা করল, 'তা ছাড়া আমাদের ঘর খুঁজে দিয়েছে যখন লোকটা—কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে।' বললাম না কিছু। আস্তে আস্তে এগোই। হেনা আমার সঙ্গে হাঁটছে হঠাৎ ভুলে থাকতে চাইলাম। এত বড় সাগরবেলায় দাঁড়িয়েও একটি পুরুষের তাকানোর সমালোচনা করতে, তার চরিত্রের নিন্দা করতে হেনার বাধছে না ভেবে মনটা বিষিয়ে উঠল। যা আশঙ্কা করেছিলাম। মেয়েরা কখনই মনের ক্ষুদ্রতা ঢাকতে পারে না। বিরাটের কাছে এসে তোমার কি লাভ হল মেয়ে। দাঁতে দাঁত ঘষে ভিতরের রাগ চেপে রাখলাম। আর, যেন ঈশ্বরের

দয়া, যেন আমার সব বিদ্বেষ রাগ ধুইয়ে দিতে বড় মেঘের টুকরোটা সরে গিয়ে আকাশ মাটি জল সোনার রৌদ্রে ঝলমল করে উঠল। হাতঘড়ি দেখলাম। দেড়ঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু রোদ ছিল না। জগদ্দল পাথর হয়ে মেঘটা পুবাকাশ অন্ধকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। আমার হৃদ্‌পিণ্ড এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। এতক্ষণ সীসার রঙের জল ছাড়া চোখের সামনে আর কিছু ছিল না। এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র গাঢ় নীল রঙ ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছোপ, বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে-রং ধরে, আর একটু কাছের জল গৈরিক। উত্তাল অশান্ত ক্ষিপ্ত প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড ঢেউ বালির ওপর এতটা দুধ ছড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

'আমি স্নান করব না। ভীষণ ভয় করবে জলে নামতে।'

'না-ই বা করলে।' হেনার দিকে মুখ না ঘুরিয়ে উত্তর করলাম।

'হাঙর-কুমীর কত কী আছে কে জানে!' হেনা বিড়বিড করছিল। আমি নীরব। দূরে কালো কালো ফুটকি। এই ডুবে যাচ্ছে এই ভেসে উঠছে। 'ডিঙি নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে, তাই না?' হেনার অবাক চোখ জোড়া দেখতে আমার একটুও ইচ্ছা করছিল না। একটু থেমে থেকে পরে ও বলল, 'কাল রাত্তিরে কিন্তু তোমার মামার হোটেলে সমুদ্রের মাছ খেতে দেয়নি।'

'না, ওটা চিল্কার চিংড়ি ছিল।' গম্ভীর গলায় বললাম। 'সমুদ্রের মাছ খেয়ে কাজ নেই, পেটের অসুখ করবে।'

'ঠাট্টা করছ!' হেনা হাসল। তার বটুয়ার ভিতর ঝিনুকগুলি ঝনঝন করে বেজে উঠল। 'অথচ সবাই সমুদ্রের মাছ খেতে চায়, খুব মিষ্টি।' ওর গলায় আদুরে সুর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন গলায় বললাম, 'তা সমুদ্রে নেমে স্নান করলেও তো ভাল লাগে। কিন্তু হাঙর-কুমীরের ভয়ে সবাই কি নামতে সাহস পায়।'

হেনা চুপ করে গেল। আহত হল। বিস্তৃত বিস্ফারিত জলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে আঘাত করতে পেরে আমার যে কী ভাল লাগছিল। তখন ভিড় বেড়ে গেছে জলের কিনারে। হাঁটু জলে, কোমর জলে, কেউ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, আর সাহস পাচ্ছে না এগোতে—ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে যাচ্ছে, নুয়ে পড়ছে; কেউ কেউ তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠে যেন খাবি খেতে খেতে কোনোরকমে স্নান সেরে ছুটতে ছুটতে তীরে উঠে এল। সাদা টুপি পরা কালো কুচকুচে শরীর নুলিয়ার শক্ত মুঠোর ভিতর আটকা পড়ে সুন্দর মেয়েটা হাঁসফাঁস করছে; বেগোচ্ছল বিশাল ঢেউ হা-হা করে ছুটে আসছে। মেয়ে ভয়ে চোখ

বুজল আর সেই মুহূর্তে হুলিয়া ওর বেণীসুদ্ধ ছোট মাথাটা জলের নীচে ঠেসে ধরল। আর্তনাদ করে উঠল কি ও, না ঢেউ সরে গেছে—হুলিয়ার কঠিন বাহুর ওপর ফর্সা নরম শরীরের ভর রেখে ভিজা সপসপে শায়া ব্লাউজ নিয়ে রূপসী মাতালের মতো টলতে টলতে হাসতে হাসতে তীরে উঠে আসছে। কে ওকে মাতাল করল—হুলিয়ার হাতের ঝাঁকুনি? ঢেউয়ের একটা মাত্র দোলা? বালির বিছানায় বসে পুরুষ হাসছে। হয়তো স্বামী, হয়তো সঙ্গী। ত্রস্ত হাতে শুকনা শাড়ি ব্লাউজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বোধ করি হেনা সেই মুহূর্তে ফিসফিসে গলায় কিছু একটা মন্তব্য করছিল; আমি অন্যদিকে চোখ সরিয়েছি, গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম মোটা ভুঁড়ির ভদ্রলোক হাঁটুজলে কেমন ভয়ে ভয়ে একটা ডুব দিয়ে পাকা চুলে একরাশ বালি নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে এল। সমুদ্রকে এত ভয়! ভদ্রলোককে চিনলাম। আমাদের কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের এক প্রতিপত্তিশালী ব্যারিস্টার যেন। ডাঙ্গায় তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ; রাস্তার মানুষকে হতচকিত করে দিয়ে দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলে—সমুদ্রের কাছে শিশু, অসহায় শিশু।

'আমি ওদিকে যাচ্ছি।'

'তাই যাও।'

ঝিনুক খুঁজতে লেগে গেছে ও। শরীর বেঁকিয়ে লম্বা ঘাড় নুইয়ে হেনা বালু খামচাতে খামচাতে এগিয়ে যায়। স্বস্তি বোধ করি। লবণগন্ধী হাওয়ায় ওর বেণী দুলছে, আঁচল উড়ছে। উড়ুক। চিন্তা করলাম, সমুদ্রের ধারে এসে একবার যার ঝিনুক শামুক কুড়োবার নেশায় পেয়ে বসে, সারাক্ষণ বুঝি তাকে বালুর ওপর চোখ রেখে চলতে হয় ছুটতে হয়; ঢেউয়ের নাচ জলের রং ফেরা তার আর দেখতে হয় না। মন্দ কি! মনে মনে হাসলাম। সমুদ্র অনেক ছোট জিনিস ঠেলে ঠেলে তীরে তুলে দিচ্ছে। যাদের ছোট মন তারা ওসব নিয়ে মেতে থাকুক। হেনা, তোমার জন্য শামুকের খোলস, মাছের কাঁটা, জলের নীচে মরা গাছের শিকড়—কি জলের অন্ধকারে নিহত ভক্ষিত আর কোনো জীবের নখ দাঁত হাড়, যা সমুদ্রের কাছে অপবিত্র উচ্ছিষ্ট অনাবশ্যক। দু-হাতে সব কুড়িয়ে আঁচল ও থলে বোঝাই করে নিয়ে এস। কাল রাত্রির মতো আজ আবার স্বচ্ছ দিনের আলোয় ঝামাপুকুর লেনের মেয়েটিকে অনুকম্পা করতে করতে ওপরে উঠে এলাম।

মামা আমাকে দেখতে পেয়ে চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খর্বকায় মানুষটি। না কি আমাকে এখানে পাবে আশা করে আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলতে গেলে প্রায় ঢেউয়ের বাড়ি এসে লাগে এখানে। জলের

এত কাছে আর একটিও চায়ের দোকান নেই বলে কাল দুপুরে হেনাকে নিয়ে এখানে প্রথম চা খেতে ঢুকেছিলাম। দোকানের আটপৌরে চেহারা দেখে হেনা নাক সিঁটকিয়েছিল। অথচ এ-দোকানে না ঢুকলে কাল মামার সঙ্গে পরিচয় হ'ত না। এবং হোটেলে ঘর পাওয়া শক্ত হ'ত।

'কি মশাই, এর মধ্যেই উঠে এলেন ?'

হেসে ঘাড় কাত করলাম।

'চায়ের পিপাসা পেয়েছে।'

'তাই বলুন, চা-খোর মানুষের ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা চাই।' দোকানে ঢুকে মামা হাঁকডাক শুরু করে দিল : 'কইরে, বাবুকে ভাল করে চা বানিয়ে দে। বসুন।'

একটা বেঞ্চির ওপর আমি বসলাম। মামা পাশে বসল।

'এই চায়ের দোকানও আমার ভাগ্নের।

কথা শুনতে আমি তার চোখের দিকে তাকাই। কোটরগত রাতজাগা চোখ দুটো কুঁচকে মামা মিটিমিটি হাসে।

'হোটেল করার পরামর্শ দিয়েছিলাম আমি। মামার পরামর্শ মতো কাজ করে লাভ হয়েছে কিনা একবার বীরেনকে জিজ্ঞেস করুন না। সাত বছরে দু'খানা বাড়ি কিনেছে বীচের ওপর। তার আগে অবশ্য এই চায়ের দোকান, চামড়ার দোকান ছিল একটা। হরিণ আর সাপের চামড়ার জুতো ব্যাগ তৈরী করে বেচত ব্যাটা। যুদ্ধের সময় চামড়ার টান পড়ে। আসলে পুঁজি কম ছিল মুচির। না হলে তখনই তো ফেঁপে ওঠার সময় গেছে। চার টাকার ব্যাগ চৌদ্দ টাকা, দশ টাকার জুতো বত্রিশ টাকায় বিকিয়েছে। তা ক্যাপিটাল না থাকলে কি দিয়ে কি হবে। দোকান ফেল পড়ল। আমি বীরেনকে বললাম দোকানটা রেখে দিতে—চমৎকার চায়ের দোকান হয়—কিছুতেই শুনবে না কথা, শেষটায় রাজী হল যদিও ; কি, এই দোকানই তো ভাগ্নের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। হুঁ, চায়ের দোকানের টাকায় হোটেল—আর হোটেল খুলে সাত বছরের মাথায় বীচের ওপর দু-দুখানা পাকা বাড়ি।'

মামা চুপ করল। চা এসে গেল। আমার জন্য পুরো কাপ, মামার জন্য 'একটুখানি'।

'লিভারটা একেবারে গেছে। চা সহ্য হয় না। দেখলেই অবশ্য খেতে ইচ্ছে করে, তাই, অই এক চুমুক—আমার কড়া অর্ডার আছে চা চাইলে কখনই এর বেশি দিবিনে।' কাপে চুমুক দিয়ে মামা বলল, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম, আজ বড়লোক হয়ে বীরেন আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না ; না বলুক, আমি চিরকাল তোমার উপকার করে এসেছি—তোমার ভালটা দেখে এসেছি যখন

আজও করব, করছি, দেখছি—তখন দেখলেন তো, চেঙ্গার এসে নামল আর অমনি খপ্ করে ধরে ফেললাম—দিলাম পাঠিয়ে প্যারাডাইজে।'

হেসে মৃদু গলায় বললাম, 'দেখেছি।' এখন বুঝতে পারলাম সবাই একে 'মামা' ডাকে কেন। হোটেলের মালিকের মামা কাজেই বোর্ডারদেরও মামা—তারপর বুঝি সেই ডাক আস্তে আস্তে এখানকার রিক্সাওয়ালা, মুদি, পান-বিড়ির দোকানের মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবছিলাম আর স্থির দৃষ্টি মেলে সামনের উত্তাল অশান্ত জল দেখছিলাম, শব্দ শুনছিলাম। 'দূরের সমুদ্র সুন্দর কি কাছের—কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে ?'

চমকে উঠলাম। আমার মতো কথা বন্ধ রেখে মামাও হঠাৎ জল দেখছিল। লেন্সের ওপিঠে ফ্যাকাশে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে। প্রশ্নটা অতর্কিত। কিন্তু এত ভাল লাগল। মৃদু মৃদু হাসছে রোগা মানুষটা ; এবার আমার চোখ দেখছে।

'বলুন, ষোল ঘণ্টার বেশি এখানে কাটিয়ে দিলেন তো। দূরের সমুদ্র টানছে আপনাকে, না বালির ওপর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে ক্ষ্যাপা ঢেউ—সেগুলো ?' চুপ করে রইলাম। যেন নতুন করে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। কাল অন্ধকারের সমুদ্র দেখে ঢেউয়ের শব্দ শুনে যেমন হয়েছিল। যেন ঠিক করতে পারছিলাম না, আকাশের কোল ঘেঁষে শুয়ে থাকা শান্ত গম্ভীর নীল রহস্যে ভরা দূরের সমুদ্রকে আমি বেশি ভালবাসব, কি এখানে তীরের কাছের তরল হাস্যোচ্ছল শুভ্র ফেনবিকীর্ণ খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত মুখর তরঙ্গমালা।

'ঠিক করতে পারছি না।' অসহায়ের মতো মামার দিকে তাকাই।

'তাই বলুন।' মামা তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে একটা শব্দ করল। 'চট্‌ করে এর উত্তর দেওয়া যায় না। যারা দেয় তারা না বুঝে বলে। হুঁ—পুরো দু বছর লেগেছিল আমার এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে—হা-হা।'

কিন্তু আমি তার হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। অবাক হয়ে ভাবছিলাম সমুদ্র নিয়ে রোগা মানুষটা তা হলে রাতদিনই অনেক কিছু ভাবছে। কুড়ি বছর রাত জেগে ঢেউয়ের গর্জন শুনছে তখন বলছিল না ?

'কৈ রে, আর একটুখানি দিবি।' দোকানের প্রৌঢ় কর্মচারীটির দিকে মামাকে সকাতরে তাকাতে দেখে অবশ্য আমার হাসি পেল। লিভারের রুগী এইমাত্র চা খেয়ে আবার চা চাইছে। হাসলাম এবং এ-ও লক্ষ্য করলাম কর্মচারীর চেহারা নিদারুণ অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। ফিনাইলের ন্যাতা বুলিয়ে সে ওপাশের টেবিলটা মুছছিল। ওখানকার যত মাছি তাড়া খেয়ে আমাদের কাছে চলে এল।

'কি, তুই যেন রাগ করলি নীলাম্বর !'

কর্মচারীর মনের ভাব বুঝে ফেলে মামা গলাটাকে আরো করুণ করে ফেলল। 'দে দে—পয়সা দেব, আমি তোদের ক্ষতি করব না। তোর মনিব দু-বেলা দু-কাপ বরাদ্দ করে দিয়েছে আমার জন্য—কিন্তু অতিরিক্ত যেটা খাচ্ছি তার জন্য কি আমি দাম দিই না।'

হাতের ন্যাতা ফেলে রেখে নীলাম্বর গজগজ করে উঠল। 'আপনার কাছে পয়সা চাইছে কে—আপনার ভাগ্নের দোকান—যত খুশি খেয়ে যান। কিন্তু সময়-অসময় আছে তো—এখন বেলা দশটা বাজে, ধোয়া মোছার কাজ করব কি চা বানাব।'

মামা আমার চোখ দেখল।

'বুঝলেন তো। আসলে বীরেন বারণ করে: চা চাইলেই মামাকে চা দিবি নে। আমি বুঝি—সাতচল্লিশ বছর বয়স হল এমন সাদা কথাটা বুঝব না! বীরেন এখন আমাকে পছন্দ করে না। না করুক। কিন্তু আমি তার উপকারই করে যাব, তার ভালটাই দেখব, আমি হোটেলের যত বোর্ডার যোগাড় করি—'

কথা শেষ হল না। নীলাম্বর ঠক্ করে পেয়ালাটা মামার সামনে রাখল। চা পেয়ে মামার মুখ উজ্জ্বল হল, তৎক্ষণাৎ একটা চুমুক দিয়ে সরস গলায় বলে চলল: 'হ্যাঁ, বলছিলাম, তা বলে তোমার এদিকের বিষয়-সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে বা কি পরিমাণ হার্ড ক্যাশ আছে সে-সবের খোঁজ আমি রাখি না—দরকার নেই আমার রাখবার—আমি ভিখিরি আছি, আছি—আমার যদি ওসবের দিকে নজর থাকত, লোভ থাকত তো নিজে একটা হোটেল বা রেস্টুরেণ্ট খুলে বসতে পারতাম না কি? কুড়ি বছর হল এখানে আছি—না, কিছুই আমাকে টানল না, কিছুই আমার দরকার নেই—খাই না খাই, ছেঁড়া কাপড় পরলাম, একবার চিন্তা করি না—' ক্লান্ত শীর্ণ হাতটা সমুদ্রের দিকে তুলে ধরে মানুষটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'আমি আছি আর সে আছে—আর কিছু চাই না, দরকার নেই।'

হাসলাম আর কেমন যেন একটু শ্রদ্ধার চোখে, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, কবি বা দার্শনিকের দিকে মানুষ যেমন তাকায়, রোগা মানুষটাকে আর একবার দেখে নিয়ে তার মতো আমিও স্থির দৃষ্টি মেলে সমুদ্র দেখতে লাগলাম।

দূরের গাঢ় নীল ফিকে হয়ে গেছে। উজ্জ্বল রৌদ্র বুকে নিয়ে সমুদ্র এখন অন্য রূপ ধরেছে, যেন কিছু গলানো সীসা, কিছু রূপা হয়ে গিয়ে ওদিকের রাশি রাশি জল গর্জন করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে। 'লক্ষ্য করেছেন—রূপা ও সীসার সঙ্গে খানিকটা জাফরান রঙের মিশেল আছে।'

মামার দিকে চোখ না ফিরিয়ে আমি ঘাড় কাত করলাম। 'রোদের তেজ যত বাড়ছে তত তার বিক্রম বাড়ছে।' হাসল মামা।

'তাই।' বললাম, 'মেছো ডিঙিগুলো আর দেখছি না।'

'সব উঠে এসেছে।' নাকের একটা শব্দ করে নোংরা দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা বুঝি ভিতরের উল্লাস প্রকাশ করল। 'আর কতক্ষণ—এখন ওখানে থাকলে আছাড় মেরে ডিঙি ফাটিয়ে ফালা ফালা করে দেবে না! ওর সঙ্গে কি আর চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার্কি চলে।'

কথাটা বুকের মধ্যে গেঁথে রইল। 'চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার্কি চলবে না বলে তো এখন আর দূরে-কাছে একটা মানুষকে জলে নেমে স্নান করতে দেখছি না।' চিন্তা করলাম। বালুতট প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। বালুর ওপর ভেঙে পড়া শব্দের ঝড় খরতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু তটের গায়ে আঘাত করেও সে শান্তি পাচ্ছে না, যেন তৎক্ষণাৎ এতটা করে ভালবাসার ফেনা সান্ত্বনার শুভ্র প্রলেপ বুলিয়ে দিতে এক-একটা ঢেউ জল ছেড়ে কতদূর পর্যন্ত উঠে আসছে। মহতের যা গুণ! কাউকে আঘাত দিতে নেই, হিংসা করতে নেই; প্রেম-ভালবাসা যত পার বিলিয়ে যাও। বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ে সাদা সাদা ফেনার আবেগময় চুম্বন এঁকে দিয়ে ঢেউগুলি আবার নেমে যায়।

'আমার মনে হয়, কাছের জল দেখছেন, বালু ছিটানো ঢেউ।'

মনের কথা লোকটা কি করে টের পেল; অবাক হয়ে ঘাড় কাত করে হাসলাম। 'তাই ফেনাগুলো দেখছি—জুঁইফুলের মতো সাদা।'

'এখন কিছুকাল ফেনা দেখেই কাটবে, আর ঘোলা জলের মাতলামি।' মামা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তারপর আর এখানে চোপ থাকবে না, আর ক'দিন পর আপনার চোখ আর কোথাও সরে যাবে।'

দূরের সমুদ্র! আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কেননা, পাশের মানুষটির গাঢ় দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর হঠাৎ এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল যে, কথা বা হাসি কোনটাই যেন তখন মানাত না। চুপ করে দিগন্তে ধূসর নীল বিস্ফারের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর গুরুগুরু শব্দ শুনলাম। না, কেবল দেখা নয়, শোনা নয়, বুকের ভিতর কি যেন হাহাকার করে উঠল। যেন আমার কি নেই, হারিয়ে গেছে—না কি সারা জীবন যা চেয়েছি তা আজও পাইনি বলে হৃদ্‌পিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। আমার কানের কাছে অপরিচ্ছন্ন রেখাসংকুল মুখটা সরিয়ে এনে মামা ফিসফিস করে উঠল, 'আপনার রক্তের মধ্যে ওই শব্দ চলে যাবে—মগজের ভিতর ছবিটা আটকা পড়বে—আজ না, ক'দিন তাকিয়ে থাকুন—তখন আর কোনো কাজকর্ম ভাল লাগবে না, চোখের ঘুম উধাও হবে, ক্ষুধা কমে যাবে—'

'ভয়ংকর নেশা।' বিড়বিড় করে বললাম। ভাল লাগছিল, আবার ভয়ও করছিল শুনতে। অত্যন্ত আস্তে কথা বলছিলাম দুজন। যেন এসব জোরে

বলতে নেই, অন্যকে শুনতে দিতে নেই।

'কদিন আছেন এখানে ?'

'সাতদিন—তারপর ছুটি ফুরিয়ে যাবে।' মামার চোখের দিকে তাকাই। যেন বিশ্বাস করতে পারল না আমার কথা, এমনভাবে মানুষটা মাথা নাড়ল।

'হুঁ, ওই সাতদিন চৌদ্দদিন হয়ে যাবে—চৌদ্দদিন দেখতে দেখতে মাসে গিয়ে দাঁড়াবে—মাস বছর।' একটু থেমে মামা শেষ করল: 'আমি চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছিলাম সমুদ্র দেখতে—চব্বিশ ঘণ্টা আজ কুড়ি বছর হতে চলল।'

অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। ফ্যালফ্যাল করে মানুষটাকে দেখছিলাম। একদিন চাকরি করত তা হলে, বিয়ে-থা করেছিল কি ? কিন্তু সেসব প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল না, মনে হল অবান্তর—শুধু সমুদ্র আর সমুদ্রের ধারের রুগ্ন জীর্ণ মানুষটাই সত্য—মাঝখানে আর কিছু নেই, থাকা উচিত নয়; কি, আমারও কি কাল প্রথম রাত্রেই মনে হয়নি যদি আমিও এই গর্জমান স্পন্দমান ভয়ংকর সুন্দরের সামনে হারিয়ে যাই—হারিয়ে যেতে পারতাম—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় মামা। চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন। একটু আগের মুগ্ধ আবিষ্ট ভাবটা কেটে গেছে।

'কি হল ?' আস্তে শুধাই। কথার উত্তর দিচ্ছি না বলে কি রাগ করল, ভাবলাম—

'নাঃ, মশাই, আর দেখা হল না—ভাল লাগছে না।'

'কেন,' জলের দিকে চোখ ফেরাই, তারপর আবার মানুষটার মুখ দেখি। বুঝতে পারি না।

'আপনার ওই জুঁই ফুলের মতো সাদা ফেনার দিকে এখন আর চোখ রাখা যায় না।'

'কেন ?' একটা বড় ঢোক গিললাম। একটু হাসতে চেষ্টা করলাম।

'কেন আবার কি, ফুলের ওপর যদি একটা মাছি বসে থাকে আপনার ভাল লাগবে ?' অসমান ময়লা দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা রীতিমত ভেংচি কাটল: 'কতক্ষণ সেই ফুলের দিকে আপনি তাকাবেন বলুন—ঐ, ঐ দেখুন।' আঙুল তুলে মামা আমাকে সামনের রৌদ্রখচিত সুন্দর বালুতট দেখাল; বালুর ওপর ছুটে ছুটে আসছে দুধরং ফেনা; নির্জন শূন্য—আর কেউ নেই ওখানে স্নান করতে, ঢেউ দেখতে; না, আছে—একজন, একটি মেয়ে। মেঘের টুকরো হয়ে সিল্কের আঁচল উড়ছে, বেণী দুলছে। একটা বেশ বড়মতন ফেনা পর পর দুবার ছুটে এসে ওর আলতা ছোপানো পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিলে। খিলখিল করে হাসছে হেনা। ঢেউ সরে যেতে আবার একটু এগোয়, নুয়ে ঝিনুক কুড়ায়;

এবার আগের চেয়েও বড় হয়ে রামধনুর মতো বেঁকে দ্রুত ধাবমান ফেনার উচ্ছ্বাস ওকে আক্রমণ করে—কিন্তু ছুঁতে পারে না, ছুটে হেনা শুকনা বালুর ওপর উঠে আসে আর খিলখিল করে হাসে। যেন সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেসে ভেঙে কুটিকুটি হতে চাইছে ও।

'ইয়ার্কি করা হচ্ছে, তামাশা চলছে সমুদ্রের সঙ্গে।' আমার দিকে তাকায় না মামা, ওদিকে চোখ রেখে রাগে গজগজ করে। আমি নীরব। লজ্জায় চোখ তুলতে পারছি না। সত্যি তো, এত হাসবার কি আছে, মনে মনে বললাম, সমুদ্র দেখে মানুষ যেখানে বিমূঢ় বিস্মিত সেখানে হেনার এই চাপল্য কত অশোভন, কেমন অসংগত ঠেকছিল! ফুলের গায়ে মাছি—ঢেউয়ের মাথার পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার গায়ে আলতা পরা পা ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার তুলে আনা আর ছুটে পিছনে সরে আসা! উপমাটা মনে প্রাণে আমাকে অনুমোদন করতে হল। রাগে দুঃখে ছটফট করছিলাম। আমার মনের অবস্থা মামা বুঝতে পেরেছিল কি, নিশ্চয় চেহারা দেখে অনুমান করতে তার কষ্ট হয়নি, মুখটা কানের কাছে সরিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এমন সেজেগুজে জলের কাছে যাওয়াটাও কিন্তু ঠিক না মশাই,—তখনই আপনাকে আমি বলব ভেবেছিলাম।'

যেন একটা সতর্কবাণী, একটা অনিশ্চিত আতঙ্কের ইশারা। পুরো লেন্সের ওপিঠের বিবর্ণ চোখ দুটোর দিকে আমি একবার মাত্র দৃষ্টি বুলিয়ে আবার জলের দিকে চোখ ফেরালাম। 'চলি, দেখা হবে।' বিড়বিড় করে বলতে বলতে লোকটা বেরিয়ে গেল। একটু স্বস্তিবোধ করলাম বৈকি তখনকার মতো। সিল্কের আঁচল উড়িয়ে বেণী দুলিয়ে সমুদ্রকে সামনে রেখে হেনার ছুটোছুটি, নির্বোধ হাসি আর-একজন না দেখুক, তৃতীয় একটি প্রাণীর চোখে না পড়ুক, মনে মনে আমি তাই চাইছিলাম। একটা বিজাতীয় ক্রোধ, অপরিসীম ঘৃণা বুকের মধ্যে চেপে রেখে চিন্তা করছিলাম রং-করা ঠোঁটের বিচ্ছুরিত হাসির বিদ্রূপ ছড়িয়ে, কাজল বুলানো চোখের কুটিল কটাক্ষ হেনে প্রমত্ত ভয়ংকর সমুদ্রকে অপদস্থ করার ধৃষ্টতা চিরদিনের মতো থামিয়ে দিতে হেনাকে কী শিক্ষা দেওয়া যায়!

'বুঝলেন মশাই, সুবিধের লোক নয়—ওর সঙ্গে মেলামেশা কম করবেন।' নীলাম্বর। মামা দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে টেবিলের কাপ সরাতে লোকটা এসে পাশে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে ওর চোখ দেখি।

'কে, কার কথা বলছ?' প্রশ্ন করতে করতে অবশ্য বুঝে গেলাম কর্মচারীটির এই আক্রোশ কার উপর। যখন-তখন চা করে দেওয়ার দুঃখ সে কিছুতেই ভুলতে পারে না নিশ্চয়। অল্প হাসলাম।

'কেন, আমার তো মনে হয় বেশ ভাল লোক, দিনের বেলা সমুদ্র দেখে আর

রাত জেগে ঢেউয়ের শব্দ শোনে—ওই তো কাজ ওর।'

'পাজী মশাই, মহাপাজী—বীরেনবাবু ভালমানুষ বলে দু'বেলা দু'মুঠ ভাত দেয়—অন্য লোক হলে ওকে ঘাড়ে ধরে কবে বার করে দিত।'

'কেন, হোটেলের বোর্ডার-টোর্ডাব যোগাড় করে দেয় তো শুনি।' প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চুপ করে রইলাম। বিষয়ী ব্যবসায়ী বীরেনবাবুর কাছে—তার কর্মচারীর কাছে মাঝে মাঝে দু-একটি খদ্দের বা বোর্ডার যোগাড় করে দেওয়ার মূল্য কতখানি! যে লোক সারাদিন বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায়, সমুদ্রেব ঢেউ গুণে সময় কাটায়, সে লোক তাদের চোখে মহা অপদার্থ বা পাজী হওয়া বিচিত্র নয়। 'শালা মাতাল, শালা নেশাখোর।' টেবিল সাফ করতে করতে নীলাম্বর নিজের মনে গজগজ করে। কিন্তু বলতে কি, এইমাত্র যে আমার পাশে বসে ছিল—কাছের সমুদ্র আর দূরের সমুদ্রের রহস্য ব্যাখ্যা করতে যার জুড়ি নেই, যার কথা শুনে সমুদ্রকে আরও নিবিড় করে চিনতে চলেছি, ভালবাসতে আরম্ভ করেছি, সে মাতাল নেশাখোর জানতে পেরে আমি এতটুকু বিচলিত হইনি। বরং চিন্তা করলাম, মদ বা গাঁজা টেনেও যদি সে নেশা করে, মাতলামি করে, সেই নেশা তার কতক্ষণের। বরং বলা যায়, যে-নেশার টানে আজ কুড়ি বছর মানুষটা সব ছেড়ে এখানে পড়ে আছে সেটাই তার আসল নেশা; সেই ভয়ংকর নেশা বুঝতে পারার ক্ষমতা বীরেনের নেই, চায়ের দোকানের কর্মচারী টাকপড়া নীলাম্বরের নেই, হয়তো আর কারোরই নেই, আমি ব্যতিক্রম এবং এইজন্য ভিতরে গৌরববোধ করলাম। কবি শিল্পী সাধকের সংখ্যা এই জগতে খুব বেশী কি? চিন্তা করে নীলাম্বরের চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সফেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উন্মুক্ত সমুদ্র দেখতে, ঝড়ো লোনা হাওয়ায় বুক পুড়ে নেশায় আতুর হতে ছুটে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

হুঁ, একসময় শাড়ির আধখানা ভিজিয়ে বালি মাখানো পা দুটো টেনে টেনে হেনা যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল আমি ঘৃণায় অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আঁচলেব খুঁটে আবার এতগুলি ঝিনুক বেঁধে এনেছিল ও; ঘাম-তেলতেলে মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল, চোখের কোলের কাজল ফিকে হয়ে গিয়ে সেখানে বুঝি চাপ চাপ ক্লান্তি ঝুলছিল। শিউরে উঠেছিলাম। নারীর এই দলিত মথিত ক্লান্ত বিপর্যস্ত রূপের সঙ্গে কি আমি পরিচিত ছিলাম না, বড় বেশী পরিচিত ছিলাম বলে রৌদ্রালোকিত প্রশান্ত বালুবেলার পবিত্র পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার কবে দিয়ে ঝামাপুকুরের বাড়ির গাঢ় রাত্রির নৈঃশব্দ্যগুলি আমার আমার চোখের সামনে ঝুলছিল, বিছানার ছবিটা মনে পড়ছিল। ভয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলাম; এক মায়াবিনী ডাইনী সমুদ্রের ধার পর্যন্ত আমাকে

ধাওয়া করে ছুটে এসেছে !

'তুমি যাও, ঘরে ফিরে যাও !' কণ্ঠস্বরের বিকৃতি নিজের কানেও লাগল, কিন্তু তখন উপায় ছিল না।

'তুমি যাবে না ? বেলা হল, কখন খাবে।' চমক নেই ভয় নেই কুণ্ঠা নেই। সেই পরিমিত সংক্ষিপ্ত নিস্তরঙ্গ ধূসর দিনগুলির ডাক। আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। এখানে এসেও খাওয়ার ডাক !

'তুমি যাও, কাপড-চোপড় বদলাবে তো, না কি ?' কোনোরকমে উত্তর সেরে গরম বালুর ওপর জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম। ঢেউয়ের শব্দে ওর কণ্ঠস্বর চাপা পড়বে চিন্তা করে দূরে সরে গেলাম।

ওর সাধ মিটেছিল। সমুদ্রের মাছ দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে নিটোল ঘুমের ভিতর দিয়ে সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিতে পেরেছিল। ঢেউয়ের শব্দে ঘুম ভাঙবে ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে রেখেছিল। প্রতিবাদ করিনি। কেননা, চোখে জল দেখতে না পারলেও জলের গর্জন আমার রক্তের মধ্যে বাজছিল, জলের ছবি মগজের ভিতর আটকা পড়ে গিয়েছিল। শিয়রের পাশে ঝিনুক শামুকগুলি ছড়িয়ে রেখে ঘুমোচ্ছিল হেনা। ইচ্ছা করছিল সবগুলি তুলে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কি, আমি সহ্য করতে পারছিলাম না এগুলিও ওর সঙ্গে ট্রেন চড়ে খুব শিগগিরই কলকাতায় ফিরে যাবে, হাওড়া স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি চাপবে। তারপর এক ছুটে ঝামাপুকুর লেন। তারপর কাচ-পরানো আলমারীর তাক। না, তখন আর হেনার সময় নেই ওদের দিকে তাকাবার। অফিসের রান্না নামছে না। আর একবার একটু জোরে ছড়ছড় শব্দ করে কলের জলটা বন্ধ হয়ে গেল। ছাইরঙা আকাশ। মানুষের গরম নিশ্বাস আর ঘামের গন্ধের মধ্যে ট্রামের এক কোণায় একটু জায়গা। তারপর লিফ্‌ট-এর সোঁ সোঁ। তারপর ? তারপর আর কিছু নেই। সমুদ্র অনেক দূরে। ঢেউয়ের গভীর নিস্বন স্তব্ধ। ঝক-ঝকে বালির বিছানায় রূপালী ফেনার উচ্ছ্বাস অতীতের স্বপ্ন হয়ে আছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। যেন কর্তব্য স্থির করতে পারছি না। হেনার মাথার কাছে দেওয়ালের ছবিটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকি।

ঘুম থেকে উঠেই সকলের আগে ও খোঁজ করে চিরুনির, চুলের কাঁটার।

'আমি জানি না।'

'পাউডারের কৌটো গেল কোথায় ?'

'আমি দেখিনি।'

'বা—রে, আমার লিপস্টিক কাজললতা বা কে সরালে।'

'সত্যি আমি বলতে পারব না।' অনুনয়ের চোখে স্ত্রীর মুখ দেখি। একটু

বেশী গম্ভীর থেকে দেওয়ালের ছবিটার দিকে চোখ ফেরাই।

'অবাক কাণ্ড তো! ঘরে কি চোর ঢুকেছিল।' হেনা বিড়বিড় করে; আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গলা টান করে উঁকি দিয়ে দেওয়ালের তাক দুটো দেখল ও, তারপর হাঁটু মুড়ে পিঠ বেঁকিয়ে খাটের নীচ দেখে শেষ করল। 'না, কোথাও নেই—ওখানে আলতার শিশিটা ছিল—নেই। বিচ্ছিরি কাণ্ড তো।'

ঘুরে ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মুখের পেশী কঠিন করে আমি মনোযোগ দিয়ে নিজের হাতের নখ দেখি, চামড়া দেখি।

'কি হল, তুমি চুপ করে যে?'

'আমি কি জানি?' ভয়ে ভয়ে চোখ তুললাম।

'তুমি লুকিয়েছ, নিশ্চয় তুমি।'

'সত্যি না।'

'উঁহু, আর কে আসবে এ-ঘরে—দরজার ছিটকিনি আটকানো—তুমি চেয়ারে বসে ঢুলছ। শোবার সময় আমি কানের রিং দুটো খুলে টিপয়ের ওপর রেখেছিলাম—ত্থাখো, ঠিক ওখানে রয়ে গেছে। আর চোর এসে কিনা সোনা রেখে আলতা লিপস্টিক নিয়ে গেল। আর, চোর ঢুকবেই বা কি করে।' হেনা আমার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেয়: 'তুমি তুমি—দুষ্টামি করে—' কাজটা কাঁচা হয়ে গেছে। আর গম্ভীর হয়ে থাকাও অর্থহীন, বরং হেসে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। হাসলাম।

'কোথায় রেখেছ, কি আশ্চর্য—এমন কাজ করে তুমি এতক্ষণ চুপ থাকতে পার!' হাসির ঝলক তুলে হেনা আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পডছিল, তার আগেই আমি শার্টের নীচে লুকানো কোলের ওপর জডো করা চিরুনি চুলের কাঁটা আলতা লিপস্টিক বের করে দিই। এবার হেনা হাসতে হাসতে মেঝের ওপর ভেঙে পডল, এলোখোঁপা ভেঙে গিয়ে চুলের রাশ কালো কালো ঢেউয়ের মতো সাদা নরম পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পডল। চট করে চোখটা সরিয়ে নিই, বুকের ভিতর ধাক্কা লাগে, অপরাধী মনে হয় নিজেকে; সেকেণ্ডের জন্যও কি আমি আমার ঘরের কাছের প্রচণ্ড প্রমত্ত যুগ যুগান্তের বিস্ময় ভয়ংকর সুন্দর পবিত্র সমুদ্রতরঙ্গকে ভুলতে চেয়েছিলাম। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে জানালার পাল্লাগুলি খুলে দিলাম। হেনা ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঁচল সামলে নিয়ে চিরুনি দিয়ে ও চুল আঁচড়ায়। টের পেয়ে আমি আর ওদিকে তাকাই না।

'হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

'এমনি।'

'এসব লুকিয়েছিলে কেন ?'

'এমনি।'

'এখানে এসে মাঝে মাঝে তোমার কী যে হচ্ছে—তখন বীচ্‌-এ কত বড় এক ধমক—'

'ধমক দিইনি তো, বলছিলাম তুমি যাও আমি আসছি।'

'ও, তাই নাকি—আমি ভাবলাম—' হাসির শব্দ।

'কি ভেবেছিলে শুনি।' সমুদ্রকে পিছনে রেখে ঘুরে দাঁড়াতে হল ; ঢেউয়ের শব্দ ওর হাসির শব্দে চাপা পড়ে যায় অনুভব করে মাথাটা আবার গরম হতে থাকে। এমন আর কতকাল চলবে যেন ঠিক করতে না পেরে হতভম্বের মতো ওর মুখ দেখি, ভুরু দেখি। সুযোগ বুঝে নারী অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করে। 'তাকিয়ে কী দেখছ ?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয় দেখছ, আমাকে দেখছ।' প্রতিশোধ তুলতে ঠোঁটের হাসি নিভিয়ে হেনা গম্ভীর হয়ে ওঠে : 'তা আমায় দেখে দরকার কি—ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ, সমুদ্র আমার চেয়ে সুন্দর।'

এরপর আর আঘাত করা চলে না চিন্তা করে অনুকম্পার হাসি দু চোখে ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম, 'অত সেজেগুজে কোথায় বেরোনো হচ্ছে।'

'আমি সেজেগুজে বেরোই তুমি চাও না—কেমন, তাই তো এসব লুকিয়েছিলে।' দাঁত দিয়ে ফিতা কামড়ে ধরে ও বেণীর গলায় ফাঁস পরায়, তারপর ফিতাটা মুখ থেকে আলগা করে দেয় : 'না কি এটা কলকাতা না বলে আমার সাজতে-গুজতে মানা—এখানে কেবল তুমি আছ আর জল আছে আর তোমার ঐ কুৎসিতদর্শন মামাটি আছে, তাই যথেষ্ট—' একটু চুপ করল ও, হাতের আরশি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সগুরচিত খোঁপাটি দেখল, তারপর : 'আমি ভাবতেই পারি না বেছে বেছে তুমি ঐ বাজে চরিত্রের ছোটলোকের মতো দেখতে মানুষটার সঙ্গে কি করে মিশে যেতে পারলে—একটা ঘণ্টা ওর সঙ্গে বসে চায়ের দোকানে গল্প করে কাটালে, আমি কি লক্ষ্য করিনি।'

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করলাম না, চুপ করে গেলাম। যেমন তখন চায়ের দোকানের নীলাম্বরের কথা শুনে চুপ থেকেছি। কিন্তু নীলাম্বর না বুঝুক হেনা বুঝত, পৃথিবীর যে মানুষ প্রথম ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়েছিল সে বাজে চরিত্রের ছিল, ছোটলোক ছিল, আকাশের গ্রহনক্ষত্রের রহস্য যে বোঝাতে চেয়েছিল সে উন্মাদ ছিল, অপরাধী ছিল—হোটেল-রক্ষক বীরেনবাবুর মামার মুখে সমুদ্র ছাড়া কথা নেই, অগাধ বিস্তৃত ধূসর নীল ছাড়া চোখে আর কোনো রং নেই,

স্বপ্ন নেই, কাজেই—

'আমি এখন মন্দির দেখতে যাব, বুঝলে, মন্দির দেখা হয়নি—এ-বেলা আর বীচ্-এ যাব না।'

'তাই যাও।' অস্ফুটে বললাম। আমার গায়ে যেন দক্ষিণের হাওয়া লাগল। এখানে এসে ত্রিশ ঘণ্টা পর আমি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করতে লাগলাম।

আকাশের আলো নিভে যাচ্ছে, সমুদ্র সীসার রং ধরেছে, কাছের সীসা গলে গলে তরল রূপা হয়ে সোঁ সোঁ শব্দ করে অবিশ্রাম ছুটে আসছে। ম্রিয়মাণ রৌদ্রের গন্ধ লবণের গন্ধ গায়ে মেখে ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হু-হু বাতাস বইছে, আমি নড়ছি না, আমার পিছনের শুকনা বালু উড়ছে। সামনের বালু লোনাজল খেয়ে ভারি হয়ে শুয়ে আছে, বাতাস তাকে নড়াতে পারে না। সেই ভারি ভিজা বালুর ওপর পায়ের দাগ নেই, কোনো দাগ নেই—মসৃণ গাঢ় অকলঙ্ক নিটোল ; জল সরে গিয়ে এই বুঝি পৃথিবীর প্রথম মাটি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে মনে করা যায়, আর আমার ঠিক পিছনে কত কোটি পায়ের চিহ্ন পড়ে বালু ক্ষত-বিক্ষত—যুবকের পায়ের দাগ যুবতীর পায়ের ছাপ, কত লক্ষ বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু কিশোর কিশোরী না হেঁটে গেছে এর ওপর দিয়ে। মনে হতে পারে সব মানুষ বুঝি এখানে এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে, মনে হতে পারে সব মানুষ সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল, তারপর যার যেখানে যাবার চলে গেছে। আসলেও কি তাই নয়, ভাবলাম মানুষ আসে মানুষ যায়, আর নগ্ন নির্জন সমুদ্র একভাবে ফুঁসে চলেছে। তার মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা আছে, প্রাণের ঔজ্জ্বল্য আছে, আবার মৃত্যুর নিষ্ঠুর নিরবয়ব অন্ধকার অতলস্পর্শ গর্ভ জুড়ে লক্ষ ষড়যন্ত্রের আবর্ত তৈরী করে চলেছে।

'কি দেখছেন, কাকে খুঁজছেন ?

'আপনাকে।'

'আমি তো এখানেই আছি মশাই,' হালকা শীর্ণ হাত দুটো আমার কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে বীরেনবাবুর মামা হাসল। 'লক্ষ্য করছিলাম সব চলে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল, 'আপনি একলা, ঘুরে ঘুরে জল দেখছেন কেবল।'

'ভাল লাগছে, আবার ভয়ও করছে।' অল্প হাসলাম।

'তা করবে, আরো কিছু দিন যাক, আমার মতো যেদিন আর পিছুটান থাকবে না সেদিন আর ভয়ডর থাকবে না।'

গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। একটা কি পায়ে লাগল।

'ডাব—' মামা নাকের শব্দ করে হাসল, খুব ভাল লাগল না হাসিটা, কিন্তু তা হলেও কথাগুলি শোনার মতন : 'কেউ নিবেদন করেছিল আর কি—সমুদ্র দেখতে এলেই তো ফল ফুল ছুঁড়ে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়।'

'কিন্তু রাখল না তো উপহার, সমুদ্র আবার ওটা বালুর ওপর রেখে গেছে।' বিড়বিড় করে বললাম।

'সমুদ্র এসব রাখে না—কিন্তু মানুষ কি তা বোঝে!' একটু চুপ থেকে লোকটা আস্তে আস্তে বলল, 'কেন রাখবে আপনিই বলুন—ডাবটার মধ্যে কি আছে—না শাঁস না জল, সবে ফুল কেটে বেরিয়েছিল হয়তো, ওই ফল আপনি খাবেন না—আমিও না। খাওয়া যায় না। কাজেই সমুদ্র ফিরিয়ে দিয়েছে। ফুল? ফুল বেলপাতা, আপনি চিবিয়ে খান, না আমি খাই? কিন্তু মূর্খের দল এসবই ঢেউয়ের মাথায় ছেড়ে দিয়ে ভাবে অনেক কিছু দিলাম।'

'তা তো বটেই।' সায় না দিয়ে পারলাম না।

'পাথরের দেবতা না, মাটির ঠাকুর না—সমুদ্র হল সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ।'

চুপ করে শুনলাম। তারা-ছড়ানো আকাশের নীচে কালো জলের অশ্রান্ত গর্জন একথাই কি মনে করিয়ে দিচ্ছে, ভাবলাম। আমি জীবন্ত, আমি ভয়ংকর—

'আমি যখনই বালুর ওপর বেড়াতে আসি পকেটে করে কিছু মাছভাজা, কেক্ পাউরুটি বা আর-কিছু খাবার নিয়ে আসি।'

হাসছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এত জোরে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি লাগল যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হল রোগা মানুষটার শরীরে এত বল!

'কি, বিশ্বাস করছেন না? আমার আপনার মতো তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, ইচ্ছা রুচি সব-কিছু। ওই দেখুন কেমন রাক্ষসের মতো হাঁ নিয়ে ছুটে ছুটে আসছে।'

হাসি মিলিয়ে গেল, বুকের ভিতর ঢুব-ঢুব করছিল। গাঢ় জমাট অন্ধকার কেটে ফালা ফালা করে দিয়ে ভয়াল বিশাল ঢেউ এত বড় এক-একটা হাঁ নিয়ে ছুটে আসছে, অস্বীকার করবে কে?

'আপনি তখন বলছিলেন জুঁইফুল—সাদা জুঁইয়ের মালা মাথায় জড়িয়ে ওরা আপনাকে আমাকে ভালবাসতে আসে। তা তো বটেই—একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখুন, ফুল কি সাদা শক্ত ধারালো দাঁত ওগুলো।'

অস্বস্তি বোধ করছিলাম। না, আমি মেনে নিতে পেরেছিলাম রূপালী ফেনা না, কোমল ফুল না; ঝকঝকে মসৃণ নিষ্ঠুর কঠিন দাঁতের সারি মেলে ধরে ওরা আসছে, একটার পিছনে আর-একটা, আর-একটা, আর-একটা—আমার পাশের মানুষটা আবার নাকের শব্দ করে হাসছে। যেন ঘিনঘিনে হাসিটা আমার মগজের ভিতর আটকা পড়ে যাবে। মেরুদাঁড়ায় শিহরণ অনুভব করলাম। আমার কাঁধের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিচ্ছে না, কেন, মুহূর্তের জন্য তা-ও

চিন্তা করলাম।

'কি মশাই, একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, মুখে রা নেই—খামকা কথা বলছি?'

'না না না।' প্রতিবাদের সুর তুললাম, স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। 'তা তো বটেই। তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, সাধ রুচি সব—।'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছিলাম, ধানদূর্বা বেলপাতাও খাবে না সে—ফুলকচি ডাব পেয়ারাও খাবে না—আমি যখনই বীচ্-এ আসি, পকেটে করে মাছভাজা, সিঙ্গাড়া, রুটি, কেক্, ডিমের বড়া নিয়ে আসি।' চুপ করল মামা। এবার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নেয় বলে ভাল লাগে। কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন ভাবছিল মানুষটা। বালু পার হয়ে দুজন আস্তে আস্তে শক্ত উঁচু তীরের দিকে এগোই। আমিই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। রাত হলে হোটেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিরুক্তি না করে মামা উঠে আসতে রাজী হয়। অথবা গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে এবং আমাকে সেটা বলতে হবে ভেবে যেন চুপ করে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আর ঢেউয়ের শব্দ পিছনে রেখে রাস্তার আলোর কাছে এসে গেছি যখন, মামা বলল, 'ওই আমার নেশা, সমুদ্রকে খাওয়ানো—ওরা ধান দূর্বা ফুল বেলপাতা দেয় বলে আমি ওদের মূর্খ বলি, পাগল বলি—উল্টে আমাকে ওরা বলতে ছাড়ে না, হুঁ আমি বাজে—সৃষ্টি-ছাড়া মানুষ; পাজী বদমায়েস, কেউ কেউ বলে—'

'কেন আপনি তো—' হঠাৎ কি বলতে থেমে গেলাম। আশ্চর্য অনুভব-শক্তি লোকটার। আমার চোখে চোখ রেখে হাসল। আলো-অন্ধকারে কপালের ভাঁজগুলি খরতর হয়ে ফুটে উঠছিল।

'ঠিক বলেছেন, কারো তো অনিষ্ট করিনি—নিজের খেয়াল নিয়ে নিজে চলি। কিন্তু কি করবেন মশাই, মানুষ তাতেও আপনাকে রেহাই দেবে না। ঠিকই বলেছেন। আমার ভাগ্নে বীরেন। আজ সে অনেক পয়সার মালিক আর সেই গরমে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবহেলা, হুঁ, আমার ওপর সে চটে আছে কেন জানেন—জানেন না।'

'কাল শুনব।'

'আরে মশাই এ কি সমুদ্রের গর্জন—আজ কাল পরশু, সারাজীবন শুনলেও শেষ হবে না। আমার কথা একটুখানি, ওই বলতে বলতে ফুরিয়ে যাবে, শুনুন। কলকাতা থেকে অ্যাল্সেসিয়ানের বাচ্চা কিনে এনেছিল বীরেন—কত আদর যত্ন পয়সা খরচ কুকুরের জন্য। হঠাৎ বাচ্চাটা একদিন হারিয়ে গেল! বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হল, পাওয়া গেল না—এখন বীরেন সন্দেহ করছে আমাকে—

হুঁ, তার মামাকে।'

'কেন? আপনি কুকুর দিয়ে কি করবেন?'

'আর কি।' ঘিনঘিনে নাকের হাসিটা আবার কানের কাছে, মুখের কাছে ছড়িয়ে দিল লোকটা: 'ওই ওখানে দিয়ে দিয়েছি।' গর্জমান অন্ধকার সমুদ্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে মামা শেষ করল: 'বীরেন আমাকে দিয়ে বিশ্রী সন্দেহটা করছে—আজ চার বছর—অথচ সে জানে, ভাল করে জানে, মাছটা ডিমটা রুটি-কেকটা ছাড়া অন্য কিছু আমি কোনো দিন ওকে খেতে দিইনি। আচ্ছা চলি মশাই, কথায় কথায় অনেক রাত হল।'

আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে, একটা কিছু আমার মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে পেরেছিল লোকটা। আবার সারা রাত জেগে কাটালাম। বাইরে অন্ধকার বালুর ওপারের শব্দের ঝড় যত না শুনেছি, লোভী নিষ্ঠুর অতৃপ্ত অশান্ত ঢেউয়ের দাঁতালো ভয়ংকর চেহারা যত না দেখেছি, তার চেয়ে আমি বেশি দেখেছি আমার বিছানা: কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা একটা নরম তুলতুলে শরীর। আলোটা জ্বলছিল। ইচ্ছা করে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। তা নিয়েও অবশ্য রাগারাগি হয়ে গেছে। আমি আমার ভাতের থালা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। হেনার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল ও। মন্দির দেখতে বিস্তর হাঁটতে হয়েছিল: 'ক্লান্ত।'

'তুমি খেয়ে নাও।'

'তুমি?'

বিরক্ত হয়ে হাত তুলে তাকে চুপ করতে বলেছিলাম। যেন কথা বললে আমার বাইরের সোঁ সোঁ শব্দ শোনার ব্যাঘাত হবে। হাসছিল ও। 'রাত বারোটা পর্যন্ত বীচ্-এ কাটিয়ে এসে এখনো তোমার জানালায় দাঁড়িয়ে জল দেখতে হবে, ঢেউয়ের গর্জন শুনতে হবে। উঃ, আমার তো একদিনেই ক্লান্তি লাগছে—জল কত দেখা যায়—ওই একঘেয়ে শব্দ কত শোনা যায়।'

'চুপ চুপ—তুমি খেয়ে নাও।'

অগত্যা ও খেয়ে নিয়েছিল। খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। আলোর জন্য চোখ বুজতে কষ্ট হচ্ছিল, টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার তখনো খাওয়া হয়নি, ঘর অন্ধকার করতে বলতে পারে না। ওর একটা পা বিছানার ওপর টান করে ছড়িয়ে দেওয়া। আর একটা পা তুলে রেখেছিল। শায়ার লেস্ হাঁটুর কাছে উঠে গিয়েছিল। হাঁটুটা একটু একটু করে আন্দোলিত করছিল ও, আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর ডুমটা দেখছিল, আমাকে দেখছিল। হাঁটু তুলে রাখার

দরুন পায়ের নরম মাংসল ডিমের ছবিটা আমার চোখে পড়েছে, তুবার চোখে পড়েছে ; কি, তখন থেকেই আমার মাথাটা গরম হচ্ছিল। আমার মগজের ভিতর সমুদ্র ফুঁসে মরছে, সাদা ঝকঝকে ধারালো দাঁতের হাঁ নিয়ে অসংখ্য ঢেউ ছুটে আসছে, আর সাদা ধবধবে শায়ার নীচে হেনার পায়ের নরম মাংস কাঁপছিল। আর ঠিক তখনই কিনা ও হাই তুলে ঘুমের ছোপলাগা লালচে চোখ দুটো করুণ করে আমার দিকে মেলে ধরে বলছিল, 'ওই বাজে লোকটার সঙ্গে মিশে মিশে তোমার এমন হয়েছে—জলের নেশা ধরে গেছে।'

উত্তর করিনি। মহৎকে ভালবাসতে, বিরাটের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিতে সংযম অভ্যাসের দরকার, যেন চিন্তা করছিলাম ; তাই হেনার কথায় কান দেব না বলে চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ও চুপ থাকেনি, আবার কথা বলছিল। ঘুমের জলে ভিজে ওঠা ভার-ভার কথা, 'ভয়ংকর নিষ্ঠুর ওই মামা লোকটা, পাশের ঘরের মহিলা বলছিলেন, ওর সঙ্গে আপনার কর্তাকে মিশতে দিচ্ছেন কেন।'

আমার সংযম আর রইল না। পাশের কামরার মহিলার সঙ্গে হেনা মন্দির দেখতে গিয়েছিল মনে পড়ল।

'তোমার ঘুম পেয়েছে তাই আবোল তাবোল বকছ, আমি খেয়ে আলো নিবিয়ে তোমার পাশে শুয়ে পড়ি তাই চাইছ।'

ধমক দিয়ে উঠেছিলাম। লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলাম।

'কেন নিষ্ঠুর কেন, কি করেছে ও!' ছুটে বিছানার কাছে চলে গেছি। ধমক খেয়ে, আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে চুপ করে ছিল ও। না কি সমুদ্র-পাগল সৃষ্টিছাড়া লোকটার নিষ্ঠুরতার কথা আমার কানে তুলতে নেই, পাশের ঘরের মহিলার সে-রকম কিছু নির্দেশ ছিল ? কথাটা পরে চিন্তা করেছি। হেনা আর চোখের পাতা খুলছিল না। আমি রাগ করে ভাতের থালা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলেছি। আলোটা তেমনি জ্বলছিল। গজগজ করছিলাম: 'এটা কলকাতার বাসা না—সকাল সকাল খেলাম আর ঘর অন্ধকার করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। তবে আর বাইরে বেড়াতে আসা কেন।' শেষের কথাটা নরম গলায় বলেছিলাম। কিন্তু বেচারা আর চোখ খোলেনি। তাই চাইছিলাম। আলো জ্বলছিল। জানালার বাইরে অন্ধকার সমুদ্র গোঁ গোঁ করছিল। আমার মাথায় তখন একটা কুকুরছানা, নরম মাংস। আমি পরিষ্কার দেখছিলাম হোটেল থেকে ওটাকে চুরি করে নিয়ে বীরেনবাবুর মামা সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। অট্টহাস্য করে সকলের বড় ঢেউটা ছুটে এসে ওটাকে তুলে নিয়ে গেল। তাই বলছিলাম, রোগা মানুষটা আমার রক্তের মধ্যে কি যেন সংক্রামিত করে দিয়েছিল, না হলে বাইরের উন্মত্ত অশান্ত গর্জন শুনতে শুনতে নেশাতুরের মতো আমি একসময় বিছানার কাছে সরে

যাব কেন। হেনার পায়ের নরম মাংসল ডিমটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিলাম, যেন কতটা নরম নখ বসিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, ঘুমের মধ্যেই যন্ত্রণায় ও উঃ করে উঠেছিল, তখনি হাত সরিয়ে এনেছি যদিও।

পরদিন খুব সকালে উঠে হেনা কোন্ এক সাধুবাবার আশ্রম দেখতে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত পাশের ঘরের মহিলাও সঙ্গে গেল। মনটা হালকা লাগছিল। রাত্রির ওই ঘটনার পর কেমন করে ও আমার দিকে তাকাত, আমি ওর দিকে তাকাতাম—সেই সমস্যা ভোরের নরম আলোয় ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মিটে গেল। ঘরের দিক থেকে মন হালকা লাগছিল, কিন্তু বাইরের ছবি দেখে মন ভার হয়ে রইল। আকাশের চেহারা মেঘে মেঘে মন্থর বিষণ্ণ হয়ে আছে। সমুদ্রের রঙেরও পরিবর্তন নেই। কোথায় সেই সবুজ ছোপ, নীল নয়নাভিরাম ময়ূরকণ্ঠী রং, রূপালী ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল জাফরান ছটা! দূরের জল কাছের জল এক রং—ছাই রং। যেন সেইজন্যই সমুদ্রকে আরো ভয়ংকর লাগছিল। হাসি-উচ্ছ্বাসের বালাই নেই—কেবল ক্রোধ, কেবল গর্জন আলোড়ন ছাড়া আর কিছু জানে না সে। কিন্তু আমার মন আরো খারাপ লাগছিল লোকটাকে একবারও কোথাও দেখতে পেলাম না বলে। না কি সমুদ্র যেদিন এই চেহারা ধরে সেদিন মামা তার ধারেকাছে থাকে না—কেবল রৌদ্রের দিনে মুহুর্মুহু রং ফেরার রহস্য দেখতে, কি রাত্রির অন্ধকারের হিংস্র উন্মত্ত কোলাহলের অর্থ খুঁজে বার করতে তার উৎসাহ? কোথায় গেল! বালুর ওপর অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম। একবার পুবে, আর একবার পশ্চিমে অনেক দূর হেঁটে গেলাম। কেউ নেই। সমুদ্র আজ মেজাজ খারাপ করে আছে দেখে স্নান করবে দূরে থাক, মানুষ যেন জলের কাছে ঘেঁষতেই সাহস পাচ্ছে না—একটি দুটি মুখ দেখা গেল, ঢেউয়ের অবস্থা দেখে দূরে থেকেই তারা বিদায় নিয়েছে। মাছ ধরতে জেলেরা আসেনি। মামাকে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে এক সময় সেই চায়ের দোকানে ফিরে এলাম। না, সেখানে নেই। আজ চা খেতেই আসেনি বীরেনবাবুর মামা। 'হয়তো রাত্রে খুব টেনেছিল এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।' চা তৈরী করতে করতে নীলাম্বর বলছিল, 'নেহাত মামা—তাই পারছে না, না হলে কবে বাবু জুতো পেটা করে বেটাকে তাড়িয়ে দিত।' কান ছিল না তার কথায়; উদাস শূন্য চোখে বিবর্ণ ঢেউগুলির মাতামাতি দেখছিলাম। আমার পাশে একটা লোক নেই—কানের কাছে মুখ এনে এসিডে খাওয়া ময়লা দাঁত বের করে কথা বলছে না। তাই সমুদ্রকে অপরিচিত ঠেকছিল, দুর্বোধ ঠেকছিল। দুদিনেই মানুষটা আমাকে সমুদ্রের কত কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আজ একটা সকালের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। যেন আর পাঁচজনের চোখ

দিয়ে আমি জল দেখছি, জলের একঘেয়ে শব্দ শুনছি। যেন আর একটা বেলার মধ্যেই আমি হেনার মতো 'বোরিং' বলে সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেব। হয়তো আর যে ক'দিন আছি বীচ্-এ বেড়ানোর কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে মঠ-মন্দির-আশ্রম দেখব। মুখের ভিতরটা তেতো-তেতো ঠেকছিল। দূরের ধূসর রেখাটা ক্রমে কালো হয়ে আসছে। গুরগুর শব্দটা, গভীর—মন্থরতর হয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, ওপরের মেঘ ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। ঝড় উঠল কি? কিন্তু বললে কেউ বিশ্বাস করত না, আমি চায়ের দোকানের বেঞ্চির ওপর বসে তখন ঢুলছিলাম।

কতক্ষণ এভাবে বসে বসে ঘুমোচ্ছিলাম কে জানে; বোধ করি নীলাম্বরের পেয়ালা-পিরিচ ধোয়ার শব্দে এক সময় ধড়মড় করে জেগে মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসলাম, আর তখন চোখের পাতা টান টান করে মেলে ধরে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে আমি বাইরেটা দেখলাম; স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল; এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে, হাওয়ায় সব ঝেঁটিয়ে কোন্‌দিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে—একটা প্রকাণ্ড নীল পেয়ালা উপুড় হয়ে আছে মাথার ওপর, সমুদ্রের ওপর, আর সেই পেয়ালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁপা রঙের রৌদ্র। আর সেই রোদ শুষে নিতে লুঠ করে নিতে ঢেউদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে; তারা কলরব করছে, ছুটছে; ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে রূপার গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে সবুজের ছোপ। দূরের জল কোমল নীল; যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে বলে নীল পেয়ালা থেকে চুঁইয়ে পড়া সবটুকু আলো শুষে নিতে পেরে ওধারের জল শান্ত গম্ভীর হয়ে আছে।

এখন হয়তো মামাকে দেখতে পাব। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বালুর ঢালু বেয়ে খানিকটা ছুটে আর এগোতে পারলাম না, পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল। নিজের চোখ দুটোকে আবার যেন বিশ্বাস করতে বাধছে; ওপরে রৌদ্র-গাঢ় স্তব্ধ আকাশ, সামনে ফেনশীর্ষ লক্ষ লক্ষ ঢেউ, ডাইনে বাঁয়ে পিছনে উত্তপ্ত প্রখর ঝকঝকে বালুরাশি—আর কেউ নেই, আর কিছু চোখে পড়ল না; কেবল একজন—একটি মূর্তি। বেণীটা দুলছে, শরতের এক টুকরো সাদা মেঘ হয়ে আঁচলটা উড়ছে। কি, একবার আমার মনে হল সমুদ্র, আকাশ ও মরুভূমির মতো বিশাল বালুবেলার এই নগ্ন নির্জন ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশ ছাড়া আর কোথাও ওকে মানায় না—মানান উচিত না।

হেনা খিলখিল করে হাসছে। এত বড় একটা ফেনার ঝলক ওর পায়ের কাছে ছুটে আসে; আলতা-পরা পায়ের পাতা ভিজে যায়। যেন ইচ্ছা করে

ফেনার দুধে ও পা ডুবিয়ে রাখছে। কাল তা করেনি, পারেনি, সাহস পায়নি —ঢেউ ছুটে আসার আগে ও ছুটে পালিয়ে এসেছে, ভ্রূকুটি করেছে সমুদ্রকে, ঢেউ সরে যেতে ঝিনুক কুড়িয়েছে ; আজ অন্যরকম। ঝিনুক কুড়োতে মন নেই, জলের স্পর্শে ওর বুঝি রোমাঞ্চ জাগছে , অসহ্য পুলকে হেনা হাসছে। ভাল লাগল দেখে। আমার মনে পড়ে না, প্রথম রাত্রে আমার স্পর্শ—পুরুষস্পর্শ এত আনন্দ দিতে পেরেছিল তাকে। শায়াশাড়ি কুচকে দলা করে হাঁটুর কাছে তুলে ধরেছে ও। নিটোল সুবলিত সোনার রঙের পা দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার মনে পড়ে না, এখন, বালির বিছানায়, ঢেউয়ের মুখে ওর পা দুটো যেমন সুকুমার লোভনীয় চেহারা ধরেছে, আমাদের ঘরের বিছানায় তার হাজার ভাগের এক ভাগ সুশ্রী লাবণ্যযুক্ত মনে হয়েছে কোনোদিন। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, যেন নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে আমার, টের পেলাম। একটু একটু করে এগোই। হাঁটু থেকে আঙুলের ডগা পযন্ত সুঠাম বাঁকা রেখায় কামনার আশ্চর্য রামধনু ফুটিয়ে হেনাও জলের দিকে পা বাড়ায়।

'আর একটু—আর এক পা এগিয়ে যাও।'

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ও ফিক করে হাসল।

'ভয় করে।'

'আমি আছি ভয় কি।'

'তুমি আমার হাত ধর।'

আমি ওর হাত ধরলাম।

'ইস কত বড় ঢেউ!' ভয়ে চোখ বোজে ও।

'ঢেউ এখানে আসছে নাকি।' ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিই। মুঠ আলগা করি না যদিও, কেননা আঁকশির মতো বাঁকানো শক্ত আঙুলগুলি দিয়ে আমি বার বার ওর বাহু ও গ্রীবার নরম মসৃণ মাংস অনুভব করছিলাম, অনুভব করতে ভাল লাগছিল। বালুর শেষ প্রান্তে চলে গেছি আমরা। আমাদের সামনে ধুধু সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই , সাদা কঠিন হিংস্র দাঁতের হাঁ নিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে ঢেউ, পিছনে আর একটা, আর একটা···

'এই করছ কি!'

ভয়ে আঁতকে ওঠে ও, যেন হৃদ্‌পিণ্ডের ধাক্কা আমার হাতে এসে লাগে। 'একেবারে ছেলেমানুষ।' নরম গলায় ধমক দিলাম, 'আমি তো ধরে রয়েছি, ভয় কি—'

'না না'—যেন হেনার হঠাৎ কি মনে পড়ে, বিদ্যুতের মতো শরীরে ক্ষিপ্র

মোচড দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ায়, আমার চোখ দেখে, তারপর বুঝি আমার পিছনের বালুর দিকে চোখ পড়তে ও রীতিমত আর্তনাদ করে ওঠে: 'যা ভেবেছি তাই, ওই তো শয়তান দাঁড়িয়ে হাসছে—ওর পরামর্শ শুনে তুমি এমন কাজ করতে চাইছ—'

'কি রকম—' অস্ফুট ভয়ের গলায় বলতে গেছি, তার আগেই হাতের মুঠ ছাড়িয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে হেনা ওপরে উঠে গেল ; এবার আমি ঘুরে দাঁড়াই। হেনা কাঁপছে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, যেন চোখে জল এসে গেল। আর তখন লক্ষ্য করলাম কালো রুগ্ন অপরিচ্ছন্ন চেহারার সেই মানুষটা—বীরেনবাবুর মামা হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। আমাদের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেখে সে হেসেছিল কি? জানি না। দেখলাম দড়ি দিয়ে বাঁধা একতাল কাঁকড়ার মতো কি যেন হাতে ঝুলিয়ে লোকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে।

মনে আছে সেই সন্ধ্যায় ট্রেন যখন সাক্ষীগোপাল স্টেশনে এসে দাঁড়ায় তখন আমি স্বাভাবিক হতে পেরেছিলাম, সহজ হতে পেরেছিলাম। হেনার হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা তুলে দিয়ে বললাম, 'কিন্তু তুমি আমায় বলতে পারতে, জানিয়ে দিতে পারতে লোকটা এমন ভয়ংকর নিষ্ঠুর—স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছিল।'

হেনা হঠাৎ উত্তর করল না, জানালার বাইরে অন্ধকার দেখল, তারপর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল: 'বলিনি—বলতে ভয় করছিল—কি জানি যদি ওর রোগের ছোঁয়াচ তোমাকে পেয়ে বসে—' একটু থেমে পরে ও বলল, 'সমুদ্র দেখে এমন পাগল হয়ে উঠেছিলে!'

চুপ থেকে জানালার বাইরে চোখ রাখলাম। অস্বীকার করব কেমন করে। সত্যি কি আমার মধ্যে একটা কিছুব সংক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল না। আর ঢেউয়ের গর্জন নেই। ঝিঁঝি ডাকছিল। ঝিঁঝির ডাক ও নারিকেল পাতার মৃদু মর্মর শুনতে শুনতে নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরালাম।

বৃষ্টির পরে

প্রভাতের বজ্রমুষ্টি আমার দিকে এগিয়ে এল। কুঞ্চিত কপাল। ভুরুর রেখায় স্পন্দন। যেন সে খুব চিন্তা করছে কাজটা করবে কিনা। অগ্র পশ্চাত ভাবছে। ভয়ংকর কিছু করার আগে এ যুগের সভ্য মানুষকে নানা ভয়াল চিন্তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। প্রভাত দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানতাম ওই পর্যন্ত এসে সে থামবে।

বজ্রমুষ্টি আমার নাক কপাল লক্ষ্য করে ছুটে এল না। বরং আস্তে আস্তে তার শক্ত মুঠিটা খুলে গেল, আঙুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল ; জলে ভেজা পেট মোটা আঙুরের রঙের নরম ফোলা-ফোলা আঙুলগুলি আমার নাকের সামনে টেবিলের ওপর নেমে এল। তারপর আবার সব কটা আঙুল একত্র করে সিগারেটের বাক্সটা মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে প্রভাত আর একটা সিগারেট বার করতে ব্যস্ত হয়। মৃদু হেসে তার দিকে দেশলাইটা ঠেলে দিই।

তার সিগারেট না জলা পর্যন্ত আমি চুপ থাকি। আমার জানলার বাইরে আকাশ ধূসর হয়ে আছে। বর্ষা আসি আসি করছে। মাত্র কাল বিকেলে বাগানে লক্ষ্য করেছি বৈশাখী চাঁপা বকুলের ঔদ্ধত্য কমে গেছে—আমার লন্‌-এর অত বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথার আগুন এইবেলা একেবারে নিভবে। বসন্ত জ্বালায় গ্রীষ্ম জ্বালায়—বর্ষার কাজ নেভানো। মনে মনে বললাম। কেবল জল ঢালা। ঠাণ্ডা করে দেওয়া।

নিশ্চয় প্রভাতও মনে মনে কিছু বলছে। পাতলা নীলাভ ধোঁয়ার বলয় তার প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল ঘিরে ফেলেছে। চোখ বোঁজা। আমার কেন জানি মনে হল তখন, এইমাত্র, কৃষ্ণচূড়ার রং নিভে যাওয়া আর সীসার রঙের বিবর্ণ আকাশটা অত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম বলে প্রভাত নরম হয়ে এল, তার বুকের তরল আগুন আর টগ্‌বগ্‌ করছে না, জমতে আরম্ভ করেছে, দেখতে দেখতে জুড়িয়ে যাবে।

‘প্রভাত!’ নরম গলায় ডাকলাম। আর সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করলাম তার মুখের দাড়ি-গোঁফ অবিশ্বাস্যরকম বেড়ে উঠেছে। বোঁজা চোখের কোলে গাঢ় কালির পোছ। ক'রাত ঘুম নেই? তার চিহ্ন? আবার মনে মনে হাসি।

ঘটা ক'রে অনিদ্রা অনিয়মের বিজ্ঞাপন চোখে মুখে ঝুলিয়ে প্রভাত এখানে ছুটে এসেছে।

সঙ্গে একটা ঝড়ো হাওয়া নিয়ে সে এ-ঘরে ঢুকেছিল না! সব উড়িয়ে দেবে তছনছ করে দেবে—ভেঙে দুমড়ে, দরকার হলে এবাড়ির প্রত্যেকটা ইট গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে আর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমায় চাপা দিয়ে রেখে সে বেরিয়ে যাবে। এই? এই মন নিয়ে প্রভাত এত সকালে তার ল্যাণ্ডমাস্টার ছুটিয়ে সুদূর ঢাকুরিয়া থেকে আমার বি. টি. রোডের বাড়ির দরজায় এসে নামল?

যেন জেনে শুনেও আমি বন্ধুকে আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে এনে বসলাম। ওই তো বসে আছে সে। স্থির স্তব্ধ। চোখ বুজে সিগারেট টানছে। আমি জানতাম, আমার লন্‌-এর কৃষ্ণচূড়ার ম্লান বিষণ্ণ চেহারা, আমার বাগানের বকুল চাঁপার দীর্ঘশ্বাস, আমার ছাদের ওপরকার আকাশের ধূসর রং প্রভাতের মনের ওপর সুন্দর কাজ করবে। তার ঔদ্ধত্য চঞ্চলতা ঈর্ষা বিদ্বেষ থাকবে না। থাকল না তো?

'প্রভাত!' নরম গলায় ডাকলাম।

চোখ খুলল সে। লাল লাল চোখ। প্রভাত যে উগ্র ব্লাডপ্রেসারে ভুগছে আমার অজানা নেই। তার পক্ষে উত্তেজনা বিষ। তুমি হাস। সুন্দর করে হেসে ঠাণ্ডা মাথায় আমার সঙ্গে কথা বল। দেখছ তো আকাশের রং। শুনছ না আমার বাড়ির পিছনের বাগানের জঙ্গলে ব্যাং ডাকছে। ওরা কখন ডাকতে শুরু করে জানো? আকাশ বেয়ে কলস্বরে পৃথিবীর বুকে জল নামবে। কাল নামতে পারে। আজ বিকেলে নামতে পারে। আজ দুপুরে কি এখনই বর্ষণ আরম্ভ হওয়া বিচিত্র না। ওই দেখ, জানালার ওপারে গাছগুলি স্থির—একটি পাতা নড়ছে না। ওরাও আসন্ন বৃষ্টির গন্ধ টের পেয়েছে। গাছেরা চুপ করে থাকে। জলের গন্ধ পেয়ে ভেককুল মুখর হয়ে উঠল। আনন্দে ওরা ডাকছে, চিৎকার করছে। 'প্রভাত—'

'আমায় কিছু বলছ?' প্রভাত এই প্রথম ঠোঁট খুলল। কিন্তু ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল। চাউনিটাও কটমটে। বাইরের উত্তেজনা কমেছে, কিন্তু ভিতরটা যে এখনো উত্তপ্ত অশান্ত।

নিশ্চিন্ত হলাম চাকরকে দেখে। চা নিয়ে এসেছে। যদি এই মুহূর্তে তৃতীয় ব্যক্তি সামনে এসে না পড়ত হয়তো বিপদ ঘটত। ভয়ে ভয়ে আমি প্রভাতের সেই বদ্ধ মুষ্টির দিকে আবার চোখ রাখলাম। এমন শক্ত হয়ে আছে তার ডান মুঠিটা।

'চা খাও।' মৃদু স্বরে বললাম। চা ও জলখাবারের প্লেট-এর ওপর লাল

লাল চোখ বুলিয়ে প্রভাত গলার একটা বিশ্রী শব্দ করল 'সন্দেশ চলবে না। সন্দেশ তুলে নাও—নোন্‌তাটা থাক।'

'তাই থাক।' প্রভাতের গলার স্বর অনুকরণ করতে পারলাম না, এবং সেরকম ইচ্ছাও ছিল না যদিও, কেবল কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে চাকরকে বললাম, 'সন্দেশ তুলে নাও।'

নিঃশব্দে চায়ের পর্ব শেষ হল। আমার বুক দুর দুর করছিল। চাকর শূন্য কাপ প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল। তৃতীয় ব্যক্তির অবর্তমানে প্রভাতের মুঠিটা যে আবার শক্ত হয়ে উঠবে বেশ বুঝতে পারছিলাম, কেন না এতটা সময়ের মধ্যে তো সে একবারও হাসল না, চাউনিটা নরম করল না। লাল চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে আমার ঘরের দেওয়াল দেখতে লাগল। পুব থেকে পশ্চিমে তার দৃষ্টি সরে যায়, তারপর উত্তরের দেওয়ালের গায়ে সে দু-চোখ স্থির করে ধরে রাখে। আমার পিছন দিক। আমি দেওয়াল দেখছি না, প্রভাতের চোখ দেখছি। দক্ষিণ দিকে আমার মুখ। হন্তদন্ত হয়ে প্রভাত যখন ছুটে এল দক্ষিণ দরজার মুখের চেয়ারে তাকে বসতে দিয়েছি হাওয়া পাবে বলে। মোটা মানুষ। ঘামে পিঠের পাঞ্জাবি ভিজে গিয়েছিল। হয়তো হাওয়া লেগে এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। আমি তার পিঠ দেখছি না, মুখ দেখছি। মিস্ত্রী আসছে না বলে আমার ঘরের পাখা বিকল হয়ে আছে। যদি তা না হত, যদি মাথার ওপর পাখাটা ঘুরত তবে বোধ হয় প্রভাতকে ওই চেয়ারে বসতে দিতাম না। উত্তরের দেওয়াল পিঠ করে দক্ষিণ মুখো হয়ে সে বসত। আর তখন সে ওই দেওয়ালের হুকে ঝুলানো র‍্যাকেট দুটো নিশ্চয় দেখতে পেত না। পাশাপাশি ঝুলানো ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট দুটোর ওপর স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে প্রভাত কী ভাবছে তার ভুরুর বাঁক, কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফের নীচের পেশীর মৃদু স্পন্দন আমায় বলে দিল। যেন আমার ইচ্ছা করছিল একটা পর্দা দিয়ে দেওয়ালটা ঢেকে দিই। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। প্রভাত দেখে ফেলেছে—খেলার সরঞ্জাম দুটো দেখামাত্র অনেক কিছু সে অনুমান করে নিতে পারছে। ঝুনো ব্যারিস্টার। একটা প্রমাণ, এইটুকুন তথ্যের দাগ ধরে ধরে তারা কল্পনার ফিতাকে হাজার মাইল ছাড়িয়ে দিয়ে চমৎকার মামলা দাঁড় করাতে পারে। যা আশঙ্কা করছিলাম! চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। যা আশঙ্কা করছিলাম! ঘর ছেড়ে সে বারান্দায় ছুটে গেল। আর সেখানে দাঁড়িয়ে সে যে নীচের লন, ওধারের ফুলের বাগান, বাগানের পাশে আতা ও ডালিম ঝোপের তলার বেঞ্চিটা দেখবে এতো জানা কথা। ঘরের চেয়ারে বসে ঘামছিলাম। কপালে ঘামের ফোঁটা দাঁড়িয়েছে। হাত তুলে মুছতে পারছি না। অবশ হয়ে গেছে দুটো হাত। যেন কোনোরকমে শিরদাঁড়া খাড়া রেখে আমি

স্থির চোখে প্রভাতকে দেখছি। তার পিঠ। আদ্দির জামা আবার কি ভিজতে আরম্ভ করল। গেঞ্জির ফুটকি-গুলি পরিষ্কার দেখা যায়। আমি আশঙ্কা করছিলাম। লন, ঝোপের পাশের বেঞ্চি ও পিছনের রজনীগন্ধার জঙ্গল দেখা শেষ করেই এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রভাত বিকৃত স্বরে আমাকে নানারকম জেরা করতে লেগে যাবে। উত্তর তৈরী করে রাখিনি, কিন্তু প্রশ্নগুলি কি হবে অনুমান করতে পারছিলাম। তার মতন আমিও সন্তানের পিতা। তফাৎ হচ্ছে এই যে চোখা চোখা প্রশ্নের বাণে বুক বোঝাই করে আমি তার বাড়িতে ছুটে যাইনি, যেমন সে এখানে ছুটে এল। তফাৎ হচ্ছে এই যে যে-চোখ দিয়ে প্রভাত পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত আমার সে-চোখ নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি প্রভাত রেলিং-এর ওপর আর একটু বেশি ঝুঁকে গেছে। চিলের চোখ দিয়ে সে ওপর থেকে নীচের ঘাসের ওপর চুণের দাগ বুলানো ব্যাডমিণ্টন খেলার চৌকোণ ঘরটা দেখছে, দেখছে চৌকোণ ঘর থেকে ঝোপের পাশের বেঞ্চির দূরত্ব কতটা; দেখছে পাশাপাশি যদি দুজন বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে বসে আর সূর্য পশ্চিমে হেলতে থাকে তো আতা ও ডালিমের ছায়া দুজনের গলা ও বুকের কতটা ঢাকতে পারে। বা পেরেছিল। না কি ছায়া লম্বা হবার আগে দুজন সেদিনের মতো খেলা সাঙ্গ করে জাল গুটিয়ে র‍্যাকেট কাঁধে ফেলে টুকটুক করে ওপরে উঠে এসেছিল। তারপর? প্রভাত কী ভাবছে জানি না। তাব পরের ভাবনা ভয়ংকর অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেন তার দেরি আছে। যেন এখনও রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে ঘাড় লম্বা করে দিয়ে প্রভাত শকুনের চোখ দিয়ে আমার লন বাগান খেলার জায়গা কাঠের বেঞ্চি ঝোপঝাড় জরীপ করছে।

'প্রভাত!' খুব সাহস করে নরম গলায় ডাকলাম।

প্রভাত সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ পর এই প্রথম পকেট থেকে রুমাল বার করে সে ঘাড় গলা মুছল। টলতে টলতে আসছে। তার চোখ দেখে চমকে উঠলাম। লাল রং নেই। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যেন ক্লান্তিতে সে ভেঙে পড়ছে। যেন অনেক দূরের শ্মশানে প্রিয়জনকে পুড়িয়ে হেঁটে হেঁটে এই মাত্র ঘরে ফিরল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। আশ্বস্ত হলাম। একটু আগের আশঙ্কাগুলি কাটিয়ে উঠতে বেগ পেতে হয় না। হাসি।

'দেখলে, কী সুন্দর জায়গাটা, কেমন সবুজ নরম ঘাস—'

মাথা নাড়ল সে। অর্থাৎ কিছুই দেখেনি। রুমাল দিয়ে আবার ঘাড় গলা মোছে। নিরস্ত হই না। নিরস্ত হব না মনের এই জোর আছে বলে না আমি হাসতে পারছি। বললাম, 'বিকেল হতে এমন চমৎকার কিচিরমিচির শুরু করে দেয় পাখিগুলি ওই আতা আর ডালিমের ডালে বসে—'

'তুমি চুপ কর, চুপ কর!' হুঙ্কার ছাড়ল প্রভাত। তারপর শুনলাম চাপা গর্জন। যেন নিজের মনে বলছে সে: 'কাব্য, কবিত্ব করা হচ্ছে।'

তেতো মতন একটা ঢোক গিললাম। আমি যে-চোখ দিয়ে পৃথিবীটা দেখছি সে-চোখ প্রভাতের নেই। তাকে তুমি ক্ষমা কর। ঈশ্বরকে ডাকলাম। দিনরাত সে মামলা মোকদ্দমার প্যাঁচ কষছে মাথায়। হয়তো আমাকেই আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করাতে মাথায় ফন্দী আঁটছে। বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসে মোড়া এমন সুন্দর মাঠ ফুলের বাগান রাখা আমার অপরাধ হয়েছে; আদালতে তাই প্রমাণ করবে প্রভাত। চাই কি এ বাড়ির গাছের মাথায় পাখিদের কূজন গুঞ্জনের জন্যও সে আমাকে দায়ী করবে। আমি প্রভাতের চোখ দেখতে লাগলাম। আমার মনে হল লনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা যে এই কদিন আগেও আগুন ছড়াচ্ছিল আগুন লাগানোর অভিযোগ এনে সে আমায় দোষী সাব্যস্ত করবে। প্রভাত, ফুল ফোটার ব্যাপারে মানুষের হাত নেই। ইচ্ছা করলেই সে সবুজ ডাঁটার মাথায় রজনীগন্ধার রূপালী বিস্ময় জাগাতে পারে কি। যে জাগাবে সে আকাশ কালো করে আসছে। ঐ দেখ, বৃষ্টি হবে! আর বৃষ্টি পড়লে দেখবে বাগানের ওদিকটায়—

কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রভাতকে কথাটা বোঝাতে পারলাম না। তার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠছিল, চোখ লাল হচ্ছিল। যেন এবার সত্যি দমে গেলাম আমি। কথা বলতে কষ্ট হয়। গলা পরিষ্কার করতে অল্প একটু কেশে নিলাম। তারপর মেকি হাসি ঠোঁটের আগায় বুলিয়ে ক্ষীণ গলায় বললাম, 'আর একটু চা খাও।'

'কেন, কেবল চা কেন!' বিশ্রী একটা ভাঁজ দেখা গেল প্রভাতের চর্বি থলো-থলো থুঁতনিতে। ওটা যে তার হাসি বুঝতে এক সেকেণ্ড দেরী হল না আমার। চোখ লাল করে হাতের মুঠি পাকিয়ে মানুষ যখন হাসে তখন তার কী অর্থ দাঁড়ায়? শিকার লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে গিয়ে শিকারী সময় সময় হাসে বৈকি। 'তোমার ঘরের আলমারীর তাকে এখন বোতল সাজানো থাকে না?' মুখ না, চোখ দিয়ে প্রভাত কথা বলল। তার নীরব প্রশ্ন আমার মর্মে বিঁধল। আমার যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা সে খুঁচিয়ে বার করতে চাইছে। অথচ কুড়ি বছরের ওপর আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি। প্রাজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপক অতীতের অসংযমের চিত্র দেখতে চায় না। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। প্রভাত গলার শব্দ করে হেসে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে।

'কেবল চা খেয়ে নেশা হয় না ব্রাদার।'

এই প্রথম আমার পাকা ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল, হাতের মুঠি শক্ত হল, চোখের

রং লাল হল।

আমার চোখের ভাষা প্রভাত বুঝতে পারছে না? নিশ্চয় পারছে।

অতীতের অসংযম মনে পড়ে ঢাকুরিয়ার এক প্রতিষ্ঠাবান বিত্তশালী প্রবীণ ব্যারিস্টার কেমন শিউরে উঠছে লক্ষ্য করে পুলকিত হই। আঘাত পেলে মানুষ প্রত্যাঘাত করে। বন্দুকের ঘোড়া টিপবার আগে নিষ্ঠুর শিকারী যেভাবে হাসে আমার ঠোঁটেও সেরকম একটা হাসি ঝুলছিল।

'তোমাব বরানগরের রক্ষিতা কি বুড়িয়ে গেছে—আর নেশা ধরাতে পারছে না? বড যে আজ অন্য নেশা খুঁজছ প্রভাত?'

'চুপ চুপ।' প্রভাতের চোখ ধমকে উঠল। 'আমারটা আমার মধ্যেই রয়ে গেছে—কিন্তু তোমার নেশা তোমার সন্তানকে পেয়েছে। তোমার মদের রক্ত ওর ভিতরে কাজ করছে, তাই না ও মাতাল হয়ে—'

'চুপ চুপ!' আমার চোখ নীরব রইল না। 'ব্যারিস্টার কিনা, তাই আত্ম-পক্ষ সমর্থন করতে তোমার জুড়ি নেই।' আমার রক্তবর্ণ চোখ ধমকের স্বরে বলল, 'নারী-মাংসের ওপর তোমার চিরদিন লোভ, আমি তো জানি, তুমি আমার বন্ধু, সেই লোভী রক্ত নিয়ে তোমার সন্তান বড হয়েছে—তাই না—'

প্রভাতের চোখ আর কিছু বলছে না। আমাব চোখ হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করল।• যেন এইটুকুন যথেষ্ট। ঠোঁট না নেড়ে আমরা পরস্পরকে কঠিন আঘাত করলাম। প্রভাত ষাট আমার উনষাট। ছোটবেলা দুজনে হাত চালিয়েছি পা চালিয়েছি—দরকার মত দাঁত মুখ ব্যবহার করেছি। কিন্তু এখন শুধু একে অন্যের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে, নীরব থেকে দরকার মত লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ঝগডা করা ছাডা উপায় কি। অথচ প্রভাত গোডায় সেটা বুঝতে পারেনি। ঝডো হাওয়া হয়ে সে ঘরে ঢুকেছিল। বজ্রমুষ্টি আমার দিকে বাডিয়ে দিয়েছিল। যদিও পরক্ষণেই তা শিথিল হয়ে গেছে। আমরা মনে করি বটে বুকের ভিতর গরম রক্ত টগবগ করে ফুটছে। আসলে তা না। ওটা সংস্কার। ক্রুদ্ধ হলেও কতটা ক্রুদ্ধ হওয়া চলে এই বয়সে? আমরা ঠাণ্ডা হয়ে গেছি, রক্ত জমে এসেছে। বুঝলে প্রভাত। তার মুখের ওপর নিঃশব্দ দৃষ্টি বুলিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি।

কিন্তু সে বোঝে না। শিশুর মত চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁডায়। আমার দিকে তাকাতে ঘৃণাবোধ করছে। সরাসরি দেয়ালের কাছে সরে যায়। ঝুলানো র‍্যাকেট দুটো হুক থেকে টেনে নেয়। দুহাতে দুটো র‍্যাকেট শক্ত করে ধরে শূন্যে নাড়াচাড়া করে। যেন. মনে মনে সে সাট্‌লকক্ ছোড়াছুঁড়ি করে। হাসি। যদি তোমার বয়স কুডি থাকত তো দুটোই নিজের কাছে না রেখে একটা আমার

হাতে তুলে দিতে, প্রভাত ; বলতে, চলো চলো, কী সুন্দর বাইরেটা—চমৎকার ঘাসের জমির ওধারে ফুল ফুটেছে—হাওয়াটা অদ্ভুত। বলতে, চলো—নীচে আমরা খেলা করব আর চাঁপার গন্ধে দুজনের বুক ভরে উঠবে, নেশা লাগবে।

চমকে উঠলাম। মনে মনে কথা বলা থেমে গেল। কেন না প্রভাত হাতের র‍্যাকেট দুটো এত জোরে ছুঁড়ে মেরেছে যে ওধারে আমার ড্রেসিং-টেবিলের গায়ে ছিটকে পড়ে আয়নাটা ভেঙে দিল। লাভ হল কিছু ? প্রভাতের মুখ দেখি। ফাটল ধরা আরসির বুকে তার বাঁকাচোরা মুখটাকে শয়তানের মুখের মতন দেখায়। অথচ এমনি সে সুপুরুষ। ক্রোধ মানুষকে কত নীচে টেনে নেয় ভাঙা আরসির ছবি তার প্রমাণ। প্রভাতকে অনুকম্পা করি। যেন কিছুই হয়নি এমন ভান করে সে পায়চারি করে। একটা গ্লাসের টুকরো তার জুতোর চাপে কুড়মুড় শব্দ করে গুঁড়িয়ে গেল। কিছু একটা চিন্তা করা শেষ করে সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'নীচে খেলাধুলো সেরে ওরা ওপরে উঠে আসত, এখানে ?'

'ওঘরে। পাশের ঘরে। এটা আমার বসবার কামরা দেখছ না ?'

প্রভাত ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর পা টিপে টিপে এগোয়। যেমন শিকারের সম্ভাবিত আস্তানার দিকে শিকারী এগোয়। উত্তেজনা কৌতূহল ঘৃণা লোভ আশঙ্কা আকাঙ্খার ছবি যদি কেউ একসঙ্গে দেখতে চায় তো প্রভাতকে দেখুক। এই মুহূর্তে। সে যেমন স্থূল দেহটা টেনে টেনে পিঠটা একটু কুঁজো করে রেখে গলাটা ঝুলিয়ে দিয়ে মাথাটা ঈষৎ আন্দোলিত করতে করতে পাশের কামরার দিকে চলেছে। আর একটা গ্লাসের টুকরো তার জুতোর চাপে কুড়মুড় শব্দ করে ভাঙে। প্রভাত শুনল না। আমি শুনছি। তার দৃষ্টি তার মন ওঘরে। বাঁ-হাতে পর্দা টানছে ডান হাতে দরজার কবাট ঠেলছে। বেশি জোরে ঠেলতে হয় না। ভেজানো ছিল। আস্তে ধাক্কা দিতে পাল্লা ফাঁক হয়ে যায়। কি দেখছে সে ? চর্বির খাজ পড়া কাঁধ দুটো একত্র জমে গিয়ে একটা উঁই টিপির চেহারা ধরেছে। পিঠটাকে ঢোলের মতন মনে হয়। প্রভাতের সামনের দিকে যদিও দু চারটা চুল আছে মাথার পিছনটায় মস্ত বড় টাক। ওঘরের জানলাগুলো বন্ধ। ভিতরটা অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপছে কি সে। বুঝতে পারছে না কোথায় সুইচ বোর্ড। অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়ে সে শূন্য ঘরে কি কি তথ্য প্রমাণ মেলে তাই খুঁজতে ব্যস্ত। হয়তো একটা দুটো জানলা খুলে দিলে, কি আলোটা জ্বাললে সব পরিষ্কার দেখা যেত। চিন্তাটা তার মাথায়ই আসছে না। আসতে পারে না। মাথায় অন্য সব চিন্তা ঠেসে রেখে সে এটা ওটা হাতড়াচ্ছে। ওটা কি ? জিনিসটা টেনে এনে প্রভাত দরজার কাছে ছুটে আসে। চুলের

রীবন। লাল টুকটুকে রং। আমি দূর থেকে দেখলাম; এখানে চেয়ারে বসে থেকে ওখানে দৃষ্টি পাঠিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে সে কী কাজটা করল! জুতো দিয়ে পিষছে চুলের ফিতাটা। নুয়ে আবার সেটা হাতে তুলে নেয়। নাকের কাছে গিয়ে গন্ধ শোকে। তারপর সেটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যেন আর একটা কিছুর জন্য সে অন্ধকারে হাত বাড়িয়েছে। ওটা কি? প্রভাত দরজার কাছে—আলোর কাছে ছুটে এল। মূল্যবান কিছু না। ছোট একটা অ্যাসট্রে। প্রভাতের হাতের নাড়াচাড়ায় কিছু ছাই ঝরে পড়ল—কিছু পোড়া তামাকের গুঁড়া। এবার নিশ্বাস বন্ধ করে আমি তাকিয়ে রইলাম। ওটা আর তার জুতোর তলায় গেল না। যত্ন করে সে পকেটে পুরল। যেন আর কিছু জানবার দরকার নেই দেখবার দরকার নেই ওঘরে। আস্তে বেরিয়ে এল প্রভাত।

'কতক্ষণ থাকত ওরা ওঘরে?'

'অনেকক্ষণ।'

'রোজ?'

'রোজ।'

'কবে থেকে এটা হচ্ছিল?'

'শীতের শুরু থেকে—তখনও গাছে গাছে নতুন পাতা কুঁড়ি ফুল দেখা দিতে আরম্ভ করেনি।'

'আবার কাব্য।' প্রভাত বিড়বিড় করে উঠল। 'তো তুমি কিছু বললে না, তুমি কি দেখতে না?'

কী উত্তর দেব! উত্তর তৈরী করে রাখিনি। অসহায় চোখে তার কুঞ্চিত অপ্রসন্ন ভ্রূযুগল দেখতে দেখতে দুবার ঢোক গিললাম। হ্যাঁ, ছিল উত্তর। আমি বলতে পারতাম প্রভাতকে—যখন ওদিকে চোখ গেল আমার, যখন টের পেলাম তখন আর বলার সময় ছিল না। শীত শেষ হয়ে বসন্ত এসে গেছে। তখন কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভায় আকাশ লাল হয়ে গেছে, মধুলোভী ভোমরাদের আনাগোনার বিরাম ছিল না, ওদিকে আম জাম কাঁঠাল জামরুলের গুটি দেখা দিয়েছে গাছে গাছে। ফলের সম্ভাবনায় ডাল পাতাগুলি কাঁপছিল। সেই উৎসবের দিনে ওদের দুজনকে কিছু বলতে আমি সাহস পাইনি।

আমাকে নীরব দেখে প্রভাত দাঁতে দাঁত ঘষল। তার বুঝি মনে নেই বাঁধানো দাঁত—বেশি জবরদস্তি করতে গেলে ছিটকে মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। যেন বন্ধুকে সাবধান করে দিতে আমি ঠোঁট আলগা করতে যাব, এমন সময়, প্রভাত কপালের ঘাম না রীতিমত আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে রুমাল দিয়ে

চোখের কোণা মুছল। কাঁদছে? আর তার কণ্ঠস্বর বিকৃত বীভৎস হয়ে আমার কানের পর্দা আঘাত করল।

'কত টাকা খরচ করেছি আমি ওর জন্য, এই সেপ্টেম্বরে ও বিলেত যেত, কত সম্ভাবনা ছিল—অকৃতজ্ঞ—' প্রভাত থরথর করে কাঁপছিল। টেবিলের ওপর দুহাতের ভিতর মুখ গুঁজল। আমার ইচ্ছা করছিল ঐ অবস্থায় তার চেহারা দেখি চোখ দেখি। ক্রোধের আগুন তাহলে এবার সত্যি নিভতে শুরু করেছে! এখন সে বেদনাহত। এখন হয়তো বোঝাতে গেলে প্রভাত কবিতা বুঝবে কাব্য শুনবে। বাইরে আকাশের দিকে চোখ গেল আমার। শিউরে উঠলাম। বিশাল কালো মেঘ আমার লনের ওপর থমকে দাঁড়িয়েছে। গুরগুর শব্দ হচ্ছে।

'প্রভাত!' ফিসফিস করে ডাকলাম।

এত মৃদু ডাক তার কানে গেল না। বরং তার ক্রন্দনজড়িত মৃদু স্বরটা আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম। আর বিকৃত মনে হচ্ছে না কথাগুলি। যেন হৃদ্‌পিণ্ড গলে গলে চোখের জলে ধুয়ে টেবিলের উপর ঝরে পড়ছে: 'আমি কোথাও চলে যাব। বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি কিছুই ধরে রাখতে পারবে না আমাকে আর—সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব।'

ইচ্ছা করছিল শব্দ করে হেসে উঠি; ইচ্ছা করছিল দুহাতে প্রভাতকে জড়িয়ে ধরি। তা পারলাম না যদিও। টেবিলের ওপর ঝুঁকে গাঢ় গলায় বললাম, 'ঐ সান্ত্বনা ঐ সন্তোষ নিয়ে আমি বুক বেঁধে আছি, প্রভাত। আমার কেউ নয়, আমি কারওর নই। এটা ভাল। না হলে আমিও কি কম যত্ন করেছি ওর। ডায়োসেশানে এবার থার্ড ইয়ার চলছিল—এদিকে গানের মাস্টার, নাচের জন্য মাস্টার, কিন্তু কিছুই তো ভাল লাগল না তার।'

'কিছুই ভাল লাগল না তার।' আমার কথাগুলি অনুকরণ করল প্রভাত। টেবিল থেকে মুখ তুলল। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। উত্তেজনা নিয়ে পাশের কামরায় ঢোকা, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মাত্র এই ক-মিনিটের মধ্যে ভেঙে চুরে দুমরে একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল মানুষটা। ওই প্রায়ান্ধকার কামরায় এমন আর কি চোখে পড়ল তার যে আর চোখ লাল করতে পারছে না সে, হাতের মুঠি শক্ত করতে পারছে না।

অল্প শব্দ করে হাসলাম।

'আমার আমার করি বটে আমরা, কিন্তু কিছুই আমাদের নয়—কেউ আমাদের নয়।'

প্রভাত ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। আমাকে সে এখন পুরোপুরি সমর্থন করছে। গাঢ় নিশ্বাস ফেলে সে বাইরেটা দেখল। 'অসহ্য গুমট।' অস্ফুটে

বলল সে।

আমি তার সুযোগ গ্রহণ করলাম।

'এখনি বৃষ্টি হবে। হাওয়া বন্ধ হয়ে আছে। চলো বাইরে, নিচে—'

প্রভাত ঘাড় কাত করে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। বন্ধুর হাত ধরি। বোধ করি এই প্রথম আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছে সে। তার চোখে কৃতজ্ঞতা। অবাক হলাম। রক্তবর্ণ চক্ষু মরা মাছের চোখের ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে কৃতজ্ঞতায় নরম হয়ে এল না কিন্তু, সজল মেঘের রং কিশোরীর চোখের রং ফিরে এসেছে তার চোখে। ষাট বছরের প্রভাতের চোখে। তেমনি ঠাণ্ডা নিষ্কলুষ।

'আমিও তাই ভাবছি। এখন ভাবছি, আর রাগ করব না, দুঃখ করব না। কিছুই যখন সে নিতে চাইলে না, নিলে না; আমার কোনো চাওয়া যখন ওর ভাল লাগল না তখন আব—'

সিঁড়ির পথে সে বলছিল।

'না, আমার কোনো চাওয়া ও চায়নি।' প্রভাতকে অনুকরণ করে আমি মৃদু গলায় বললাম, 'ওর ভাল লাগার কাছে আমার সব ইচ্ছা সাধ গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে, কাজেই দুঃখ করব কার জন্য।'

নিচের পোর্টিকো পার হয়ে দু বন্ধু হাত ধরাধরি করে নরম ঘাসের বুকে পা রাখলাম।

'আমি কি জানতাম।' প্রভাতকে নিয়ে আমি তখন বাগানের কাছে চলে গেছি। আস্তে আস্তে যেন অনেকটা নিজের মনে সে বলছিল, 'কলেজ ছুটি হতে সে এখানে ছুটে এসেছে খেলতে। ঐ পর্য্যন্ত জানা ছিল। কিন্তু ওই খেলা যে—'

তার হাতে মৃদু চাপ দিলাম। যেন হঠাৎ চুপ করতে ইসারা করলাম। দুটো বড় বড় রুপালি ফোঁটা পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ল। 'বৃষ্টি হবে—বৃষ্টি আরম্ভ হল। এখন আমরা আরো শান্তি পাব, প্রভাত।' চোখ তুলে প্রভাত আকাশ দেখল, কদম আর দেবদারুর সবুজ নিবিড় পত্রগুচ্ছ দেখল। আমি পরিষ্কার উপলব্ধি করছিলাম আসন্ন বৃষ্টির মুহূর্তে আমার বাগানের রূপ দেখে প্রভাত মুগ্ধ হয়েছে যা তখন ওপরের চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে তাকে বোঝাতে কষ্ট হচ্ছিল। 'বুঝলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গণ্ডীর ভিতর থাকি, কোথাও আবদ্ধ থাকি ততক্ষণ অশান্তি। যেদিন আমি এটা উপলব্ধি করলাম সেদিন বাইরে চোখ পাঠিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলাম। আজ তুমি সন্ন্যাসী হতে চাইছ বন্ধনমুক্তি চাইছ, আজ তোমার আকাশ মাটি গাছ ফুল ঘাস—ওই ওখানে ঝোপের আড়ালে তারস্বরে ব্যাং ডাকছে তা-ও ভাল লাগবে।' একটু চুপ থেকে পরে আস্তে আস্তে বললাম,

'আর তখন এই ভাল-লাগার মন নিয়ে ভালবাসার হৃদয় নিয়ে তুমি সবাইকে ক্ষমা করতে পার, সব কিছু সহ্য করতে পার।'

প্রভাত আমার কথা বুঝল। বুঝল কেন সেদিন কৃষ্ণচূড়ার আগুনে আমি দুচোখ পুড়িয়েছিলাম। কেন ভোমরার গুনগুন আর পাখির কিচিরমিচির শুনতে কান পেতে রেখেছিলাম। কি দেখব না, কি শুনব না বলে।

'আমার কিছু না কেউ না—আবার সবাই আমার সব কিছু আমার।' সুন্দর করে হেসে পায়ের কাছের নরম রজনীগন্ধার ডাঁটার ওপর আঙুল রাখলাম। 'দেখ, সবুজের বুকে শাদা কুঁড়ি ঘুমিয়ে ছিল। দু ফোঁটা জল পড়তে চোখ মেলছে। আমার ফুল—আমার বাগানের রজনীগন্ধা। দুদিন পর এসো। তখন ঈর্ষা করবে। ঘনবর্ষা শুরু হবে, আর সতেজ উদ্ধত লাবণ্য নিয়ে সবুজ ডাঁটারা রানীর মতো হেলে দুলে তোমায় জানিয়ে দেবে এ-বাগানের মালিক কে, কে এই সৌভাগ্যবান পুরুষ।'

ড্যাবডাবে চোখে প্রভাত আমাকে দেখল। একটু হাসলও। সে হাসুক, তার মন ঝরঝরে হয়ে যাক এই তো চাইছিলাম। বললাম, 'কিন্তু কদিন প্রভাত, কদিন ওরা আমার থাকবে? কৃষ্ণচূড়ারা কদিন আমার বাড়ির সামনেটা আলো করে ছিল? যেদিন বর্ষণ থামবে, একবার এসে উঁকি দিও। তোমার কান্না পাবে বাগানের চেহারা দেখে। হয়তো সেদিন আমাকে মনে মনে অনুকম্পা করবে। কিন্তু সত্যি কি আমি কাঁদব প্রভাত, যা রইল না মরে গেল তার জন্য? না, সেদিন নতুন করে আমাকে দেখতে ভালবাসতে আর একজন আসছে। হিমের স্পর্শ পেয়ে শিউলিরা চোখ খুলছে।'

ঋতুর পর ঋতু তাই তো চলছে। একটি আসে আর একটি যায়।' প্রভাত দার্শনিকের মতো গলার স্বর করল। 'ফুল ফল—'

'পশু পক্ষী মানুষ—সব।' গলার স্বর চড়িয়ে দিলাম। জোরে বৃষ্টি নেমেছে। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। জাম গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দুজন। জলের ছাটে ভিজে যাচ্ছি। তবু ভাল লাগছিল। এত বড় একটা লাল পিঁপড়া প্রভাতের জামার হাতায় বেয়ে ওঠে। প্রভাত আঙুলের টোকা দিয়ে অনায়াসে ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু ফেলছে না। যেন কষ্ট হচ্ছে তার। কত সহিষ্ণু কত নরম হয়ে গেছে ও এই আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখে ভাল লাগল। আর আমি বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা বড় করে বললাম, 'ঋতুতে ঋতুতে গাছের রূপ বদলায় প্রকৃতির রং বদলায় মানুষের স্বভাব বদলায়। হুঁ তার ইচ্ছা, তার চাওয়া, তার অভিরুচির রং। কোনটা থাকল বলে আমরা হাসব কোনটা থাকল না বলে আমরা কাঁদব তুমি বলতে পার কি? কেননা তোমার ছেলের কোনোটাই

তোমার না, আবার সবটাই তোমার—তেমনি আমার মেয়ের। ঠিক ফুল ফোটার মতন, ফুলের মরে যাওয়ার মতন। তাই তো ওরা মাঠের খেলা ছেড়ে যখন চুপ করে গাছের নীচের ওই বেঞ্চিটায় বসে থাকতে আরম্ভ করল আমি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি ; যখন বেঞ্চি ছেড়ে আমার ঘরের পাশের সেই ছোট্ট কামরায় আশ্রয় নিল আমি চুপ কবে রইলাম। আমি হাসিও নি কাঁদিও নি।'

প্রভাত নীরব। বৃষ্টির জলে স্নান করে করে গাছের রং-ফেরা দেখছে উল্লাস দেখছে। যেন একটু পরে সে আমাব কথায় ফিরে এল।

'মানে সারা বসন্তটা ওরা মাঠে খেলাধূলা করল, গ্রীষ্মের শুরু থেকে ওই কামরায় ঢুকল ?'

'তাই।'

'আর বর্ষা আসছে এমন সময় তোমার লনেও রইল না ওরা, ছোট্ট ঘরেও রইল না।'

'না।' সংক্ষেপে উত্তর সারলাম। প্রভাতের মুখের দিকে তাকাতে আবার ভয় করে। যেন তার গলায় স্বর আবার ভাঙছে টের পাই। 'এসো, ইদিকে—' প্রভাতের হাত ধরে আস্তে টানলাম। 'আমার মাধবীবনের কী চেহারা হয়েছে দেখবে।'

'মাধবী মরবে অপরাজিতা জাগবে।' যেন এই প্রথম একটা কবিতার লাইন বলতে চেষ্টা করল প্রভাত। খুশি হয়ে তার হাত ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলি। বৃষ্টির জোর হঠাৎ কমে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। মাথার ওপর পাখার ঝাপটা শুনলাম। একটা পাখি গায়ের জল ঝাড়ছিল। মাধবীবন দেখা শেষ করে আর একটু এগোই দুজন। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াই। প্রভাত ও আমার দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ওপাশে ঘন কেয়া-ঝোপ। লম্বা ডাঁটার মতো শাদা ফুলটা হাওয়ায় একটু একটু দুলছে। টুপটাপ জল ঝরছে পাপড়ি থেকে। কিন্তু আমরা তা দেখিনি—সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। দেখছিলাম এ পাশটা। জমির একটু অংশ। যেন কাল রাত্রে মাটি খোঁড়া হয়েছিল—রাত্রে বা বিকেলে বা কাল সকালে। নতুন মাটির চিহ্ন। গর্ত খুঁড়ে আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তার ওপর ঘাসের চাপড়া বসানো হয়েছে। বৃষ্টির তোড়ে ঘাস সরে গেছে, মাটি ফেটে গেছে। ভিজা মাটি ফুঁড়ে ফুলের কলি আকাশের মেঘ দেখছে—ভুঁই-চাঁপার কলি ; একটা না পাঁচটা, আমরা রুদ্ধশ্বাসে গুণে শেষ করলাম। প্রভাত কাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমিও। যেন শেয়ালের মতো মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে প্রভাত ওটাকে টেনে বার করল। আশ্চর্য, রাগ করল না সে, কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে না। আমার বুক দুবদুব করছিল

যদিও আশঙ্কায়। তখন সে ব্যাডমিণ্টানের র‍্যাকেট দুটো ছুঁড়ে মেরেছে। আমার ঘরের ড্রেসিং-আয়না ভেঙেছে। উন্মত্ত হয়ে চুলের রীবন জুতো দিয়ে পিষেছে। এখন ? প্রভাতের চোখে জল এল।

আমিও চোখ মুছলাম। একটু পর, যেন এই নিয়ে তিনবার নবজাত ঘুমন্ত শিশুর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রভাত আবার আস্তে কোল থেকে ওটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওপরে মাটি চাপা দেয়। ঘাসের চাপড়াগুলি সুন্দর করে বসিয়ে দেয়। তারপর সে উঠে দাঁড়ায়। আমিও। বৃষ্টিটা একেবারে ধরে গেছে। কেয়াঝোপ পিছনে রেখে মাধবীবন পার হয়ে দুজন আবার সবুজ ঝকঝকে ঘাসের ওপর চলে আসি।

'এটা করার দরকার ছিল কি ?' প্রভাত আমার চোখ দেখছিল না। মেঘের ফাঁকে রোদ চিকিয়ে উঠেছে তাই দেখছিল।

'হয়তো ভয়ে—লজ্জায়।' আমি আস্তে বললাম।

'তারপর পালিয়ে গেল দুটিতে।' তেমনি আকাশ মুখ করে সোনাগলা রোদ চোখে নিয়ে প্রভাত বলছিল। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তার মুখ দেখছিলাম। কেবল কি অনুকম্পা ? যেন আরো অনেক কিছু দেখলাম প্রভাতের চকচকে চোখ দুটোর মধ্যে। ফুল শুকিয়ে যাওয়ার ব্যথা—ফুলের শুকিয়ে একটু একটু করে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। আমি তাই আশা করছিলাম।

বনের রাজা

'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলে।'

'গাছের ডাল? পাতা?'

'ডাল পাতা ফুল কুঁড়ি ফল সব,—সবাই ফিস্‌সিস্ করে আমার সঙ্গে কথা বলে।'

'আমার সঙ্গে বলবে?'

'হুঁ, বলবে না আবার!' নাতির হাত ধরে সারদা তাকে কাছে টেনে নেন। তারপর ওর ছোট মাথাটা বাদাম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে সারদা অল্প শব্দ করে হাসলেন: 'এই বেলা কানটা চেপে ধর, কথা শুনবি।'

মতি তাই করে। প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির দিকের মোটা বাকলে ঢাকা কাণ্ডের ওপর কান চেপে ধরে মতি স্থির হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীষ্মের দুরন্ত এলোমেলো হাওয়া বইছে। সবুজ সতেজ বাদাম পাতার সরসর শব্দ তুলে হাওয়া অন্যদিকে ছুটছে। মতির মাথার চুল নড়ছে, সারদার মাথায় টাক, চুল নেই, পাকা গোঁফটা হাওয়ায় একটু একটু কাঁপছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কাঁপছে সারদার ঠোঁট জোড়া। অবশ্য এটা হাওয়ার জন্য না, শব্দ না করে হাসিটা মুখের ভিতর গলার কাছে ধরে রাখছে বলে দাদুর ঠোঁট নড়ছে, দশ বছরের মতি টের পায়। এটা দাদুর দুষ্টামি। দাদুর বয়সের আর কোনো বুড়ো বা বুড়ী এমন দুষ্টামি করে কি না মতি মাঝে মাঝে চিন্তা করে।

'কি হ'ল, শুনলি কিছু?'

'নাঃ।' মতি মুখ বেজার করে মাথা নাড়ল ও সঙ্গে সঙ্গে কানটা গাছ থেকে আলগা করে আনল। 'কিছুই শুনছি না।'

'ওয়াক্ থুঃ।' সারদা মুখ ঘুরিয়ে মাটির ঢিবির পাশের কচু জঙ্গলের ওপর থুথু ফেলেন। এবার আর হাসেন না। গোঁফের আড়ালে পুরু ঠোঁট জোড়া স্থির হয়ে আছে। অস্থির হাওয়ায় বাদাম গাছটা বেশি নড়ছে বলে হলদিবনা পাখিটা ডাল ছেড়ে অন্যদিকে উড়ে গেল। যেন হলদিবনার উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে সারদা একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়েন। তারপর চোখ নামিয়ে নাতির মুখ দেখেন।

'কান নষ্ট হয়ে গেছে তোর,—শহরে থেকে থেকে এটি হয়েছে দাদু।'

'তাই কি ?' দাদুর চোখের ধূসর বাদামী রঙের মণি দুটো দেখতে দেখতে কী যেন ভাবে ও, তারপর দুধ-সাদা দাঁতের সারি বার করে মতি হাসে, মাথা নাড়ে। 'কেন, আমাদের বীডন স্ট্রীটের বাসায় তো একটা পেয়ারা গাছ আছে,—রাস্তার ওপর কত বড় গোলমোহর ফুলের গাছ,—কৈ, সে দুটো গাছ তো কথা বলে না ?'

'বীডন স্ট্রীটের গাছ !' গলার বিশ্রী শব্দ করে সারদা কথা বলেন, 'দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ির ঘড়ঘড় ভেঁপু, রেডিওর চিৎকার শুনে সেসব গাছের কিছু আছে নাকি। সব বোবা হয়ে গেছে, কথা বলবে কি, কোনোরকমে প্রাণটা টিকিয়ে রেখে ধুক্‌পুক্ করছে।' সারদা আর এক দলা থুথু ফেলেন। 'তোদের বীডন স্ট্রীটের পেয়ারা গোলমোহর গাছের পরমায়ু ক'দিন ?'

মতি চুপ।

'এখানে গাছের কাছে গাছ ছাড়া আর আর ঐ গ্যাখ্, এক একটা গাছকে যেমন কিছুই নেই। গুঁড়ির কাছে কত ঘাস মাটি! আদর করে জড়িয়ে ধরেছে অপরাজিতা লতা, ঝুমকা লতা।'

মতি হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকের গাছ, ঘন লতাঝোপ দেখে। সারদা আঙুল দিয়ে গাছের ডাল পাতা দেখান।

'আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালে ডালে রঙবেরঙের পাখিরা এসে উড়ে ব'সে, গান গায়, পাতার বোঁটায় ঠোঁট ঘষে, ফলে ঠোকর মারে, তাই না ?'

দাদুর চোখের ধূসর বাদামী মণি দুটো উত্তেজনায় ঝিকিয়ে ওঠে। নাতি ঘাড় কাত করে অস্ফুট গলায় বলে, 'তাই।'

গোঁফের আড়ালে সারদার কালচে পুরু ঠোঁট দুটো হঠাৎ আবার বেঁকে যায়।

'আর তোদের বীডন স্ট্রীটের গাছের গুঁড়ির কাছে কি ? পাথরের খোয়া, গরম পীচ, গাছকে জড়িয়ে থাকে ইলেকট্রিক তার, গাছের মাথা ডিঙিয়ে ওঠে চারতলা, দু'তলা দালান, কেমন ?'

নাতি এবারও ঘাড় কাত করে অস্ফুট স্বরে দাদুর কথায় সায় দেয়। দিয়ে চুপ করে পায়ের নখ দিয়ে মাটির ঘাস খোঁটে।

'কাজেই শহরের গাছেরা কথা বলে না, পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে তাদের জিভ খসে পড়েছে, গাড়ির ঘড়ঘড় আর রেডিওর চেঁচামেচি শুনে শুনে তাদের কান ভোঁতা হয়ে গেছে।' কথা শেষ করে সারদা কচুজঙ্গলের গায়ে থুথু ছিটান।

'গাছের কান আছে দাদু ?'

'আছে বৈকি। জিভ আছে, কান আছে। নাক আছে, চোখ আছে।' দাদু গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন। 'আমাদের মতো ওরাও সব কিছু দেখতে পায়।'

কালো চকচকে চোখ জোড়া বড় করে মতি এদিক ওদিক দেখে। সারদা হাঁটেন। মতি হাঁটে। কচুজঙ্গল পিছনে রেখে দু'জন ঢালু জমিতে নামে। রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়েছে। হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়েছে সেখানে। দু'জন জলের ধারে গিয়েছে কি না গিয়েছে, জলে পা ডোবালো কি না ডোবালো যেন দু' তিনশ ব্যাং লাফিযে ছিটকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জলে ঝাঁপ দিল। প্রথমটায় হঠাৎ ভয় পেলেও পরে মতি যেন খুব মজাব জিনিস দেখল, দু' হাতে তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

'তোর প্যাণ্টের পকেটে এক আধ ডজন ঢুকিয়ে নে না।' গম্ভীর থেকে দাদু প্রস্তাব দেন। 'কেমন হলদে তেলতেলে চেহারা ওদের!'

'ধ্যেৎ কী হবে ব্যাং দিয়ে?' মতি নাক সিঁটকায়।

'খাবি ভেজে চচ্চড়ি করে?'

'ওয়াক্ থুঃ।' মতি থুথু ছিটায়। 'চীনারা ব্যাং খায়। আমরা খাব কেন?'

'হুঁ, তোমবা বরফ চাপা পচা পচা মাছ খাবে। পচা বাসি মাছ খেয়েই তোর এমন হাড়গিলে চেহারা হয়েছে, বুকের সব ক'টা হাড় গোনা যায়।'

কথাটা সত্য। মতির শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তাই না দাদুর চিঠি পেয়ে সামারের ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এল। পাঁচ সাত দিনেই শরীরটা ভাল বোধ করছে সে। পুকুরের টাটকা মাছ আর খাঁটি দুধ খেতে পারছে এখানে।

মাঠের জল পার হয়ে দু'জন তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায়। একটা না, সাত আটটা জাম গাছ। ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। আর থোকা থোকা কালো জাম ঝুলছে মাথার ওপর। যেন শ্রাবণ আকাশের অগুনতি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গাছের মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে। মতি হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। এক সঙ্গে এত পাকা জাম সে কোনোদিন দেখেনি। সব অবশ্য পাকেনি। কাঁচা কচি সবুজ রঙের,—আধপাকা লাল রঙের জামই বা গাছে কম কি। লাল সবুজ কালো। যেন এক একটা গাছের ডালের মাথায় লাল সবুজ কালো পাথরের মালা ঝুলিয়ে রেখেছে কে?

'হাঁ করে দেখছিস কি?' দাদু ধমক লাগায়।

'দেখছি, ভারি সুন্দর লাগছে।'

'হুঁ! সারদা হঠাৎ কি ভেবে হাসেন। 'সুন্দর লাগছে বলে গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ফলগুলো তোর মুখের ভিতরে লাফিয়ে এসে ঢুকবে, কেমন?'

'না, তা ঢুকবে কেন।' মতি মাথা নাড়ে।

'সুন্দর সুন্দর করেই তো তোরা মরলি।' সারদা কাঁধের গামছাটা কোমরে বেঁধে নেন।

মতির মতো তাঁর পরনেও হাফপ্যাণ্ট। খালি গা, খালি পা। বুড়ো হলে হবে কি, হাতের পায়ের মাংসের গোছার এখনও শক্ত পাথুরে চেহারা! দাদু গাঁয়ে থাকে বলেই শরীর এত ভাল। মতি ভাবে। অথচ তুলনায় মতির বাবা, হ্যাঁ এই সারদা রায়ের ছেলে সুকুমারবাবুর শরীর কেমন নরম ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। বাবার চেহারাটা মতির এখন মনে পড়ল। এখন বেলা এগারোটা। তার বাবা অফিসে চলে গেছেন। ডালহৌসী স্কোয়ারে একটা প্রকাণ্ড লাল বাড়িতে তার বাবার অফিস। একদিন তাদের চাকরের সঙ্গে গিয়ে মতি বাবার অফিস দেখে এসেছে। মতি চিন্তা করল, যদি তার বাবা গ্রামে চলে আসেন দাদুর মতো তাঁরও শরীরটা ভাল হবে, ভাল থাকবে। এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে বাবাকে তাই পরামর্শ দেবে কিনা মতি তা-ও চিন্তা করল। কিন্তু তার বাবা আসতে চাইলেও মা আসবে না। মতি জানে। এখানে তার আসা নিয়ে মা ভীষণ আপত্তি তুলেছিল। সাপ ব্যাং জঙ্গল জল কাদা ছাড়া কিছু নেই এখানে। গাঁয়ে কোনো ভদ্দরলোক বাস করতে পারে নাকি। তাছাড়া, কেবল চাষাভুষো নিয়ে কারবার। হয়তো ওদের ছেলেপুলেরাই মতির সঙ্গী হবে। একটা ভাল কথা শুনবে না, লেখাপড়ার চর্চা থাকবে না, দিনরাত মাঠে জঙ্গলে ঘুরে পাখির ছানা চুরি আর গরু ছাগল ঠেঙানো শিখে আসবে মতি। অবশ্য মা আপত্তি করলেও দাদুর চিঠি পেয়ে বাবা তাকে একজন লোক দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। এখানে এসে মতির ভাল লাগছে। চাষাভুষো সাপ ব্যাং জঙ্গল কাদা ছাড়াও এখানে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলি সত্যিই ভাল, সত্যিই সুন্দর। মতির ইচ্ছা, কেবল সামারের ছুটি না, সব সময়ের জন্য এখানে থেকে যায়। তার বাবা মাও এখানে চলে আসুক।

এই আশ্বিনে উনষাট পেরিয়ে ষাটে পা দিচ্ছেন সারদা। গাছের উঁচু ডালে চড়ে তিনি তাঁর দশ বছরের শহুরে নাতিকে অবাক করে দিতে পেরেছেন কিনা চিন্তা করার আগে হাত বাড়িয়ে কালো জামের ছড়া ছিঁড়ে কোমরের গামছায় পোরেন। চার পাঁচটা জাম মুখে ফেলেন। দশ বারোটা জাম ছড়া থেকে আলগা হয়ে ছিটকে নিচে পড়ে। মতি মহানন্দে সেগুলি কুড়াতে লেগে যায়। পুষ্ট পাকা জামের মধুর টক টক রসে-মাসে সারদার মুখগহ্বর যখন ভরে ওঠে তখন তাঁর চোখের মণি দুটো একটি ছোট ছেলের চোখের মণির মতো চক্‌চকে হয়ে ওঠে, ঘোলাটে বাদামী রং মিলিয়ে গিয়ে পাকা জামের বীচির মতো লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে।

'দেখতে সুন্দর।' সুন্দর সুন্দর করে তোরা মরবি।' গাছের মগডালে উঠতে চেষ্টা করেন সারদা। 'যা দেখতে ভাল তা খেতেও ভাল। কিন্তু খাওয়া জিনিসটা তোরা ভুলে গেছিস।' মগডালে চড়ে সারদা মনে মনে নাতির সঙ্গে কথা বলেন। তোদের বীডন স্ট্রীটের বাসায় সুন্দর সুন্দর সোফাসেটি পর্দা, ফুলের টব আছে। রেডিও আছে, নিয়োন আলো আছে, ড্রেসিং টেবিল কাচের বাসন প্লাস্টিকের খেলনা পুতুলে ঘর বোঝাই। তোর মা এ বেলার শাড়ি ওবেলা পরে না; সকালের সুন্দর শাড়ি ব্লাউজ ছেড়ে বিকেলে তার চেয়েও কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা বেশি মানাবে ভেবে দিশাহারা হয়। তোর বাবার সুন্দর টাই স্যুট জুতো গাড়ি কেতাদুরস্ত আর্দালি পিওন নিয়ে দিন কাটে। না, তোরা উপোস থাকিস বলব না। কাচ ঘেরা বন্ধ অফিস-কামরার পাখার তলায় বসে সুকুমার পাউরুটি, টিনের মাখন, শিয়ালদার ঠাণ্ডাঘরে জিইয়ে রাখা দুটো আলু সিদ্ধ, মরিচগুঁড়ো, বাসি ডিম আর কিছু শুকনা আনাজ সিদ্ধ ও গুঁড়ো দুধ জমিয়ে তৈরি একটা বড় বরফি দিয়ে লাঞ্চ খায়। ব্যালান্সড্ ডায়েট? অস্বীকার করবে কে। রীতি-মতো শহরের নামী ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সুকুমার অফিসে বসে খবর কাগজের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে প্রোটিন ফ্যাট্ কার্বোহাইড্রেট মিনারেল্‌স সহযোগে তার দুপুরের সুষম আহার সম্পন্ন করে। ঘরে সুকুমারের স্ত্রী ভেজাল তেল আর গুঁড়ো হলুদ লঙ্কায় রান্না করা মাছের ঝোল ও চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে চিন্তা করছে, শহরের কোন্ সিনেমা ঘরে ভাল ছবি এল, ম্যাটিনী শো দেখে আসা যাক। 'সিনেমা!' কথাটা মনে হতে সারদা মুখ বিকৃত করলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ডবল সাইজের পাকা জাম মুখে পুরলেন। 'মানুষের পরমায়ু নিয়ে তোরা শহরে বসে আছিস। কেবল বাইরের রং চং আর ঠাটঠমক। এদিকে ভেজাল খাদ্য আর বন্ধ বাতাস যে তোদের আয়ুর বারোটা—'

নীচে থেকে মতি চেঁচাতে থাকে:

'দাদু অত উঁচোয় উঠছ কেন,—ডাল ভেঙে—?'

সারদা হাসেন। উঁচু ডালের ওপর বসে মাটির দিকে তাকান।

'ভাঙবার আগে ডাল জানান দেবে, মট্‌মট্ শব্দ হবে, তোদের বীডন স্ট্রীটের গাড়ি ঘোড়া জানান না দিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে।'

মতি নীরব হয়ে যায়। এ গাছের শালিক বুলবুলির দল দাদুর তাড়া খেয়ে অন্য গাছে উড়ে গিয়ে জটলা করে, পাকা জামে ঠোকর লাগায়। কিন্তু বুড়ো দাদুই বা কম যায় কি! মতি চিন্তা করে। এই তো সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে চারটে পাকা আম দিয়ে এতবড় বাটির এক বাটি ক্ষীর মুড়ি খেয়ে এসেছে। এখন আবার গাছে উঠে প্রাণভরে পাকা জাম খাচ্ছে। শ দেড়শ এর মধ্যে

খাওয়া হয়েছে ঠিক। মতি বেশি খেতে পারে না। 'পেট চিমসি মেরে গেছে, শহুরে ছেলে, কী আর খাবি, কতটা খাবি।' সকালে দাদু তাকে ঠাট্টা করছিল। কেননা এত ভাল দুধ মেরে তার ঠাকুমা কাল রাত্তিরে ক্ষীর তৈরী করেছে, সেই ক্ষীর মতি কতটা খেতে পারল! ক্ষীরের গন্ধটা এখনও তার হাতে লেগে আছে। দুধের গন্ধ, ঘিয়ের গন্ধ, ক্ষীরের গন্ধ কী মতি এখানে এসে জানতে পারছে। 'খেতে খেতে খাওয়া বাড়বে।' দাদুর ঠাট্টা শুনে মতির ঠাকুমা বলছিল, 'খাওয়াটা অভ্যাসের কাছে,—কলকাতায় থাকতে তুমি কি আর বেশি খেতে পারতে,—এখন তো তোমার খাওয়া দেখে আমিই মাঝে মাঝে অবাক হই।' দাদু হাসছিল। 'অবাক হচ্ছ কি ভয় পাচ্ছ খাঁটি কথাটা বলে ফেল।' যেন দাদুর খোঁচা খেয়ে ঠাকুমা লজ্জা পেয়ে চুপ করে ছিল, কিন্তু দাদু চুপ ছিল না। 'হুঁ, ভুঁড়িটা বেজায় বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে ভয় পাবারই কথা,—আয়ুর ফিতে লম্বা করতে হলে খাওয়াটা ঠিক রাখতে হবে বৈকি। নাকি ধরো ফিতেটা যদি কটাস্ করে ছিঁড়ে যায়, থ্রম্বসিস, কি ঐরকম কিছুতে হুট্ করে মরে যাই তো তোমার সাহস বাড়বে?' শুনে ঠাকুমা রেগে গিয়ে বলছিল: 'আহা, কথার কী ছিরি! কেন তোমার কি মরবার বয়স হয়েছে নাকি যে, এসব যা তা বলছ?' আর কথা না বলে দাদু আম-ক্ষীর খাওয়ায় মনোযোগ দিয়েছে এবং ঠাকুমা আরো কিছুটা ক্ষীর দাদুর বাটিতে ঢেলে দিয়েছে। এক সঙ্গে দাদুর চোখ ও ঠাকুমার চোখ দেখে তখন মতি বুঝে ফেলেছে, খেতে পেয়ে বুড়ো যেমন খুশী, তেমনি খাইয়ে বুড়ি মহাখুশী।

আয়ুর ফিতা। কথাটা মনে পড়তে মতি তার বাবার কথা চিন্তা করল। না, তার বাবা মোটে খেতে পারে না। এই এতটুকুন ভাত, দু' তিনখানা লুচি কি এইটুকুন সুজি খাওয়ার পর দু' হাত তুলে বাবা মাকে আর কিছু দিতে নিষেধ করে। যেন আর একটা লুচি কি এক মুঠো ভাত বেশি খেলে বাবার পেট ফেটে যাবে। এটা তো ভাল লক্ষণ না, মতি এখন দাদুকে দেখে, দাদুর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছে; তার বাবা হয়তো হুট্ করে একদিন—

'নে ধর্।'

মতি চমকে ওঠে। দাদু গাছ থেকে নেমে এসেছে। এই এত জাম কোমরের গামছায় বাঁধা। দরদর করে ঘামছেন সারদা। রোমশ ভুঁড়িটা ফলের রসে যেন আরো ফুলে উঠেছে।

'আমি আর খেতে পারছি না দাদু।' মতি ঘাড় নাড়ে।

'ঐ মাটিরটা কুড়িয়ে খেয়েই তোর পেট ভরে গেল! গাছেরটা খা, দুটো একটা খা।' হেসে সারদা এক খাবলা জাম নাতির হাতে তুলে দেন। মতি আর আপত্তি করে না, দুটো একটা জাম মুখে ফেলে দাদুর সঙ্গে হাঁটে।

'হুঁ, আমার জাম বাগান দেখলি, আম বাগান দেখলি,—এইবেলা তোকে জামরুল আর পেয়ারা বাগানটা দেখাব।'

মতি খুশী হয়ে পা চালায়। দাদুর আম বাগান কাল দেখা হয়ে গেছে, আজ জাম বাগান দেখল।

'সব গাছ তুমি লাগিয়েছ দাদু ?'

সারদা থুথু ফেলেন। জামের রসে থুথুর রং গাঢ নীল রং ধরেছে। 'জাম গাছ আগেই ছিল। এতগুলি জাম গাছ এক জায়গায় আছে দেখে তো এধারের জমিটাও কিনলাম।'

'আম,—সব আমের গাছ তোমার হাতের বলছিলে কাল।'

'হুঁ', সারদা আকাশের দিকে তাকান। 'আমি এসে একটাও আমগাছ পাইনি। হাজার টাকার আমের কলম কিনে আমাকে লাগাতে হয়েছিল। তাই না আজ অত বড বাগান হয়েছে।'

'বেশ ভাল ভাল আম হয় তোমার বাগানে।'

'হিমসাগর আর মোহনফুলি ছাডা কোনো আমের কলম লাগানো হয়নি, দাদু,—আমের বেলায় আমি বেজায় খুঁতখুঁতে। বাজে আম আমার দুচোখের বিষ।' সারদা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে নাতির দিকে ঘাড ফেরান। যেন ছেলেটা কি ভাবছে। ঘেমে মুখখানা লাল টুক্‌টুকে হয়ে গেছে। দাদুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে মতি ফিক্ করে হাসল

'হাসছিস যে।' সারদা ভুরু কুঁচকান। ভুরুতে একটা দুটো সাদা চুল এখনও রয়ে গেছে, বাকি চুল উঠে যাওয়ার দরুন কপালটা আগের চেয়ে চওড়া হয়েছে মনে হয়। কপালের দু' তিনটা গভীর রেখার খাঁজে খাঁজে ঘাম জমে রোদে চিকচিক করে। 'গত বছর পাঁচ শ টাকার সিঙ্গাপুরী কলা আর আনারসের চারা লাগিয়েছি।'

'কলাবাগান দেখেছি,—আনারসের বাগান দেখা হয়নি।' মতি ঢোক গিলল।

'একে একে সবই দেখা হবে, এখানে এসে গেছিস যখন আনারস, পেয়ারা কামরাঙা, জামরুল, সবেদা সব কিছুর বাগান দেখতে পাবি।'

মতির চোখের তারা ঝিকিয়ে উঠল।

'সবেদা খেতে আমি খুব ভালবাসি।'

সারদা কথা বলেন না, হাঁটেন। মতি হাঁটে। একটা বড দীঘির পাড ঘুরে দু'জন আবার রাশি রাশি ডাল পাতা ছডানো বিশাল ছায়ার জগতে এসে দাঁড়াল। মতি গুনে গুনে দেখল এক এক সারিতে চারটে করে গাছ, তিন সারিতে একুনে বারোটা জামরুল গাছ। এক একটা গাছে পাতার চেয়েও যেন

ফল ফলেছে বেশি। ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে নধর পুষ্ট তুধ রং অসংখ্য জামরুল ঝুলে আছে। জামগাছের চেয়ে এখানে পাখির সংখ্যা বেশি। এখানে তারা বেশি চঞ্চল, বেশি কলমুখর। মতি বুঝতে পারল, টিয়া বুলবুলি শালিক কাক কালো জামের চেয়ে তুধবরণ জামরুল পছন্দ করে বেশি। আর কাঠবিড়াল। লেজ ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওরা এ ডাল থেকে ও ডালে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'কেমন দেখছিস মতি ?'

'ভারি সুন্দর,—মনে হয় গাছে গাছে তারা ফুটে আছে, রাতের আকাশে যেমন তারা ফোটে।'

'কাব্য !' সারদা মুখ বিকৃত করলেন, থুথু ফেললেন। তারপর হাত বাড়িয়ে ঝুলে পড়া একটা ডাল থেকে এক ছড়া জামরুল ছিঁড়ে নাতির হাতে তুলে দেন। 'খেয়ে ত্যাখ্, কেমন মিষ্টি রসালো ফল আমার গাছের।'

'খুব মিষ্টি।' মতি একটা ফলে কামড় বসায়। অবশ্য নাতির কথা শুনতে সারদা চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই। হাত বাড়িয়ে আর এক ছড়া জামরুল পেড়ে টপা-টপ্ মুখে ফেলেন, কচমচ করে চিবোন। ছোট ছেলের মতো জামরুলের রস ঠোঁটের কশ বেয়ে থুতনির আগায় এসে ঝুলতে থাকে সারদার। দেখে মতি মজা পায়। তার ষাট বছরের বুড়ো দাত্ন যে সত্যি একটি ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছু না, মতি এখানে এসে বুঝতে পারছে, দেখছে। একটা জামরুল সে খেয়ে শেষ করতে পারছে না। দাত্ন পাঁচটা সাবাড় করে দিচ্ছে। আয়ুর ফিতে লম্বা করছে দাত্ন। ভেবে মতি নিজের মনে হাসল।

'এইবেলা বুঝি আনারস ক্ষেত দেখতে যাব আমরা ?'

'উঁ হুঁ।' সারদা মাথা নেড়ে বলেন, 'আনারস ক্ষেতে যাবি কি, এখনো পাতার রং যায়নি, আর তু এক পশলা বৃষ্টি হলে তবে তো আনারস পাকতে আরম্ভ করবে। এখন সব কাঁচা রয়ে গেছে।'

কেবল ফলের বাগান দেখা না, দেখার সঙ্গে খাওয়ার একটা অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে সারদা নাতিকে বার বার বোঝাতে চাইছেন। বুঝতে পেরে মতি আর আনারসের কথা তুলল না। কিন্তু কথা না বললেও ছেলেটা আবার কি ভেবে ভেবে মিটিমিটি হাসে।

'হাসছিস যে বড়ো ?'

'আমার ইচ্ছা করে তোমার একটা নাম দিই দাত্ন।'

'কি নাম ?' সারদা খুশীই হন। পিটপিট করে নাতির চকচকে চোখ তুটো দেখেন। 'বল্, বলে ফেল্।'

'ফলের রাজা।' মতি ফিক্ করে হাসল।

'হুঁ, তার চেয়ে বল্ গাছের রাজা, বাগানের রাজা।' সারদা হাতের শেষ জামরুলটা কচকচ করে চিবোন। 'ফল পিছে, গাছ আগে বুঝলি।' কি ভেবে সারদা নিজের মনে হাসলেন। 'তারপর গেল বার আমার একটাও আম খাওয়া হয়নি জানিস?'

মতি ফ্যালফ্যাল করে দাদুর মুখ দেখে।

'গেল বার ঝড়ে সব আমের বোল গুটি নষ্ট হয়ে যায়। এতবড় আমবাগানে একটা আম বড় হতে পারেনি, পাকেনি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, পাকা আম খাইনি তো খাইনি, তাই বলে কি আমি বাগানের গাছগুলির ওপর রাগ করেছিলাম, না গাছের যত্ন করিনি! বরং গত বছর আমি আমার নিষ্ফলা আম বাগানেই বেশি সময় কাটিয়েছি, ওদিকে জামের বাগানে জাম পেকে ঝরে ঝরে নিচে পড়েছে, ঘাসের ওপর হাঁটু-উঁচু কালো জাজিম তৈরী হয়েছে পাকা জামের, কিন্তু আমি একবার ওদিক মাড়াইনি। হুঁ, জামরুল পেকে পেকে সব কটা গাছ সাদা হয়ে গেছে, কাঠবিড়াল আর রাজ্যের পাখি পেট ভরে জামরুল খেয়েছে, আমি একবার এখানে চুপি দিতে আসিনি।'

'তবে তো তুমি ফলের চেয়ে গাছকেই বেশী ভালবাস।' মতি আমতা আমতা করে বলল।

'তবে?' সারদা নাক দিয়ে শব্দ বার করলেন। আমি আর ক'টা ফল মুখে দিই, না কি একলা আমি খাব বলে এত এত গাছ লাগিয়েছি, বাগান করেছি। আমার গাছের ফল পাখিরা বেশি খায়, বাদুড় আর কাঠবিড়ালগুলি বেশি খায়, খাচ্ছে।'

'তাই দেখছি।' সারদার দশ বছরের শহুরে নাতি জামরুলের ডালে ডালে লেজমোটা কাঠবিড়ালগুলির ছুটোছুটি দেখতে দেখতে খুশী হয়ে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বিডন স্ট্রিটের বাসায় সে তার গুল্‌তিটা ফেলে এসেছে। ওখানে কি আর কাঠবেড়াল আছে। কেবল ইলেক্‌ট্রিক তার, ট্রাম টেলিফোনের তার। তারের গায়ে গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মতি কাঠবিড়াল আর পাখি মারার সাধ মিটিয়েছে। তারের ঝন্‌ঝন্ শব্দটা এখনও তার কানে বাজছে। শহরের কথা মনে হতে সে দাদুর দিকে তাকায়।

'কিছু বলছিস্?'

মতি অল্প অল্প হাসে।

'তোমার একটা বড় গাড়ি ছিল, হল্‌দে রঙের গাড়ি?'

'হ্যাঁ', সারদা থুতনি নাড়েন। 'কার কাছে শুনলি?'

'মা বলছিল একদিন, গাড়িটা বেচে দিয়েছ?'

'বেচে দেব না তো সঙ্গে করে ওটা গাঁয়ে নিয়ে আসতাম নাকি।' সারদা থামেন, চারদিকে তাকান। 'ভাল রাস্তাঘাট নেই, এখানে আমি গাড়ি দিয়ে করতাম কি?'

তাও বটে। দাতুর মতো নাতিও ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখে। মাঠ জঙ্গল ডোবা খানা আর এবড়ো-খেবড়ো মেঠো পথে দাতু কী করে গাড়ি চালাতো!

'বেচে দিয়ে ভাল করিনি?' সারদা নাতির চোখ দেখেন। মতি ঘাড় কাত করে। সারদা হাসেন। 'না কি মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে আমি আম বাগানে জাম বাগানে এসে আম জাম খেতাম?'

'ধ্যেৎ।' ছবিটা মতিরও মনঃপূত হয় না। 'তাছাড়া, ঘাসের ওপর দেদার পাকা জাম জামরুল ছড়িয়ে থাকে। গাড়ি ছুটিয়ে এলে চাকার তলায় সব থেঁতলে যেত।'

সারদা শব্দ করে হাসেন।

'যা বলেছিস দাতু, তাছাড়া, একবার এখানে গাড়ির হর্ন শুনলে আমার গাছের সব পাখি কাঠবেড়াল ভয়ে ছুটে পালাতো। কেমন না?'

মতি ঘাড় কাত করল। কি একটু ভাবল। চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক দেখল। তারপর:

'আমার তো মনে হয় গাড়ির শব্দ শুনে ফড়িং প্রজাপতিগুলিও ভয়ে পালিয়ে যেত।'

'তাই, গাড়ি বাজে জিনিস। সাধে কি আর বেচে দিলাম।' সারদা নাতির ওপর সন্তুষ্ট হন।

'তবে কিনা—'

'আবার তবে কিনা কি!' সারদা রুখে ওঠেন। 'আর কি বলার আছে শুনি?'

ঘাড় গুঁজে মতি পায়ের নখ দিয়ে ঘাস খোঁটে। 'পায়ে যদি ধুলো না লাগল, নরম ঘাস না মাড়ালাম তো বেঁচে আছি বলে আমার মনে হয় না।' কথা শেষ করে সারদা গোড়ালি দুটো জোরে জোরে ঘাসের ওপর ঘষেন। তাই, মতি চিন্তা করল, দাতু সারাদিন খালি পায়ে থাকে, গাছের রাজা জুতো পরে না।

কিন্তু যে কথাটা তার জিভের ডগায় এসেছিল বলতে না পেরে মতি অস্বস্তি বোধ করে। দাতু হাঁটে, মতি হাঁটে। জামরুল বাগানের ঠাণ্ডা ছায়া মাথার ওপর থেকে সরে যায়। দুজন রৌদ্ররুক্ষ আকাশের নিচে চলে এল।

'বেজায় রোদ।' মতি আস্তে বলল।

'এটা জ্যৈষ্ঠ মাস।' চড়া গলায় দাতু বলল, 'শ্রেষ্ঠ ঋতুর শ্রেষ্ঠ মাস, রোদ তো

চড়বেই, না হলে আম জাম কাঁঠাল কলা পাকবে কেন।'

'তাও বটে।' মতি বিড়বিড় করে দাদুর কথায় সায় দেয়, হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। তার কপালটা ঘামছিল বেশি।

'এক কাজ কর না।' সারদা নাতির দিকে ঘাড় ফেরান।

'কি ?' মতি ঘাড় ফেরায়।

সারদা হাঁটা বন্ধ করে থমকে দাঁড়ান। মতি বুড়োর চোখ দেখে। বুড়োর চোখের বাদামী মণি দুটো রোদের তাপে লাল হতে শুরু করেছে কি।

'রোদটা তোর মাথায় বেশি লাগছে, কেমন ?' সারদা অল্প হাসেন।

'হুঁ।'

'তা তো লাগছেই', সারদা আবার এক দলা থুথু ছিটান। মাঠের গরম বালি থুথুটাকে চোখের নিমেষে শুষে নিচ্ছে, যেন মতি তাই দেখতে আরম্ভ করেছিল। সারদা আঙুল দিয়ে মতির পরনের হাফপ্যাণ্ট দেখান। 'ওটা খুলে ফেল্,—খুলে মাথায় জড়িয়ে নে, মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে।'

'ধ্যেৎ' মতি ফিক্ করে হাসল, 'তুমি যেন কী দাদু, মাঠের ওপর দিয়ে আমি লেংটা হয়ে হাঁটব নাকি !'

'আমি গরু, আমি ছাগল, আমি গাছের কাঠবিড়াল, জঙ্গলের শেয়াল' সারদা ভেংচি কেটে বড় একদলা থুথু ফেলেন। 'তোকে এখানে দেখছে, কে, কতবড একটা মানুষ হয়ে গেছিস শুনি ? লজ্জা করে!' একটু থেমে সারদা বললেন, 'এ তোমার বিডন স্ট্রীটের ছাদ দেয়াল ডিঙিয়ে আসা মরা হাজা রোদ্দুর না, এ হল গিয়ে মাঠ ফাটানো দীঘি শুকানো তেজী খাড়া রোদ; অভ্যাস নেই যখন তোমার মাথাটিও ফেটে চৌচির হতে পারে, তাই বলছিলাম—দাদু ওটা মাথায় জড়িয়ে নিতে।'

যেন দাদুকে খুশি করতে মতি পরনের প্যাণ্ট খুলে মাথায় জড়ায়। প্রথমটায় কেমন বাধো বাধো ঠেকে তার, কানটা গালটা লাল লাল হয়, তারপর অবশ্য মতি স্বাভাবিক হয়ে যায়; দাদুর সঙ্গে লম্বা পা ফেলে হাঁটে। সত্যি তো, কে আছে কে দেখছে তাকে এই রোদ্দুরে; কাক শালিকটা পর্যন্ত ধারে কাছে নেই। 'বুঝলি'; সারদা হাসেন, নাতির কাঁধে হাত রাখেন; নাতি তাঁর বাধ্য হয়েছে দেখে খুশী গলায় বলেন, 'আমি কিছু গ্রাহ্য করিনে। আম বাগানে কি জাম বাগানে থাকলে, যখন দেখি বেশি ঘাম দিচ্ছে শরীরে, গরম কমছে না, গায়ে কিছু থাকলে খুলে ফেলে স্রেফ লেংটা হয়ে ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি।'

'খুব আরাম লাগে!'

'আলবত লাগতে হবে, হি হি।' ছোট ছেলের মতো শোনায় সারদার

হাসি। 'নরম ঘাস তোমার শরীরকে আদর করছে, গাছের মিষ্টি ছায়া তোমার শরীর ঢেকে রাখছে, আরাম না লেগে পারে দাদু।'

'জামা কাপড় কিছু না।' যেন দাদুকে আর একটু খুশী করতে মতি বলল, 'আগে মানুষ যখন জঙ্গলে ছিল, বনে ছিল তখন তো শুনছি ওরা জামা কাপড় চিনতই না।'

'তবে আর কি, জানিস তো সব। সারদা আকাশের দিকে চোখ তোলেন। আগে মানুষ সুখে ছিল, এখন পোশাক-আশাক তার যন্ত্রণা বাড়িয়েছে।'

দাদুর মেজাজ ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে মতি কথাটা বলে ফেলল: 'মা বলে, এতবড় ইঞ্জিনীয়ার ছিল তোর দাদু, এখন একটা চাষাভুষো হয়ে গাঁয়ে আছে।'

'বলুক না, বলতে দে,—চাষা বলছে শুনলে আমি রাগ করিনে।'

'মা দুঃখ করছিল এলগিন রোডের এত বড় বাড়ি তুমি বেচে দিলে।'

'তোর মা তো দুঃখ করবেনই, তোর মা ইঁট কাঠ লোহা বালির স্বপ্ন দেখেন। আমার স্বপ্ন মাটি, আমার স্বপ্ন গাছ।'

'ঘাস ছায়া পাখি কাঠবিড়াল।' মতি যোগ করল।

'কাজেই শহরের বাড়ির বদলে এখানে আমি কী পেয়েছি তোর বাবা মা জানবে না।' যেন বিরক্ত হয়ে সারদা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইলেন। 'শহরের পুরনো পচা আকাশের নিচে থেকে ওদের ইমারতের স্বপ্ন দেখতে দে, কল ইঞ্জিনের ধোঁয়া কালি গিলে গিলে আয়ুর ফিতা গুটিয়ে নিতে দে।' সারদা ভেংচি কাটার মতো চেহারা করে নাতির মুখ দেখেন।

'ওরা তোমার আগে মরে যাবে দাদু?' মতি প্রশ্ন না করে পারল না। 'আমার বাবা মা?'

'সব, কলকাতা শহরটাই যে মরতে বসেছে।' দাদু নাকে হাসল। যেন মতি কি ভাবল, ভেবে প্রশ্ন করল, 'বাড়িগুলো? বাড়িগুলোর কী হবে, এত বড় বড় দালান?'

'ভেঙে পড়বে, ভেঙে মাটির সঙ্গে একদিন মিশে যাবে!'

'তারপর?'

'তারপর সেখানে ঘাস গজাবে, গাছ হবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে।'

'খুব চমৎকার হয় তা হলে, না দাদু? কলকাতার এখানে সেখানে পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।'

'তাই তো হতে হবে, তা না হলে পৃথিবীর নিত্যনতুন চেহারা থাকবে না যে।' কথা শুনতে শুনতে দাদুর সঙ্গে মতি একটা সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছল।

এর আগে সে এদিকে আর একদিনও আসে নি। ভারি সুন্দর গোলমতন একটা প্রকাণ্ড পুকুর। আয়নার মত ঝকঝক করছে জল। পুকুরের একদিকে শাপলা আর একদিকে পদ্ম বন। থালার মতো সবুজ গোল পদ্মপাতাগুলো জলের ওপর চুপচাপ শুয়ে আছে। শাপলা-পাতাগুলো গোল না, অনেকটা পানের মতো দেখতে। টুকটুকে লাল দুটো শাপলা ফুল ফুটেছে। কাল আরো দু-চারটা ফুল ফুটবে, পরশু এক ডজন ফুটতে পারে, তার পরদিন আরো অনেক বেশি ফুল ফুটবে। সবুজ ডাঁটার আগায় আগায় অসংখ্য কুঁড়ি কলি তৈরী হয়ে আছে। কলিগুলোর গা ছুঁয়ে এক ঝাঁক ফড়িং উড়ছে। 'পদ্মের কলি দেখছি না দাদু।' মতি বলছিল। দাদু হেসে উত্তর করল, 'এখন কি, বর্ষা পড়ুক—বর্ষার জলে কলি কুঁড়ি গজাবে আর শরৎকালে সব ফুটবে। অবাক হয়ে মতি পদ্মবন দেখল আর চিন্তা করল কবে শরৎকাল আসবে আর রাশি রাশি পদ্ম ফুটবে। 'তুই কেবল জলের ওপরের ফুলের কথা ভাবছিস, আমার এই পুকুরের জলে কত বড় বড় মাছ আছে জানিস, তোর চেয়েও বড় এক একটা রুই কাতল এই পুকুরে আছে।'

ফুলের কথা ভুলে গিয়ে মতি জলের নিচের মাছের কথা চিন্তা করতে লাগল। বড় মাছ মানে অনেকদিনের পুরনো মাছ।

'পুরনো মাছ খেতে ভাল দাদু ?'

হুট করে নাতির মুখে খাওয়ার কথা শুনে সারদা খুশী হল। 'ভাল না মানে ?' সারদার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। 'টাটকা হলে সব মাছই খেতে ভাল, নতুন পুরনো বুঝি নে !'

দাদু যে মাছের খুব ভক্ত মতি এখানে এসে জেনে গেছে।

তাও কি তাদের কলকাতার বাসার মতন একটুকরো দেড়টুকরো মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া !

গাদাগাদা মাছ চাই সারদার। দুবেলা।

বাটি ভরে ভরে ঠাকুমা দাদুর পাতের সামনে মাছভাজা, মাছের ঝোল মাছের চচ্চড়ি সাজিয়ে দেয়।

তাই বুঝি সারদা কাল দুপুরে খেতে বসে নাতিকে বলছিলেন। মাছ খাওয়ার জন্যে তিনটে দীঘি পুকুর কাটিয়েছেন তিনি। 'হুঁ, এমনভাবে মাছ খেতে হয় যেন কেবল হাতে-মুখে না, গা দিয়েও আঁষটে গন্ধ বেরোয়—তবে না মাছ খাওয়া।'

আর মতির তখন মনে পড়েছে, তার মাকে-বাবাকে। হাতে একটু আঁষটে গন্ধ থাকবে বলে খেয়ে উঠে ভাল করে বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। মা

সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে হাতে পাউডার মাখেন।

'বুঝলি, সর্দি-কাশির ধাত থাকলে তোদের কলকাতার ডাক্তাররা রুগীকে কডলিভার, ইমারসন, এ-ওষুধ সে-ওষুধ খেতে পরামর্শ দেয়। আমি খাই গরম গরম টাটকা মাছের তেল ভাজা। সর্দি-কাশি ধারেও ঘেঁষতে পারে না।'

সুতরাং এখন মাছের কথা উঠতে দাদুর চোখ চক্‌চকে হবে, জিভে জল গড়াবে স্বাভাবিক। জলের দিকে তাকিয়ে সারদা হাই তোলেন। 'বড্ড খিদে পেয়েছে রে নাতি, পেট চোঁ চোঁ করছে।'

মতি অবাক হবার ভান করল। হাসল।

'সকালে অনেক আম ক্ষীর খেয়েছ দাদু, তারপর এত এত জাম-জামরুল। এর মধ্যে তোমার—'

'আমারটা পেট না, পিপে, কিছুতে কি আর ভরতে চায়—তোর খিদে পায়নি ?' সারদা ঘাড় ফেরাল।

মতি মাথা নাড়ল।

'একটুও না।'

'তোরটাও পেট না, হোমিওপ্যাথির শিশি।'

দাদুর কথা শুনে মতি শব্দ করে হাসল। সারদা এখন আর থুথু ফেলেন না, একটা বড় ঢোক গিললেন।

'সূর্যি এখন মাথার ওপর দেখছিস তো।' বলতে বলতে আকাশের দিকে তিনি চোখ রাখেন। 'আজ আমার উত্তরের পুকুরে জেলেরা জাল ফেলেছে। এতক্ষণে বাড়িতে মাছ পৌঁছে গেছে জানা কথা। হুঁ, চেতল মাছ, বলে দিয়েছি। আমার তো মনে হয়, তোর ঠাকুমা এখন চেতলের পেটিগুলো দিয়ে কালিয়া রাঁধতে বসে গেছে।'

'তা হবে।' মতি খুক্ করে হেসে ফেলল। 'তাই তোমার পেট চোঁ চোঁ করছে।'

'তা হবে মানে ?' সারদা রুখে ওঠেন। 'নির্ঘাত কালিয়া পাক করছে বুড়ি, আমি এখান থেকে গন্ধ পাচ্ছি।'

বুড়ো না, একটি শিশু। তেমনি লোভী, চঞ্চল। তা হতেই হবে, মতি চিন্তা করল। 'এই বয়সে আয়ুর ফিতে লম্বা করতে হলে এদিকের অনেকগুলি বছর কমিয়ে দিয়ে বাদুড়কে গাছের মগডালে উঠে জাম-জামরুল খেতে হবে, মাছের কালিয়ার নামে বেসামাল হয়ে পড়তে হবে।'

'তুমি তা হলে এখন বাড়ি ফিরছ দাদু ?' নাতি শুধোয়।

'আলবত, ভাত খাব মনে পড়লে আমার অন্য কোথাও যেতে, আর কিছু

করতে ইচ্ছা করে নাকি ?'

'কিন্তু আনারসের বাগানটা দেখা হল না যে।' যেন দুষ্টুমি করে মতি বলল, 'ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে আর একটু বেড়াব, তোমার পেয়ারা বাগানটাও দেখব—'

'পেয়ারা এখন পাথরের গুটি হয়ে আছে, আষাঢ় মাস আসুক, দু-চারটা জলের ঝাপটা লাগুক, তবে তো পেয়ারা ডাঁসবে পাকবে, এখন বাদুড়েও পেয়ারা ছোঁয় না।'

কাজেই মতি নিবৃত্ত হয়।

জাম-জামরুল বাঁধা গামছাটা সারদা কোমর থেকে খুলে আলগা করে নেন। 'নে ধর—তোর ঠাকুরমার জন্যে ক'টা তো নিয়ে যেতে হবে, আমি নিজের হাতে তুলে না দিলে একটা ফল বুড়ি মুখে দেবে নাকি ?'

হাত বাড়িয়ে মতি ফলের পুঁটলিটা নেয়।

'ইচ্ছা হলে তুইও দুটো-একটা খা না, অনেক আছে হ্যাঁ, এই ছায়ায় বসে বসে খা।' সারদা কোমরের বেল্ট খুলতে ব্যস্ত।

তা অবশ্য ইচ্ছা হলে মতি একটা দুটো ফল মুখে দেবে। পুকুর পাড়ের এই ছায়াটাও চমৎকার। মাথার ওপর প্রকাণ্ড হরিতকী গাছ। পুকুরের চার পাড ঘিরে ঘন বেত জঙ্গল। কিন্তু তার দাদু একী করছে !

'দাদু তুমি কি—' মতির কথা আটকে গেল।

'হুঁ', একটানে সারদা বেল্ট খুলে ফেলেন, 'এখানেই একটা ডুব দিয়ে যাই, বাড়ি গিয়ে আর চানটান হবে কি, গিয়েই খেতে বসে যাব, মাছের কালিয়া আর ভাত।' সারদা হাসলেন।

মতি অবাক হল কি, ভয় পেল কি ! বুকের মধ্যে কেমন একটা ধাক্কা অনুভব করল সে। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

পরনের প্যাণ্ট ঘাসের ওপর রেখে দাদু পুকুরে নেমে গেল। না, যদি ওটা তাদের মানিকতলার মোড় কি শেয়ালদা হত ; অনেক মানুষ, অনেক দোকান, গাড়ি ঘোড়া পুলিস ফেরিওয়ালা থাকত তো মতি মনে করতে পারত লোকটার মাথা খারাপ। একবার টালিগঞ্জ মাসির বাড়ি যেতে মতি ট্রাম থেকে এমন বুড়ো বয়সের একটা পাগলকে দেখেছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেখে রাস্তার লোক হি-হি করে হাসছে।

কিন্তু এখন ? এখানে ?

মতি ঘাড় ফেরাল, একটা ঢোক গিলল, ভয়ে ভয়ে ঘাসের ওপর রাখা সারদার ছাড়া হাফপ্যাণ্টটা দেখল, তারপর যেন একটু সাহস বাড়ল, চোখ তুলে সে পুকুরের জল দেখল। দাদু সাঁতার কাটছে। মতির সঙ্গে চোখাচোখি হতে সারদা হেসে

ফেলে জলের নিচে মাথা ডুবিয়ে দেন। আর দেখা যায় না মানুষটাকে। এক দুই তিন···যেন মনে মনে মতি গুনছে, দাদু কতক্ষণ জলের নিচে থাকতে পারে। দূরে জলের ধাক্কায় পদ্ম পাতাগুলি কাঁপছে, কলি কুঁড়ি নিয়ে শাপলার ডাঁটাগুলি নড়ছে। বুঝল মতি, দাদু ডুব সাঁতার কেটে দূরে চলেছে। আর ঠিক তখন তার মাথার ওপর হাওয়া লেগে হরিতকী গাছের পাতার সরসর শব্দ হল, বেত জঙ্গলের কোন্ দিকে একটা ডাহুক ডাকে, কোথা থেকে একটা সাদা মেঘ উড়ে এসে আকাশের কিনারে ঝুলছে—একটা মাছরাঙা ক্রিক্ শব্দ করে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা রুপোর পাত ঠোঁটে করে আকাশে উড়ে যায়।

মতির খুব ভাল লাগে। হাত বাড়িয়ে ঝুলি থেকে একটা কালো জাম তুলে সে মুখে পুরল। হুঁ, ঠাকুমার জন্যে দাদু জাম নিয়ে যাচ্ছে। বাবার কথা মনে পড়ল তার। মার কথা। কোনোদিন জাম-জামরুল না, আম-আনারস না—অফিস থেকে বাবা যখন বাড়ি ফেরে, তার হাতে থাকে মার পাউডারের ডিবি, স্নো ক্রিম। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল মতি, তারপর উঠে দাঁড়াল।

মতির এখন খেয়াল হল, সে নিজেও লেংটা। সেই যে দাদুর কথায় প্যাণ্ট খুলে রোদ বাঁচাতে মাথায় দিয়েছিল, আর সেটা পরা হয়নি। কিন্তু তা হলেও মতির এখন একটুও ইচ্ছা করছিল না, ওটা পরে। কলেজ স্ট্রীট থেকে তার বাবা এটা কিনে দিয়েছিল। তা দিক। তার মনে হল, এটার আর দরকার নেই, বাজে জিনিস। ভীষণ ইচ্ছা করছিল তার এমনি এ অবস্থায় দাদুর মতো সে পুকুরের জলে নেমে যায়। ডুব সাঁতার কেটে শাপলা আর পদ্ম বনের কাছে চলে যায়। কিন্তু ইচ্ছা হলে কী হবে, সে সাঁতার জানে না।

তা হলেও সে মন খারাপ করল না। কি একটা পাখি হরিতকীর ডালে এসে উড়ে বসে ভীষণ কিচিরমিচির শুরু করেছে। দাদুর মাথা একবার জলের ওপর ভেসে ওঠে। আবার ডুব দেয়। মতির মনে হয়, ডুব মেরে মেরে দাদু জলের নিচে পুরনো মাছগুলিকে দেখছে। মাছের ভক্ত, কে জানে একটা মাছ না হাত দিয়ে ধরে ফেলে ডাঙায় তুলে আনে।

ভেবে মতি নুয়ে হাত বাড়িয়ে ঠাকুমার জামের পুঁটলি থেকে আর একটা জাম তুলতে যাবে, চমকে উঠল।

হাসির শব্দ। তার পিছনে কে হাসছে। মতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাড় ফেরায়। একটা মেয়ে। বেত ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে। হাতে একছড়া বেতফল। বেতফল খাচ্ছে আর মতির দিকে তাকিয়ে আছে। চকচক করছে চোখ দুটো। ছিপছিপে লম্বা গড়ন। এখানে এসে মতি কালো বাসক গাছ চিনেছে। রোগা লম্বা মেয়েটাকে দেখে তার সরু লিকলিকে বাসক ডাঁটার

কথা মনে পড়ল। তেমনি কালো মিশমিশে গায়ের রং। হাসির ঠমকে নড়ছে, বাতাস লেগে বাসক ডাঁটা যেমন নড়ে, কাঁপে।

কিন্তু তার দিকে মেয়েটা এমন করে তাকাচ্ছে দেখে মতির দুকান লাল হয়ে উঠল, গরম হয়ে উঠল। চালাক ছেলে, শহরের ছেলে। মেয়েটার এভাবে তাকানোর অর্থ বুঝতে মতির এক সেকেণ্ড দেরি হয় না—খপ্ করে সে ঘাসের ওপর থেকে হাফ্‌প্যাণ্টটা কুড়িয়ে নিয়ে পরে ফেলল। এই এক সেকেণ্ডেই সে বেজায় ঘামছে।

'কি চাই তোর, কি দেখছিস ?' প্যাণ্ট পরে মতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধমক লাগায়।

'কিস্‌সু না, এট্টা বেতফল খাচ্ছি।'

'একটা তো না, একছড়া।' মতি রাগে গসগস করে। কটমট করে মেয়েটাকে দেখে। গায়ের রং যেমন ময়লা তেমনি ময়লা কুটকুটে পরনের শাড়িটা। তার ওপর ছেঁড়া। কিন্তু দাঁতগুলি খুব ফরসা। বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে দাঁতগুলি দেখে মতির তবু কিছুটা ভাল লাগল। ভাল লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়ে তার বুকের ভিতর ঢিব করে উঠল। আড়চোখে সে ঘাসের ওপর ছেড়ে-রাখা বড় হাফপ্যাণ্টটা দেখল। দাদু এখন কী অবস্থায় জলে সাঁতার কাটছে, সে জানে। ঐ বুঝি দাদুর স্নান সারা হয়েছে, পাড়ের দিকে আসছে না ?

'এই কোথায় যাচ্ছিস তুই !' মতি আগের চেয়েও জোরে ধমকে ওঠে, 'কোথায় চললি ?'

'এট্টু জল খাব।' ওর সঙ্গে একটা চটের বস্তা। মতি এতক্ষণ এটা লক্ষ্য করেনি। বেত ঝোপের ধার থেকে বস্তাটা টানতে টানতে হরিতকী গাছের নিচে নিয়ে এল মেয়েটা, তারপর বুঝি জল খেতে পুকুরের দিকে পা বাড়ায়।

'না এখন জল খেতে হবে না।' মতি রুখে দাঁড়ায়, 'তোর এই বস্তার মধ্যে কি ?'

'শুকনা পাতা।'

'অ, তুই পাতা কুড়ুনী।' মতি নুয়ে বস্তার ভিতরটা দেখে ! শুকনো পাতার সঙ্গে দুটো আনারস। বেশ তাজা। যেন এইমাত্র বাগান থেকে কেটে আনা হয়েছে। মতি সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'কোথায় পেলি আনারস ?'

প্রথমটায় একটু থতমত খায় মেয়েটা, তারপর হাসে, আঙুল দিয়ে পুকুর দেখায়।

'রাজাবাবুর ক্ষেতের, ঢুট্টি কেটে আনলুম হুন দিয়ে খেতে।'

তার মানে দাদুর বাগানের ; পুকুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দাদুকে রাজাবাবু বলছে ও, মতি বুঝল !

'তোর পিঠের ছাল তুলে ফেলবে রাজাবাবু। তুই কাঁচা আনারস কেটে আনলি।'

'কিছুটি বলবে না মুইকে, মুই কত ফলপাকুড় খাই রাজাবাবুর গাছের, বাগানের, কিচ্ছুটি বলে না।' বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে দাঁত বের করে মেয়েটা হাসে, ঘাড নাড়ে, ভুরু বেঁকায় ; তারপর : 'যাই, রাজাবাবুর দীঘির মিঠা জল এখন পেটটি পুরে খাই।' বলে কোমরে ক্ষিপ্র মোচড় তুলে ঘাসের ওপর দিয়ে তর্‌তর্‌ করে ও পুকুরের ধারে চলে গেল, জলের কাছে।

মতি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এইমাত্র যে দুশ্চিন্তাটা তার মনে এসেছিল সেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মেয়েটা ঠিক জলের কিনারে চলে গেল তো। দাদু সাঁতার জল ছেড়ে কোমর জলে এসে দাঁড়ালো না। ইস্‌ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল মতি। মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। তবে কি দাদু, এত বড় মেয়েটার সামনে জল থেকে ডাঙ্গায় উঠবে। দাদু ! যেন চিৎকার করে ডেকে বুড়োকে সাবধান করে দিতে চাইছিল সে,—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না ; ভয় বিস্ময় ঘৃণা আশঙ্কা বিতৃষ্ণা বিষণ্ণতার ছোট বড় নানা রকম তরঙ্গ তার বুকের মধ্যে খেলা করে গেল। এই একটু সময়ের মধ্যে। উন্মাদ না, শিশু না,—মতি মনে মনে বলল, আমার দাদু, এক কালের বড় ইঞ্জিনীয়ার, এলগিন রোডের বাসিন্দা সারদা রায় একটা জন্তু, একটা দানো, একটা ভয়ঙ্কর কুৎসিৎ জীবে পরিণত হয়েছে।

হাসছে ? মেয়েটা দাদুকে দেখে হাসছে ? কিন্তু দাদু যে এখনো কোমর জলে দাঁড়িয়ে। নাভিটা পর্যন্ত দেখা যায় না। অণুবীক্ষণের মত দৃষ্টিটাকে পুকুরের দিকে ধরে রেখে মতি একটা শুকনো ঢোক গিলল। হাওয়ার দোলায় মাথার ওপর হরিতকী গাছের মাথায় নতুন করে সরসর শব্দ জাগল। দূরের বেত ঝোপের ভিতর ডাহুকীটা ডাকছে। আকাশের কিনারে সাদা মেঘের দলাটা আরো সাদা হয়ে তুলোর মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এসব কিছুই দেখতে শুনতে ভাল লাগছিল না মতির। তার চোখ তার মন তার সবটুকু চৈতন্য এখন জলের ধারে, জলের ওপর।

ও কি ! দাদু হাসছে মেয়েটাকে দেখে ? ঘাড় নাড়ছে ? পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে মেয়েটা ঘাটের সিঁড়িতে বসে পড়ল যে ! সাদা ধূসর লোমে ঢাকা দাদুর ভুঁড়িটা জলের ওপর জাগছে না ? নাভিটা দেখা গেল না ? মতির শরীর

কাঁটা দিয়ে ওঠে, নিশ্বাস ফেলছে না, ঢোক গিলতে পারছে না সে। অবশ্য তখনই মতি একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, বড় করে ঢোক গিলতে পারল। দাদু আবার গলা জলে সরে গেছে, সাঁতার জলে। দাদু সাঁতার কাটছে। মেয়েটা হাত তুলে শাপলা বন দেখাচ্ছে। সবুজ ডাঁটা সমেত বড় শাপলা ফুলটা সারদা ছিঁড়ে আনেন। ফুল নিয়ে ডুব দেন। তারপর ভেসে ওঠেন পুকুরের এধারে। আবার মতির বুকের ভিতর ঢুবঢুব করে। কিন্তু না,—সারদা এবার ঘাটের ওপরের সিঁড়িতে পা রেখে আগের মতো কোমর জলে কি বুক জলেও দাঁড়ান না। গলার কাছে জল। জলের সঙ্গে সারদার থুতনি। সেখান থেকেই তিনি ডাঁটা সমেত লাল শাপলা ফুল ডাঙ্গার দিকে ছুঁড়ে দেন। হাত বাড়িয়ে মেয়েটা তা লুফে নেয়। তারপর ডাঁটা থেকে ছিঁড়ে ফুলটা খোঁপায় গোঁজে। গলাজলে দাঁড়িয়ে দাদু হাসে, মেয়েটাও হাসে। খোঁপায় ফুল গোঁজা হয়ে যেতে মেয়েটা আঁজলা আঁজলা জল খেল ঘাড় নুইয়ে। চুলের লাল ফুলটা হাওয়ায় কাঁপছিল। জল খাওয়া সেরে ও সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর এক ছুটে উঠে আসে তীরের সবুজ ঘাস আর হরিতকী গাছের গুঁড়ির কাছে। শুকনা পাতার বস্তাটা টেনে কাঁধে তোলে, তারপর কোমরের একটা ক্ষিপ্র মোচড় তুলে ওধারের বেতঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে। যেন বেতজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওর বেরোবার পথ।

হাঁ করে একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে মতি নিশ্চিন্ত হয়, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বাঁচা গেল, আপদ গেল। বিড়বিড় করে উঠল সে; আর তৎক্ষণাৎ দাদুকে দেখতে পুকুরের দিকে চোখ ফেরাল। 'দাদু তোমার স্নান হয়ে গেছে?' খুশি গলায় মতি ডাকল। ডাকতে পারল।

'হ্যাঁ রে দাদু, হয়েছে, হয়ে গেল।' সারদা জল ছেড়ে ডাঙ্গায় ওঠেন। ডাহুকটা ভীষণ জোরে ডাকছে। পেঁজা তুলোর মতো সাদা পাতলা মেঘগুলো এখন গায়ে গায়ে লেগে একটা বিশাল শ্বেত পদ্মের চেহারা ধরতে আরম্ভ করল না। আশ্চর্য এক মেঘের ফুল। খুশী হয়ে মতি দাদুকে দেখছিল। টপটপ জল ঝরছে কান থেকে, নাকের ডগা থেকে, থুতনি থেকে, হাতের আঙুলগুলি থেকে। দাদুর উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে মতির মনে হচ্ছিল একটা পুরনো গাছ। অনেকদিন জলের নিচে থাকার পর এখন উঠে এসেছে। গাছের রাজা তো গাছই হবে, মতি ভাবল। দাদুর গায়ের সাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের গায়ের শ্যাওলা। শ্যাওলা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। হরিতকী গাছের সরসর শব্দটা মতি কান পেতে শুনল।

সারদা তাঁর হাফপ্যাণ্ট পরেন, কষে বেল্ট আঁটেন।

ঠাকুমার জামের পুঁটলিটা মতি হাতে তুলে নেয়।

'একটু দেরি করে ফেললাম, কেমন রে নাতি।'

মতি হাসে, কথা বলে না, দাত্বর সঙ্গে হাঁটে।

'আমার এই পুকুরের জল চমৎকার ঠাণ্ডা, একবার নামলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না।'

'হুঁ।' মতি প্রথমটায় অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করে, তারপর কি ভেবে বলল, 'আমার তো মনে হয় ঠাকুমা অনেকক্ষণ কালিয়া রাঁধা শেষ করে বসে আছে।'

সারদা কথা বলেন না, হাঁটেন। মতি চুপ থেকে হাঁটে। দাত্ব কি কিছু ভাবছে? মতি ভাবে। দাত্বর আগে আগে, মাথার সামনে, কপালের সামনে একটা লাল ফড়িং উড়ে উড়ে চলে।

'আচ্ছা দাত্ব?'

'কি বলছিস?' সারদা থুথু ফেলেন না, আড়চোখে নাতিকে দেখেন, নাতি তাঁর হাত ধরে হাঁটে।

'তোমার বাগান থেকে তুটো আনারস কেটে এনেছে মেয়েটা, শুকনা পাতার বস্তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।'

'হুঁ,' মৃত্ব গলায় হাসেন সারদা। 'কাঁচা আনারস মুন লঙ্কা মেখে খাবে আর কি।' সারদা কপালের সামনে উড়ন্ত লাল ফড়িংটাকে লক্ষ্য করেন। 'তা আমুক না, কত আর খাবে, হাজারের ওপর আনারস হয়েছে এবার আমার ক্ষেতে।'

মতি একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

এবার নাতির কাঁধের ওপর হাত রেখে সারদা হাঁটেন।

'বাতুড় কাঠবিড়াল শালিক বুলবুলিতে কি কম ফল নষ্ট করে আমার! করুক! আমি একটুও রাগ করি না। আমার অনেক আছে বলেই তো ওরা খাচ্ছে।'

মতি নিরুত্তর। অনেক হেঁটে তার পা তুটো ধরে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করে যেন সে কেমন চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার কাঁধের ওপর দাত্বর হাত। দাত্বর গায়ের গন্ধ চামড়ার গন্ধ তার নাকে লাগছে। মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না! কোমল মিষ্টি ঠাণ্ডা মৃত্ব শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। মতি বুঝল। মতি বুঝল না আয়ুর ফিতে লম্বা করতে এই গন্ধও শরীরে ধরে রাখার দরকার আছে কিনা। বুঝতে না পেরে সে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগল। আর হাঁটতে লাগল।

বন্ধুপত্নী

এই গল্প আমার স্ত্রী রেবাকে নিয়ে হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয়নি। হলো আর-একজনকে নিয়ে, বিশ্বাস করা যায় না এমন অদ্ভুতভাবে। এক বর্ষার রাত্রে।

বলবেন, এমন হওয়া উচিত না। উচিত-অনুচিতের তত্ত্ব আলোচনা করলে অবশ্য গল্প হয় না। উচিত তো না-ই আমার স্ত্রী রেবার কাহিনীও আপনাদের কানে তোলা। কিন্তু উপায় কি।

রেবাকে নিয়ে আরম্ভ করা যাক।

হ্যাঁ, এক গ্রীষ্মের ছুটিতে ও আমার কাছে এসেছিলো। এই শেষ আসা। আমাদের বিয়ের পর এক বছরের মধ্যে অবশ্য আরো দু-তিনবার রেবা ছোটো-বড় ছুটিগুলো আমার কাছে এসে কাটিয়ে গেছে! যেমন পুজোর একমাস, বড়োদিনের সাত দিন, গুড্‌ফ্রাইডে—ইস্টার মন্‌ডে—পয়লা বৈশাখ—সংক্রান্তি ইত্যাদি মিলিয়ে ন'দিন। আর-এক জায়গায় ওর চাকরি। স্কুলের টিচার। আমি আছি কলকাতায়। আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না বছরে দু-বার তিনবার ওর কাছে ছুটে যাওয়া। চাকরিটাই এমন। বিয়ের সময় আঠারো দিনের ছুটি ব'লে ক'য়ে ওপরওয়ালার কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়েছিলাম। বছর না পুরতে আবার ছুটি চাওয়া তো অসম্ভবই, বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শিগগির আর ছুটি মিলতো কিনা সন্দেহ। আপিসে এমন লোকও আছে যাদের তিন কি সাড়ে তিন বছর পার হ'য়ে গিয়েও ছুটি মিলছে না। হাব-ভাব দেখে মনে হয় তাদের ছুটির দরকার নেই। দরকার কি আর হয় না! হয়তো একবার—দু-বার—তিনবার আবেদন-নিবেদন ক'রে যখন বুঝেছে একটানা একমাস কি একুশ দিন কর্মচারীদের অদর্শন তাঁর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, প্রায় হৃদয়বিদারক ঘটনার মতো, তখন কর্মচারীরা ওপরওয়ালার কাছে ছুটি চাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অসুখ-বিসুখ? সে-কথা অবশ্য আলাদা। খুব বেশিদিন রোগে ভুগে কি ঘন-ঘন সর্দি-কাশি-পেটের অসুখে কামাই ক'রে কে কবে মার্চেন্ট আপিসে চাকরি রাখতে পেরেছে আপনাদের অজানা নেই।

রেবা এ-সব বুঝতে পেরেছিলো।

হ্যাঁ, আমার এবং আমার চাকরির অবস্থা।

শেষবার, অর্থাৎ সামারের ছুটিতে এসে মুখ কালো ক'রে ও বলছিলো আর খুব শিগ্‌গির তার পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব হবে না, পুজোতেও না, ট্যুইশনি নিয়েছে। তা ছাড়া, সব চেয়ে বড়ো কথা বার-বার আসা-যাওয়া ক'রে ক'মাসেই সে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে। স্কুলের চাকরি। কত আর মাইনে দেয় কর্তারা। সুতরাং রেলভাড়া বাবদ যদি দু-চার মাস পর-পর পঁচিশ-ত্রিশ টাকা বেরিয়ে যায় তবে তার ভাত খাওয়া হয় না। 'আর, তোমার পক্ষেও সম্ভব না শিগ্‌গির বেনারস যাওয়া। সুতরাং—'

সুতরাং এক চালার নিচে থেকে এক হাঁড়ির ভাত খেয়ে দাম্পত্য-জীবন কাটানো শিকেয় তোলা রইলো।

কি, আমি সাহসই পাইনি রেবাকে প্রস্তাব দেওয়ার যে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি এখানে থাকো।

'আমার ট্রেনিং পাস না-করাটা কত বড়ো ভুল হয়েছে আজ বুঝতে পারছি।' রেবা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিলো, 'আমি কী জানতাম না বিয়ের পর এ-অবস্থা হবে। কিন্তু কাকু তো আর তা দেখেননি, মন্ত্র পড়িয়ে কোনোমতে পার করিয়ে দেবার জন্যে চোখে ঘুম ছিলো না। আর থাকবেই-বা কী ক'রে। আমি বাড়তি লোক, নিজের এতগুলো সন্তান, চাকরিও তেমন হাতিঘোড়া কিছু না। বাবা মরবার পর ওঁর সংসারে আমাদের যেদিন ঠাঁই নিতে হয়েছিলো সেদিনই জানতাম কত বড়ো অবিচার করা হ'লো আর-একটা লোকের ওপর। তবু তো তিনি ধারকর্জ ক'রে আমার পরীক্ষার ফীজ্‌ যোগাড় করলেন। না হ'লে বি. এ. পাস করাই আমার কপালে ঘটতো না।'

এই অবধি এসে রেবা থেমেছিলো।

'বেশ তো, তুমি না-হয় ট্রেনিংটা পাস ক'রে নাও, আমি দেখি ইতিমধ্যে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে কলকাতার কোনো ইস্কুলে যদি তোমার একটা—'

এত বড়ো চোখ করেছিলো স্ত্রী। হ্যাঁ, বিয়ের পর দ্বিতীয়বার বড়োদিনের ছুটি কাটাতে যখন ও আসে।

'অদ্ভুত স্বার্থপর তুমি।' মনে হয়েছিলো বুঝি সেদিনই সে বাক্স গুছিয়ে আবার বেনারস রওনা হয়। বললো, 'এতটা নীচ হ'তে আমি পারবো না। চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে সেখানে আলাদা বাসা করেছি, কিন্তু তা ব'লে কাকুর পরিবারের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমি স্বামী-সঙ্গ করতে আজই এখানে ছুটে আসবো—ম'রে গেলেও তা পারবো না। তারপর মা? মা-ও একটা সমস্যা! রোজ সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে না পারলে ম'রে

যাবে—কলকাতায় এসে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব, বিয়ের রাত্রেই আমার কানে-কানে বলছিলো।'

আমি চুপ ছিলাম। কাকুর পরিবার। মা। বিশ্বেশ্বরের মন্দির। ট্রেনিং নেওয়া।

গুডফ্রাইডের ছুটিতে ও এলো।

সে-বার কলকাতার জলে ওর নিজের বদ্‌হজম, গা-হাত ব্যথা এবং এ-সব অস্বস্তির দরুন রাত্রে অনিদ্রা।

আমি বললাম, 'না-হয় কালকের মেলেই তুমি ফিরে যাও, আরো তো ছুটির তিন-চার দিন আছে। সেখানে গিয়ে একটু রেস্ট্ নিয়ে তারপর কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারবে।'

তিন দিন না। ছুটির একদিন হাতে রেখে ও ফিরে গেছে।

তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে প্রথম দু-দিন ওর ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। এটা-ওটা কেনাকাটা করলো—দোকানে-দোকানে ঘুরে। ওর জুতো শাড়ি, বিধবা মা-র জন্যে কাপড়চোপড়, সেখানে ঘরের দরজা জানলার পর্দাগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিলো, তাই নতুন পর্দা কেনা হ'লো কুড়ি টাকার। একটা ইলেকট্রিক স্টোভ, বড়ো স্টীলের ট্রাঙ্ক, দুটো চামড়ার স্যুটকেস এবং তিনটে মাঝারি সাইজের পাপোশ। টুকিটাকি জিনিসও বিস্তর ছিলো। সাবান তেল স্নো ক্রিম পাউডার রাইটিং-প্যাড জেলির শিশি মাখনের টিন এবং কিছু ওষুধপত্র। ওষুধগুলো ওর নিজের জন্য কি মা-র জন্য আমি প্রশ্ন করিনি। করবো কি। সারাদিন ঘুরে জিনিসপত্র কেনাকাটা ক'রে ঘরে ফেরার পর এমন ক্লান্ত হ'য়ে ও বিছানায় এলিয়ে পড়েছিলো যে কাছে গিয়ে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোয়নি। হ্যাঁ, ক্লান্তি ওর চোখে-মুখে বেশি প্রকট হ'য়ে উঠেছিলো। এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে ব'সে ও আসল কথাটা তুললো। খরচপত্র। দু-চার মাস পর-পর এ-ভাবে কলকাতায় স্বামীর কাছে আসতে হ'লে ও সর্বস্বান্ত হ'য়ে পড়বে। সুতরাং আর শিগ্‌গির—

গ্রীষ্মের ছুটির তিনদিন আমার কাছে কাটিয়ে পঁচিশ দিন হাতে রেখে রেবা ফিরে গেলো। সত্যি তার বিশ্রামের দরকার। স্কুল খুললে আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে মেয়েদের আকবর বাদশা আর তৈমুরলঙের জীবনী শেখাতে হবে।

আমার জুতো নেই, গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে, একটিমাত্র শার্ট বাড়িতে সাবান দিয়ে কেচে কোনোরকমে কাজ সারা হচ্ছিলো ব'লে সেটার সাদা রং ম'জে গিয়ে মেটে হলদে রং ধরেছে। রেবা লক্ষ্য করেছিলো কিনা জানি না। কিন্তু তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা না ঘামিয়ে বরং যতটা সম্ভব হাসিখুশি থেকে ওর জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদায় সাহায্য করলাম, ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলাম এবং গাড়িতে

তুলে দিতে শেষ পর্যন্ত স্টেশনেও গেলাম।

'বাই—বাই।' হাত তুলে ইংরেজি কায়দায় ও বিদায় নিলো। বাই—বাই।' আমি হাসিমুখে মাথা নেড়ে প্রত্যাভিনন্দন জানালাম। সিটি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো। রেবা আর আসেনি। আমার স্ত্রী।

এখন আসল গল্পে আসা যাক।

ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিলো ক'দিন ধ'রে। সর্দি-কাশিতে ভুগে আমি একাকার। দু-দিন আপিস কামাই হ'য়ে তৃতীয় দিন চলছে। এমন সময় দুপুরবেলা হুড়মুড় ক'রে এসে ঘরে ঢোকে সুবিনয়। আমার বন্ধু। মাথা ও কান বেয়ে টপটপ জল ঝরছিলো। গায়ের জামা খুলে ফেলে হাত বাড়িয়ে আমার ময়লা তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে সে মাথা ও ঘাড় মুছলো।

'কী ব্যাপার?'

'তোকে দেখতে এলাম।' সুবিনয় আমার পাশে বসলো।

এখানে ব'লে রাখি, রেবাকে শেষবারের মতো বেনারস এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে এসে আদ্যোপান্ত সুবিনয়কে সব বলেছিলাম। নম্র নিরীহ গোবেচারা মানুষ এবং ঘরের ইট-কাঠকে যদি আমার বিশ্বাস করতে বাধতো সুবিনয়কে কিছু বলতে আমার আটকাতো না। আজ অবশ্য আমি গলা বড়ো ক'রে স্বামী-পরিত্যাগকারিণী রেবার কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। আমার খারাপ না লেগে বরং ভালোই লাগছে। কিন্তু সেদিন?

আমায় ভয় ছিলো পাছে কেউ টের পায়।

স্ত্রী আমাকে পছন্দ করছে না, আমার সঙ্গে থাকতে তার আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্কই তো,—কাকু, মা, স্কুলের চাকরি এ-সব প্রশ্ন এদিকে উঠেছিলো, কিন্তু তার আগে? সেই প্রথম যাত্রায় কলকাতায় থেকে যাবার প্রস্তাব দিতে মেয়েটির (স্ত্রী বলতে আমার ঘৃণা হয় এখন) চোখের তারায় যে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিলো পুরুষ হয়ে আমি তা ধরতে পেরেছিলাম বৈকি।

আর ধরতে পেরে আমি তা বিশ্বের কাছে লুকিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ ক'দিন এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে। একটা জায়গা চায় সে, একটি পাত্র খোঁজে। একজনের নিষ্ঠুর হওয়ার কাহিনী নিষ্ঠুরের মতো কাউকে ব'লে তারপর তার কাছে সৎ-পরামর্শের জন্য হাত পাততে না পারা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না। সেই শান্তি আমি সুবিনয়কে দিয়ে পেয়েছিলাম। অবশ্য খুব যে একটা বড়ো রকমের পরামর্শ ও আমাকে দিতে পেরেছে তা নয়! ওয়েট্ অ্যাণ্ড সী ব'লে আমায় সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া নিরীহ মানুষটার মাথায় আর বিশেষ কিছু আসেনি।

না, ভুল বললাম, এসেছিলো, এসেছে। ও যে সত্যি আমার বন্ধু, আমার দুঃখে খুব বেশি বিচলিত হ'য়ে পড়েছে সেটা সুবিনয় নিজে যতটা না বুঝেছিল আমি বুঝেছিলাম ঢের বেশি।

সুবিনয় আমার কপালে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করলো। আমি বললাম, 'জ্বর নেই, কাল একটু গা গরম হয়েছিলো, আজ ভালো আছি।'

'তা তুই কি ঠিক করলি ?'

কথার উত্তর না দিয়ে আমি অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ছিলাম। সুবিনয় আবার প্রশ্ন করলো, 'কী খেলি ?'

অল্প হাসলাম। হেসে সুবিনয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললাম, 'একটু বার্লি জ্বাল দিয়ে খেয়েছি। স্টোভ ধরাতে গিয়ে আঙুলটাও পুড়িয়েছি।'

'বেশ করেছিস।'

আমার মুখের দিকে তাকালো না সে। ঘরের মেঝেয় একরাশ ছেঁড়া ন্যাকড়া, অনেকগুলো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, স্পিরিটের শিশি ও হাতল-ভাঙা একটা সস্‌প্যানের পাশে স্টোভটার দিকে চেয়ে থেকে সুবিনয় যেন কী চিন্তা করছিলো।

'আজ শনিবার ?'

'হ্যাঁ, অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা তোর কাছে চ'লে এলাম। আজও সকালবেলা তোর বউদির সঙ্গে কথা হচ্ছিলো।'

আমি চুপ ক'রে আবার দেয়াল দেখছিলাম।

'তা হাত-পা পুড়িয়ে বেঁধে খেয়ে ক'দিন চলবে, না-হয় মেসে চ'লে যা।'

বললাম, 'তোমার ওয়েট অ্যাণ্ড সী উপদেশ মেনে নিয়ে এখানে প'ড়ে আছি আর-কি। যদি আবার কোনোদিন সে আসে।' হাসলাম।

'ননসেন্স।'

নিরীহ সুবিনয়ের চেহারা চাপা ক্রোধে থমথম করছিলো দেখে হাসি বন্ধ করলাম।

'মেসে ফিরে যা, না-হয় আমি যা বলছি তা কর। এ-ভাবে থেকে শরীরটাকে শেষ করিস না।' সুবিনয়ও দেয়ালের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিলো।

বিয়ের পর রেবা যে-বার প্রথম যাত্রা কলকাতায় আসে, মেস ছেড়ে দিয়ে নেবুতলায় একুশ টাকা ভাড়ার ছোটো একটা কামরায় বাসা বেঁধেছিলাম। সেই ঘরে আমি আজও প'ড়ে আছি। রেবা ফিরে আসবে ব'লে না, রেবার বার-বার এসে ফিরে যাওয়ার পরও যখন দেখলুম ফুড্‌ আর লজ্‌ বাবদ মাস যেতে পঁয়তাল্লিশ টাকা মেসে না দিয়ে এখানে একুশ আর একটু কম-সম খেয়ে এবং

মাঝে-মাঝে রাত্রে মুড়িটুড়ি চালিয়ে আমি পঁয়ত্রিশের মধ্যে মোটামুটি সারতে পারছি, তখন ভাবলাম (আপনি যদি স্বল্প বেতনভোগী কেরানী হন, আপনিও এই রাস্তা ধরবেন), আর মেসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন কেন। তা ছাড়া, তা ছাড়া আরো কথা আছে। সেদিন বিয়ে করেছি অথচ আজ সাত মাসের মধ্যেও আমার নামে সবুজ বা সাদা একটাও খাম আসছে না, মেসের লোকের চোখে সেটা বিসদৃশ ঠেকবে ভেবেও সেখানে ফিরে যেতে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। বলবেন আপিসের ঠিকানায় বউ চিঠি দেয় ব'লে ওদের বোঝাবো। সেই রাস্তা বন্ধ ছিলো, কেননা মেসের তারাপদ রায় ও নগেন দত্ত নামে দুই ভদ্রলোকও আমার আপিসে চাকরি করে। এক ঘরে, হ্যাঁ, এক টেবিলে ব'সে আমরা লেজার লিখি। কাজেই বুঝতে পারছেন লোকের কাছে কি লুকোতে আমার লোকালয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিলো না। এই ঘরটাকে নির্জনাবাসই বলা যায়। গোটা বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন টালি-ছাওয়া একতলা কামরা। আমার কাছে চিঠি আসে কি না আসে বাড়ির মালিক হার্ডওয়্যার মার্চেণ্ট ধনপতি নন্দী কি তার গোষ্ঠীর কেউ উঁকি দিয়ে দেখতে আসবে না। তা ছাড়া আমার জ্বর হ'লো কি পেটের অসুখ, হাত পুড়িয়ে সাগু পাক ক'রে খেলাম কি পা পুড়িয়ে চালে-ডালে একত্র সিদ্ধ ক'রে খিচুড়ি, তা-ও তাদের জানতে মাথা ব্যথা নেই। দু-তিনবার বউ এসে গেছে, এখন দু-তিন বছর কেন, বাকি সারা জীবনেও যদি আর সে কাছে না আসে, বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে বারাণসীধামে স্বজনের কাছে প'ড়ে আছে আমার বলতে বাধা ছিলো না। আমি ব্যাচেলার নই, বিবাহিত, এটা যখন প্রমাণ হ'য়ে গেছে বাড়িওলার ঘর অধিকার ক'রে থাকতে আর ভয় ছিলো না। তা ছাড়া কেরানীরা সুযোগ পেলেই পরিবার দেশে পাঠিয়ে দেয় লক্ষপতি ধনপতি নন্দীরা সেটা জানেন না আমি বিশ্বাস করতাম না।

ঘরে না থাকলে তো কথাই নেই, থাকলেও অধিকাংশ সময় আমি দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে রাখি। আর তা ছাড়া মাত্র দুটো জানলার মধ্যে বলতে গেলে দেড়খানাই ঘরের ওপাশে ধনপতিবাবুর কয়েক শ' টন পুরোনো জং-ধরা লোহার টুকরো স্তূপ ক'রে রাখা হয়েছিলো ব'লে, খোলা সম্ভব হ'তো না। সুতরাং বাকি আধখানা দিয়ে বাইরের আলো বাতাস এবং মনুষ্যদৃষ্টি প্রবেশ করার তেমন সুযোগ ছিলো না। কাজেই আমি অধিকতর নিশ্চিন্ত ছিলাম। নির্জনবাস বৈকি।

কিন্তু এখানে এভাবে হাত পা ছড়িয়ে একলা শুয়ে-শুয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলবো আর অনাহারে অর্ধাহারে থেকে শরীর নষ্ট করবো দেখতে সুবিনয় প্রস্তুত না। এখানে আমাকে ওয়েট অ্যাণ্ড সী নীতি মেনে চলতে দিতে সে নারাজ। বিশেষ ক'রে গত মঙ্গলবার আমাশয়ে ভুগে উঠে আবার এই বিষ্যুতবারেই সর্দিজ্বরে

বিছানা নিয়েছি দেখে সুবিনয় আমার ওপর রীতিমতো খেপে গেছে এবং অগত্যা যদি আমি মেসে ফিরে না যাই তো আজ এখুনি আমাকে তার সঙ্গে তার বাসায় চ'লে যেতে হবে। 'কালও তোর বউদির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে।

দেয়ালে পেরেকের গায়ে রেবার ফেলে-যাওয়া একটা রিবন ঝুলছিলো। অনেকদিন এক জায়গায় একভাবে থেকে কালি-ঝুল ও ধুলো লেগে চকচকে ফিতেটার ধূসর রং ধরেছে। ওটাকে অবলম্বন ক'রে এতবড়ো একটা মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে। একটু-সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে পরে বন্ধুর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আমার লজ্জা করে।'

'তুমি স্ত্রীলোক।' সুবিনয় রীতিমতো ধমক লাগালো, 'লজ্জা করে! আমার সঙ্গে থাকবি, বন্ধুর বাসায় থাকবি এতে লজ্জাটা আসে কোথা থেকে আমায় বুঝিয়ে বলতে পারিস ?'

গত পরশু সুবিনয় প্রথম আমাকে এ-প্রস্তাব দেয়। এবং সেদিন যে-প্রশ্ন করেছিলাম আজ আবার সেই প্রশ্ন চোখে ভেসে উঠলো।

সুবিনয় আমার হাতে হাত রেখে বললো, 'অরুণাকে সে-সব আমি কিছুই বলিনি। বিশ্বাস কর। তুই আমার বন্ধু। আমার কাছে তুই সব বলতে পারিস, কিন্তু তোদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক হ'য়ে আছে আমি মূর্খ না যে আমার স্ত্রীকে তা বলতে যাবো।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'বলেছি ওয়াইফ আসতে এখন কিছুকাল দেরি হবে, সেখানে আর-একটা পরীক্ষা পাস দিতে তাঁকে থেকে যেতে হচ্ছে, কাজেই সুধাংশু বাসা তুলে দেবে, এদিকে আবার মেসের খাওয়া তার সহ্য হয় না—ডিসপেপ্‌শিয়ায় ভোগে।'

'তোর তো একখানা মোটে কামরা, কি ক'রে হবে ?'

'হ্যাঁ, একখানা বটে, ওটাকেই পার্টিশন লাগিয়ে দুটো করা হয়েছে। দু-তিন মাস আমার পিসতুতো-ভাই বঙ্কিম তার স্ত্রী ও একটা বাচ্চা নিয়ে থেকে গেলো কিনা। খুবসম্ভব বঙ্কিমের ক্যানসার হয়েছে। চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছিলো।'

'তারা এখন কোথায় ?'

'চ'লে গেছে। বঙ্কিম আসামের কোন একটা চা-বাগানে চাকরি করে। খুবসম্ভব সেখানেই ফিরে গেছে। আর যাবে কোথায়। এ-রোগ তো সারবার নয়, মাঝখান থেকে এসে আমার কিছু—'

সুবিনয় থামলো।

'টাকা-পয়সা কিছু দেয়নি বুঝি ?'

'কোথা থেকে দেবে, দিয়েছিলো গোড়ার দিকে সামান্য, তারপর ডাক্তারে ওষুধে এমন খরচ হ'তে লাগলো যে এদিকে দুটো লোকের ভাতের খরচ বাচ্চার দুধের খরচ বলতে গেলে সবই প্রায় আমাকে—'

'এ-সব কথা কিন্তু তুই আমায় কিছুই বলিসনি।'

'কী আর হ'তো ব'লে। দুটো মাস আমার যা গেছে, আর্থিক তো বটেই, শারীরিক কষ্ট কি আর কম হয়েছে। আপিস বাজার, তার ওপর বঙ্কিমের জন্যে রোজ ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি, একলা হাতে সব ম্যানেজ করা কি চাট্টিখানি কথা।'

'তা তো বটেই।' সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম সত্যি এই দু-মাসে সে বেশ একটু রোগা হ'য়ে গেছে। 'যাক, চ'লে গেছে ওরা তোর দিক থেকে ভালোই হয়েছে।' আস্তে-আস্তে বললাম, 'পরের উপকার করা কি আর কারো অনিচ্ছা, কিন্তু আমরা পারি কোথায়, আমাদের মতো অবস্থার লোকের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখাই যেখানে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যি কিনা ?'

তৎক্ষণাৎ কথা বললো না সুবিনয়। রেবার ফেলে-যাওয়া মলিন রিবনটা সে দেখছিলো।

আমি হাত বাড়িয়ে শিয়রের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে জল খেলাম।

'লোকের উপকার ছেড়ে দিয়ে তুই আমার উপকার কর। বিছানাটা গুটিয়ে নে, স্যুটকেসটা গুছিয়ে রাখ, জলটা ধরুক, আমি একটা রিক্শা ডেকে নিয়ে আসছি।'

আমি ফ্যালফ্যাল ক'রে সুবিনয়ের মুখ দেখি।

'রিয়্যালি, মিথ্যে বলছি না, তুই গেলে, এক সঙ্গে আমার কাছে থাকলে আমার মস্ত উপকার হয়। কি চাকরি করি ক'টাকা মাইনে পাই তোর অজানা নেই। তিন-তিনটে বাচ্চা। এদিকে অগ্নিমূল্য হ'য়ে আছে সব জিনিসপত্তর। বাড়িভাড়া আছে, তার ওপর অসুখবিসুখে—'

যেন কি বলতে চেয়েছিলাম, সুবিনয় আমার মুখের ওপর হাত রেখে বাধা দিলে।

'চলতি কথায় আমি যদি বলি আমার পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে তুই থাকবি তো তোর আপত্তি করা অন্যায়। আমারটা খাবি ব'লে তুই সেখানে যাচ্ছিস না। কেমন, হ'লো ?'

আমার আর-কিছু বলার রইলো না। দুই হাতে চোখ ঢেকে চুপ ক'রে ভাবি। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিলো। আমি জানি, আমি জানতাম, সুবিনয় আমাকে ধনপতি নন্দীর এই অন্ধকার গহ্বর থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে আজ বদ্ধপরিকর হ'য়ে এসেছে। তাই শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো। ওর সংসারে থাকা-

খাওয়া বাবদ মাস-অন্তে কিছু টাকা হাতে তুলে দিলে আর-পাঁচটা খরচপত্রের দিক থেকে সুবিধা হবে চিন্তা ক'রে যে সুবিনয় আমাকে নিয়ে যেতে আসেনি এ-সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার চেয়ে সুবিনয়কে কে-ই বা বেশি জানতো। দূর-সম্পর্কিত রুগ্ন পিসতুতো-ভাই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই যে দু-মাস তার বাসায় থেকে খেয়ে চিকিৎসা করিয়ে গেলো, কই একদিনও তো সুবিনয়ের মুখ দিয়ে সে-কথা বেরোয়নি। আসলে এই নির্জনবাস আশ্রয় ক'রে রেবার চিন্তায় রুগ্ন হ'য়ে-হ'য়ে আমি আয়ুক্ষয় করছি, বন্ধু তো বটেই, আমার পরমাত্মীয় সুবিনয়ের তা সহ্য হচ্ছিলো না। আমি জানি, আমি জানতাম, এই আস্তানার মোহ না ছাড়লে গোবেচারা নিরীহ সুবিনয় দরকার হ'লে নিষ্ঠুর হবে, বলপ্রয়োগ করবে আমাকে এখান থেকে নড়াতে। কিন্তু তা না ক'রে আজ সে অন্য পন্থা অবলম্বন করলো।

'তিনটে লোকের সঙ্গে একটা লোকের খাওয়া যেমন ক'রে হোক চ'লে যায়, বিশেষ গায়ে লাগে না। আমি ঠিক করেছি, তুই যদি যাস তোর প্রথম মাসের টাকাটা দিয়ে তোর বউদির একটা চশমা কিনে ফেলবো। কবে চোখ দেখানো হয়ে আছে কিন্তু টাকার অভাবে আজ পর্যন্ত ওটা কেনা হচ্ছে না, কিছুতেই ম্যানেজ করা যাচ্ছে না।'

'থাক, অত কথায় কাজ নেই।' রুষ্ট হ'তে গিয়েও হেসে উঠলাম। 'পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে তোর বাসায় থাকবো। কিন্তু মনে রেখো ব্রাদার, আমিও গরিব কেরানী। নিয়মমতো যদি টাকা-পয়সা দিতে না পারি, এক-আধ মাস আটকে যায়, বউদি যেন শেষ পর্যন্ত আমায় না আবার উপোস রাখতে আরম্ভ করেন।'

সুবিনয়ও হাসলো।

'হুঁ, উপোস ঠিক রাখবে না। চালাক মেয়ে। দেনার কথা মনে করিয়ে দিতে থালায় ভাতের সঙ্গে এক টুকরো কয়লা দেবে।'

আমি শব্দ ক'রে হেসে উঠলাম।

সুবিনয় বললো, 'চল, আর দেরি ক'রে লাভ নেই, বৃষ্টিটা ধরলো বুঝি এবার।'

দর্জিপাড়ায় এক গলির ভিতর সুবিনয়ের বাসা। তা বাসা যত ছোটো হোক আর সাড়ে তিন হাত ও সাড়ে তিন হাত বন্দোবস্ত রেখে একটা টিনের পার্টিশন লাগিয়ে দুটো কামরা তৈরি করার চেষ্টা করতে গিয়ে সুবিনয় ঘরখানাকে যতই শ্বাসরোধী ও অন্ধকার ক'রে তুলুক আমার তো মনে হয় ওখানে উঠে এক সন্ধ্যার মধ্যে শরীর মন ঝরঝরে হ'য়ে গেলো।

সন্ধ্যার পরেও বৃষ্টি পড়ছিলো।

এক ফাঁকে গিয়ে সুবিনয় বাজার ক'রে নিয়ে আসে।

আমি ভাত খাবো শুনে সুবিনয়ের বাজার করার প্রয়োজন হয়। বুঝলাম। ওরা ধ'রে রেখেছিলো শরীর খারাপ আমার, রাত্রে সাগু আর রুটি খাবো।

অরুণা বললো, 'না হ'লে আমরা রাত্রে চা-মুড়ি দিয়ে কাজ সারতাম।' কথা শেষ ক'রে বউদি যখন সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো সুবিনয় তখন আমার সামনেই স্ত্রীকে ধমক দিলো। 'এত কথা বলতে তোমায় কে ডেকেছে। যদি চা হ'য়ে থাকে চা ক'রে নিয়ে এসো আগে।'

সুবিনয় রুষ্টভাবে কথাগুলি বলছিলো ব'লে তার হাতে একটা চাপ দিলাম। হাত সরিয়ে নিয়ে সুবিনয় বললো, 'না, না, মেয়েদের বেশি কথা বলতে দেখলে আমার গা জ্ব'লে যায়। তুই জানিস না।'

আমার চোখে বন্ধুকে হঠাৎ অন্যরকম ঠেকলো। কিন্তু, তখনই চিন্তা ক'রে দেখলাম, না, আমারই ভুল। ইতিপূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে সুবিনয়কে দেখলেও রান্নাবান্না কি খাওয়া পরা নিয়ে দু-জনের আলোচনা আর শুনিনি। আগে এত কাছাকাছি আসিনি এদের আমি, অন্তঃপুরে।

'যাও জল ফুটেছে। চট্ ক'রে চা নিয়ে এসো। তোমার চায়ে কি একটু আদা দেবে হে সুধাংশু?' মন্থরভাবে সুবিনয় আমাকে প্রশ্ন করলো। আমি মাথা নাড়লাম।

অরুণা আমাদের সামনে থেকে স'রে যাওয়ার পর সুবিনয় বললো, 'স্ত্রীকে চাপে রাখতে হয়। আমি স্ত্রী-শাসনের পক্ষপাতী।'

আমি কথা বললাম না।

তাকিয়ে দেখছিলাম নতুন জায়গা। আমি পায়খানা সেরে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার বাণ্ডিল খোলা হয়েছে। সুবিনয় কিছুই করছিলো না। কেবল দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারক করছিলো। সুবিনয়ের বড়ো মেয়েটা বছর সাত-আট বয়েস, মাকে সাহায্য করছিলো। আমার লাল সুজনি বিছানো হ'লো। ময়লা বালিশ। বস্তুত বাদলার জন্যে ধোয়ানো যাচ্ছিলো না। তা ছাড়া ওয়াড়টা অনেকদিন থেকেই ময়লা হ'য়ে ছিলো। অরুণা যখন সুজনির ওপর আমার বালিশ জোড়া বিছিয়ে পরে বালিশ দুটো আবার সরিয়ে নিচ্ছিলো সুবিনয় তখন আচমকা ধমক দিয়ে উঠলো।

'আবার সরাচ্ছো কেন?'

'ওয়াড় দুটো খুলে ফেলবো।'

আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে গিয়ে একবারও অরুণা স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিলো না। রক্তাভ গাল।

পর-পর দু-তিনটে ধমক খেয়ে অত্যন্ত অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে আমি

চোখ ফিরিয়ে দরজার বাইরে প্যাসেজের একটা বাল্‌বের অন্তিমদশায় চ'লে যাওয়া ধুকধুকে লালচে রেখা দুটো মনোযোগ দিয়ে দেখি।

'একটা কথা জিগ্যেস ক'রে তারপর কাজ করবে। ওয়াড যে খুলছো এখন, বালিশে পরাবে কি ? এতকাল ছিলো, আজ রাতটা থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো না।'

অরুণা যত না লজ্জা পেলো আমি লজ্জিত হলাম ঢের বেশি।

'আপনি ওটা আজ খুলবেন না।' বলতে অরুণা এই সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকায়।

এবার লক্ষ্য করলাম রেবার চেয়ে সুন্দরী না হ'লেও অরুণা মন্দ-না। মন্দ-না বললে ছোটো ক'রে বলা হয়। হয়তো বেশি সুন্দরী। সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার স্ত্রীলোক বলা যায়। শরীরে, চলাফেরার, কথায়। বলতে কি অরুণা ম্যাট্রিকও পাস করতে পারেনি, যদি না আগে কোনোদিন সুবিনয় আমাকে জানিয়ে রাখতো আজ আমি ভাবতাম এই মেয়ে ডবল এম. এ। এত কাছাকাছি হ'য়ে আমি কোনোদিন মুখ দেখিনি। ভাবছিলাম রাগারাগি হবে। পুনঃপুনঃ আঘাত করার ফলে চোখে জল আসবে। কিন্তু তা এলো না।

অরুণা মুখ তুলে আশ্চর্য শান্তভাবে হাসলো। 'স্ত্রীর ওপর উঠতে-বসতে রাগারাগি করলে আজকাল স্ত্রীরা কি করে একবার ওঁকে ব'লে দিন তো ঠাকুরপো।'

'হ্যাঁ, আত্মহত্যা করে, পালিয়ে যায়—কোর্টে যায় মামলা করতে ডাইভোর্সের। তুই বুঝিয়ে ব'লে দে না সুধাংশু। আমার কথায় তো এর বিশ্বাস নেই।'

আমি একদিকের দেয়ালে চোখ রাখলাম। পরে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম এক কথায় স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে সুবিনয় নীরব নতনেত্র হ'য়ে তার কাজের তদারক করছিলো। 'পারিবারিক জীবনে তুই নিষ্ঠুর।' কেন জানি যতবার রূঢ়ভাবে স্ত্রীকে আদেশ-প্রত্যাদেশ করছিলো বার-বার সুবিনয়ের চোখে চোখ পড়তে আমার গলা বড়ো ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো, 'সংযত স্থিরবুদ্ধির মেয়ে বউদি, তা না হলে, তোকে ঘোল খাইয়ে ছাড়তো।'

কিন্তু বললাম না।

মূর্খ রেবা আমার সেই মুখ হয়তো বাকি জীবনের জন্যে বন্ধ ক'রে গেছে। ভেবে ছোট্টো একটা নিশ্বাস ফেললাম।

রান্নাবান্না হ'লো। খাওয়া-দাওয়া শেষ।

বৃষ্টিটা আবার চেপে এসেছিলো।

এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, হ্যাঁ, বিশেষ ক'রে আমার সঙ্গে থেকে 'কাকু' 'কাকু'

করে বড়ো আর মেজো ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সুবিনয়ের বাসাটা হঠাৎ নীরব হয়েছিলো। বৃষ্টিতে আবার এখন মুখর হ'য়ে উঠলো।

নতুন লোক আসাতে খাওয়ার পাট চুকবার পরও অতিরিক্ত দুটো বাসনমাজা এবং এটা-ওটা ধোয়ামোছা সারতে বেশ রাত হয়ে গেলো।

আমার বিছানার ওপর শুয়ে এতক্ষণ পর মোটামুটি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরে যেন সুবিনয় আবার সুবিনয় হ'য়ে গেলো। অর্থাৎ আগের মতো হালকা মনে রেবা-সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিয়ে চললো। 'থাক এখন এখানে ক'মাস। চিঠিপত্র যখন দেয় না তুইও দিবি না। কোথায় আছিস ঠিকানা জানাবি না। আসবে না মানে? আলবৎ আসবে। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। এক-আধটা বাচ্চা পেটে আসুক। বিদ্যার দাপট, নিজে চাকরি ক'রে তোর মতন কি কিছু বেশি রোজগার করতে পারার ভ্যানিটি চুরমার হ'য়ে যাবে। বুঝলি, ও-সব থাকে না। আফ্‌টার অল্‌ শী ইজ এ উয়োম্যান। তার যা ধর্ম তাই পালন করতে এসেছে সে পৃথিবীতে। যতক্ষণ না পাচ্ছে, যতক্ষণে না সেই সাধ পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ তুমি নিজের স্ত্রীর ক্যারেক্টার বিচার করতে পারছো না।'

আমি কথা বলছি না।

বৃষ্টিটা আবার থেমেছে। শেষ বর্ষার বৃষ্টি যায় আসে, আসে যায়।

যেন কোথায় একটু টিনের ছাদ ছিলো সুবিনয়ের বাসায়। বর্ষণ থামতে কোথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল প'ড়ে একটা ঢপঢপ আওয়াজ হচ্ছিলো।

'বুঝলি, বিয়েটা কিছু না। ওটা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে একটা বন্ধনই নয়। পরিণয়ের আসল সুতো হ'লো সন্তান। একটা বেবি হোক তখন দেখবি।'

এবার সুবিনয় আর আস্তে কথা বলছিলো না। আমার মনে হ'লো যেন ভিতরে চৌবাচ্চার ধারে অরুণা ধোয়া-মাজার কাজ করছিলো। কথাগুলি সে-ও শুনছে কিনা চিন্তা করছিলাম।

'চুপ করে আছিস কেন?' হেসে সুবিনয় আমার পেটে আঙুলের গুঁতো দিলো। বললাম, শুনছি, তুই ব'লে যা।'

'সুতরাং টেক্‌ অ্যানাদার চান্স্‌। আবার আসুক। এর আগে চান্স্‌ নিয়েছিলি?'

আমার কান লাল হ'য়ে উঠলো। কেননা, সুবিনয় আরো জোরে কথাটা বললো। যেন মনে হ'লো বাসন ধোয়া সেরে অরুণা ঘরে ফিরছে। পার্টিশনের ওপারে চুড়ির শব্দটা কানে লাগলো।

'হাঁ-ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিস কি, উত্তর দে।'

আমার গলা শুকিয়ে যায়। যেন তিন দিন পর ভাত পথ্য ক'রে হঠাৎ

অসময়ে এমন পিপাসা পেলো। চেপে গেলাম। কেননা, তখন যদি আমি হেসেও জলের কথা বলতাম সুবিনয় অট্টহাস্য ক'রে উঠতো। আজ আপনাদের কাছে বলছি, সেদিন, তখন আমাদের সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যজীবনের সব কথা সুবিনয়ের কাছে প্রকাশ করার পরও একটা জিনিস গোপন করলাম। নিষ্ঠুরা রেবা মা হবার সুযোগ প্রতিবার কৌশলে এড়িয়ে গেছে যদি আমি বন্ধুকে বলতাম, ঘরের সিলিং কাঁপিয়ে সে হেসে উঠতো নয়তো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমার পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে বলতো, 'ফুল—তুই একটা গর্দভ। যা এখন ভেরেণ্ডা ভাজগে—' ইত্যাদি।

আমি ছু-বার ঘাড় নাড়লাম। অর্থাৎ আগেও চান্স্ নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে কোনোদিন রেবা এলে ওকে মাতৃত্বের গৌরব দিতে চেষ্টা করবো। আমার বুকের ভিতর হুহু করছিলো।

যথার্থ উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুবিনয় গলা খাটো করলো এবার। মুখ দিয়ে একটা গুজ্‌গুজ্ শব্দ বের ক'রে হেসে বললো, 'আমি ওভারলোডেড হ'য়ে গেছি যদিও। তিনটে। আর-একটি আসছে। খরচটা বাড়ছে সত্যি, কিন্তু একজায়গায় স্যাটিসফ্যাকশন আছে।'

সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকাই।

'তা তো বটেই, এতগুলি সন্তানের বাপ হয়েছিস।'

'কেবল কি তাই! তিনিও ভালো হাতে আটকা পড়েছেন। একবেলার জন্যে আর বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই।'

'কেন? প্রশ্নটা ঠিক বুদ্ধিমানের মতো হ'লো না টের পেলাম যদিও।

সুবিনয় বললো, 'কে এমন বড়লোক আত্মীয় আছে যে, এই দুর্দিনের বাজারে এতগুলি বাচ্চা সমেত গিয়ে উঠলে ভালো মনে তিন বেলা খেতে দেবে। কাকার পরিবার দেখতে বছরের পর বছর তোর স্ত্রী বেনারস প'ড়ে আছে। বাচ্চা-কাচ্চা হবার আগে আমার উনিও যেতেন শেওড়াফুলি এক মামীর সংসার দেখতে। সাত-আট দিন সেখানে কাটিয়ে, আসতো অরুণা। এখন?' একটু থেমে সুবিনয় পরে হাসলো। 'যদি-বা কালেভদ্রে কোথাও থেকে নিমন্ত্রণ আসে, এখন যাওয়া হয় না আর-এক কারণে।' সুবিনয় টাকা বাজাবার মতই দুই আঙুলের বাড়ি মেরে বললো, 'এত পয়সা পাবেন কোথায় যে, আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে শ্রীমতী নায়েব করতে যাবেন। ট্রাম-বাসের খরচ আছে না? আমি বাবা ব্রেক ব'লে দিয়েছি, যাও, যেতে পারো, কিন্তু তারপর আর তিন দিন বাজার করা হবে না। কথাটি মনে রেখে বাড়ি থেকে পা বাড়িয়ো।' কথা শেষ ক'রে সুবিনয় টেনে-টেনে হাসলো।

মৃদু হেসে বললাম, 'শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন বউদি। একদিনের জন্যে

আর চোখের আড়াল হবার উপায় নেই।'

যেন আত্মতৃপ্তিতে একটু-সময় চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলো সুবিনয়। তারপর ঘাড় তুলে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'তুই দেখে বুঝতে পারলি যে অরুণা আবার কন্‌সিভ করেছে ?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'তা আর কি ক'রে বুঝবি। অভিজ্ঞতা নেই যখন। রংটা আরো ফর্সা হয়েছে লক্ষ্য করেছিস ? এ-সময় মেয়েরা দেখতে বেশি সুন্দর হয়। দাঁড়া, আর-একবার ডাকছি, আর-একবার ছাখ।'

প্রচণ্ড শব্দ করে বৃষ্টি নামলো।

কিন্তু সেই শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে চড়া সুরে সুবিনয় হাঁকলো, 'অরুণা!'

'যাই।' ঠাণ্ডা মিষ্টি গলা পার্টিশনের ওপার থেকে ভেসে এলো।

'তোমার কি আর ওদিকে সারা হবে না সারারাত।' নীরস কণ্ঠস্বর এপারে সুবিনয়ের। 'সেই কখন খাওয়া হয়েছে, চৌবাচ্চার কাজ সারা হ'লো ?'

'হয়েছে।'

'এখন কি হচ্ছে। খুটখাট শব্দ ?'

'বাচ্চাদের মশারি খাটাচ্ছি। দড়ির একটা পেরেক উঠে গেছে। বাড়ি মেরে বসাচ্ছি।'

'কী অদ্ভুত মানুষ, ওটা তো বিকেলেই বলা উচিত ছিলো আমাকে। রাত বারোটার সময় এখন—'

ওপারে কথা শোনা গেলো না।

'মশারি খাটিয়ে এখানে একবার এসো।'

বিরক্তিটা দূর হ'তে সুবিনয়ের সময় লাগলো একটু।

ওপাশে আর খটখট আওয়াজটা শুনলাম না।

'মনে হয় সারাক্ষণই তুই খিটিমিটি করিস বউ-এর সঙ্গে।' আস্তে বললাম, 'এখন টের পাচ্ছি।

'তাতে কি আমার সংসার ফুটিফাটা হ'য়ে গেছে! এখানে এসে এই এক সন্ধ্যের মধ্যে ফাটল কোথাও চোখে পড়লো নাকি তোর ?'

'না, না তা হবে কেন।' কি ইঙ্গিত করতে চাইছে বুঝতে পেরে লজ্জায় ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'তুই কেবল তাড়াহুড়োই করিস, কোনো কাজে সাহায্য করিস না। বউদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব ধীরেসুস্থে করছে ব'লেই দিনকে-দিন এমন ফুলবাগানের মতো সুন্দর হচ্ছে সংসারটি তোমার। বাচ্চাগুলো ভালো থাকুক। দেখে আমার এত ভালো লাগছিলো তখন থেকে।' কথাগুলি বেশ জোরে-জোরে বললাম।

'না, তেমন ক'রে আর সাজাতে পারছি কই।' আত্মতৃপ্তিতে সুবিনয়ের চোখ আবার আধবোজা হ'য়ে এলো। 'ওই শালার টাকা-পয়সার অভাবটাই মাঝে-মাঝে মাথা গরম ক'রে দেয়। না হ'লে—না হ'লে—' চোখ দুটো সম্পূর্ণ বুজে যায় সুবিনয়ের এবং সে-অবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে যেন কি একটু ভেবে পরে বলে, 'না হ'লে প্রথম থেকে—ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং অব যাকে বলে দাম্পত্য-জীবন—কন্‌জুগ্যাল লাইফ, এ-পর্যন্ত মন্দ কাটিয়ে আসিনি আমরা। আমার তো মনে হয় আমি এবং সে—দু-জনেই সুখী।'

স্বামীর গালি খেয়েও বউদির সন্ধ্যা থেকে হাসি-হাসি ক'রে রাখা মুখখানা আমাকে এখন তাই মনে করিয়ে দিলে।

যেন ঈষৎ অপদস্থ হ'য়ে চুপ ক'রে গেলাম।

মিটিমিটি হেসে সুবিনয় বললো, 'লিভার সতেজ রাখতে নিত্য একটু তেতো খেতে হয়, জলে কোনো জার্ম না থাকে তাই ওতে একটু ফিটকিরি মেশাতে হয়। সংসারের ডিসিপ্লিন রাখতে তাই বকাঝকারও দরকার বুঝলি? গিন্নীকে যে-পুরুষ শাসন করে না আমি সেগুলিকে মেষ বলি। ওদের কপালে দুঃখ থাকে। হ্যাঁ, আদর করতে হবে বৈকি, কিন্তু তার একটা টাইম আছে, সেটা তিনি যখন গৃহস্থালিতে লাগেন তখন না। যখন তিনি অবসর, যখন শয্যাসঙ্গিনী হন তখন। তুই ম্যারেড্ ম্যান্ তোকে আর বোঝাবো কি। কিন্তু বহুপুরুষ, মানে বিবাহিত লোক তা বোঝে না—অর্থাৎ জানে না সংসার করতে হ'লে কিভাবে চলতে হয়। ফলে ভোগে।'

একটু চুপ থেকে সুবিনয় বললো, 'বলছিলাম বেতনের টাকা ফুরোলে মাসের শেষে মাথা গরম হয়, অশান্তি পাই। কিন্তু যখন চারদিকে তাকাই তখন ভাবি ও কিছু না, মন-গড়া দুঃখ। টাকার কাঁড়ির ওপর ব'সে থেকেও কত শ্রীমানের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায়, কি বলিস।'

আমি সুবিনয়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়লাম।

'কাজেই, ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিই আর পটি-লাগানো জুতো পায়ে থাকুক, আমি সুখী; আমার সুখ দেখে অনেক টাকাওয়ালা ঈর্ষা করেন। তুই চুপ করে আছিস সুধাংশু।'

বললাম, 'এক শ' বার হাজার বার। কই, বউদিকে ডাক না। আমি একটু জল খাবো তৃষ্ণা পেয়েছে।'

'কি হ'লো, শুনছো?' এ-ঘর থেকে সুবিনয় আবার হাঁকলো, 'তোমার মশারি খাটানো হ'লো? সুধাংশু জল খাবে।'

ওধারে কথা শোনা গেলো না।

পুরো একটা মিনিট কাটলো।

'বেশ মজা তো!' অসহিষ্ণু হ'য়ে সুবিনয় আমার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি কোথায়, ঘরে ?'

'না, বারান্দায়।' আর-একটু ভিতর থেকে এবার উত্তর এলো, 'বাবলু পেণ্টুলনে তখন কাদা ভরিয়েছে, ধুয়ে দিচ্ছি, তা যেমন বাদলা, কাল শুকোবে কি।'

আমার চোখে চোখ রেখে সুবিনয় বললো, 'মেজো ছেলে আমার। তখন তো তুই দেখলি।'

ঘাড় নাড়লাম।

সুবিনয় আমার দিকে না তাকিয়ে আবার পার্টিশনের দিকে মুখ ফেরালো। 'তা বাবলুর পেণ্টুলনে তো সেই কখন বিকেলে কাদা লেগেছিল। এতসব জিনিসপত্র ধোয়াধুয়ি ক'রে এলে এক ঘণ্টা চৌবাচ্চার পাশে ব'সে। তখন ওটার কথা মনে ছিলো না, বড়ো-যে মশারি খাটিয়ে শুতে এসে এখন ছেলের পেণ্টুলন নিয়ে ব'সে গেছো ?'

উত্তর নেই, কেবল ঝুপ-ঝুপ শব্দ শোনা গেলো। আর বন্ধুপত্নীর হাতের স্বল্প চুড়ির মৃদু রিন্‌রিন্‌। পেণ্টুলন কাচা হচ্ছিলো।

আরো-একটা মিনিট কাটতে দিয়ে সুবিনয় আবার হাঁকে, 'তোমার হ'লো ?'

এবারও কথার উত্তর না দিয়ে বউদি কি যেন একটা জোরে আছড়ায়। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। তাই ওধারের সিমেণ্টের ওপর চটাস্‌-চটাস্‌ আওয়াজ এধারে সিমেণ্ট কাঁপিয়ে তুললো। যেন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে সুবিনয় ছুটে যাচ্ছিলো। আমি হাত চেপে ধরলাম। 'এত অস্থির কেন। আসবে এখুনি একটু পেণ্টুলন ধুতে আর কত সময় লাগবে।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ওপাশের শব্দ লক্ষ্য ক'রে সুবিনয় চিৎকার ক'রে বললো, 'আমি যদি আসি তো বাল্‌তির মধ্যে তোমার মুখ চেপে ধরবো. ডাকছি, বড়ো-যে সাড়া দিচ্ছো না ?'

'ভালোই হয় তবে, বিষ খেয়ে কি পালিয়ে গিয়ে তোমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার আর দরকার পড়বে না আমার, বাল্‌তির সাবান-গোলা-জলের ভেতর একটু বেশি সময় মুখটা চেপে ধ'রে রেখো, অতি সহজে কাজ সারা হবে।'

যেমন আশা করছিলাম। ঠাণ্ডা মিঠে গলায় অরুণা কথা বলে আর হাসে আর কাপড় কাচে ঝুপ-ঝুপ। না, যেন কাচা হ'য়ে গেছে, এই বেলা বাল্‌তির জলে সেটা ধোয়া হচ্ছিলো।

'তা আজ সেটি পারবে না, বাড়িতে ঠাকুরপো আছেন। আমায় খুন করছো টের পেলে পুলিশ ডাকবেন।' যেন বারান্দা ছেড়ে অরুণা এখন ঘরে এসে ঢুকলো।

স্ত্রীর উক্তি শুনে সুবিনয় আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিলো। কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য না ক'রে পার্টিশনের দিকে মুখ রেখে বললাম, ঠিক বলেছেন বউদি। আমি এসেছি এখন সুবিনয় আর কিছু করতে পারবে না।

'দেখুন, দেখে যান আপনার বন্ধু কেমন ক্রুয়েল। রাতদিন স্ত্রীর ওপর রাগা-রাগি আর বকাবকি। আপনি কালই রেবার কাছে চিঠি লিখে দিন।'

অট্টহাস্য ক'রে এ-ঘরের দেয়াল কাঁপিয়ে তুললো সুবিনয়। 'তাই দে, আজ রাতেই চিঠিটা লিখে রাখ সুধাংশু। আর লিখে দে, তোর বউ যখন আবার কলকাতায় আসবেন বেড়াতে-বেড়াতে একবার যেন দয়া ক'রে তোর বন্ধু সুবিনয়-বাবুর এত নম্বর মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে উঁকি দিয়ে দেখে যান। স্ত্রীলোক। এক-নজর দেখলেই বুঝবেন বিয়ের পরদিন থেকে যে-চারাগাছটাকে তার স্বামী উঠতে বসতে গামলা আর বালতির জলে চুবিয়ে মারছে ফল ফুল কুঁড়ি পাতায় বর্ষার ডুমুর গাছটি হ'য়ে উঠেছে।' কথা শেষ ক'রে বন্ধু টেনে-টেনে হাসছিলো।

নিজের সংসারের সুখ বর্ণনা তো বটেই তার সঙ্গে আমার লক্ষ্মীছাড়া সংসারের দিকে একটুখানি উপেক্ষার ইঙ্গিত ছিলো টের পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

বন্ধুপত্নী এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে এলো।

অরুণা হাসছিলো। তার কান বেয়ে চুল বেয়ে জল পড়ছিলো। বৃষ্টিতে বেশ ভেজা হয়েছে মাথা দেখে মনে হ'লো।

নোলকের মতো নাকের ডগায় একটা জলের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জলটা মুছে ফেলুন।'

অরুণা বাঁ হাত দিয়ে নাকের জল মুছে জলের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে নীরবে হাসলো। হাসির সঙ্গে একটি মেয়ে-মন ভীষণভাবে আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেলো।

গ্লাসটা আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এবং আমার ওয়াড়হীন বালিশ দুটোর ওপর ওর সবে-পাট-ভাঙা একখানা ধোয়া ধবধবে শাড়ি বিছিয়ে দিয়ে বললো, 'আর-কিছু দরকার হবে ঠাকুরপোর ?'

বললাম, 'না। ভীষণ কষ্ট দিলুম হঠাৎ এসে উঠে। এত রাত হ'য়ে গেলো কাজ শেষ হ'তে আপনার।'

'না, মোটেই না, একবার জিগ্যেস ক'রে দেখুন। আপনি না এলেও রোজ

বারোটা বাজে। একলা হাত আমি সব দিক সামলাতে পারি না।'

'ও, তুমি তা হ'লে বলছো আমি আপিস থেকে খেটেখুটে এসে তোমার ছেলেমেয়ের পেণ্টুলন সাফ করি, বেশ মজা।'

সুবিনয় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আবদার ছাখ সুধাংশু। এমন দুঃখের জীবন হবে জানতে পারলে কোন শালা বিয়ে করতো, তুই বল।'

'বেশ তো, রেবাদি আসুন একবার। দেখে যান কোন কাজটা অপূর্ণ থাকে শেষ পর্যন্ত। বড়ো-যে অষ্টপ্রহর হৈ-রৈ করছো।' ব'লে অরুণা আমার দিকে তাকালো।

'রেবার আসবার দরকার কি, সুধাংশু এখানে উপস্থিত আছে। সে নিজে দেখুক। কতটুকুন-বা সংসার, কী বা থাকতে পারে কাজ যে একেবারে ওই নিয়ে মত্ত হ'য়ে আছো সারাক্ষণ। একটা লোক একলা হাতে একটা বড়ো দেশ ম্যানেজ ক'রে, রাজ্য চালায়।'

আমি সুবিনয়ের যুক্তি শুনলাম না। একটু গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'ছেলেপুলের সংসারে কাজের ঝক্কি অনেক। মেয়েদের দারুণ কষ্ট হয়।'

'অ্যাঁ, তুই কত কষ্ট বুঝেছিস। যেন কত তোর অভিজ্ঞতা। আজ অবধি তো রেবা তোকে—'

কথাটা সুবিনয় শেষ করলো না। হোহো করে হাসলো। আমার কান লাল হ'য়ে উঠলো। বুঝতে পারার মতো বুদ্ধিমতী অরুণা। তার দুই কানও লাল হ'য়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।

আমার চোখে ধরা পড়বে ব'লে ভয় পেয়ে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে অরুণা হেসে উঠে তাড়াতাড়ি বললো, 'যারা রাতদিন স্ত্রীকে বকাবকি করে তারা কি প্রকৃতির পুরুষ জানেন নিশ্চয় ঠাকুরপো?'

অল্প হেসে বললাম, 'স্বার্থপর!'

অরুণা আড়চোখে সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে-সব পুরুষকে মেয়েরা ঘৃণা করে।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো প্রবল হেসে ঘৃণাটা উড়িয়ে দিয়ে সুবিনয় স্ত্রীর শরীরের ওপর চোখ রেখে বললো, 'কতটা ঘৃণা করো তার প্রমাণ দেখাতেই তো এসেছো মাঝ রাতে দু-জন পুরুষের সামনে। তা সুধাংশু পাকা ছেলে। আমি বলার আগেই ও টের পেয়েছে যে আবার তুমি—' হিহি ক'রে হাসলো সুবিনয়। 'মেয়েরা পুরুষদের ঘৃণা করে!'

হাসতে-হাসতে বার-বার বলছিলো সে। অরুণা ছুটে পালালো।

হ্যাঁ, সেই রাত্রেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিলো। যার ওপর আমার এ-গল্প দাঁড়িয়ে। ওরা চ'লে যেতে আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে বৃষ্টি খরতর হ'য়ে উঠছিলো। নতুন জায়গা, কাজেই শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম এলো না। জেগে চুপ ক'রে বৃষ্টির শব্দ শুনলাম। আর চিন্তা করলাম সুবিনয়ের কথা। বেচারা তখন এতটা প্রগল্‌ভ এতটা অসতর্ক হয়ে উঠেছিলো ব'লে দোষ দিতে পারিনি তাকে। এতকাল আমি আমার হারানো-স্ত্রীর গল্প ব'লে-ব'লে আর উপদেশ চেয়ে-চেয়ে বন্ধুকে হয়রান ক'রে তুলেছিলাম। আজ আমি তার অন্তঃপুরে এসে পা বাড়াতে সে তার একান্তভাবে পাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে রাগারাগি অথবা হাসাহাসি ক'রে আমার কাছে নিজের দাম্পত্য-জীবনের অগাধ সুখ প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে স্বাভাবিক।

না করাটাই সুবিনয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক ঠেকতো। শুয়ে-শুয়ে সুবিনয়ের আস্ফালন ও তার স্ত্রীর বার-বার চমকে উঠে পরমুহূর্তে স্বাভাবিক হেসে আক্রমণ প্রতিরোধ করার সুন্দর ছবিটা চিন্তা করতে লাগলুম। আপনাদের কাছে অস্বীকার করবো না, কান পেতে রইলাম পার্টিশনের দিকে।

এক-আধটা কথা শোনা যেতে পারে আর সেই কৌতূহল নিয়ে আমি যদি কান পেতে থাকি তো আমার সেই রুচিকে আপনারা ক্ষমা করবেন না জানি। কিন্তু আমার তখন মনের অবস্থা কি ছিলো ? খুব স্বাভাবিক যে, আমি জেগে থেকে রেবার চরিত্রের সঙ্গে অরুণাকে মিলিয়ে দেখবো দুই নারীর রূপ। রেবা তেমন ক'রে কোনোদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেনি। পাশের কামরায় বন্ধুপত্নী সুধাকণ্ঠী অরুণা, হ্যাঁ, বলতে গেলে রিক্‌শা থেকে নামার পর সেই বিকেল থেকে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো। আমি খাওয়ার পরে একবার ছাড়া অরুণার হাতে আগে আরো পাঁচ-সাত গ্লাস জল চেয়ে খেয়েছি। সুবিনয় বাজারে গেছে পর অরুণার সঙ্গে কত কোটি কথা বলেছি তার হিসাব দিতে পারবো না।

রাত্রে অন্ধকারে বিছানায় ঢোকার পরও যদি সুবিনয় স্ত্রীকে ধমক দেয় তো তার উত্তরে অরুণা না-জানি কেমন ক'রে কথা বলবে শুনতে ছেলেমানুষের মতো প্রায় পাগলের মতো কান খাড়া রেখেছিলাম। কিন্তু বাইরে প্রবল প্রখর বারিপাতের শব্দ আর এই ছোট্টো বাসায় পাশের কামরায় সুবিনয়ের সংসারের ঘুমন্ত ছোটো-বড়ো মানুষগুলোর লম্বা-লম্বা শ্বাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিলো না। কান খাড়া রেখে বৃষ্টির শব্দকে উপেক্ষা ক'রে আমি অতঃপর ওদের দু-জনের, বন্ধু সুবিনয় ও তার স্ত্রী অরুণার শ্বাস-প্রশ্বাস বিচার করতে লাগলুম।

হয়তো সেই অবস্থায় আমার ঘুম এসেছিলো।

এক-সময় হঠাৎ চোখ মেলে টের পেলাম মাথাটা আর তুলে ধরা হাতের তেলোর ওপর রাখা নেই। বালিশে নেমে গেছে। মুখটাও পার্টিশনের দিকে ঘোরানো নেই। আমি যে-দেয়াল পিঠের দিকে রেখে শুয়েছিলাম সেই দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে এখন অন্ধকারে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে আছি। বাইরে বৃষ্টির গর্জন থেমেছে। টিনের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার টপটপ শব্দটা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু থেমে-থেমে, একটানা নয়, যেন যেখান থেকে জল পড়ছিলো সেখানে জল ক'মে এসেছে। বৃষ্টিটা তা হ'লে বেশ-কিছুক্ষণ ধরেছে অনুমান করলাম।

কিন্তু জলের শব্দ না অন্য কারণে আমি আবার কান পেতে থাকি। আমার মনে হ'লো একটা বেড়াল মিউ ক'রে উঠে আবার থেমে আছে। আমার যেন মনে হ'লো বেড়ালটা আমার নাক ও মুখের উপর তার ঈষদুষ্ণ কোমল মোলায়েম শরীরটা বার-দুই ঘ'ষে দিয়ে এইমাত্র জানলার বাইরে লাফিয়ে গেছে। শিয়রের ওপর একটা ছোট্ট জানলা এখন চোখে পড়ছে। একটা পাল্লা খোলা। এদিকে একটা জানলা আছে আগে আমার চোখে পড়েনি। গরাদের উপর এক-চিল্‌তে আলোর রেখা ধুকধুক করছে। দুই চোখ রগ্‌ড়ে আরো একটু-সময় সেদিকে তাকিয়ে তারপর অবশ্য বুঝতে কষ্ট হ'লো না, আলোর রেখা পাশের বাড়ির কোনো ফাঁক কি ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে সুবিনয়ের ঘরের জানলায় উঁকি দিয়েছে। কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম পাল্লাটা কি ক'রে খুললো। ভাদ্র মাসের পচা রাত। ঘরের ভিতর এমন গুমোট। পায়রার খুপ্‌রির মতো সুবিনয়ের এই কামরায় একলা বিছানায় শুয়ে সেইজন্যই তখন আমার আরো ঘুম আসছিলো না এবং মনে-মনে আমি একটা জানলা কামনা করেছিলাম বৈকী। ছোটো হ'লেও ওই ফাঁক দিয়ে একটু-একটু হাওয়া আসছে টের পেলাম, হাওয়ায় বৃষ্টির গন্ধ ছিলো। বেড়ালটা এই জানলা দিয়ে ঢুকেছিলো এবং সম্ভবত আমার বিছানায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিলো। আমি জেগে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে পালিয়েছে এখন বুঝতে কষ্ট হ'লো না। জানলায় হয়তো ছিটকিনি ছিলো না। হয়তো এক-আধটা দমকা বাতাস এসে থাকবে তাই একটা পাল্লা স'রে গেছে। দ্বিতীয় পাল্লাটাও হাত বাড়িয়ে খুলে দেবো কিনা চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ গরাদের সেই ফিন্‌ফিনে আলোর রেখাটা যেন একটা বড়ো আলো হ'য়ে দপ্ ক'রে আমার চোখের সামনে জ্ব'লে উঠলো। খুব চমকে উঠলাম বৈকি। তারপর হাসলাম। 'বউদি এত রাত্রে!' বিছানায় উঠে ব'সে গলা বাড়িয়ে মুখটা আমি জানলার কাছে সরিয়ে নিই। স'রে এসে গরাদের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে অরুণা দাঁড়ায়।

'আপনি ঘুমোননি?'

'না, তেমন ভালো ঘুম আসছে না।'

'নতুন জায়গা'।' অরুণা ঠোঁট টিপে হাসলো। 'আমি টের পেয়েছি, আপনি বিছানায় ছটফট করছিলেন।'

আপনাদের বলেছি এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত মোহিনী মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। থুতনি ঠোঁট নাক কপাল ভুরু ঠোঁটের পিছনে সরু সাদা দাঁতের সারি চোয়ালের ধার লম্বা পালক ঘেরা চোখের বিদ্যুৎ মধ্যরাত্রে আমাকে, হ্যাঁ, রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছিলো। আমি সময়ের অতিরিক্ত সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে রইলাম। গায়ে ব্লাউজ ছিলো না।

পরনে আধময়লা নরুন-পাড় ধুতি। শাড়িটা তখন ভিজে গেছে ব'লে ছাড়া হয়েছে বুঝতে কষ্ট হ'লো না। সুবিনয়ের কাপড় ওটা অনুমান করলাম।

হাঁ-ক'রে অরুণার চোখে চোখ রেখে, এই মেধাবী মেয়ের কাছে আমি ভীষণভাবে ধরা না প'ড়ে যাই তাই চট্‌ ক'রে বললাম, 'না, নতুন জায়গা ব'লে আমার বিশেষ তেমন অসুবিধা বোধ হয়নি। বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম এতক্ষণ, এইমাত্র তো জাগলাম। ক'টা বাজে?'

'একটা বেজে গেলো একটু আগে।' অরুণা আস্তে ডান-হাতখানা গরাদের ওপর রাখলো; সাদা কনুইটা আমার নাকের কাছে চ'লে এলো প্রায়। অরুণার নিশ্বাসপতনের শব্দ শুনলাম।

বললাম, 'এত রাতে আপনি ওখানে? ওটা বুঝি আপনাদের ভিতরের বারান্দা?'

'হ্যাঁ, বাবলুর পেণ্টুলনটা ঘরে থাকলে কাল শুকোবে না ব'লে বাইরে দড়িতে রাখলাম। হাওয়ায় যদি কিছুটা শুকোয়।'

'আপনি তা হ'লে এতক্ষণ ঘুমোননি?'

'না, ওর ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিলে তো আমার সংসার চলে না। সবাই ঘুমোলে পর এখন একটু বাইরে এলাম। ভালো লাগছে হাওয়াটা।'

'অত্যন্ত খিটখিটে সুবিনয়।'

'সারাদিন খেটেখুটে আসে। চাকর-বাকর নেই। বাইরের কাজগুলো ওর নিজের হাতে করতে হয়। রাত্রের খাওয়া শেষ হ'লো কি, এটা করবে না, ওটা এখন না, শিগগির আলো নেবাও। অর্থাৎ আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'হ্যাঁ, সারাদিন পরিশ্রম ক'রে বাড়ি এসে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়তে চায়। আমি লক্ষ্য করলাম। তাই সুবিনয়ের এত তাড়া আপনার পিছনে।' কথার শেষে একটু হাসলাম।

আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছিলো পাছে-না বাড়িতে আমি রেবাকে এটা-ওটার জন্যে বকাবকি করি কিনা অরুণা প্রশ্ন করে। আমাদের মধ্যে যে এ

ওকে ব'লে কাজ করানোর সম্পর্কই গ'ড়ে ওঠেনি সে-কথা ও জানে না তো। কাজেই ভয় হচ্ছিলো, প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধরা না পড়ি আমি গুলি-খাওয়া বাঘ।

স্ত্রীর ওপর হুকুম চালানোর আগেই ও আমাকে আমার হাত-পা জখম ক'রে দিয়ে চ'লে গেছে। সুবিনয়ের মতো সন্ধ্যাবাতি লাগতে ঘুম-পাওয়া রাত আমার চোখের আগায় দোলে না। আমি নিশাচর।

চেহারা দেখে নারী ব্যর্থ পুরুষকে চিনতে পারে কিনা ভয়ে-ভয়ে অরুণার কালো অতল-গহ্বর চোখের মধ্যে আমি আর-একবার ডুব দিলুম আর ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, সুবিনয়ের যদি আর-একটু আয়-টায় বাড়তো, একটা চাকর-রাখার, নিদেন ঠিকে-ঝি রাখার সংস্থান হ'তো।'

আমার ঝি ছিলো কিনা অরুণা প্রশ্ন করলো না। বুদ্ধিমতী প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেলো।

উঁকি দিয়ে ও আমার বিছানা দেখলো।

'ছারপোকায় কাটে ?'

'না।'

'আপনি আসবেন জেনে তক্তাপোশটায় দুপুরে খুব ক'রে গরম জল ঢেলেছি। সব মরেছে তা হ'লে।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

স্বল্প হেসে আমি বিচিত্ররূপিণী আর-এক নারীকে দেখলাম। রেবার সঙ্গে একেবারে মিল নেই। রাগী স্বার্থপর স্নেহমমতাহীন রেবা। এটি মা। স্নেহশীলা জায়া।

এদিক থেকে তো বটেই, তা ছাড়া বিয়ের পর থেকে সুবিনয় স্ত্রীর সঙ্গে আছে এক জায়গায় এক বাড়িতে আজ আট বছরের বেশি—এটা তার একান্ত বন্ধু হিসেবে আমার কাছে মামুলি হ'য়ে গেলেও আজ হঠাৎ সব-কিছু যেন চোখে নতুন ঠেকলো। সতেরো নম্বরের অমুক স্ট্রীটের বাড়ি সুবিনয়ের—কথাটা শুনে-শুনে মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো। আজ এই গাঢ় বর্ষার রাত্রে সেই ঘরে আশ্রয় নিয়ে আমি একটা ভাঙা জানলার চারখানা জং-ধরা লোহার শিকের ব্যবধান রেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো এটা আগে জানা ছিলো না।

নতুন, ভয়ংকর নতুন লাগছিলো অরুণাকে। সুসংবদ্ধ সাদা দাঁত দেখিয়ে আর-একবার ও হাসলো। শব্দ ছিলো না হাসিতে। বাঁ-হাতে একটা হারিকেন। ভিতরের চৌবাচ্চা বারান্দা কি পায়খানার জন্যে ইলেকটি ক বাতির ব্যবস্থা নেই তাই তেলের ল্যাম্প। সন্ধ্যার পর ওদিকে যেতে হয়েছিলো ব'লে আমাকে ওই

আলো দু-একবার ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ জ্বলবার পরও চিমনিটার কোথাও এক-আঁচড় কালি পড়েনি লক্ষ্য করলাম। যেমন এত কাজ-কর্ম করার পরও অরুণার হাত পা মুখ ঝকঝক করছিলো।

আলো-সমেত হাতটা কপালে তুলে অরুণা চুল সরালো। তাই চোখ দুটো আরো চিকচিক করতে লাগলো।

'ওই শুনুন, আমাদের কর্তার নাক ডাকছে।' ক্ষীণ হাসলো ও।

আমি মাথা নাড়লাম।

'ঘুমোলে সুবিনয়ের নাক ডাকে। কলেজে পড়ার সময় একবার সুবিনয়ের সঙ্গে এক-বিছানায় তাদের হোস্টেলে রাত কাটাতে হয়েছিলো ব'লে আমার জানা আছে।'

'বাবলুটার তো এখন থেকেই ঘুমোলে নাক ডাকে। আরো বড়ো হ'লে সে যে কী গর্জন করবে ভেবে এখন থেকেই আমার মাথা গরম।'

'সুবিনয়ের মতো হয়েছে ছেলে।' আমি ক্ষীণ হাসলাম।

কিন্তু গৃহিণী তাতে বিশেষ সাড়া দিলো না।

আমি বললাম, 'নাক-ডাকা-ঘুম ভালো। ঘুম গাঢ় হ'লে তবে নাক ডাকে, ঘুমটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।'

এবারও অরুণা চুপ ক'রে রইলো।

বললাম, 'সুবিনয়ের বাড়িতে সুনিদ্রা হয় দেখে বাস্তবিক আমার এমন আনন্দ হচ্ছে। আমার বন্ধু ও।' ব'লে সতর্কভাবে বন্ধুপত্নীর চোখের দিকে তাকাই। 'স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে খাটবে কি ক'রে।' কিন্তু এবারও চোখের কোনো ভাবান্তর আমি দেখতে পেলাম না। বরং আগের চেয়েও একটু বেশি গম্ভীর হ'য়ে অরুণা বললো, 'তবু তো আমার মনে হয় ওর ওজন ঠিক নেই। আর-একটু ওজন না বাড়লে চট্ ক'রে স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। চল্লিশের ধাক্কায় টিকবে না।'

সুবিনয়ের চল্লিশের কাছে বয়েস উঠেছে। আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো সে। কথাটা হয়তো তার স্ত্রীর জানা আছে ভেবে বয়স সম্পর্কে আমি কিছু বললাম না।

'এই শীতে ক'টা ক্যালসিয়াম ইনজেকশন না নিয়ে রাখলে আগামী বর্ষায় নির্ঘাত অসুখে পড়বে। কিন্তু টাকার অভাবে সেটি হচ্ছে না।'

আমি বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ শুনছিলাম।

যেন অরুণাও একটু-সময় সেই শব্দ শুনতে ঘাড় ফেরালো। তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালো।

'আমি-ই ব'লে-ক'য়ে ঘরখানাকে দু-ভাগ করিয়েছি। আত্মীয় আসে থাকবে।

যখন না থাকে ভাড়া দিয়ে দাও। অতিরিক্ত ক'টা টাকা আসবে। সেটা দিয়ে তুমি বরং শরীরটাকে আরো ভালো করতে চেষ্টা করো, একটু ওষুধপত্র দুধ ডিম খাও। তা শুনতে কি চায়। একেবারে ছেলেমানুষ।'

আমি অরুণার সঙ্গে স্বল্প হাসলাম বটে। ঈর্ষায় আমার নাভিদেশ পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছিলো। সেইজন্যেই এত কিল-চড় বকাবকি বালতির মধ্যে মুহুর্মুহু ঠেসে ধ'রে মেরে ফেলার ঘটা! এত আদর!

বললাম, 'হ্যাঁ, সেজন্যেই সুবিনয় আমাকে এখানে পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে থাকতে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এলো', ঠোঁটে একটা মোচড় দিয়ে বললাম, 'বলছিলো তখন এই টাকায়, মানে থাকা-খাওয়া বাবদ পয়লা মাসে যে টাকাটা আমি সুবিনয়ের হাতে তুলে দেবো তা দিয়ে সে আপনার চশমা কিনবে।'

'বলেছে নাকি আপনাকে এ-কথা। ছি-ছি কী মোটা বুদ্ধি লোকটার।'

ব'লে অরুণা আবার ঘাড় ফিরিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে লাগলো। ভিতরে একটুখানি উঠোনে হারিকেনের আলোয় বৃষ্টি পড়ছে দেখা যাচ্ছিলো।

যেন ঘরের ভিতর কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ ক'রে উঠলো। যেন নিশ্বাসের টানা ঘড়ঘড় শব্দ থামিয়ে সুবিনয় একবার জাগতে চেয়েছে। দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির চিরচিরে রেখাগুলি বেঁকে বারান্দায় এসে অরুণার কাপড়ের আঁচলটা ভিজিয়ে দিয়ে গেলো।

কিন্তু সে-সব কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সুবিনয়ের স্ত্রী আমার জানলার পাশে আরো ঘন হ'য়ে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা লোক! অ্যাঁ?' রিমঝিম বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অরুণা গলাটাকে মোলায়েম ক'রে তুললো। শেষটায় আপনাকে আমার চশমার টাকার অভাব হয়েছে ব'লে এখানে ধ'রে নিয়ে এলো, ছি-ছি। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

লজ্জার হাত থেকে বন্ধুপত্নীকে বাঁচাতে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'না, তাতে কি, আমরা বন্ধু। প্রয়োজনে এক-সময় ছাত্রাবস্থায় এ ওকে টাকা দিয়েও তো সাহায্য করেছি।'

যেন কি-একটু ভাবলো অরুণা।

বৃষ্টির শব্দটা আবার হঠাৎ ক'মে যায়। শিশুটি আর কাঁদে না। সুবিনয়ের নাক পূর্ববৎ স্বাভাবিকভাবে ডাকতে থাকে।

'যাকগে, সেজন্যে আমিও খুব ভাবছি না। আপনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বলেছে দুঃখ নেই। কিন্তু আমিও দেখে নেবো এ-টাকা দিয়ে আমার চশমা আসে কি ওর দুধ। আপনি সাক্ষী থাকবেন ঠাকুরপো।'

'থাকবো।' খুব কষ্টে অস্ফুট গলায় বলতে পারলাম। কেননা, আমার শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছিলো স্বামী-সোহাগিনী অরুণার সাদা কনুইটা আর-একটু বেশি ঢুকে পড়েছিলো আমার অন্ধকার ঘরে। যেন ঘরের অন্ধকারে একটা কোমল শ্বেতাভ কীলক গুঁজে দিয়ে আগের মতো প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত হ'য়ে ও নিশ্বাস ফেলতে পারলো।

'ওর বাল্যবন্ধু, কাজেই আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তার চেয়েও বড়ো আপনি। আপনার ওপর যতটা দাবি খাটে আর কারোর ওপর খাটে না। কথাটা সন্ধ্যেবেলা বলবো ভেবেছিলাম, সুযোগ পাইনি। এখন ও ঘুমিয়েছে তাই বলতে এলাম। টাকা-পয়সা সুবিধামতো যা পারেন আপনি দেবেন, তার জন্যে খুব যে একটা কড়াকড়ি নিয়ম থাকবে আমি তা চাই না। হ্যাঁ, নিয়মের মধ্যে একটা জিনিস আপনাকে মেনে চলতে হচ্ছে, দু-টাকা এক-টাকা পাঁচ দশ কুড়ি—যখনই যা দিচ্ছেন সবটাই যেন আমার হাতে দেওয়া হয়। না, ওর হাতে একটি পয়সা না, বুঝতে পাচ্ছেন?'

মাথা নাড়লাম। মনে-মনে বললাম এই জন্যেই চোখে ঘুম নেই। কিন্তু সে-কথা আর প্রকাশ করি কি ক'রে!

চুপ ক'রে রইলাম।

হারিকেন-ধরা বাঁ-হাতে আবার কপালের চুল সরালো। আমি বললাম, 'যান, এইবেলা ঘুমোন গে, আমার মনে থাকবে।'

আলস্যের একটা হাই ভেঙে অরুণা কীলকের মতো কনুইটা সোজা ক'রে অন্ধকারে আমার মুখের সামনে ঝুলিয়ে দিলে।

'বউদি বুঝি শিগ্‌গির আসছেন না?'

'না।'

যতটা সম্ভব গলা সংযত রেখে বললাম, 'সামনে তার এগ্‌জামিন।'

'বাবা, কি ক'রে যে পারে এ-সব মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে—' অরুণা বৃষ্টির দিকে চোখ ফেরালো। কিন্তু বৃষ্টি তখন নেই। কেবল টিনে জল পড়ার টপটপ শব্দ হচ্ছিলো।

আমি চুপ। আমি চুপ ছিলাম, কেননা ঈর্ষার আগুন আমার নাভিদেশ নিয়ে প'ড়ে না থেকে তখন মাথার ভিতর আগুন জ্বালিয়ে তুলছিলো। বেশি রাত্রি হওয়ার দরুন অনিদ্রায় চোখ জ্বালা করছিলো, কপালের রগ দুটো দপ্‌দপ্‌ করছিলো।

আর বাইরে সেই একঘেয়ে টপটপ-টপটপ আওয়াজ। আমার স্নায়ুর মধ্যে সেই বিশ্রী শব্দটা প্রবেশ ক'রে শরীরটাকে ভয়ংকর ক্লান্ত অবসন্ন ক'রে তুললো।

যেন আর-একটা কি কথা বলতে অরুণা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। হাতের আলোটা নড়েচড়ে ওঠে। পিছনে দড়িতে ভিজে পেণ্টুলনের ছায়াটা দোলে। কেবল ওর ডিমের মতো ঈষৎ লম্বাটে মসৃণ মুখখানা স্থির। রাত্রির মতো গভীর কালো চোখ-জোড়ায় পলক পড়ছিলো না। আমি, আমি সময়ের কিছু অতিরিক্ত সময় নিষ্পলক চোখে সন্তানসম্ভবা নারীর রূপ দেখলাম।

'যান,' তিক্ত নীরস গলায় বললাম, 'রাত হয়েছে, ঘুমোন গে। এক আধলাও আমি সুবিনয়কে দিচ্ছিনে। সব, হয়তো আমার রোজগারের পুরো টাকাটাই আপনার হাতে তুলে দেবো।'

'পাগলের মতো কথা বলছেন।' অরুণা অদ্ভুত চাপা গলায় খিলখিল ক'রে হাসলো। অন্ধকারে যে-হাতটা আমার মুখের সামনে বুকের সামনে ঝুলিয়ে রেখে-ছিলো সেটা আস্তে আন্দোলিত ক'রে বললো, 'সব আমায় দিয়ে দিলে রেবার জন্যে রাখবেন কি। পরে ও এসে আমার চুল ছিঁড়ে খাবে।'

'না, সে আর আসবে না।' কঠিন ক্রূর গলায় কথাটা কোনোরকমে ব'লে শেষ ক'রে আমি হিংস্র উন্মত্ত পশুর মতো ওর অনাবৃত সাদা বাহুটা সজোরে চেপে ধরলাম। যেন প্রতিশোধ নেবার আর-কোনো উপায় ছিলো না ব'লে আমাকে তা করতে হয়েছিলো। আমার হৃৎপিণ্ডের ঢুব্‌ঢুব্‌ আওয়াজটাই কানে বাজছিলো শুধু। আর-কোনো শব্দ ছিলো না। যেন টিনের ওপর জল পড়া থেমে গেছে তখন। ঢং-ঢং ক'রে পাশের বাড়ির দেয়াল-ঘড়িতে দুটো বাজলো। আর পার্টিশনের ওপারে নাকের ঘড়ঘড় ধ্বনি।

আশ্চর্য! সময়ের অতিরিক্ত সময় অরুণা আমার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধ'রে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেবার ন্যূনতম চেষ্টা না ক'রে ধীর ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'এ-মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে, ছি-ছি কী ছিরি হয়েছে পোশাকের, এই নিয়ে তো ও আপিস-কাছারি করছে!'

আমার বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'য়ে হাতটা নিচে গড়িয়ে পড়লো।

গিরগিটি

সস্তা টিনের ঘর হলেও বাড়িটা তার ভাল লাগে। লোকজন একরকম নেই বললেই চলে। মোটে আর-একঘর ভাড়াটে। তা-ও ঠিক পাশাপাশি ঘর না। উঠোন পার হয়ে বাঁ দিকের ভাঙা জিরজিরে, একটা দেওয়াল ঘেঁষে ডুমুর আর পেঁপে জঙ্গলের আড়াল করা নিচু একচালার একটা খুপরি নিয়ে বুড়ো মানুষটা ওধারে পড়ে আছে। ওর থাকা না-থাকা সমান কথা। সারা দিনের মধ্যে এক-আধবার যদি কাশির শব্দ কি যন্ত্রপাতি চালাবার টুংটাং আওয়াজ কানে আসে,—আসে না। ডুমুর গাছ পেঁপে জঙ্গল ভাঙা নড়বড়ে পাঁচিল সামনে নিয়ে ঐটুকুন ডেরার জং-ধরা পুরোনো টিনের দরজার আড়ালে বসে দিনরাত বুড়ো ভুবন সরকার কি করে দেখবার তিলমাত্র কৌতূহল বা ইচ্ছাও অবশ্য তার হয় না। বরং যদি কেউ এখন মায়ার ঘরে উঁকি দেয় তো দেখতে পাবে দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় আরশির সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ও নিজেকে দেখছে। দেখছে আর যেন আনন্দের আতিশয্যে মৃদু শিস দেওয়ার মতন একটা গানের সুর জিহ্বা ও ঠোঁটের মাথায় জড়িয়ে রেখে রেখে তারপর একসময় নিজের নিশ্বাসের সঙ্গে বার করে সেটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গায়ের জামায় বোতাম নেই, আঁচলটা ঢিলে হয়ে মাটিতে লুটোয়, খোঁপার বাঁধন খুলে দেওয়াতে ঘাড়ে পিঠে কোমর অবধি একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝারো গড়ন। রং খুব ফর্সা না। কিন্তু মুখখানা সুন্দর। অন্তত মায়ার নিজের কাছে নিজের ছোট্ট পাতলা কপাল আর দু'ধারে একটু বেঁকে যাওয়া না-সরু-না-মোটা ভুরু ও ঢালুর দিকে ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া নাক ও কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে মতন বা বলা যায় বাদামী রঙের চকচকে মণি দুটো অসম্ভব ভাল লাগে। হ্যাঁ, আর ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ একখানা থুতনি। নিজের কাছে তো বটেই প্রণবের কাছেও এই চোখ এই নাক এই ভুরু গাল কপাল এবং বিশেষ করে শক্ত পালিশ গোল ছোট্ট থুতনিটা যে কত প্রিয় তা মায়া এই দু'বছরে বেশ বুঝে নিয়েছে। বাপ্, আদর করতে সকলের আগে প্রণব এই থুতনি ধরে নাড়া দেবে টিপবে রগড়াবে নয়তো থুতনির ওপর নিজের নাক কি গালটা চেপে ধরে ঘষবে। খসখসে গালের ঘষায় মায়ার থুতনির ছাল উঠে যায় যেন। কিন্তু তা

কি আর কোনদিন গেছে। দু'বছর আগে কুমারী বয়সে যেমন ছিল আজও সেই থুতনি নিটোল অক্ষত হয়ে নিজের জায়গায় চুপ ক'রে বসে আছে। যেন এর ক্ষয় নেই বৃদ্ধি নেই জরা নেই। কচি পেয়ারা। তুলনাটা মনে করে মায়া হাসল। অথচ দু-দুটো বর্ষায় না জানি কত সহস্র গাছের পেয়ারা বড় হল পাকল কি পাকবার আগেই পোকা কি বাদুড়ের কামড়ে নষ্ট হয়ে নিচে ঝরে পড়ল। আনন্দের আতিশয্যে মায়া বাঁ হাতের দুটো আঙুল দিয়ে নিজের সুন্দর থুতনিটা একবার স্পর্শ করল। তারপর আরশির কাছ থেকে সরে এসে এধারের দেওয়ালের ব্রাকেটে কুঁচিয়ে রাখা খয়েরী-পাড় বুটিদার শাড়ি, আটপৌরে একটা ব্লাউজ ও শুক্‌নো তোয়ালেটা টেনে নামাল। সাবানের কেস্ ও দাঁতন নিতে ভুলল না। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে তখনি কি ও কুয়োতলায় গেল? না। এ-বাড়ির সুবিধা এই। কানে শুনতে খারাপ লাগে যে কল নেই। কিন্তু তাতে কি। দু'জন তো ওরা মানুষ। অফিসে যাবার আগে রাস্তার কল থেকে প্রণব দু'বালতি জল ধরে নিয়ে আসে। তাতেই তাদের রান্না আর খাওয়া কুলিয়ে যায়। বিকেলে এক-আধ বালতি আনতে হয়। তা-ও রোজ না। কোনো কোনো দিন। এদিকে স্নান হাত-মুখ ধোওয়া বাসনকোসন ধোওয়া কাপড় কাচাকাচি সব, সব পাতকুয়োর জলে। কত সুবিধে। সারাদিন বালতি ডুবিয়ে ডুবিয়ে যত খুশি জল টেনে তোল কেউ কিছু বলবার নেই। তা ছাড়া ঘড়িধরা সময় নিয়ে কলে জল এলো কি চলে যাচ্ছে বলে যে তাড়াহুড়ো ক'রে কাজ সারতে হয় না এটাই মায়ার সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রচুর সময় নিয়ে আলসেমির নৌকোয় গা ভাসিয়ে দিয়ে এক-এক সময় এক-একটা কাজে হাত লাগালেই হল। আর বড় কথা ভিড় বলতে কিছু নেই এখানে। মায়া ছাড়া আর কারোর কুয়োতলায় কাজ আছে বলেও মনে হয় না। প্রণব সেই সাতসকালে দু'বালতি জল মাথায় ঢেলে খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়। ফেরে বিকেল পাঁচটায়। আর কে? ওপাশের ঘরের বুড়ো? লোকটাকে মায়া কোনোদিন কুয়োতলায় দেখল না। ও আসলে স্নান করে কিনা খায় কিনা মায়ার সে সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। খায় নিশ্চয়ই। না হলে আর বেঁচে আছে কি করে। কিন্তু রান্না করে কি? তা হলে তো অন্তত এক-আধ বালতি কুয়ো থেকে কি কল থেকে হোক,—আর রান্না না করলেও এমনি তো জল খেতে হয়—সেইটাই বা কোথা থেকে আসে। রাত ন'টায় আর একবার রাস্তার কলে জল আসে। যদি তখন? কিন্তু তা-ও মায়ার চোখে পড়েনি। অবশ্য মাঝে মাঝে রাত বারোটায়ও জল আসে। তখন কি? তা অবশ্য মায়া বলতে পারে না। বা-রাস্তার কল থেকে এত রাত্রে জল ধরে তার ঘরের সামনে দিয়ে কেউ যাচ্ছে

কি না দুপুর রাত অবধি জেগে বসে থেকে লক্ষ্য করার মায়ার ইচ্ছা ধৈর্য কোনোটাই নেই। বড় কথা এখানে এ-বাড়ির উঠোন যেমনি ফাঁকা তেমনি কুয়োতলাটাও সারাক্ষণ ফাঁকা থাকে বলে মায়ার যখন ইচ্ছা তখন যতটা খুশি সময় নিয়ে কাজ করার সুবিধা আছে। এই চেয়েছিল ও, এমনটি সে চাইছে। শাড়ি শায়া ব্লাউজ এক হাতে, আর-এক হাতে দাঁতন সাবানের বাক্স নিয়ে ও উঠোনের ডান পাশের নিম গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। এখন বর্ষা ঋতু। পাতা ও ফলে ফলে গাছটা বোঝাই হয়ে আছে। দুটো-একটা নিমফল পাকছে। একটা-দুটো মাটিতে পড়ছে। আর পাকা নিমফলের লোভে রাজ্যের বুলবুলি উড়ে এসে কিচিরমিচির করছে উড়ছে ছুটোছুটি করছে ডাল থেকে ডালে। মায়া ওর সুন্দর থুতনি তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে পাখিদের নিমফল খাওয়া দেখল। নির্জন কুয়োতলার মতন নিমগাছটাও এ-বাড়ির একটা সম্পদ, অন্তত মায়ার কাছে, ভাবে ও। অবশ্য বাড়িওয়ালা বরদাসুন্দর বটব্যাল জল্পনা করছে, এপাশের নিমগাছ, ওপাশের ডুমুর আর পেঁপের জঙ্গল সাফ করে ফাঁকা উঠোনের সবটা জুড়ে বড় দোতলা পাকা দালান তুলবে। টিনের ঘর রাখবে না। কিন্তু সেটা কবে হবে আজকালই হচ্ছে কিনা শোনা যায়নি। অবশ্য তাই নিয়ে মায়া কি তার স্বামী প্রণব মাথা ঘামায় না। টিনের ঘর ভেঙে দিলে সস্তা ঘর খুঁজতে তারা কোন দিকে যাবে, না কি এখানেই দোতলার পাকা ঘরে একটু 'সুবিধামতন' ভাড়া হলে থেকে যাবে তা-ও তারা কিছু ঠিক করেনি। বরং সেসব না ভেবে মায়া সবুজ চকচকে চিকরিকাটা নিমপাতাগুলোর নাচানাচি দেখতে লাগল। আকাশের থমথমে মেঘলা ভাব কেটে গিয়ে একটু সময়ের জন্যে রোদ উঠতে পাতাগুলো যেন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে একটাল ইঁট কবে থেকে পড়ে আছে। মখমলের মতন পুরু নরম সবুজ শ্যাওলার একটা আস্তরণ সবগুলো ইঁটকে যেন জমিয়ে এক করে দিয়েছে। আগুনে রঙের দুটো ফড়িং সবুজ ইঁটের পাঁজা ঘিরে নাচানাচি করছে। ওপাশের ডুমুরের ডালে এত বড় একটা গিরগিটি স্থিরচোখে তাকিয়ে ফড়িং দুটোকে দেখছে। যেন কোথাও একবার একটু শান্ত হয়ে ওরা বসলে সে লাফিয়ে পড়ে ওদের ঘাড় কামড়ে ধরবে। করুণ চোখে ফড়িং দুটোকে আর একবার দেখে মায়া আস্তে আস্তে কুয়োতলার দিকে চলল।

কুয়োতলার এখানে-ওখানে লম্বা ঘাস গজিয়েছে। জায়গাটা সিমেণ্ট করা নেই। গোড়ার দিকে মায়ার অসুবিধা হত। জল কাদা আর আগাছার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে দড়ি বাঁধা বালতি নামিয়ে কুয়ো থেকে জল টেনে তুলতে ওর এমন গা ঘিনঘিন করত। কিন্তু আশ্চর্য, ক'দিনে এটা সয়ে গেছে। প্রণব খানছয়েক

পুরনো ইঁট বিছিয়ে দেওয়ার পর থেকে মায়া আর কোনো অসুবিধাই বোধ করে না। বরং কুয়োতলার এই মাটি, লম্বা ঘাস, ঘাসের ফাঁকের চিকচিকে জল কাদা আর অগুণতি কিলকিলে মশার বাচ্চা দেখতে ওর এখন ভাল লাগে। যেন এগুলো না থাকলে খারাপ লাগত। বিয়ের পর থেকে এতকাল ওরা শহরের মাঝখানে যে বাড়িতে ছিল সেখানে সিমেণ্ট করা শক্ত ঠনঠনে কলতলার বাঁধানো চৌবাচ্চার পাশে বসে একদঙ্গল মেয়েছেলের কাপড় কাচাকাচি কলরব আর তাড়াহুড়োর চাপে পড়ে মায়ার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। মাটি আকাশ ঘাস পোকার গন্ধ ছিল না। ছিল দেওয়াল আর দেওয়াল, আর কটকটে ফিনাইলের গন্ধ আর সস্তা সাবান হেয়ার-অয়েলের মিঠে পচা গন্ধে ভরা বদ্ধ বাতাসের গুমোট। কলতলায় যতক্ষণ থাকত মায়ার গা-বমি করত। এখানে খোলা হাওয়া আর ঘাসের শিসের দোলানি আর নিমগাছ থেকে ভেসে আসা পাকা নিমফলের গন্ধ আর বুলবুলির কিচিরমিচিরের এক আশ্চর্য নির্জন জগতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে মায়া যতক্ষণ খুশি প্রণবের কিনে দেওয়া ভাল সাবানটা মাখতে পারে,—যে-ভাবে খুশি। বাপস্, আগের বাড়িতে ইচ্ছামতন খোলা-গা হয়ে বসে মায়া একদিন সাবান মাখতে পারেনি। হ্যাঁ, মেয়েরাই,—একটি মেয়ের গায়ের কাপড় সরে গেলে কি খুলে ফেললে এমন সন্দিগ্ধ কুটিল চোখে তাকায় ? আর চোখ টেপাটেপি ঠোঁট টেপাটেপি। এখানে সেসব বালাই নেই। মায়া একটানে গায়ের ব্লাউজটা খুলে ফেলল। কাঁচুলি ও সায়ার বাঁধন আলগা করে দিতে সরসর করে সেগুলো আপনা থেকে খসে পড়ল। পা দিয়ে এক পাশে ও-দুটো ঠেলে সরিয়ে রাখল ও। এমনি জল দিয়ে কেচে দেবার ইচ্ছা। এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ার ঝাপ্‌টায় শাড়িটা একসময় গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে যেতে হাড ও মাংসের স্থূল সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধ-বাঁকা রেখাগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি! গায়ে জল ঢালার আগে রোজ ও কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থেকে শাড়ির পতপত ও হাওয়ার শিরশিরানিটা অনুভব করে। যেন প্রত্যেকটা রোমকূপের মধ্যে হাওয়া ঢুকে গলা বুক পিঠ পেট কোমর তলপেট উরু হাঁটু হাঁটুর নিচে পায়ের মাংসল ডিম দুটোকে সতেজ স্নিগ্ধ করে দেয়। আঁচলটা আর গায়ে রাখে না ও। কোমরে জড়ায়। তারপর কুয়োপাড়ের উঁচু সিমেণ্টের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে কোমর থেকে থুতনি পর্যন্ত সবটা শরীর সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিচের অন্ধকার জলের দিকে তাকায়। জলের আয়নায় নতুন করে সে নিজেকে দেখে। যেন চিনতে পারা যায় না এ-মায়া সেই মায়া, এই কপাল সেই কপাল, এই থুতনি সেই থুতনি, এ-বুক সেই বুক।

কি, ঘরের আরশিতে এইমাত্র সে যা দেখে এসেছে—। যা সুন্দর শক্ত জমাট আর এখানে জলের অন্ধকারে তা কেমন বিশ্রী হয়ে পড়েছে। এ-অবস্থা দেখে মায়া প্রথমটায় চমকে ওঠে, ভয় পায়। তারপর অবশ্য কারণটা বুঝতে পেরে নিজের মনে ও হাসে। সামনের দিকে অতটা ঝুঁকে থাকলে নিজের ঐ চেহারা দাঁড়াবেই। সুতরাং ভয় মিছে। আসলে ওর—চট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ওপর চোখ রেখে সে নিশ্চিন্ত হয়। তেমনি নিটোল মসৃণ জোড়া ফুলের স্বপ্ন হয়ে কার দিকে তাকিযে আছে ওরা সারাক্ষণ? কি দেখছে? মায়া আবার নিজের মনে একটুখানি হাসল। আবার জোরে হাওয়া বইছিল আর ওর সারা শরীর শিরশির করছিল এমন সময় হঠাৎ ও চমকে উঠল। শুকনে পাতার ওপর দিয়ে কে হেঁটে এল না। ব্যস্ত হয়ে আঁচলের খুঁটটা কোমর থেকে টেনে খুলে তাই দিয়ে ও কোনরকমে বুক ঢেকে তারপর ঘাড ফেরাল। ঘাড ফিরিয়ে মানুষটার চেহারা দেখে মায়া নিশ্চিন্ত হয়। ভয় পাওয়ার কিছু না। একটা হাঁড়ি হাতে করে ভুবন সরকার অদূরে পেয়ারা চারাটার গুঁডি ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন জল নিতে এসে কুয়োতলায় স্ত্রীলোক দেখে বুডো লজ্জা পেয়ে আর পা বাডাচ্ছে না। মায়া কিন্তু ততটা লজ্জাবোধ করল না। কোনোদিনই করে না। পাঁকাটির মত সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে ক'খানা পাঁজর, শনের মত পাকা একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল ও হলদে ক্যাকাশে চোখ জোডা নিয়ে কালেভদ্রে যদি কখনও লোকটা তার সামনে এসে দাঁডায় কি পাশ কেটে চলে যায়, মায়ার মনেই হয় না একটা মানুষ, একজন পুরুষ। ঠিক বুডো হয়েছে বলে না, ওর ক্ষীণ হাত-পা নিষ্প্রাণ চাউনি, মন্থর চলার মধ্যে এমন একটা কিছু মিশে আছে যে, মায়ার কখনও কখনও ওকে দেখলে ডুমুরতলার ওধারের পুরোনো ভাঙা পাঁচিলটা কি পেঁপে-জঙ্গলের পাশের মৃত নিষ্প্রাণ সহস্রক্ষতচিহ্নযুক্ত মাদার গাছটার চেহারা মনে পডে। এর বেশি না। অথচ এ-ও যে বরদাসুন্দর বটব্যালের সাডে বারো টাকা ভাডার টিনের ঘরের ভুবন সরকার নামধেয় একজন মান্য-গণ্য বাসিন্দা এবং একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী মায়া ভুলে যায়।

একপাশে একটু সরে দাঁডিয়ে মায়া অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ভুবন জল নিতে অগ্রসর হচ্ছে না। যেন সাহস পাচ্ছে না।

'নিন, আপনি জল নিয়ে যান।' মায়া ডাকল।

মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল ভুবন। ডাক শুনে চোখ তুলল।

'আপনি চান সেরে নিন। আমার পরে হলেও চলবে।' কথা বলল না লোকটা। যেন পোকায় খাওয়া একটা শুকনো ডুমুরপাতা খসখস শব্দ করে উঠল।

'আমার চান সারতে দেরি হবে।' কথাটা বুড়োকে বুঝিয়ে বলা দরকার, না হলে বুঝবে না, টের পেয়ে মায়া রাগ না করে বরং শব্দ করে হাসল। 'আপনাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার চান করা চলবে কি ?'

হাঁ করে তাকিয়ে ভুবন তার একমাত্র প্রতিবেশিনীর হাসি দেখছিল। না কি কচি সবুজ চিকরিকাটা নিমপাতার গায়ে বর্ষা-দুপুরের রৌদ্রের ঝিলিক দেখছে বুড়ো, ভাবল মায়া। তার ঠোঁটে চোখে সত্যি তখন মেঘ-ভাঙা এক আঁজলা হলুদ রোদ ঝিলমিল করছিল।

পেয়ারা পাতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুকনো কাঠের মত মানুষটা যেন আরো কালো হয়ে উঠল।

'না, আপনার চান সারা হোক। আমি ঘুরে আসছি, হাতের একটু কাজও বাকি আছে বটে।' বলে বুড়ো আর দাঁড়ায় না, সরে যায়। কষ্ট লাগে মায়ার। হয়তো এভাবে বলা ঠিক হয়নি। যদি দাঁড়িয়ে থাকত ওখানে তো দোষ ছিল কি। তা ছাড়া জল নিতে ও বড়-একটা আসে কই। নিশ্চয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল এখন। গায়ে জল ঢালার আগে বুকের আঁচলটা আবার কোমরে জড়াতে জড়াতে মায়া ভাবে। এ-বাড়ির ভাঙা পাঁচিল মরা গাছ কি ছাতাপড়া পুরোনো ইঁটের পাঁজার সঙ্গে যে-লোকটার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে মায়া পরিতৃপ্ত ছিল আজ তাকে হঠাৎ আলাদা করে দেখতে যাওয়া কি তার পায়ের শব্দে গা ঢেকে ফেলার মধ্যে কি একটা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেল না? মায়ার বুকের মধ্যে কেমন খচখচ করতে লাগল। এক টুকরো অনুশোচনা গলার কাছে আটকে থেকে যেন জায়গাটা জ্বালা জ্বালা করে উঠল। স্নান করার আনন্দ তেমন করে ও অনুভব করতে পারল কই। সাবান-গোলা জল দুধের ধারা হয়ে ওর উষ্ণ কোমল ঝকঝকে চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। একলা মায়া ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ তা দেখছে বলে আজ আর সে মনে করতে পারল না। অথচ ওরা রোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে, হ্যাঁ, সহস্র পাতার চোখ মেলে এবাড়ির নিমগাছ, রোদ কি জল ঠেকাতে বড় বড় ছাতা মাথায় ওধারের পেঁপেগাছগুলো, এপাশের কচি পেয়ারা গাছটা, ওদিকের পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো পর্যন্ত, ইঁটের পাঁজা ছেড়ে লাল ফড়িং দুটো উড়ে এসে ঘুরে ঘুরে মায়ার ভিজে চুল দেখে নাভি দেখে স্তন দেখে জঙ্ঘা দেখে। কচি কলাপাতার বোঁটার মত ওর পিঠের ঋজু মসৃণ সুন্দর শিরদাঁড়া ঘেঁষে একটা মশা হুল ফুটিয়ে দিয়ে এতটা রক্ত খেয়ে পেট মোটা করে একসময় উঠে গেল। যেন মায়া টের পেল না। ভাল করে তোয়ালে দিয়ে গা রগড়াতে আজ তার হাত উঠছিল না। ভাবছিল ও মানুষটাকে এখানে দাঁড়াতে নিষেধ করা আর ডুমুরের মরা ডালটাকে এদিকে উঁকি দিতে

বারণ করা এক কথা। যেন সেই অভিমানে ফড়িং দুটো এল না, পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো নেই, পেঁপে গাছগুলো ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকেছে, নিমগাছটা বুলবুলিদের ফল খাওয়াতে ব্যস্ত। মায়ার স্নান দেখতে কারো উৎসাহ নেই। ওদের একজনকে সরে দাঁড়াতে বলায় বাকি সবাই রাগ করেছে দুঃখ পেয়েছে। অথচ এদের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরা খুলে দেওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে পাঁচ বালতির জায়গায় পনেরো বালতি জল ঢেলেছে ও, প্রণবের কিনে দেওয়া সাবানটাকে বার বার ঘষে কদিনে ক্ষয় করে এনেছে।

মৃদু একটা আঘাত বুকে নিয়ে কোনো রকমে ও স্নান শেষ করল। ভাল করে মাথা মোছা হল না তোয়ালে বা কাপড়ের জল নিংড়ানো হল না। মন্থর ভারি পায়ে কুয়োতলা ছেড়ে ও ঘরে ফিরে এল। তখনি আবার তার আরশির সামনে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু তা সে করল না। ভেজা কাপড়গুলো মেলে না দিয়ে দলা করে সেভাবেই দরজার পাল্লার ওপর রেখে দিল। টস্‌টস্‌ করে জল ঝরছিল সেগুলো থেকে। মায়া এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে তা দেখল কিন্তু সে-সম্পর্কে ও কিছু ভাবছে বলে চোখ দেখে মনে হল না। চৌকাঠ পার হয়ে আস্তে আস্তে ও আবার উঠোনে নামল। আবার এক সেকেণ্ড কি ভাবল, তারপব ওপাশের ডুমুর-জঙ্গল ও ভাঙা পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে ডেকে বলল, 'আমার হয়ে গেছে আপনি যান।

কেউ সাড়া দিল না। টিনের ডেরা থেকে বেরোলো না কেউ। মায়া আর একটু সময় অপেক্ষা করল। একটা শালিক ওর পায়ের শব্দে উঠোনের ঘাস ছেড়ে উড়ে পেয়ারার ডালে গিয়ে বসল। এক পা এক পা করে মায়া ডুমুরতলার দিকে এগোয়।

টিনের চাল প্রায় মাথায় ঠেকে। ভিতরে ঢুকল না ও। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখল। অবাক হল না, বরং মায়ার দুঃখ হল। মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতের কাছে মাটিতে দুটো একটা যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। কোনোটা জং ধরা। কোনোটার হাতল নেই, কি মাথা ভেঙে গেছে। ওধারে দুটো গোল মতন কি যেন পড়ে আছে। ইলেকট্রিকের কলকব্জা কিছু হবে মায়া অনুমান করল। পাশেই আর একটা জিনিস দেখে মায়া চিনল। টেবিলফ্যান্‌। দুটো ব্লেডই ভেঙে গেছে, একটা আছে। ওটা ইলেকটিক স্টোভ না হয়ে যায় না। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সব দেখা শেষ করে মায়া আবার বুড়োর মুখটা দেখতে লাগল। দুটো চোখ গর্তে ঢুকে পড়েছে। কপালের চামড়া ঠেলে পাকানো দড়ির মতন একটা মোটা শিরা বেরিয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন দুটো চোয়াল। নাকটা উঁচু, গাল কপাল শুকিয়ে যাওয়ার দরুন

আরো বেশি উঁচু দেখাচ্ছে। গলায় বুকে ক'খানা শুকনো হাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। শিয়রের কাছে শূন্য এল্যুমিনিয়মের ডেকচিটা পড়ে আছে। দেখে মায়ার দুচোখ আবার ছলছল করে উঠল। একটু সময় ইতস্তত করে তারপর ও আস্তে ডাকল, 'ঘুমিয়ে পড়লেন কি ? ঘুমোচ্ছেন ?'

'হুঁ হুঁ কে ?' বুড়ো চমকে উঠে চোখ মেলে দরজার দিকে তাকাল তারপর ব্যস্ত হয়ে পা দুটো গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল। হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে অল্প হাসল, হাই তুলল একটা। 'ভাবলাম আপনার চানটা হোক, হাতের কাজটা সেরে ফেলি, আর এর মধ্যে কিনা চোখটা লেগে গেল।'

'আমার হয়ে গেছে, যান।' বলল মায়া, বলে চলে আসত চৌকাঠ ছেড়ে কিন্তু পারল না, দাঁড়িয়ে রইল। এই প্রথম ওর মুখোমুখি দাঁড়ানো। শুকনো মরা গাছ দেখে যেমন ভয় বা লজ্জা পাওয়ার প্রশ্ন মনে জাগে না এখানেও তাই। শূন্য হাঁড়িটা তুলে নিয়ে মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে ভুবন ওর চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে যেন কি বলি-বলি করছে। মায়া মাটির দিকে চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করল, 'এইবেলা বুঝি রান্নাবান্না হবে ?' কোণার দিকে একটা উনুন ও কিছু ভাঙা বাঁশ কাঠের টুকরো মায়ার চোখে পড়েছে।

'হুঁ, দিদি, ইচ্ছা ছিল সেরকম, তা শরীরটা যেন এখন আর নড়াতে ভাল লাগছে না।' বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল ভুবন, চুপ করে রইল একবার, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বেলা এখন কটা ঠিক বাজবে দিদি ?'

'বারোটা হবে।' মায়া মাটি থেকে চোখ তুলল। 'অনেক বেলা হয়েছে।' যেন মানুষটার চোখের রং এখন আর তেমন ফ্যাকাশে না থেকে একটু চকচকে হয়েছে দেখে মায়া ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে ডুমুর পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের রোদ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হল। শুকনো পাতার খসখস শব্দের মত নিশ্বাসের আর একটা শব্দ কানে এল ওর।

'আহা, কত ভাল লোকের সংসর্গে আছি আমি।' যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিল বুড়ো। 'দিদি আমার কষ্ট করে খবর দিতে এল কুয়োতলা অবসর হয়েছে, তুমি যাও।'

মায়া কথা বলল না। চোখের একটা প্রসন্ন ভাব নিয়ে বুড়োর হাতের শূন্য হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। যেন বুড়ো আবার একটা কি বলি-বলি করছিল। টের পেয়েও মায়া চোখ তুলল না। দুটো লাল ফড়িং-এর একটা ইঁটের পাঁজা ছেড়ে এখানে উড়ে এসে ওর হাঁটুর কাছে ঘুরঘুর করছে দেখে মায়া অবাক হয় খুশী হয়।

'ইচ্ছে করেছে অনেকদিন, সাহস হয়নি কথা বলতে, কিন্তু দিদি যে এত

ভাল মানুষ আমি কি জানতাম। ভাঙা অসমান নোংরা দাঁত বার করে ভুবন অল্প শব্দ করে হাসল। 'কেমন ভাল লোকের সংসর্গে বাস করছি আমি। আহা!'

'বুড়োমানুষ আমার সঙ্গে কথা বলবেন তাতে—' বাকিটা বলল না মায়া, সুন্দর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝিয়ে দিল।

'বুঝতে পেরেছি বুঝতে পারি।' ভুবন খুশী হয়ে মাথা নাড়ল। 'সকল লোক কি আর সমান। সংসারে সব মানুষ একরকম হলে সৃষ্টি অচল হত।'

মায়া নীরব। ফড়িংটা এখন তার কানের কাছে খোঁপার পাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

'সকল লোক সমান না।' ভুবন আবার বলল, 'সেদিন রাস্তার কলে এই হাঁড়ি দিয়ে জল ধরতে গিয়ে কি কম নাকাল হতে হয়েছিল, দিদি, বড় বেশি অপমান হয়ে ফিরে এসেছিলাম।'

'কে অপমান করল?' মায়া বুড়োর চোখের দিকে তাকায়।

'দিদির বয়সী একটা মেয়ে, বৌ, কার বৌ জানি না, রাস্তার ওধারের একটা টালির ঘরে যেন থাকে।' বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তার বয়সের একটি বৌ বুড়োকে অপমান করেছে শুনে মায়ার দুঃখ এবং কৌতূহল হল। 'কি বললে বৌটা, কি বলছিল আপনাকে?'

'আমি হা করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি হা করে দাঁড়িয়ে থেকে ওকে দেখছি। ওকে দেখতে আমার কলের কাছে দাঁড়ানো। জল ধরতে যাওয়াটা কিছু না, ছুতো।'

'ছি ছি ছি।' মায়া সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল। 'এমন একটা বুড়ো মানুষকে এভাবে বলতে কি ওর—'

বাকিটুকু বলল না মায়া। কিন্তু তার চোখের বেদনা ভুবনকে অভিভূত করল। 'সব মানুষ সমান না সকল চোখ এক না।' একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে ভুবন মৌচাকের মতন মস্ত কালো খোঁপা ঘিরে লাল ফড়িং-এর নাচানাচি দেখল। গাল ঘুরিয়ে মায়া আবার একটু সময় পেয়ারা পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া আষাঢ় আকাশের হলদে আলো দেখছিল।

'অনেক বেলা হল, এইবেলা রান্নাবান্না আরম্ভ করুন।' ঘাড় ফিরিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে মায়া চুপ করে গেল। ফ্যাকাশে মরা চোখ দুটোতে যেন অন্যরকম রং লেগে আবার চকচক করছে। ডান হাতের হাঁড়িটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ভুবন আস্তে আস্তে ঠোঁট নাড়ছে, যেন কি বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে।

আর দাঁড়াল না, চৌকাঠ ছেড়ে মায়া উঠোনে নামল।

শুকনো ডুমুর পাতার খসখস শব্দ শুনে আর একবার ও ঘাড় না ফিরিয়ে পারে না। না, ভুল দেখেছে সে, মরা মাছের চোখ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। রুক্ষ জীর্ণ অস্থিসার একটি মানুষ। মৃত পত্রহীন মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ল মায়ার।

'আমায় কিছু বলছেন ?'

'না,' ভুবন মাথা নাড়ল। 'বলিনি কিছু। দিদিকে দেখে ভাবছিলাম। দিদিকে দেখলে আমার কেবলই ওই ডালিম চারাটার কথা মনে পড়ে।'

'কোথায় ডালিম চারা, কোন্‌দিকে!' যেন খুব বেশি চমকে উঠল মায়া। আঙুল দিয়ে ভুবন উঠোনের একটা পাশ দেখিয়ে দিতে মায়া সেদিকে তাকায়। অনেকদিন আগেই ওটা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু এখন যেন নতুন করে ও ডালিম চারাটা দেখতে পেল। চারা বলা চলে না ঠিক। গাছ। লম্বা ঋজু একটি মেয়ের সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেক-গুলো আঙুল! আঙুল ছেয়ে নতুন লালচে সবুজ পাতার ঝিলিমিলি। হাওয়ায় দুলছে নড়ছে। যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলোমেলো চুলে বিলি কাটছে আর খিলখিল হাসছে। আর একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়া। আধফোটা একটা কলি সিঁদুরের রেখা হয়ে পাতার মাঝখান থেকে উঁকি দিয়ে আবার তখনি লুকিয়ে যাচ্ছে। আর একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল মায়া। একবার দেখল। দুবার দেখল। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না। সুগোল সুঠাম আশ্চর্য সবুজ দুটো ফল। পাতার আড়াল সরিয়ে সন্তর্পণে দুবার দেখিয়ে তারপর যেন লুকিয়ে ফেলল মেয়েটি আর খিলখিল হাসল। ছোট্ট একটা নিশ্বাস পড়ল মায়ার।

'চারা না, গাছ।' ঘাড় ঘুরিয়ে ও ভুবনের মুখের দিকে তাকায়। ভুবন মাথা নাড়ল।

'নতুন গাছ। যৌবন লেগেছে গায়ে।'

মরা মাছের মত চোখদুটো আবার চকচক করছে কিনা দেখতে মায়া আর মুখ ফেরায় না। যেন কি ভাবছিল ও। ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে এল।

কি, অপরের চোখে সে নিজেকে দেখছে ? কে সেই পর ? কেউ না। মানুষ না পুরুষ না। সংসারে একমাত্র পুরুষ প্রণব। তার স্বামী। যার মুখে রাতদিন তার রূপ যৌবন শরীরের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনে শুনে মায়া এখন ক্লান্ত হয় বিরক্ত হয়। আর কোনো পুরুষের চোখেমুখে সে তার বাইশ বছরের যৌবনের স্তুতি দেখল না শুনল না। যদি দেখত শুনত তবে কি সে

রাগ করত ? মায়া ঠিক ভেবে পেল না। বুঝতে পারছিল না ও। হাজার পাতার চোখ মেলে নিম গাছটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে, পেঁপে গাছগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে, ভাঙা পাঁচিল মরা গাছ কাক শালিক বুলবুলির ঝাঁক যখন-তখন মায়ার হাত দেখছে পা দেখছে হাঁটু দেখছে পিঠ কোমর ভুরু চোখ চুল নখ সব। রাগ করে না ও, বরং খুশি হয়। যদি ওরা এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে না থাকত তো তার মনে হত না সে বেঁচে আছে। সুতরাং—

দুপুরে খাওয়ার পরে চোখে আজ ঘুম আসেনি। শুতে গিয়ে শোয়া হল না। এক আশ্চর্য নেশায় মন শরীর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সত্যি তো। মরা মাদার গাছ কি নোনাধরা পাঁচিলটা যদি হঠাৎ মুখ ফুটে বলে ওঠে, 'চমৎকার! কত সুন্দর তুমি,' অথবা 'তোমাকে দেখে বর্ষার রজনীগন্ধা কি বৈশাখের চাঁপার কথা মনে পড়ে আমাদের,' তো সে কি খুব অবাক হবে ? হয়নি। এখনও হল না। বরং নূপুর বাজার মতন উত্তেজনায় আনন্দে তার রক্তের মধ্যে মিষ্টি রিমঝিম একটা শব্দ হচ্ছিল। সেই কখন থেকে। শোয়া ছেড়ে একসময় ও উঠল। আস্তে দরজার দুটো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। ঠিক মাঝ জায়গায় দাঁড়ালেই দেওয়ালের আরশিতে ও পায়ের নখ থেকে সিঁথির ডগা পর্যন্ত সব দেখতে পায়। না, আরশি-মুখ করে দাঁড়ালেও সব দেখা যায় কি। সব বাঁধন খুলে পা দিয়ে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিলে ও। আর সেই মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন রক্তের বাজনাটাও কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। না, নিজের এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি, এভাবে! ডালিম গাছ। পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়া যৌবনের সতেজ প্রগলভ লাবণ্য। পুলকের বিদ্যুৎ-শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা করে গেল, টের পেল মায়া। আর রক্তের বাজনাটা যেন প্রচণ্ড শব্দ করে তখন বেজে উঠল ঝম্ ঝম্ ঝম্। ঘরের চালে শব্দ হচ্ছিল, বাইরে, গাছের পাতায়, পাঁচিলের গায়ে কুয়োতলায়, ডুমুর জঙ্গলে। আকাশ ভেঙে জোরে বৃষ্টি নামল, আর আয়নার সামনে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কোটিবার ও নিজেকে দেখল।

অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল এটা। একদিন দু'দিন তিনদিন। এবং সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস ও লক্ষ্য করল। অবশ্য তাতে প্রথম দিন ও ভয়ই পেয়েছিল, দ্বিতীয় দিন আর ভয়টা রইল না, মনটা একটু খারাপ লাগল। কিন্তু অবাক হল মায়া, তৃতীয় দিন তার মনে হয় এ-ই স্বাভাবিক। প্রণবের কথা হাসি ওঠা বসা খাওয়া বিশ্রাম, তার জুতোর শব্দ সিগারেটের গন্ধ অফিসের গল্প বা মায়া রাঁধতে বসেছে আর পাশে ব'সে স্বামী তার গলায় কি পিঠের ঘামাচি খুঁটছে কি

বিড়বিড় করে বাজারের হিসাব বলছে ইত্যাদি সব কেমন যেন মায়ার কাছে পুরোনো, বড় বেশি একঘেয়ে ঠেকতে লাগল। যেন জন্মাবধি সে এসব দেখছে শুনছে। যেন শুনে শুনে দেখে দেখে এখন তার হাঁপিয়ে ওঠার সময় এল। এমনকি রাতটাও। আদর চুমু আবেগ উচ্ছ্বাস কোনো কিছুর মধ্যেই আর ও দিশেহারা হয়ে যেতে পারছিল না। যেন কতকাল ধরে চলছে। যেন এসব কাজ এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকলে ভাল হয়। বিছানার গন্ধ প্রণবের গায়ের গন্ধ চটচটে ঘাম আর গরম নিশ্বাসের হল্কা থেকে রেহাই পেতে সত্যি ও এক সময় উঠে পড়ে। 'এর মধ্যেই তোমার জলতেষ্টা পেয়ে গেল!' ঠাট্টার সুরে প্রণব বিডবিড করে। কিন্তু মায়া উত্তর দেয় না। গম্ভীর থাকে। সবটা আবহাওয়া তার কাছে অশ্লীল কুৎসিত ঠেকে। বিছানার অন্ধকারে আধশোয়া স্বামীকে কুৎসিত মনে হয়। বেশবাস ছেড়ে নিজেকে কুৎসিত মনে হয়। অথচ—অন্ধকার জানালায় একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ও ভাবে।

প্রশ্নের জবাব দেয়নি ভুবন। ঘাড় গুঁজে মাছ কুটছিল। জলপচা শাদাটে ক'টা পেটফোলা ট্যাংরা মাছ। একটা ভোঁতা কাটারির বুকে পুঁছিয়ে পুঁছিয়ে পেট আলগা ক'রে মাছের কালচে তামাটে রঙের নাড়ি-ভুঁড়ি বার করতে করতে ভুবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যেন লোকটার নিশ্বাসের ঝাপটায় মাছির ঝাঁক ভনভন ক'রে ওঠে। কিছু তার নাকের সামনে কিছু ঘাডের কাছে পিঠের ধারে উড়ে বেড়ায়।

'আপনার বুঝি বঁটি নেই?'

ভুবন শুধু মাথা নাড়ল কথা বলল না বা চোখ তুলে চৌকাঠের দিকে তাকাল না।

মায়া একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'বঁটি থাকলে সুবিধে হত। ছোট মাছ কাটারি দিয়ে কুটতে কষ্ট।' ব'লে মায়া ঘাড ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। আজকের দুপুরের চেহারাটা অন্যরকম। বৃষ্টিও পড়ছে আবার রোদও উঠেছে। সিল্কের মত শাদা নরম মেঘে মোড়া আকাশ থেকে কে যেন একটা রূপালি জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। রূপার সুতোর মতন শাদা ফিনফিনে বৃষ্টির ছাট এসে থেকে থেকে মায়ার পায়ের কাছে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাটি ঘাস গাছের পাতা ভাল ক'রে ভিজতে না ভিজতে আবার দেখা যায় ঝকঝকে রোদের হাসি। লাল ফড়িং না। ঘাস-ফুলের মত ছোট্ট শাদা একটা প্রজাপতি ওর থুতনির কাছে উড়ে উড়ে বেড়ায়। মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে ভুবনের দিকে তাকায়। এবার ও খুশি হল। ফ্যাকাশে হলদে

চোখ জোড়া মেলে মানুষটা হা ক'রে তাকে দেখছে। মায়া বাঁ পা নামিয়ে ডান পা-টা চৌকাঠের ওপর রাখল।

'তা কারখানার কাজ কি করে গেল বললেন না তো ?'

শুকনো মরা পোকায় খাওয়া গাছের বাকলের মতন বুড়োর ঠোঁটের চামড়া ঈষৎ বিস্ফারিত হল। বোঝা গেল হাসতে চেষ্টা করছে। বাঁ হাতের পিঠটা কপালে ঠেকিয়ে আবার হা করে সে মায়ার মুখের দিকে তাকায়। অর্থাৎ অদৃষ্টে নেই তাই চাকরি গেছে। বুঝতে পেরে মায়া একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'যাক, হাতের কাজটা যখন শেখা আছে কোনো-রকমে চলে যাচ্ছে—যাবে। ঘরে বসে টুকিটাকি সারাইয়ের কাজ করছেন মন্দ কি।'

কিন্তু চোখ দেখে মনে হল না ভুবন তা ভাবছে। কি ভাবছে চিন্তা না করে মায়া আবার উঠোনের দিকে মুখ ফেরাল। ভিমরুলের চাকের মতন প্রকাণ্ড খোঁপার পরিবর্তে অল্প বয়সের একটি মেয়ের মতন চেরা বেণী আজ ও ঘাড়ের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। হাওয়ায় দুটো বেণী নড়ছিল। স্কুলে পড়ার সময় বেণী করত ও। বৌ হবার পর আজ এই প্রথম। আর এই বেণী তৈরী করার সময় অনেকদিন পর এক ধরনের বনজ লতার কথা বার বার মনে পড়ছিল তার। প্রণব এভাবে চুল বাঁধা পছন্দ করবে না এটাও মায়া চিন্তা করেছে এবং স্বামী বাড়ি ফেরার আগেই ওটা ভাঙতে হবে ভেবে তার বুকের মধ্যে বেশ একটু টনটন করছিল। খসখস শব্দটা শুনে মায়া চমকে ঘাড় ফেরাল। ভুবন এবার দাঁত বার করে রীতিমত হাসছে।

'কি হল ? মাছ কোটা তো শেষ হয়েছে, এবার রান্না চাপান।'

'তা চাপাব, এক সময় চাপালেই হল।' হাত নেড়ে মাছের গায়ের মাছি তাড়ায় ভুবন। 'রান্না আর খাওয়ার কথা এখন বড় একটা ভাবি না, দিদি, কেমন যেন ইচ্ছাই করে না, হি-হি। একটা কাজ ছিল শেয়ালদার। বুঝিয়ে দিয়ে ফেরার সময় এই তো আজ আট দিন পর দুটো মরা ট্যাংরা আনলাম। রান্নাই বা আর রোজ হয় কোথা,—'

মায়া চুপ করে রইল।

হাওয়াটা একটু বেশি জোরে বইছিল ব'লে পিঠের বেণী দুটো একজোড়া সাপের মতন পরস্পর জাপ্‌টাজাপটি করে আবার কোমরের দু'দিকে সরে গিয়ে হিলহিল করছিল। যেন সাপের খেলা দেখতে বুড়ো চোখ বাঁকা করে ঘাড় কাত করে মায়ার পিঠের দিকে চেয়ে থাকে। ঘোলা জলের ওপর রোদ পড়লে যেমন একটা চিকচিকে শাদাটে আভা জাগে, বুড়োর চোখে আজ

আবার সেই রং দেখল মায়া। কিছু বলল না ও, বরং ক্ষুদে প্রজাপতিটা এইবেলা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, উড়ে উড়ে এসে ওর গলায় বুকে বসতে চেষ্টা করছে দেখে মায়া সেটাকে একসময় খপ্ করে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলে পরে ওটাকে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে দিতে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার ভুবন তার সবটা পিঠ ও কোমর দেখতে পাবে মায়া অনুমান করছিল। বাচ্চা প্রজাপতিটা বাইরে ঘাসের ওপর ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ মরার মতন শুয়ে থেকে পরে একসময় নড়েচড়ে উঠে দিব্যি উড়তে উড়তে পেয়ারা গাছের দিকে চলে গেল। মায়া খুক্ করে হাসল। ভুবনও হাসল। মায়া ঘুরে দাঁড়াল।

'মরেনি। ভাবলাম হাতের চাপে চটকে শেষ হয়ে গেছে।'

'কেন মরবে?' ভুবন ঘাড় নাড়ল। 'নরম মুঠো। এই চাপে কি আর ও মরে!'

মুখ ফিরিয়ে মায়া শাদা প্রজাপতিটাকে আর দেখতে পেল না। পেয়ারা পাতার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

'ভারি সুন্দর ছিল, এই এতটুকুন!'

ভুবন ঘাড় নাড়ল। ফাটা শুকনো রোদ পোড়া গাছের বাকলের মতন পুরু ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আরো সুন্দর লাগছিল দিদির থুতনির চারপাশে যখন ও ঘুরঘুর করছিল। মাছ! মাছ কুটব কি ছাই। আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি কোন্ ফুলের সঙ্গে কোন্ ফলের সঙ্গে এই থুতনির তুলনা চলে। মচ্‌কা ফুল—না না না, করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে,—অবিকল সে রকম। দিদির থুতনি দেখলে তাই মনে পড়ে। মিছে বলছি? আর একবার যখন আরশিতে মুখ দেখবেন কথাটা সত্য কিনা বুঝবেন।'

মেরুদাঁড়ায় একটা শিহরণ অনুভব করত মায়া, কিন্তু তা করতে গিয়েও সে ওটা আর টের পেল না। তাই আগের চেয়েও শান্ত স্থির চোখে ও ভুবনের মুখের দিকে তাকাল। একজন পুরুষের মুখে ও রূপের প্রশংসা শুনছে কি? না না, যা-ও একটু হাসির রোদ লেগে ঘোলাটে চোখ দুটো চিকচিক করছিল এখন আবার মরা মাছের চোখের মতন ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন শুকনো হাঁটুর সঙ্গে দুটো হাত ঠেকানো। বরং ক্ষীণ একটা বেদনার ঢেউ বুকের মধ্যে অনুভব করল মায়া। অল্প হেসে বলল, 'তা দেখব আরশিতে, দেখা যাবে সত্যি আমার থুতনি অত সুন্দর কিনা। আপনি এইবেলা উঠুন। আসুন। আমি জল তুলে দিই আপনি মাছটা ধুয়ে ফেলুন। অনেক বেলা হল।'

দু'জনের পায়ের শব্দে গিরগিটিটা ওধারের পাঁচিলের মাথা থেকে লাফিয়ে

ডুমুরজঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। মায়া থমকে দাঁড়ায়। পিছন থেকে ভুবন বলল, 'তা আমি না-হয় এতকাল কোণার দিকের ভাঙা ঘর নিয়ে ছিলাম, এখন উঠোনের এধারে নতুন ঘর তুলেছে বটব্যাল। আর ঘর তৈরির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাড়াটেও পেল, এখন তো জঙ্গলটঙ্গলগুলো একটু সাফ করে ফেলা উচিত ওর, কিন্তু শালা কি এদিকে একবার উঁকি দিতে আসে? মাসকাবার হলে ভাডা গুণতে হাজির হবার বেলায় ঠিক আছে।'

'না খুব বেশি জঙ্গল কি।' মায়া বলল, 'আমার কিন্তু এই গাছটাছগুলো বেশ ভালই লাগছে। সস্তার মধ্যে বাডিটা চমৎকার।'

একটা নিশ্বাস ফেলল ভুবন।

'আমার ইচ্ছা করছে এই আগাছাগুলো তুলে ফেলে এধারটায় কিছু ফুলের গাছ করি।'

মায়া কথা বলল না।

'তা এ-বছর আর হয় না।' পিছন থেকে ভুবন পরে বলল, 'আরো আগে পুঁতলে তবে ঠিক হ'ত। এখন বীজ পুঁতলে শালার জলেই সব পচে ভূত হয়ে যাবে, গাছ বেরোবে না। আর গাছ বড হতে হতে শীত এসে যাবে। শীতে আর দোপাটি তেমন ফোটে কই। উঁহুঁ।'

'হ্যাঁ, সুন্দর।' ঘাড ফিরিয়ে মায়া বলল, 'দোপাটি ফুল আমি খুব পছন্দ করি। ছোটবেলায় দেখতাম আমাদের স্কুলের বাগানে,—এমন দিনে গাছগুলো শাদা হয়ে থাকত।'

'শাদা লাল গোলাপী অনেক রঙের হয়।' ভুবন আস্তে আস্তে বলল, 'আমার ইচ্ছা লাল দোপাটি করার। লাল ফুল দিদির বেণীতে মানাবে ভাল।'

মায়া হঠাৎ আবার কথা বলতে পারল না। ভুবনও চুপ করে রইল। কিন্তু কুয়োতলায় গিয়ে সে মুখ খুলল। মায়া জল ঢালছে আর দু'হাতে রগড়ে মাছের গায়ের ছাই ময়লা সাফ করতে করতে কি ভেবে সে বলল, 'ছোটবেলার কথা ইস্কুলে পড়ার দিনগুলোর কথা দিদির খুব বুঝি মনে পড়ে।'

প্রথমটায় উত্তর দিল না মায়া, তারপর এক সময় আস্তে আস্তে বলল, 'মনে পড়লেই আর কি করা যায়। দেখতে দেখতে বড হলাম, স্কুল ছাড়লাম, তারপর বিয়ে হয়ে গেল।' একটু থেমে পরে বলল, 'হাজারবার মনে পড়লে কি ইচ্ছা করলেও এখন আর সেদিন ফিরে পাব না।' নিজের মনে কথাটা বলে শেষ করে বিষণ্ণ চোখ দুটো ও আকাশের দিকে তুলে ধরল। রোদের আভা মুছে গিয়ে কালো বড় বড় মেঘের আনাগোনা আরম্ভ হল এবার। মাছ ধোয়া শেষ করে ভুবন সেগুলো রং-চটা ফুটো লোহার থালাটায় তুলে রেখে লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আর জল ঢালতে হবে না ?' মায়া চোখ নামাল।

'না, আমার হয়ে গেছে।' ঘাড় তুলে ফ্যাকাশে চোখে ভুবন ওর আপাদ-মস্তক দেখে। কুয়োর বাঁধানো কার্নিশের ওপর একটা পা, এক পা নিচে ইঁটের ওপর রেখে মায়া হাতের শূন্য বালতিটা একটু একটু আন্দোলিত করছিল বলে ওর বুক কোমর উরু মন্থর ঢেউয়ের মতন থেকে থেকে দুলছে কাঁপছে।

'মন, দিদি। ছোটবেলার মনটা যদি আমরা কোনোরকমে ধরে রাখতে পারি তো বুড়িয়ে গিয়েও মাঝেসাঝে সে-দিনের নাগাল পাই। মিছে বলছি ?'

আকাশে চোখ তুলল মায়া। চমকে ওঠার মতন কাউকে দেখছে না ও, কি কারো কথা শুনছে না। নিম গাছটা বুলবুলিদের ফল খাওয়াতে খাওয়াতে সারা দুপুরই এই বুলি আওড়ায়। উঠোনের চড়ুইগুলো, ওধারের ফড়িং দুটো, ডুমুর-জঙ্গলের ছায়ায় ঝিঁঝির দল সারাক্ষণই কি ডেকে ডেকে মায়াকে একথা শোনাচ্ছে না ? আর, এটা ও বেশ বুঝতে পারে ওদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে এ-বাড়ির শ্যাওলা-ধরা ইঁটের পাঁজা, নড়বড়ে ভাঙা দেওয়াল, হয়তো মৃতপ্রায় হলুদ রঙের পেঁপে গাছটাও ফিসফিসে গলায় কেবল এই বলছে। এখন ?

শান্ত সহানুভূতির চোখে মায়া ভুবনকে আবার দেখল।

'যান, এইবেলা গিয়ে উনুনটা ধরিয়ে ফেলুন—অনেক বেলা হল।'

ভুবন স্থির। নির্বাক।

একটা বেণী ঘাড় ডিঙিয়ে ওর বুকের ওপর লুটোয়। চোখ বাঁকা করে মায়া তাই দেখে। এমন সময় হঠাৎ এক আঁজলা রোদ ওর বুকের সামনে দিয়ে থুতনি ঘেঁষে উড়ে গেল। এক ঝাঁক প্রজাপতি। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ। হাতের তেলোর মত বড় এক-একটা। ওরা ডালিম গাছটা লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। যেন দিশেহারা হয়ে হাতের বালতিটা ঠক্ করে একদিকে ছুঁড়ে ফেলল মায়া। ছুটল। পেয়ারা গাছের ডালে আঁচল বেধে গেল, নিচের দিকেও কি একটা কাঁটায় শাড়ির পাড় আটকে ওর মোরগফুল আঁকা শায়া বেরিয়ে পড়েছে। কোনোমতে সামলে নিয়ে আবার এগোয়। ধরল একটাকে। বাঁ হাতের লম্বা সরু দুটো আঙুলের মাঝখানে আলতো করে একটা পাখা চেপে ধরে ও কুয়োতলায় ফিরে এল। ডান হাতের মুঠোয় আঁচলটা। বুকের ওপর চেপে রেখেছে কোনোরকমে। শ্বাস-প্রশ্বাসে জায়গাটা কাঁপছে।

এই প্রথম ভুবন শব্দ ক'রে হাসল। যেন জং-ধরা খসখসে গলায় নতুন ধাতুর ধার শোনা গেল।

মায়া মুখ কালো ক'রে ফেলল।

প্রজাপতিটাও হাত থেকে উড়ে গেল।

আঁচলটা অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে বুকে জড়ালো, গলায় তুলল ও এবং অন্য দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু কতক্ষণ ?

এদিকে আবার ওকে তাকাতেই হয়।

তাকিয়ে অবশ্য নিশ্চিন্ত হয়। কাঠ। মরা কাঠ চুপ ক'রে বসে আছে। দুটো হাত শুকনো নিষ্পত্র গাছের ডাল। জীর্ণ বাকল। ভিতরের শাঁস পুড়ে গেছে। অঙ্গার দেখা যায়।

'উঠে ঘরে যান। সেই কখন তো মাছ ধোয়া হল। খাওয়া-দাওয়া করবেন না!'

'আমি হা ক'রে তাকিয়ে দেখছিলাম।'

'খুব বড় প্রজাপতি! এত বড় প্রজাপতি এখানে এসে আর আমি দেখিনি।' মায়া বলল।

'আমি প্রজাপতি দেখছিলাম না।'

মায়া বুড়োর চোখের মধ্যে তাকায়।

ঘোলা ফ্যাকাশে চোখ স্থিরভাবে ধ'রে রেখে ভুবন হাসে। 'দিদির ছুটে যাওয়া দেখছিলাম। আহা রাজহংসীর গতিভঙ্গি। কথাটা মিছে বলছি ? আয়নায় দেখবেন। ঘাড় ঘুরিয়ে যদি সম্ভব হয়। আমি এমন সুন্দর ছাঁদের পিঠ কোমর আর কারো দেখিনি।'

'দেখব আয়নায়, রোজই তো দেখছি।' ধমকের সুর বার করতে গিয়ে ও কোমল গলায় হাসল। 'এইবেলা উঠুন, চলুন আমি উনুন ধরিয়ে দিই। আষাঢ়ের বেলা তা-ও হেলতে শুরু করেছে।' মায়া নুয়ে হাত বাড়িয়ে মাছের থালাটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'কত ভাল লোকের সংসর্গে আছি আমি!' পিছনে চলতে চলতে ভুবন বলল। 'দিদির মন কত নরম!'

ডুমুরতলার নিচু চালার ভিতরে ঢুকল দু'জন আর সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামল। কয়লার ব্যবহার নেই বুঝতে কষ্ট হয় না। কবে যেন কয়লা আনা হয়েছিল। দু-চার খণ্ড এক কোণায় পড়ে আছে। তার ওপর উইয়ের ঢিবি মাথা জাগিয়েছে।

ভুবন বলল, 'মাঝে-মধ্যে রান্নাবান্না যে না করি দিদি তা না, ওই ওধারের পুরোনো বেড়ার বাঁশ কাঠ কিছু কিছু ভেঙে এনে কাজ চালাই আর কি।' একটু থেমে পরে বলল, 'তা কাঁচা ঘর বটব্যাল এমনিও রাখবে না। আস্তে আস্তে সবটাই পাকা ক'রে ফেলবে। তখন আমাকেও উঠতে হবে বৈকি।'

'পরিবার সংসার কোনোদিনই ছিল না নাকি ?' উনুন সাজিয়ে আগুন দিতে তৈরি হবার আগে মায়া একবার ঘাড় সোজা করল। তার গলার বুকের

উদ্ধত পেশীর সুন্দর ভঙ্গি দেখতে ভুবন ফ্যাকাশে চোখে আবার রং আনতে চেষ্টা করছে টের পেয়ে মায়া ঘাম মুছবার অছিলায় আঁচলটা নামিয়ে কোলের ওপর জড়ো করল। তারপর একটা পোকা বা মাকড়ের দিকে স্থির সতর্ক দৃষ্টি রেখে টিকটিকি যেমন চুপচাপ বসে থাকে কতক্ষণ ও সেভাবে বসে রইল। কেনই বা থাকবে না। কুয়োতলায় যখন ও স্নান করে খোলা গায়ে সাবান মাখে পাশের মুমূর্ষু মাদার গাছটা পিটপিট চোখে তাকিয়ে থেকে থেকে পরে হঠাৎ এক সময় যখন ওর সঙ্গে কথা বলে শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে তখন কি ও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সতর্ক সন্দিগ্ধ চকিত হয়ে ওঠে না! ধারালো দৃষ্টি হেনে গাছটাকে পরীক্ষা করার পর মায়া নিশ্চিন্ত হয়। চমক ত্রাস জয় ক'রে আবার স্বাভাবিক গলায় গানের গুনগুনি তুলে বুকে পিঠে সাবান ঘষে। এখনও তাই হল। বাদলা দুপুরের পচা ভ্যাপসা গরম তার ওপর ভুবনের পুরোনো ছোট্ট আবর্জনায় ঠাসা ঘরের অস্বস্তিকর গুমোটে ঘেমে ও স্নান ক'রে উঠছিল। কপালে গলায় ঘাম। গলার নিচে বুকের স্তনের পাশে পাশে মুক্তাবিন্দু হয়ে মুহুর্মুহু ঘাম জমছে আর পরমুহূর্তে তারা ভেঙে গলে ঝরে পড়ছে। সবল সুস্থ হাতে আঁচল ঘষে ঘষে মায়া ঘাম মুছল। ভুবনের দিক থেকে চোখ সরাল না। যেন শরীরটাকে আরও একটু স্বস্তি দিতে শাড়ি শায়া গুটিয়ে হাঁটুর খানিক নিচে পর্যন্ত তুলে ধরল। তারপর আশ্চর্য ঠাণ্ডা নরম গলায় প্রশ্ন করল, 'লঙ্কা পেঁয়াজ ঘরে আছে? পচা মাছ রসুন ছাড়া চলবে না কিন্তু।'

'দেখি, হয়তো আছে।' যেন অত্যন্ত অনিচ্ছায় নধর সুডৌল পায়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ভুবন ঘরের এদিক-ওদিক দেখে। 'রসুন থাকতে পারে, পেঁয়াজ যেন ফুরিয়ে গেছে।'

'নিয়ে আসুন, আমি উনুন ধরিয়ে দিলাম।'

ভুবন লঙ্কা পেঁয়াজ খুঁজতে উঠে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে দেখল উনুন ধরেনি, কেবল গলগল ক'রে ধোঁয়া উঠছে। আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এক জোড়া চোখ ছুরির ফলার মতন চকচকে ঝকঝকে হয়ে গেছে।

শুকনো পাতার খসখস শব্দ হল।

'দিদির চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে।'

'কেন, কিসের ভয়।' মায়া নরম গলায় হাসল।

'বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার খুঁজছে, সে-রকম দৃষ্টি, সেই চোখ।' খসখসে গলায় ভুবন হাসে। 'মিছে বলছি না কিন্তু।'

মায়া কথা বলল না।

। আরো জোরে চেপে এল।

কিন্তু জলের ঝমঝম ছাপিয়ে বাইরে অদ্ভুত একটা ডাক শোনা গেল। যেন ঘরের পিছনে অসহ্য উল্লাসে একটা ভুতুম পাখি গলা ছেড়ে ডাকছে।

আর সেই মুহূর্তে দপ্‌ ক'রে উনুনে আগুন জ্বলে উঠল।

ভুবন খুশী। কালো চোখের মধ্যে আগুনের নাচ দেখতে পেয়ে মুখটা মুখের কাছে সরিয়ে আনল। 'দিদির চোখ জোড়া আরো সুন্দর আরো ভয়ানক লাগছে এখন।'

'কি রকম, কিসের মতন শুনি?' গর্বে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত করল মায়া।

'যেন বাঘিনী শিকার ধরেছে। খুশীর রক্তে দু' চোখ লাল।' খসখস ক'রে ভুবন হাসে।

মায়া কথা বলে না। কি ভাবে। তারপর আগুনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার ঘরে আরশি আছে?'

ভুবন মাথা নাড়ল। 'ছিল। ভেঙে গেছে।'

'তবে আর কি।' যেন তাচ্ছিল্যের শীতলতা দিয়ে মায়া চোখের আগুন নিভিয়ে দিল।

'নিন পেঁয়াজটা ছাড়িয়ে ফেলুন। বসে থাকলে রান্না নামবে কি। শিলনোড়া থাকলে দিন চট্‌ ক'রে লঙ্কা দুটো বেটে নিই। হলুদ কোথায়?'

মরা মাছের ফ্যাকাশে চোখ তুলে ভুবন ঘরের এদিক-ওদিক দেখে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠে যায়। কাঠ। মরা গাছ চোখের সামনে হাঁটছে। বিদ্যুৎশিহরণ মেরুদাঁড়ার অর্ধেক পর্যন্ত এসে মিলিয়ে গেল টের পেয়ে মায়ার কান্না পায়। বাঁ-হাতের কনিষ্ঠা ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুপ ক'রে ভাবে।

অফিস থেকে প্রণব সকাল সকাল ফেরে।

ফজলি আম নিয়ে এল, এক ডিবি পাউডার কিনে আনল।

মায়া হাসল। তা বিকেলে ও সেজেছিল ভাল। সুন্দর খোঁপায় এতবড একটা নীল অপরাজিতা গোঁজা। সিঁদুরের ফোঁটাটা টকটক করছে সিঁথিমূলে। অপরাজিতা রঙের ব্লাউজ। ব্লাউজের সঙ্গে মিলিয়ে হাল্কা কমলা রং শাড়ি। ঠোঁটে রং আছে কি না প্রণব বুঝতে পারল না। তোয়ালের কোণায় আলতা লাগিয়ে ঠোঁট ঘষা হতে পারে। প্রণব অনুমান করল। তার ঘরে লিপ্‌স্টিক নেই।

'নাও, এইবার পাউডারটা মেখে ফেল। পাউডার তো ফুরিয়েছিল।'

'ব্‌বা। অফিস থেকে তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়েছ কি! আমার সুন্দর মুখের কথা ভেবে? বিকেলে কতক্ষণে পাউডার মেখে সাজব বলে!'

'তো, তুমি কি মনে কর। তোমার কি মনে হয় না সারাক্ষণই আমি একটি মুখের কথা ভাবি? অফিসে যেতে, অফিসে বসে, অফিস থেকে বেরিয়ে?'

'বাড়াবাড়ি। তুমি যে আমার কথা মনে কর না তা আমি কখনো মনে করি না। বরং দুঃখ, একটু বেশি মনে রাখো বলে। একটু কম ক'রে যদি রাখতে আমি সুখী হতাম। আমার জীবন সুখের হ'ত।' মায়া একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলল।

আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না ভেবে প্রণব চুপ ক'রে গেল। কাপড়চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধোয়। পাউডার ও আম সরিয়ে রেখে মায়া চা করতে বসে।

ফুরফুরে একটা হাওয়া বইছিল।

বাদলা দুপুরের পর রোদ-লাগা বিকেল বড় চমৎকার। ভালয় ভালয় চা খাওয়াটিও হল। এক সঙ্গে বসে। মুখোমুখি হয়ে বসে গল্প করল দু'জন।

একটা হলদে প্রজাপতি দু'জনের মুখের সামনে ওড়াউড়ি করল। সেই দুপুরের ডালিম-ডালে-বসা প্রজাপতি। দেখে তখনকার ছবিটা মনে হতে মায়া চুপ ক'রে রইল।

'কত বড় পতঙ্গ!' একবার ইচ্ছা করছিল তার প্রণবকে বলে। বলে: 'সুন্দর আরো কত জিনিস পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে একবার চোখ মেলে দেখো।' কিন্তু একটা জরুরী কথা এসে যাওয়াতে মায়ার আর তা বলা হয় না। ইচ্ছা করেই চুপ ক'রে রইল। তারপর অবশ্য ও কাজের কথায় মুখ খুলল: 'তা তোমার যখন বন্ধু তখন ওটা ক'রে ফেল না। একটু কমিয়ে টমিয়ে দেবে খরচ। এ-বয়সে প্রিমিয়াম চালাবার সাহস যদি না-পাও তবে আর কবে পাবে, আর হবে কি।'

প্রণব চুপ ক'রে মায়ার মুখ দেখে কথা শোনে।

'আমি তোমায় এটুকুন বলতে পারি। তিন হাজার টাকার ইন্সিওর করেও এই আয়ে আমরা সুন্দর চালিয়ে যেতে পারব। দুটি তো মুখ। তুমি আর আমি। কিচ্ছু কষ্ট হবে না প্রিমিয়াম চালাতে।' মায়া চুপ করল।

প্রণব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল। মায়া মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকায়। মনের ভাব বুঝতে পেরেছে আশঙ্কা ক'রে প্রণব চুপ করে রইল। খরচ চালাতে পারবে কি পারবে না। ভবিষ্যতে এই সংসারে তিনটি মুখ হবে কি চিরকাল তারা এমনি দু'জন থাকবে। পলিসির চাঁদা চালাতে অসুবিধাটা কি ইত্যাদির আলোচনা আপাতত চাপা দিতে প্রণব হঠাৎ শব্দ করে হাসল।

চমকে উঠল মায়া।

'খুব খুশী দেখছি!'

'একটা মজার গল্প তোমাকে বলা হয়নি। আজ শুনলাম।'

প্রণব ঝুঁকে গলাটা বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু গল্প শুনতে স্ত্রীর খুব আগ্রহ নেই চোখের রং দেখে সে টের পেয়ে আবার গম্ভীর হয়। সোজা হয়ে বসে।

'উঠি, উনুনে আঁচ দিতে হয।' হাই তুলে মায়া বাইরে উঠোনে গাছের মাথায় সোনার পাতের মতন রোদের শেষ ঝিকিমিকি দেখে। প্রজাপতিটা উড়ে বেরিয়ে গেছে। কোন্‌দিকে গেছে মায়ার চোখে পড়ছিল না। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এক জোড়া বুলবুলি প্রাণপণে যত পারছিল ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে নিমফল খেয়ে নিচ্ছিল। পাখার ঝাপটায় পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা হযে নিচে ঝরছিল। ডুমুরজঙ্গলের দিকে চোখ গেল মায়ার। এ বাড়িতে ওখান থেকে অন্ধকার নামে, সন্ধ্যা শুরু হয। এর মধ্যেই দুটো জোনাকি এসে জুটেছে ওধারে। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল মায়া।

'গল্পটা শুনবে ?' ভয়ে ভয়ে প্রণব প্রশ্ন করল।

'কার গল্প কিসের গল্প !' মাযা ঘাড় ফেরালো না।

'অফিসে সুকুমার আমাকে বলল, সুকুমার ভঞ্জ।'

মায়া নীরব।

'সুকুমারদের পাড়ায় ঘটনাটা ঘটেছে।'

কিন্তু ও-পক্ষের কোনোরকম উৎসাহ নেই লক্ষ্য করে প্রণব আবার দমে যায়। চুপ করে থাকে। মায়া উঠে দাঁড়ায়। 'চলি—উনুনে—'

যেন শেষ উদ্যম নিয়ে প্রণব বেশ বড় গলায় হাসল : 'গল্পটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তুমি বিশ্বাসই করবে না যে—'

'আহা বলো না, এতক্ষণে তো বলা হয়ে যেতো।' বিরক্ত কণ্ঠস্বর। যেন গল্পটা অগত্যা শুনতেই হবে, না হলে আর একজন ভীষণ অসন্তুষ্ট হবে চোখ-মুখের এমন ভাব প্রকাশ করে মায়া ধপ ক'রে বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'কি গল্প শুনি ?'

'সুকুমারদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক তার বাড়ির ঝিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। পরশুর ঘটনা। এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি। বেশ বড় বড় দু-তিনটি-ছেলেমেয়ে। স্ত্রী, হ্যাঁ, ভদ্রলোকের স্ত্রীও যে অসুন্দরী এমন না। দিব্যি দেখতে-শুনতে মহিলা। সুকুমার দেখেছে। কাল চার-পাঁচবার নাকি ফিট্‌ হয়েছে। মহিলার দাদা এ জি অফিসের বড় চাকুরে। খবর শুনে ছুটে এসে কাল তিনি থানায় খবরও দিয়েছেন—কিন্তু তাতে কি আর—হা-হা।' শব্দ করে প্রণব হাসল। 'সুকুমারদের পাড়ায় সে এক বিশ্রী হৈ-চৈ—'

কিন্তু স্ত্রীর ভুরু দেখতে দেখতে প্রণবের হাসি মিলিয়ে গেল।

বড় তাড়াতাড়ি সে গম্ভীর হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সে নির্লজ্জের মত হেসেছে।

'কী রুচি তোমার, কী বিশ্রী স্বভাব!' মায়া চেয়ার ছেড়ে উঠল। 'এই গল্প শোনাতে তুমি পাগল হয়ে ছুটে এসেছ ঘরে।' একবার থামল, উঠোনের ঘাসের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল একটুক্ষণ, তারপর প্রণবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল মায়া।

'তুমি কি জান না যে এসব গল্প আমি কোনোদিনই ভালবাসি না। তোমায় কি আমি একদিন বলিনি যে এসব কুৎসিত ঘটনা ইচ্ছা হয় তুমি গিয়ে আর কাউকে শোনাবে। আর কাউকে যতক্ষণ খুশি বসে থেকে রসিয়ে ফেনিয়ে বলে শেষ করে তবে ঘরে ফিরবে। আমাকে না, আমার কাছে এসব—'রাগে মায়া কাঁপছিল। 'ছিছি,—কোন্ ভদ্রলোক বাড়ির ঝির সঙ্গে পালালো, কোন্ লোক অফিসের টাইপিষ্ট মেয়ে দেখে ভুলেছে, কোন্ ছেলে বাসে-দেখা মেয়ের কাছে প্রেমপত্র লিখল, এসব ছাড়া কি পৃথিবীতে আর গল্প নেই, ঘটনা ঘটে না? আমি অন্য রুচির মানুষ। আমি কক্ষনো এসব কুৎসিত বাজে ছাইভস্ম কথাবার্তা ভালবাসি না, শুনি না। যদি ভাল কথা, সুন্দর কথা অফিসের বন্ধুদের কাছে শোন বাড়ি এসে বোলো, সারারাত বসে কান পেতে শুনব, শুনতে রাজী, বুঝলে।'

'হিতে বিপরীত হল।' একলা চুপ করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা বারান্দায় বসে প্রণব ভাবল। স্ত্রীর অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য এই গল্প না করে অন্য কোনো প্রসঙ্গ তোলা উচিত ছিল। কি প্রসঙ্গ, এমন কোন্ বিষয় আছে যে, শুনলে মায়া খুশী হ'ত। প্রণব তার দু' বছরের বিবাহিত জীবনকে আর একবার সূক্ষ্মভাবে জরীপ করল। করে কিছু দেখতে না পেয়ে পেয়ারাতলার অন্ধকারের দিকে চেয়েছিল। অন্ধকারে একটা বিড়াল ঘুরঘুর করছিল। প্রকাণ্ড ধুমসী বিড়াল। ছাই রঙের। ধোঁয়া রঙের। যেন এই জন্যই দৃশ্যটা আরো খারাপ লাগছিল। তাকাতে ইচ্ছা করছিল না প্রণবের। অস্পষ্ট এলোমেলো চঞ্চল ঘোলাটে। বোঝা যায় না কোনটা বিড়াল কোনটা অন্ধকার। গুলিয়ে যায়। যেন এই ধরনের বিবাহিত জীবন তার। পুরুষের কাছে নারী এর চেয়ে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন হয়ে ধরা দেয় না। দেবে না! এক খাবলা অন্ধকার। হঠাৎ নড়েচড়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তারপর আবার চলন্ত ধূর্ত শিকারী মুখের গরম রক্ত মুছে চোখের নিমেষে জমে অন্ধকার হয়ে যায়। পেয়ারাতলার চাপচাপ অন্ধকারের কিছুটা। নিরবয়ব নির্বোধ। অস্তিত্বকে রেণু রেণু করে রহস্যের অতল অন্ধকারে মিশিয়ে দিতে, নিশ্বাস ফেলার শব্দটি না করে সংসারের সাত কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে মায়ার জুড়ি আর কেউ আছে কিনা চিন্তা করে প্রণব যেমন ক্রুদ্ধ হল তেমনি হতাশ হল। হতাশই বেশি হল। যা

স্বাভাবিক। সুখী না, বিয়ে করে এই জীবনে কেউ সুখী না। বন্ধুরাও বলে বটে। কেন সুখী না, কি দিয়ে সুখী না তার চুলচেরা হিসাব অবশ্য আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। প্রণব তার নিজের সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য হিসাব কারো কাছে তুলে ধরতে পেরেছে কি। পারল না। পারে না বলেই বুকের মধ্যে এক টুকরো কান্না নিয়ে মাটির অন্ধকার থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায। একটি মোটে তারা সেখানে। কিন্তু তা হলেও ঘোলাটে অন্ধকারের চেয়ে সূচের আগার মতন সূক্ষ্ম উজ্জ্বল এক বিন্দু আলোর মধ্যে অনেক বেশি শান্তি অনেক আশা লুকিয়ে থাকে। রাত বাড়লে আলোর ফুটকি বাড়ে আশার ইশারা আকাশে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে। কোন্ এক বন্ধু তাকে পরামর্শও দিয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে খিটিমিটি বাধলে কথায় কাজে না বনলে চুপচাপ বসে রাত্রির অপেক্ষা করবে। আর একমুঠ অন্ধকার তোমার চারপাশে নামুক আরো কিছু তারা মাথার ওপর ঝিকিমিকি করুক। তারপর। তাই চুপচাপ একলা অন্ধকারে মশার কামড সহ্য ক'রে বসে থেকে প্রণব গাঢ গূঢ় রাত্রির অপেক্ষা করে। এটা প্রায অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।

মায়া ?

প্রণবের মত বাজে ভাবনাচিন্তা তার কোনোদিনই নেই।

আজও করল না।

বরং ততক্ষণ ক্ষিপ্র সুন্দর হাতে ও নতুন করে ঘর ঝাঁট দিল। বিছানা পাতল। আলো জ্বালল। আরো যা কিছু শোবার ঘরের টুকিটাকি কাজ শেষ করে শেষবারের মতন দেয়ালের আয়নায মুখখানা একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে রান্নাঘরেব দিকে চলল। শোবাব ঘরের পিছনে ছোট্ট চালা।

কিন্তু সেখানে পা দিয়ে তখনি তার আলো জ্বালতে ইচ্ছা হল না। অন্ধকার চালার নিচে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ও বাইরের দৃশ্যটা দেখে। কাদের বাড়ির একটা লিচু চারা, একটা নারকেল গাছ ওধারে। তারপর আকাশ। আকাশের কিনারে শাদা এক পোঁছ আলোর ইশারা জেগেছে। তার অর্থ চাঁদ উঠছে। এখনি উঠবে। একটা অদ্ভুত সময়। বৃষ্টির ভিজে হাওয়া মাযার চোখেমুখে লাগল।

আর ঠিক তখন ও শুনতে পেল কোন্‌দিকে গাছের পাতার আড়ালে একটা পাখি যেন ঠোঁট ঘষছে। হয়তো পাখি পাখির ঠোঁট ঘষে দিচ্ছে। দৃশ্যটা কল্পনা করে মায়ার রোমাঞ্চ হল। ইচ্ছা করে ও খোঁপাটা খুলে ফেলল। ঘাড়ের কাছে বেণীটা একটু সময় সাপের মতন প্যাঁচ খেয়ে লেগে থেকে তারপর হঠাৎ লাফিয়ে পিঠ বেয়ে কোমরের ওপর এসে ঝুলতে লাগল।

একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় মায়া। একটু ঝুঁকে ঈষৎ বাঁকা হয়ে।

আঁচলটা আর ঘাড়ে লেগে থাকে না, লুটিয়ে নিচে পড়ে।

বস্তুত তখন মায়ার সৌন্দর্য যে দেখেছে সে বলবে!

কিন্তু কে দেখবে।

কেউ দেখবার নেই বলে ভিজে হাওয়ার মতন একটা ভারি নিশ্বাস তার বুক ঠেলে গলার কাছে উঠে এসে যন্ত্রণা করতে থাকে। কিন্তু অল্পক্ষণ। খুব অল্প সময়ই প্রণবের জন্য ও দুঃখ করে। কেননা মায়া জানে এখানে এখন চাঁদ ওঠার দৃশ্য দেখতে প্রণবকে ডেকে আনলেও সে তা দেখতে পাবে না। পারে না। সেই চোখ নেই। পাখির ঠোঁট ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ? সেই কান নেই। কেন নেই, আর কি নেই স্বামীর ভাবতে মায়া আজ বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ভুলে থাকে। একটু একটু করে দু' বছরের অভ্যাসের পর এখন, আজ, নিজেকে ও বেশ সবল শক্ত মনে করছিল। আর এই জন্যই প্রণব কাছে ছিল না বলে তার এত ভাল লাগছিল।

ডুমুর-জঙ্গলের মধ্যে গিরগিটিটা হঠাৎ কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল। মায়ার বুকটা কাঁপল। একবার। পরমুহূর্তে ও সহজ স্বাভাবিক হয়ে বরং মনের স্ফূর্তিটাকে একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে উড়ন্ত জোনাকিটাকে ধরে ফেলল। জোনাকি ছুঁলে কি হয় ছেলেবেলায় শোনা কথাটা মনে হতে ও ঠোঁট টিপে হাসল। এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে, রাত্রে বিছানায় সেটি করার ভয় অবশ্য নেই ভেবে মায়া নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ বিস্ফারিত করে যেন প্রায় শব্দ করে আর একবার হাসল, তারপর পোকাটাকে দেখতে লাগল। হাতের মুঠ খুলে আবার বন্ধ করল ও। আবার খুলল। খুঁটিতে আর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে পা ছড়িয়ে বসল। ইঁট দিয়ে এক চিলতে বাঁধানো জায়গা। পা ঝুলিয়ে বসলে নিচের ঘাসে পায়ের গোড়ালি ঠেকে। মায়ার এটা ভাল লাগে। সাপের আস্তানা হবে ভয় দেখিয়ে প্রণব সব ঘাস কেটেছেঁটে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলতে চেয়েছিল,—মায়া দেয়নি। সাফ করতে হয় সাপের ভয় থাকে সামনের দিকের উঠোন পরিষ্কার কর। এটা নয়। রান্নাঘরের পিছনের এই ছোট্ট ঘাস লতা আগাছার জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে মায়ার। তার নিজস্ব জগৎ। এখানে আর কারোর হাত লাগানো কি হাত বাড়ানো ও বরদাস্ত করে না। বলতে কি, ঘাসের মাথায় পা ঠেকলে পায়ের তলা যখন খসখস করে মায়ার খুব ভাল লাগে। চোখ বুজে ও এই খসখসটা অনুভব করে। যেন হাল্কা পাতলা মেয়েলি পা পেয়ে ঘাসের শিষগুলো ইচ্ছামতন সুড়সুড়ি দিতে থাকে। না, প্রণব একদিন ছোট্ট একটা পালক (সম্ভবত পায়রার) দিয়ে তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়েছিল, বেশ কিছুদিন আগে, কিন্তু মায়ার তা ভাল লাগেনি। বরং তার রাগ পেয়েছিল। মুখে বলেনি

যদিও কিছু। কিন্তু চোখমুখের ও এমন ভাব করেছিল যে, তারপর আর একদিনও প্রণব এ ধরনের রসিকতা করতে সাহস পায়নি। কেন ভাল লাগেনি কেন খারাপ লাগল তা নিয়ে মায়া মাথা ঘামায় না। শুধু ঘটনাটা তার মনে আছে। এখানে এখন ঘাসের শিষে পা ঠেকিয়ে সেদিনের কথা ভেবে ও হাসল। বস্তুত প্রণবের অধিকাংশ কাজই কেন ভাল লাগে না একদিন ঠাণ্ডা-মেজাজে বসে ভেবে দেখবে মায়া ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু বসা আর হয় না, যেন সময়ই পাচ্ছে না ও। বস্তুত যে জিনিস ভাবতে গেলে মন প্রফুল্ল না হয়ে বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত হয় তাকে নিয়ে বসতে তার জন্য কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করতে যেন প্রকৃতিই তাকে দিচ্ছে না। প্রণবকে নিয়ে ও যে কী মুশকিলে পড়েছে তা যদি ঈশ্বর জানত।

চমকে উঠল মায়া। হাতের মুঠ আলগা করে আলোর পোকাটাকে দেখতে না পেয়ে ও অবাক হল, হতাশ হল। একটু ভাবতে গেছে আর তখনি এমন সুন্দর জিনিসটা হারিয়ে ফেলল! এদিক ওদিক তাকাল ও, হাতের পিঠ দেখল, পা, পায়ের নিচের ঘাস—কোথাও নেই। তা ছাড়া উড়ে যেতেও তো পারে না। যা-ই ভাবুক, যতক্ষণই ভাবুক মায়া চোখ বুজে ছিল না। উড়ে যাবার সময় পোকাটাকে ও দেখতে পেত। না, আছে! এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে দুষ্টু এসে বসবে মায়ার স্বপ্নের বাইরে। কখন এল? চোখ ফেরাতে পারছিল না মায়া। ভিজে হাওয়ার স্পর্শ পেতে এখানে এসেই ও ব্লাউজের বোতাম খুলে দিয়েছিল। প্রণব না থাকলে খালি-গা হয়েই বসত। (গায়ে জামা না-রাখা প্রণব পছন্দ করে না। দিনের বেলা এমনকি রাত্রেও। দরজায় খিল না দেওয়া পর্যন্ত, আলো নিভিয়ে বিছানায় না ঢোকা পর্যন্ত মায়া বুক পিঠ ঢেকে রাখবে—হ্যাঁ, দাবি ছাড়া একে আর কি আখ্যা দেবে মায়া, স্বামীর দাবি? ভাবতে মায়ার বিশ্রী হাসি পায়, করুণা করে ও লোকটাকে মনে মনে। যাক সেসব।) এখন ও স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নিজের বুকের দিকে চেয়ে রইল। সরু ঢালু জায়গা-টুকুতে একটা সবুজ মুক্তা হয়ে স্থির হয়ে বসে আছে জোনাকিটা। মুক্তার গা থেকে ঠিকরে পড়া হাল্কা সবুজ আলোয় তার বুক এখন সত্যিকাবের কাঁচা ফলের মতন দেখাচ্ছে। বিদ্যুৎশিহরণ খেলা করে গেল মেরুদাঁড়ায়। মায়া অনুভব করল নিজের বুক দেখে এত বেশি মুগ্ধ অভিভূত ও আর কোনোদিন হয়নি। আর একদিনও না। ওকি? উড়ে যাচ্ছে! উড়ে গেল? হা করে চেয়ে রইল মায়া। হাত উঠল না। হাত বাড়িয়ে আবার ওটাকে ধরবার তিলমাত্র চেষ্টাও করল না ও। বরং চরম তৃপ্তির পর দারুণ আলস্য ও অবসাদ নিয়ে মানুষ যে চোখে কোনো একটা কিছুর চলে যাওয়া দেখে ঠিক সেভাবে ও চুপচাপ ডুমুরতলার অন্ধকারের দিকে আলোর পোকার উড়ে যাওয়া দেখল। কতক্ষণ এমনি স্থির

হয়ে একভাবে বসে কাটাল মায়ার খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হল দেখল গাছের পাতা চুঁইয়ে জল পড়ার মতন বর্ষারাত্রির নীল ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না তার নরম শরীরের ওপর একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে। আলস্য-ভঙ্গের হাই তুলে ও উঠে দাঁড়াল। ওধারে পেঁপে গাছের কাণ্ড আর নোনাধরা দেয়ালের মাঝখানে এক টুকরো মাকড়সার জালে কখন জানি দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির জল লেগেছিল, জ্যোৎস্না পড়ে এখন চিকচিক করছে অল্প হাওয়ায় থেকে থেকে কাঁপছে। না, উত্তরদিকে শাদা একটা ডেলা ছাড়া আকাশে আর কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। ঘাড় উঁচিয়ে মায়া সবটা আকাশ দেখতে চেষ্টা করল, তার নিজের ঘরের চালের জন্য বাকিটুকু দেখা গেল না যদিও। তা হলেও মায়ার মনে হল আজ রাত্রে আর বৃষ্টি হবে না। কী যে ভাল লাগছিল ওর। যেন শরতের রাত ভেবে একটা টিয়া পাখি কিচমিচ শব্দ করতে করতে রান্নাঘরের চাল ঘেঁষে একদিকে উড়ে গেল। কোনো আতাগাছে গিয়ে বসবে হয়তো, মায়া ভাবল, না কি কামরাঙা গাছে ?

হ্যাঁ, হঠাৎ ভীষণ খারাপ লাগল তার কথাটা মনে হতে। এখন উনুন ধরাতে হবে। যদি উনুন না ধরায় ও যদি রান্না না করে, আজ, একটা রাত কি চলে না। খুব চলে। কেন চলবে না। অন্তত মায়ার কোনো অসুবিধা হয় না। আম আছে। প্রণব ফজলি আম এনেছে। একটা আস্ত আম যদি খায় ও তো ভাতের দরকার হয় না। তাই খেয়ে দিব্যি শুয়ে পড়তে পারে। কিন্তু প্রণব পারবে কি ? ভাত না হলে ? প্রস্তাবটা দেবে ভেবে মায়া ইতস্তত করতে লাগল। এক পা অগ্রসর হয়ে আবার দাঁড়াল ও। প্রণব কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? কেন জানি কেবলই মনে হচ্ছিল তার বারান্দার চেয়ারে বসে প্রণব ঘুমোচ্ছে।

বরদাসুন্দর বটব্যালের শহরতলির (ধরুন না টালা) এক জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন বাড়ির ভাড়াটে দম্পতির রান্নাখাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে গল্প দীর্ঘ হয়ে যাবে। কেবল এইটুকু বললে চলবে যে, মায়াকে রান্না করতে হল। প্রণব চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েনি। পায়চারি করছিল সিগারেট টানছিল। চিন্তামগ্ন। কিছু ভাবছে বুঝতে পেরে মায়া কাছে ঘেঁষেনি।

আয়োজন সামান্য। ভাত আর ইলিশমাছের ঝোল। চট্ করে রান্না হয়ে গেল। দু'জনে খেতে বসে কথা হল না।

যেন দু'জনেই ভাবছিল এখন কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না। ভালয় ভালয় খাওয়া-দাওয়াটা শেষ হোক্।

খাওয়া সেরে লবঙ্গ মুখে দিয়ে প্রণব পিঠটা এলিয়ে দিয়ে বিছানায় বসল।

এঁটো বাসন জড়ো করে রেখে হাত ধুয়ে মুখ মুছে মায়া ঘরে এল।

প্রণব হাত বাড়িয়ে হারিকেনের আলো চড়িয়ে দিল।

মায়া চিরুনি হাতে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

শোবার আগে চুল আঁচড়ানো তার চিরদিনের অভ্যাস। মায়া পান খেয়েছে। ইলিশমাছ খেয়ে মুখে আঁশটে গন্ধ লাগছে ব'লে পান খেয়েছে। এমনি অভ্যাস নেই। প্রণব পান খায় না। কাকে দিয়ে মায়া পানের খিলিটা কিনিয়ে এনেছে প্রণব জিজ্ঞেস করল না। কেবল লাল টুকটুকে এক জোড়া ঠোঁটের দিকে সে চেয়ে রইল।

'ব্লাউজটা খুলে ফেল না হয়, খুব ঘামছ।'

মায়া শব্দ করল না বা প্রণবের দিকে তাকাল না।

সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে প্রণব চুপ করে রইল।

চিরুনি চালাবার সময় মায়ার হাতের চুড়ির রিনঠিন শব্দ হয়। মায়ার হাত মাথা চুলের ছায়া এই এত বড হয়ে দেয়াল ও সিলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ছায়ার দীর্ঘ ঢেউ হয়ে চুলটা উঠছে নামছে তুলছে। আর সেই ঢেউ-এর বুকে চিরুনির ছায়াটা একটা ছোট্ট নৌকো হয়ে নেচে নেচে চলেছে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রণব দৃশ্যটা দেখল। একটা পোকা ঘরে ঢুকেই আলোর কাছে ছুটে এসে হারিকেনের চিমনির গায়ে ঠোক্কর খেয়ে নিচে ছিটকে পডল। মেঝের আবছা অন্ধকারে পোকাটাকে আর দেখা গেল না।

'আলো নিভিয়ে দেব ?' মায়া ঘুরে দাঁড়ায়।

'তোমার হয়ে গেছে ?' উৎসাহের চোখে প্রণব স্ত্রীর মুখ দেখল ও পিঠ টান ক'রে সোজা হয়ে বসল।

'হওয়া আর কি।' তেমন ভাল ক'রে কথার উত্তর দিল না মায়া। চিরুনি রেখে দিয়ে চুলে প্যাঁচ তুলে কোনোরকমে একটা এলোখোঁপা করে রাখল।

'আলো নিভিয়ে দিই ?' মায়া আবার বলল।

'যা ঘামছ জামাটা খুলেই ফেল।' প্রণব ঈষৎ ঝুঁকে বসল।

মায়া আলোটা দেখতে লাগল।

প্রণব ইচ্ছা করে সামান্য হাসল।

মায়া নীরব।

হামাগুড়ি দিয়ে প্রণব বিছানার লাগোয়া জানালার পাল্লাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘুরে বসল।

মায়া মুখ তুলছিল না।

ভুরু পর্যন্ত হারিকেনের আলো লেগেছিল ওর। কপালটা অন্ধকার ছিল বলে অসংখ্য কুঞ্চন প্রণব দেখতে পেল না তাই সাহস করে গলাটা একটু ভিজিয়ে

মোলায়েম সুরে বলল, 'না না আমি তো বলছি, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। আর আমি আমার স্ত্রীকে দেখছি। অন্য কাউকে না।'

স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া ক্ষীণ হাসল। হাসির মধ্যেও দুটো চোখ জ্বলছিল। প্রণব ঢোক গিলল।

'না না রিয়্যালি বলছি। আমি যে অন্যায় কিছু করছি না; আমি যে, আমিও যে তোমার মতন বাইরের এত লোকের এত সব কীর্তি কত বেশি অপছন্দ করি এটা তোমার কাছে প্রমাণ দিতে তোমাকেই দেখতে চাই। এর চেয়ে পবিত্র কাজ আমার পক্ষে আর কি আছে তুমিই তার রায় দাও।'

একটা টিকটিকি ঘরের চালে ডেকে উঠল।

একটা ভীষণ আপত্তি আঙুলের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে মায়া ব্লাউজের বোতামে হাত দিল।

প্রণব একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'আমার চেয়ে ভাল রুচি যে আর কারোর নেই তুমি কি আজ দু'বছর বিয়ের রাত থেকে কালকের রাত পর্যন্ত টের পাওনি ? রিয়্যালি আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি সুকুমারদের পাড়ার সেই ভদ্রলোকদের ক্লাসের লোককে। ছি ছি ছি, শেষ পর্যন্ত ঝি! আমার উচিত হয়নি জঘন্য খবরটা এনে তোমার কানে তোলা।'

'যাক আর বেশি বকতে হবে না। এইবার আলো নিভিয়ে দিই। শুতে দাও।'

একটু সময়ের জন্য প্রণব নিশ্বাস ফেলল, 'কেন ?'

'লজ্জা করে, ভাল লাগে না।'

প্রণব একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ত্যাগ করল।

'লজ্জা করে।' একটু থেমে পরে সে বলল, 'বলো ভাল লাগে না, আমাকে তোমার ভাল লাগে না, তাই এরকম করছ।'

'কি রকম ?'

প্রণব কথা বলল না।

'দু' বছর আমায় দেখে কি তৃপ্ত হওনি।'

'হইনি হইনি।' যেন প্রবল ক্রোধে প্রণব এবার ফেটে পড়ল। তৃপ্তি পাই না শান্তি পাই না বলে এখন বাতির আলোয় তোমার রূপ দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিছুটা ক্ষতিপূরণ হোক।'

'ও সেইজন্যেই ক্ষোভ।' মায়া আঁচলটা তুলে বুকের ওপর জড়ো করল। একটু পায়চারি করল। দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে আয়নার সামনে একবার দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে প্রণবের সামনে ফিরে এল।

'সেই চিন্তা সেই ধ্যান তোমার। এই জন্যেই ঘরে আলো রেখে নিজেকে আমি দেখাতে চাই না।' মায়া খুব আস্তে বলল না। তাতে অবশ্য ক্ষতি হল না। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সুন্দর ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আকাশ মেঘে মেঘে কালো অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। এখন ঝমঝম ক'রে বর্ষণ শুরু হল। যেন হুতুম পাখিটা অসময়ে দু'বার ডেকে উঠল।

আলো নিভিয়ে মশারির ধারগুলো টেনে দিতে দিতে মায়া বলতে লাগল, 'সেই পাপ চোখের সামনে নিজেকে খুলে ধরতে লজ্জা করে বৈকি। ভালও লাগে না।'

'বেশ তো, যাকে ভাল লাগে তাকে দেখাও তার সামনে সব খুলে মেলে দাঁড়িও।' প্রণব দেয়াল ঘেঁষে বিছানার একপাশে শুয়ে রইল। 'আমি আর দেখতে চাইব না।'

'কে দেখছে কাকে দেখাচ্ছি যদি জানতে তো তোমার মন একটু উন্নত হ'ত। রোজ রাত্রে আমার জন্যে তুমি এমন হ্যাংলামো করতে না।'

'অ, তা হলে কেউ দেখছে,' শ্লেষের সুর বার করল প্রণব। 'তা হলে বলো এমন কেউ আছে যাকে সব দেখিয়ে সব দিয়ে তৃপ্তি পাও, আমাকে না?'

'হ্যাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এসে আমার গায়ে গন্ধ শোঁকে, গাছ, গাছের পাতা, শালিক বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোনো মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না। তোমাকে দেখে দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, অন্তত আমার।'

'কখন দেখাও,' যেন একটু হাসতেই চেষ্টা করল প্রণব। 'আকাশের নিচে কোথায় ব'সে সব খুলে দাও আমাকে বলতে পার?'

'ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।' মায়া শুয়ে ছিল। রাগ করে উঠে বসল। 'নিশ্চয়ই আমাকে একসময় স্নান করতে হয়, কাপড় বদলাতে হয়। ইতর অভদ্র কোথাকার!'

কিছুক্ষণ আর কথা শোনা গেল না প্রণবের। যখন শোনা গেল মনে হল ঘুমে কথাগুলো গাঢ় ভারি হয়ে গেছে। অভিমানেও হতে পারে, মায়া ভাবল।

'তাই তো বলি তোমার মতিগতি বোঝা ভার। তাই তো বন্ধুরা বলে নারী-চরিত্র। আর এদিকে সারাক্ষণ আমি ভেবে ভেবে মরি। পাউডার ফুরোতে পাউডার নিয়ে এলাম। ফজলি আমের চালান এসেছে এক টাকার আম কিনে আনলাম।'

'সস্তা জিনিস দিয়ে সস্তা জিনিস আদায় করো। আমার কাছে পাবে না। তেরো বছরের খুকির কাছে গিয়ে এই কান্না কেঁদো—পাবে। আমি আর

তোমার কান্নায় গলে যেতে রাজী নই, যত খুশি চোখের জল ফেলো।'

সত্যিই প্রণব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যেন বালিশ ভিজে যাচ্ছে।

একটা বিশ্রী গুমোটে মায়ার মাথা ধরছিল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে তার ভাল লাগল। কান খাড়া করে শুনল। হঠাৎ আবার বৃষ্টিটা থেমে গেছে। টের পাচ্ছিল ও। আস্তে আস্তে বিছানার দিকের, না, উল্টোদিকের জানালায় সরে গিয়ে ছুটো পাল্লা খুলতে বাইরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল ও। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। 'মেঘের পর রৌদ্রের মতন।' মায়া মনে মনে বলল। রাত্রেও চাঁদের আলো আর বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা চলছে। যেন কোনদিকে কদমফুল ফুটেছে। ভিজে হাওয়ায় টাটকা গন্ধ ভেসে আসছিল।

এক পা এক পা ক'রে ও আর একবার বিছানার কাছে সরে এল। নাক ডাকছে, কাঁদতে কাঁদতে এইবেলা প্রণব ঘুমিয়েছে। কান খাড়া ক'রে রাখল ও একটু সময়। আর ঠিক তখন মায়া শুনল বাইরে পাতার ঝোপে একটা পাখি ডানা ঝাড়ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো জলের ফোঁটা ঝরে পৃথিবী আবার চুপচাপ। নিঝুম।

চিকরিকাটা আলপনায় ভুবনের পৈঠা ভরে গেছে। ডুমুরপাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়ে পড়ে এই কাণ্ডটি হয়েছে। এক সঙ্গে এত আলোছায়ার ঝিলিমিলি দেখে মায়ার চোখের পলক পড়ছিল না। আর তাকেও অপরূপ দেখাচ্ছে। অজস্র জ্যোৎস্না ছায়া বুকে মুখে মেখে খুঁটি ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে মায়া বসে আছে। একদৃষ্টে ভুবন তাকিয়ে দেখল!

'নিন ধরুন।'

'ছি, এতগুলো ফুল নিয়ে এলেন—মালা! দোপাটির মালা। কোথায় পেলেন?'

'বৌবাজার।' খসখসে গলায় ভুবন উত্তর করল। স্টোভটা সারিয়ে পার্টিকে বুঝিয়ে দিতে ওদিকে যেতে হল কিনা। বাজারের ভিতর দিয়ে ফিরছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ে গেল।'

মায়া কথা বলল না।

'নিন, পরুন মালাটা, গলায় আটকে দিন। একবার চেয়ে দেখি কেমন লাগে।'

'এলোখোঁপা,' ভুবনের হাত থেকে মালাটা তুলে নিয়ে মায়া ক্ষীণ গলায় হাসল। 'ভাল দেখাবে কি।'

'সবরকম খোঁপাতেই ভাল দেখাবে। দিদির এই চুলে দোপাটি গুঁজলেই হল।'

'শাদা ফুল।'

'রাত্রে খুলবে ভাল। রাতের চুলে শাদা মানায়।'

খোঁপায় মালা জড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়া বাইরের উঠান দেখে। জলে জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলো চিকচিক করছে। হাওয়ায় নড়ছে। পেয়ারা পাতা থেকে টুপটাপ রূপালি জল ঝরছে।

'সেই দুপুর থেকেই মগজে দোপাটি ফুল ঘুরছিল। কপাল ভাল পেয়ে গেলাম, দিদিকে সাজাতে পারলাম।'

মুখ ফিরিয়ে মায়া শব্দ না করে হাসল। কি একটু চিন্তা ক'রে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'সাজাবার, সাজ দেখবার এত শখ। তাই তো জিজ্ঞেস করছিলাম পরিবার সংসার কি কোনোদিনই নেই, ছিল না?'

শুকনো পাতার খসখস শব্দ হয় ভুবনের গলায়।

'ছিল, তা সেসব ইচ্ছা করে বলিনি, কি হবে বলে।'

'তা, শুনি?'

'একবার না তিনবার। তিন-তিনটে পরিবার ঘরে আনলাম, একটাও থাকেনি।' ভুবন চুপ করল।

'কোথায় ওরা?'

'প্রথমটা মরেছে কলেরায়, দ্বিতীয়টা মরল ছেলে বিয়োবার সময়, হুঁ মরা ছেলে বেরিয়েছিল। আর শেষটা পালাল আমাদের কারখানার এক ছোকরার সঙ্গে। তাও তো ক'বছর হয়ে গেল।'

কথা শুনে মায়া চমকে উঠল না, মরা কাঠের জীর্ণ কাঠামোটার দিক থেকে বিস্ময়ে ও চোখ ফেরাতে পারছিল না। কিন্তু কথা তখনও শেষ হয়নি, একটু থেমে ভুবন বলে, 'এখন আবার আমাদের উল্টাডাঙ্গার শশী বায়না ধরেছে। আজ ছ'মাস ধরে ঝোলাঝুলি করছে। হুঁ, একটা মেয়ে আছে ওর হাতে। বিধবা ভাগ্নীর মেয়ে। সোমত্থ মেয়ে কাঁধে নিয়ে মাগি ভারি বিপদে পড়েছে, তাই শশী ঘুরঘুর করছে।'

জলতরঙ্গের মিষ্টি বাজনার মতন মায়ার নরম হাসির ধ্বনিতে চারদিকের আলোছায়া কাঁপে। আবার কোনদিকে পাতার আড়ালে পাখি ডানা ঝাপটায়। হাসি থামতে মায়া বলল, 'বলেন কি, এই বয়সে আবার! আপনি সাহস পান?'

'পাই না, সাহস পাচ্ছি না বলে তো শশীকে কথা দেওয়া হচ্ছে না।'

'না, না, পারবেন না। সাহস করবেন না।' ব্যস্ত হয়ে মায়া বলল, 'শশীকে বলে দিন এই বয়সে আর ওসব হয় না।'

'তা বুঝি, তা কি আর বুঝি না দিদি।' মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে আবেগে ভুবন হিসহিস করে উঠল। 'কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।'

পাথরের মতন স্থির শক্ত হয়ে গেল মায়া। এক মুহূর্ত তারপর অনায়াস সহজ ভঙ্গিতে মরা গাছের জীর্ণ ডালের বেড থেকে নিজেকে মুক্ত করল, ক'রে সোজা হয়ে বসল। ফ্যাকাশে ঘোলা চোখে কতটা রক্তের জোয়ার এসেছিল আবছা অন্ধকারে বুঝতে না পেরে কেমন একটু অসহায়বোধ করল ও। তা হলেও সেই ভাবটা কাটাতে ওর দেরি হয় না, আস্তে আস্তে বলল, 'শশীকে বারণ ক'রে দিন, বুঝলেন, শশীকে বলে দিন যে এ বয়সে আর—'

'বলব, আমি মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছি, শশীকে শেষ কথাটা বলে দেওয়াই ভাল।'

হঠাৎ আর কথা বলে না মায়া। ঘাড ফিরিয়ে উঠোন দেখে। যেন নিজের ঘরের দিকে চোখ যেতে কি ভাবে।

'কি, কর্তাবাবু কি জেগেছেন, এইবেলা জাগবেন ?' ভুবন গলা বাড়িয়ে দেয়। মায়া নিঃশব্দে মাথা নাডল, থুথু ফেলল, যেন থুথু ফেলতেই উঠোনের দিকে মুখ বাড়িয়েছিল ও। তারপর ঘুরে বসে শান্ত মোলায়েম গলায় বলল, 'এই জংলা ছিটের শায়াটা আমাকে কেমন মানিয়েছে বলছেন না তো, কেমন দেখাচ্ছে ?'

খসখসে গলায় ভুবন হাসল।

'বলব, বলছি, ওটা পরনে দেখে তখন থেকেই তুলনাটা আমার মনের মধ্যে কেবল নডাচড়া করছে। চিতাবাঘিনী, বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘষা কোমর দিদির।'

'তাই নাকি, ঘরে গিয়ে আয়নায় দেখব তুলনাটা ঠিক হল কিনা।'

'কেন, আবার আয়না কেন, আমার চোখকে কি দিদির বিশ্বাস হয় না ?' যেন এই প্রথম ভুবনের গলায় দুঃখের আওয়াজ বেরোলো। 'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্‌ব জেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে ক'রে রেখেছি, ছানি পডতে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।'

যেন এই প্রথম মায়া ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠেছিল, এই প্রথম তার কান্না পেল, কিন্তু কোনোটাই ও হতে দিলে না। ভয় কান্না দুটোকেই জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করল ও। তাই উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে ও হাসল। 'বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি, বলুন ?'

শ্বাপদ

আমার পড়ার ঘরে ঢুকে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একবার মাত্র বই থেকে মুখ তুলে আগন্তুকের চেহারাটা দেখে নিলাম। যেন ঐ একবার তাকানোই যথেষ্ট। তাতেই বুঝে নিলাম মানুষটি কেমন। বলতে কি, প্রথম দর্শনেই আমার মন কেমন খারাপ হয়ে গেল, এই মানুষ আমার সঙ্গে থাকবে, এখানে খাবে, হয়তো আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবে চিন্তা করে মনটা ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল।

আস্তে আস্তে সে আমার পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে একটা বই তুলল। নামটা পড়ল। দুটো পাতা ওল্টাল। তারপর আবার বইটা রেখে দিল।

আমি তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাঁধানো খাতাটা টেনে নিয়ে ক্লাসের অঙ্কগুলি টুকে নিচ্ছিলাম। টেবিলে ছোট টাইম্‌পীসটা টিকটিক শব্দ করছিল। কিন্তু সেই মৃদু শব্দ হঠাৎ যেন অস্বস্তিকর লাগছিল। যেন আমার কাজে বাধা দিচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল আমার খুব গরম লাগছে, কানের ভিতর দিয়ে গরম বাতাস বেরোচ্ছে। কাজ করা আর হল না। খাতাটা বন্ধ করে কলমটা হাত থেকে এক রকম ছুঁড়ে ফেলে রেখে দুপদাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একটা লোকের উপস্থিতি যে কত খারাপ লাগতে পারে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। অথচ সে আমার কোন অপকার করছিল না, কোনরকম অনিষ্ট-চিন্তা করছিল না। কিন্তু তবু কেন তার ওপর আমার এই বীতস্পৃহা রাগ আক্রোশ প্রথম দিন থেকে বুকের ভিতর দানা বাঁধতে শুরু করল ভেবে পাই নি। হয়তো তাই হয়। রাস্তায় একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে—নাম ধাম জানি না স্বভাবচরিত্র কেমন শুনিনি, অথচ লোকটাকে একটুখানি দেখেই কেমন ভাল লেগে গেল, বাসে উঠলাম, আর একটা মানুষ সদয় হয়ে এক পাশে সরে বসে আমাকে বসতে একটু জায়গা করে দিল, কিন্তু কেন জানি মানুষটাকে দেখেই আমার এত খারাপ লাগল যে মুখ ঘুরিয়ে রড্ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম; সাধারণ একটা ধন্যবাদ জানাবার মতন আমার মনে উদারতা জাগা দূরে থাক— তার পাশে বসতে হবে চিন্তা করে দেহমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অথচ চেহারায়

পোশাকে তাকে ঘৃণা করার কিছু নেই। তবু তার ওপর আমার বিরক্তি বিদ্বেষ ঘৃণা। কাজেই মানুষকে অপছন্দ করার ঘৃণা করার কারণ যেমন চট করে হাতের কাছে খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি ভাল লাগার যুক্তিও যে সর্বদা উপস্থিত থাকবে বলা শক্ত। যুক্তির চেয়ে চোখের দেখাটাই আগে মনের ওপর কাজ করে। যেমন সেদিন আমার পড়ার ঘরে মানুষটাকে দেখামাত্র তার ওপর আমার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের ডালিম গাছটা দেখছি, পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে আমার পাশে দাঁড়াল। বুঝলাম আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু অত চট্ করে আলাপ জমাবার সুযোগ তাকে কে দেয়! আমি গম্ভীর হয়ে নীচে নেমে গেলাম। ঘাসের ওপর পায়চারি করতে লাগলাম। যা আশঙ্কা করলাম, সে নীচে নামল। রাগে দুঃখে আমি সেখান থেকে একরকম ছুটতে ছুটতে বাইরে রাস্তায় চলে গেলাম। আমাকে এভাবে ছুটতে দেখে সে অবাক হয়েছিল, টের পেয়েও আমি দূরে সরে গেলাম, তার নাগালের বাইরে; তার ছায়া আমার ছায়ার সঙ্গে মিশতে দেব না এমন একটা কঠিন প্রতিজ্ঞায় আমার দু পাটির দাঁত কঠিন দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

সকালটা এভাবে কাটল। রাস্তায়, কখনো বাগানে। বাড়ির ভিতর ঢুকতে ইচ্ছা করছিল না। স্কুলে অঙ্কের মাষ্টারের বিস্তর বকুনি খেলাম হোমটাস্ক করা হয়নি বলে। মুখ ফুটে কিছু বললাম না। হয়তো আমি যদি সুকুমারবাবুকে বুঝিয়ে বলতাম কি কারণে অঙ্কগুলি করে আনা হয়নি তো তিনি নিশ্চয় আমাকে গালমন্দ না করে চুপ করে যেতেন, একটু সহানুভূতি দেখাতেন।

কিন্তু কি করে বলি, বাড়িতে একটি লোক এসেছে, আমার এক মাসতুত ভাই —যাকে দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। পড়ার টেবিলের কাছে ঘেঁষেছিল যখন তার গায়ের বোটকা গন্ধ ঘামের গন্ধ আমার নাকে লেগেছিল; শুকনো পেঁয়াজের শিকড়ের মত চার পাঁচটা অসমান দাড়ি থুতনি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, মাথার চুলগুলি খাড়া খাড়া, নখগুলি বড় বড়; রং চটা ছোট একটা হাফ-প্যান্ট পরনে—যা তার বয়স ও দেহের কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বেমানান ঠেকছিল; মুগুরের মাথার মতন জবরদস্ত হাঁটু দুটোর দিকে তাকিয়ে কথাটা আমার মনে হয়েছিল। এমন একটা অপরিচ্ছন্ন বুনো চেহারার মানুষ আমার মাসতুতো ভাই —আর সে আমাদের বাড়িতে থাকবে খাবে শোবে, হয়তো আমার ঘরে আমার বিছানায় আমার পাশে শোবে চিন্তা করে সারা সকালে আমার মাথা গরম ছিল, অঙ্কের স্যার সুকুমারবাবুকে যদি বুঝিয়ে বলতে পারতাম! না, কাউকে বলা হল না। ক্লাসে চুপচাপ মুখভার করে বসে আমার সারাদিন কাটল। সহপাঠীদের

গল্পে যোগ দিতে পারিনি। লীগের খেলা, সিনেমা, রকেট, গ্যাগারিন, ইংলিশ চ্যানেল—কত কি গল্প বুদ্বুদের মতন আমার নাকের সামনে চোখের সামনে ভেসে বেড়াল ঘুরে বেড়াল—আমি একটা বুদ্বুদ ওড়াতে পারিনি একটাও ফুঁ দিয়ে ভাঙতে পারিনি। কেবল বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সব দেখলাম, শুনলাম। মনে হচ্ছিল আমি অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেছি, পরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। তাদের সঙ্গে কথা বলবার মিশবার অধিকার আমার নেই। কেমন কান্না পাচ্ছিল। দূরে বা কাছে এমন একটি মাসতুত ভাই আমার থাকতে পারে কোনদিন চিন্তা করিনি। ওরা—সহপাঠী বন্ধুরা আমার ওই ভাইটিকে দেখলে নির্ঘাত হেসে ফেলবে নাক সিঁটকাবে। আমার এমন জংলী চেহারার এক ভাই আছে যখন তারা জানতে পারবে তাদের কাছে আমিও অস্পৃশ্য হয়ে যাব।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছিল না।

নিশ্চয় পথের দিকে হাঁ করে সে তাকিয়ে আছে। আমার জন্য অপেক্ষা। আমার সঙ্গে কথা বলতে মিশতে মানুষটা কী ভীষণ ছটফট করছিল তখন বোঝা গেছে। সকালবেলা বলা কওয়া নেই একটা ফাইবারের স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে হাঁটু অবধি ধুলো নিয়ে সে যখন বাড়িতে ঢুকল আমি তা দেখে অবাক। ঢিপ করে মাকে প্রণাম করল বাবাকে প্রণাম করল। মা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'চিনতে পারিস? ছোটবেলায় দেখেছিস—তারপর তো আর দেখা হয়নি, তোর মাসতুত ভাই—গণেশ। সোদপুরের মাসিমার ছেলে।' সোদপুরে আমার এক মাসিমা ছিল জানতাম, ক বছর আগে তিনি মারা গেছেন তা-ও শুনেছি—হাঁপানীর রোগী মেসোর কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে—রোগের জন্য তেমন ভাল কাজকর্ম জোটাতে পারছেন না, তার ওপর একটা বড় মেয়ে ঘাড়ে, একটা ছেলে আছে। মাঝে মাঝে বাবা ও মাকে সেই মেসোর কথা বলাবলি করতে শুনতাম। বোন নেই, কিন্তু তা হলেও মা সেই রুগ্ন মেসো ও তাঁর ছেলেমেয়েকে দেখতে একদিন সোদপুরে গিয়েছিল—তা-ও প্রায় বছর ঘুরতে চলল। এখন সেই সোদপুরের মাসির ছেলে যে এই ছেলে—এই চেহারা আমি কি করে জানব। মাথায় খাড়া খাড়া চুল ও থুতনির আগায় পেঁয়াজের শিকড় কটা দেখে আমার প্রথমটায় এমন হাসি পাচ্ছিল। তালগাছের মতন ঢ্যাঙা শরীর। আর মনে হচ্ছিল লোকটা কালা বোবা হবে। মা তাকে কী প্রশ্ন করছে হয়তো শুনতে পাচ্ছে না; বাবা কী জিজ্ঞেস করছেন বুঝতে পারছে না। কেমন যেন অসহায় শূন্য দৃষ্টি তুলে ধরে বাবাকে দেখছিল মাকে দেখছিল এবং ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার আমাকে দেখছিল। ঠিক কালা বোবা না হলেও, বোকা মূর্খ আস্ত একটি গর্দভ হবে ওই

তালগাছের মতন মানুষটা চিন্তা করে আমি আমার পড়ার ঘরে চলে এলাম। তারপর বুঝি সেই মানুষ মার কথামতন জামাকাপড় ছেড়েছে, মুখ হাত ধুয়েছে, হাঁটুর ধুলো পরিষ্কার করেছে এবং মার দেওয়া চা রুটি যা হোক কিছু খেয়ে আস্তে আস্তে একসময় আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকেছিল। পড়ার ঘর মানে আমার থাকবার শোবার বসবার পায়চারি করবার এবং অনেক কিছু করবার ঘর। আমার সংসার, আমার পনেরো বছরের জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল চার ফুট ছ ফুট ওই কুঠরিটা। মুনিঋষিদের যেমন গুহাগহ্বর থাকে এবং সেটাই তাদের একমাত্র জগৎ আমার পড়ার ঘরটাও আমার সেই গোপন সুরক্ষিত পবিত্র নির্জন জগৎ। সেখানে হঠাৎ এমন বিদ্‌ঘুটে চেহারার একটা মানুষকে ঢুকে পডতে দেখে কি রাগটাই না আমার তখন হয়েছিল।

কিন্তু এখন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমার নানারকম দুর্ভাবনা হচ্ছিল। যদি দুপুরে আবার সে আমার ঘরে ঢুকে থাকে! বইগুলি ঘাঁটতে পারে, টেবিলের টানাটা খুলে দেখতে পারে; আমার বিছানার বালিশের তলায় কী আছে না আছে শূন্য ঘরে সব নেড়েচেড়ে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করতে থাকে তাকে বাধা দেবে কে। বাবা অফিসে, মা নিজের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, চাকরটা এসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাস পিটতে নিজের আড্ডায় চলে যায়, সুতরাং—

নিশ্চয় বইগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে কোনো না কোনো একটার পাতার খাঁজের ভিতর লুকিয়ে রাখা দু তিনটে চিঠি ও একটা ফটো তার চোখে পড়বে, টানাটা খুললে প্লাস্টিকের ছোট সেফ্‌টি রেজারটা দেখে ফেলবে; মা কোনোদিন আমার বই বা টেবিলের টানা ঘাঁটাঘাঁটি করে না, বাবাকে তো এজীবনে আমার পড়ার ঘরে উঁকি দিতেই দেখিনি, কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে আমি সবকিছু টেবিলের টানার ভিতর বইয়ের খাঁজের মধ্যে রেখে দিতে পারতাম। বালিশের নীচে আজ ভুল করে সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে এসেছি। পারতপক্ষে মা আমার বিছানা ধরে না, দরকার হলে চাকরটাকে পাঠিয়ে দেয়, চাদরটা ওয়াড়টা খুলে আমি তার হাতে তুলে দিই সাবান দিয়ে কেচে দিতে কি ডাইংক্লিনিং-এ পাঠাতে। কিন্তু তা হলেও সিগারেটটা দেশলাইটা আমি বালিশের নীচে কি তোষকের নীচে রাখি না। আজ কেমন ভুল হয়ে গেল। আর ঠিক আজই সেই লোক আমার ঘরে ঢুকবে। না, ওই গেঁয়োটাকে আমি ভয় করি না। কোথায় সোদপুরের ছেলে আর আমি খাস বালিগঞ্জের ছেলে। এই বয়সে আমি সিগারেট খাচ্ছি কি দাড়ি গোঁফ কামাচ্ছি কি কিছু গোপন চিঠিপত্র ও আমার প্রিয় দু একজন ফিল্ম স্টারের ছবি বইয়ের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি তা আমি দেখব। এসবের জন্য ওই কিম্ভূত-কিমাকার চেহারার গণেশচন্দ্রের কাছে জবাবদিহি দিতে বড একটা গ্রাহ্য করব

কিনা। না, আমার ভয়, যদি মাকে বলে দেয়। চিঠির জন্য ভয় করি না। কেননা যে চিঠি লিখেছে সে আমার 'খোকন' নামের পরিবর্তে বুদ্ধি করে 'মণি' নামটা ব্যবহার করেছে। কাজেই এই চিঠি আমার কাছে লেখা নয়, এক বন্ধুর চিঠি, বন্ধু আমার কাছে রাখতে দিয়েছে মাকে স্রেফ বুঝিয়ে বলা যাবে। সেফটি রেজারের জন্যও ভয় করি না। আমার নাকের নীচে ও থুতনিতে কানে চুল গজাচ্ছে—ঘামলে মুখ কুটকুট করে, অসুবিধা হয়—তাই সেগুলি পরিষ্কার করতে অস্ত্রটা হাতের কাছে রাখতে হয়। মাকে বুঝিয়ে বলব, তুমি তোমার বোনপোর মুখখানা একবার ছাখ, তার থুতনির ওই জঙ্গল দেখতে যদি তোমার ভাল লাগে তবে এখন থেকে আমিও না হয় আমার মুখটা এমন নোংরা করে রাখব। কিন্তু আমরা যে জায়গায় আছি যে-পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছি তাতে কোনোরকম নোংরামি অপরিচ্ছন্নতা বরদাস্ত করতে শিখিনি, তুমি তা ভাল করে জান মা। স্কুলে যাবার সময় জুতোটা চকচকে না থাকলে কি মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান না থাকলে তুমি রাগ কর চোখ রাঙাও। কাজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি থেকে না যায় সেদিকে ছোটবেলা থেকে আমার কড়া নজর —তোমার কাছ থেকে এই নজর পাওয়া, বাবার কাছ থেকে পাওয়া। নিশ্চয় বাবা টের পেয়েছেন আমি এখন থেকেই ব্লেড দিয়ে মুখ চাঁচতে আরম্ভ করেছি। সেদিন খাবার টেবিলে বসে বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর টের না পাওয়ার কিছু কথা নয়। তার ওপর পুরুষ। মা রেজার ব্লেডের কারবার করেন না। কাজেই আমার মুখ দেখে তাঁর টের পাবার কথা নয়। কিন্তু সেদিন সেই নীরব হাসির মধ্যে কি আমার এ-কাজের প্রতি সুন্দর একটা সমর্থন ছিল না। তাই তো তিনি চুপ করে গেলেন। স্কুলের সীমানা ডিঙিয়ে পরে কলেজে ঢুকব আর আমি দাড়ি গোঁফ কামাব, তার আগে রেজার হাতে তোলা দোষের এমন কুসংস্কার বাবার নেই। কাজেই এদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত। ফিল্ম-স্টারের ছবি বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা যদি দোষের হয় তো আমাদের বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে যে ক্যালেণ্ডার-গুলি ঝুলছে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলতে হয়। অথচ বাবা সেগুলি অফিস থেকে আনতে না আনতে মা কত যত্ন করে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে। হ্যাঁ, ভয় ওই সিগারেটের জন্য। সিগারেট ধরেছি এই বয়সে জানতে পারলে মার বিস্তর বকুনি খেতে হবে। চাই কি বাবার কানে কথাটা উঠে যেতে পারে। ওই গেঁয়ো ভূতটাই না সরাসরি বাবার কাছে প্যাকেটটা নিয়ে হাজির করে। যেমন আহাম্মকের মতন চেহারা কাজকারবারও সেরকম হবে। বুকটা দমে গেল। কেমন বিশ্রী একটা ভয় গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যন্ত্রণা দিতে লাগল। বাড়িতে

ঢুকতে পা দুটো সরছিল না।

কিন্তু ঈশ্বর যার সহায় হন তাকে কে কী করতে পারে!

সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় উঠতে দৃশ্যটা আমার চোখে পড়ল। বাবার বসবার ঘরের সোফার ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে সোদপুরের গণেশচন্দ্র ঘুমোচ্ছে। চমৎকার নাক ডাকছে। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকলাম। হাঁ করে ঘুমোচ্ছে মানুষটা। কষ বেয়ে লালা ঝরছে। সোফার নীল বনাতের ওপর টুপ টুপ করে সেই লালা ঝরে আধুলির সাইজের একটা কালো দাগ ধরে গেছে জায়গাটায় এর মধ্যেই। যেন সেই লালার গন্ধে কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে ঘুমন্ত মানুষটার মুখের কাছে ঘুরঘুর করছে। ঘেন্নায় আমার গা বমি বমি করতে লাগল। ঐ বয়সে কোনো মানুষের কষ বেয়ে লালা ঝরতে দেখলে কার না ঘেন্না হয়। তেমনি পা টিপে টিপে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে আমি আমার ঘরে চলে এলাম। সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের বইগুলি দেখলাম। না, ঠিক আছে সব, কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করে নি। টেবিলের টানাটা খুলে দেখলাম, যেমনটি সব রেখে গেছলাম জায়গা-মতন রয়ে গেছে, বোঝা গেল কারো হাত পড়েনি। বালিশটা তুলতে সিগারেটের প্যাকেটটা চোখে পড়ল, চট করে ওটা সেখান থেকে সরিয়ে ফেললাম। কোণায় পুরনো খবর কাগজের জঞ্জালের মধ্যে আপাতত ওটা গুঁজে রাখলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত। হাল্কা নিশ্বাস ছেড়ে জামাকাপড় ছাড়লাম। 'বোকা লোক', মনে মনে বললাম, 'একদিক থেকে ভাল। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে আমার পড়ার ঘরে ঢুকে এটা ওটা নাড়াচাড়া করত, কোথায় কি আছে না আছে খুঁজতে আরম্ভ করত।' কিন্তু তা না করে বাইরের ঘরে সোফার ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে বলে সোদপুরের মাসতুত ভাইটি সম্পর্কে আমার তিক্ততা ও বিদ্বেষ যেন একটু কমল।

হাত পা ধুয়ে খেতে বসেছি, তখন মা কথাটা তুলল।

'গণেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোর?'

'না তো' এসে দেখি বাবার বসবার ঘরে সোফার ওপর হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। সারা দুপুরই ঘুমোচ্ছে বুঝি?'

মা অল্প হাসল।

'সোদপুর থেকে হেঁটে এসেছে। অতটা রাস্তা হাঁটা যায়। ওইটুকুন ছেলে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'কেন, বাস বা ট্রেনের পয়সা জোটাতে পারেনি বুঝি?'

'ভীষণ গরীব। একবেলা খাচ্ছে তো আর একবেলা উপোস থাকছে।' মা গম্ভীর হয়ে গেল।

'এখানে কদিন থাকবে ?'

'তার ঠিক কি। বলছে কাজকর্মের চেষ্টায় এসেছে।'

'চাকরি।' আমি প্রবলবেগে মাথা নাড়ালাম। 'ওই চেহারায় কেউ চাকরি দেবে না।' একটু থেমে পরে বললাম, 'কদ্দুর লেখাপড়া করেছে শুনি ?'

'লেখাপড়া আর হল কোথায়। বলছিল সেভেন কেলাসে উঠে আর পড়া চালাতে পারেনি। ইস্কুলের মাইনে দিতে পারে না। নাম কাটা গেছে।'

'তবেই হয়েছে। সাত ক্লাসের বিদ্যা নিয়ে চাকরি! অফিসের বেয়ারার কাজও জুটবে না।'

'না, চাকরি করবে কেন, চাকরি করতে আমি দেব নাকি ওই দুধের ছেলেকে। আমার কাছে যখন এসেছে, দেখি, আবার ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে পারি কিনা।'

যেন দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠলাম।

'এখানে ? আমাদের স্কুলে ? আমার সঙ্গে রোজ যাবে ?'

'কেন', আমার চেহারা দেখে মা ঈষৎ হাসল। 'তুই কি মাথায় করে নিয়ে যাবি ওকে !'

'ধেৎ, সে কথা বলছে কে।' গজগজ করে উঠলাম, 'দাড়িগোঁফ গজিয়েছে, এখন যদি ও আবার সেভেন ক্লাসে পড়তে যায় সবাই হাসাহাসি করবে। আমার ভীষণ লজ্জা করবে ওর সঙ্গে স্কুলে যেতে—আমি কাউকে বলতেই পারব না এমন গেঁয়ো জংলী চেহারার ছেলে আমার আত্মীয়—মাসতুত ভাই।'

'ছি !' মা ধমকের সুরে বলল, 'ভাইকে এসব বলে নাকি কেউ ? গেঁয়ো জংলী হবে কেন, তোর চেয়ে ওর মুখখানা দেখতে বেশি সুন্দর।' একটু থেমে মা কী চিন্তা করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি সেজেগুজে থাক, আদর যত্নে আছ তাই মাজাঘষা চেহারা। না হলে গণেশের গায়ের রং তোমার চেয়ে ভাল। আর অতবড় ছেলে সেভেন কেলাসে ভর্তি হলে ছেলেরা হাসবে—তা হাসুক, সব বয়সেই মানুষ সব কেলাসে পড়তে পারে, লেখাপড়ায় আবার নিন্দা আছে নাকি।'

'ওই বয়সে কলেজে পড়লে মানাত।' হাসতে যাচ্ছিলাম। মা ভুরু কোঁচকালো।

'ওই দেখতেই মনে হয় না জানি কত বয়স হয়েছে গণেশের, আসলে ওর শরীরের বাড়টা একটু বেশি, দেখছি কেমন যেন ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে এদিকে। ও কিন্তু তোরও ছ মাসের ছোট।'

চমকে উঠলাম, মার কথাটা বিশ্বাস করতে কেমন বাধল।

'তুই হয়েছিস এক ফাল্গুনে, আর তার জন্ম ঠিক পরের ভাদ্রে। হিসাব করে ত্যাখ্ না।' মা আঙুলের কড় গুণতে আরম্ভ করল। ঠিক এমন সময় চোখ রগড়াতে রগড়াতে সেখানে গণেশ এসে হাজির। গালে লালার দাগটা তখনো লেগে আছে। যেন মার চোখে তা পড়ল না।

'ঘুম ভাঙল,' আদুরে গলায় মা বোনপোকে কাছে ডাকল, 'আয় একটু দুধ পাউরুটি খেয়ে নে। এই যে খোকন এসেছে। তখন না বার বার বলছিলি, দাদার ইস্কুল কখন ছুটি হবে কখন বাড়ি আসবে।'

পাছে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয় সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু টের পেলাম, সত্ত ঘুম ভাঙা করমচা রঙের বড় বড় চোখ দুটো মেলে ধরে সোদপুরের মানুষটা আমাকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখছিল।

আর তখন থেকে আমিও তাকে নতুন চোখে দেখতে লাগলাম। আমি কালো, তার গায়ের রং বেশ ফর্সা। আমার চোখ ছোট, তার চোপ দুটো বড় বড়, উঁচু ধারালো নাক—আমার নাক চেপ্টামতন। বয়সে ছোট হয়েও সে আমার চেয়ে মাথায় লম্বা হয়ে গেছে। সেই অনুপাতে তার হাত পা গলা পিঠ কোমর সবই আমার চেয়ে বড় মোটা ও পুষ্ট। মার কাছে বসে সে যখন দুধরুটি খাচ্ছিল মার ঘরের বড় আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিয়ে একটা চোরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

অবশ্য আমার মনের ক্ষোভ বেশিক্ষণ রইল না। সোদপুর মানে পাড়া গাঁ। বন জঙ্গলে ভর্তি। সেখানকার মানুষগুলিকে তুমি বুনো জংলী বলতে পার। শহরের মানুষের চেয়ে বুনো জংলীরা বেশি উঁচু লম্বা জোয়ান জবরদস্ত হবেই। আগাছার মতন তারা বেড়ে ওঠে। আমাদের বালিগঞ্জের পার্কের একটা গাছের সঙ্গে জঙ্গলের একটা গাছের তুলনা করলে বেশীকমটা যেমন চোখে পড়ে। বাবা সেদিন কি কথায় যেন বলেছিলেন, সভ্য মানুষ চিন্তাশীল মানুষ, দিনরাত যারা এ-ব্যাপারে সে-ব্যাপারে বুদ্ধি খরচ করে বেড়াচ্ছে তারা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও ক্ষয় করছে—কাজেই অসভ্য জংলী জানোয়ারদের মতন প্রকাণ্ড একটা দেহ সভ্য মানুষদের হয় না। অর্থাৎ বাবা বলতে চেয়েছিলেন, কেবল শরীরের দিক দিয়ে বেড়ে যাওয়া অসভ্যতার লক্ষণ। এখানেও তাই। গণেশচন্দ্রের লম্বা হাত পা চওড়া কাঁধ কোমর আমাকে আর ঈর্ষান্বিত করতে পারল না। কেবল তার নাক চোখ ও ফর্সা রংটাই যা থেকে থেকে মনটাকে খোঁচা দিতে লাগল। কিন্তু ঝাঁটার কাঠির মতন মাথার খাড়া খাড়া চুল ও অপরিচ্ছন্ন থুতনির ছবিটা মনে করে সেই খোঁচাটাও একসময় ভুলে যেতে পারলাম। পাছে সে আমার পিছু নেয় তাই

তাড়াতাড়ি বাঁড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। জলখাবার খেয়ে সোজা আমাদের লেক-ক্লাবে চলে গেলাম। মনের আনন্দে সেখানে সাবাটা বিকাল বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করলাম। বাড়িতে এক হবুচন্দ্র মাসতুত ভাই এসেছে কথাটা অনেকক্ষণ ভুলে ছিলাম।

ক্লাবের পিন্টু ও নস্তুর সঙ্গে লেকের ধাবে বসে গল্প করে সন্ধ্যাটাও কাটালাম। কিন্তু যখন বাড়ি ফেরার সময় হল সেই মুখটা আমার মনে পড়তে আরম্ভ করল।

'কি হল, হঠাৎ চুপ করে গেলি যে ?'

নস্তু প্রশ্ন করছিল। জোর কবে হাসলাম।

'না ভাবছি, এখন গিয়ে আবাব বই নিযে বসতে হবে।'

'ও, তাব জন্য মন খারাপ।' পিন্টু হাসল, পড়ার বই পড়তে আমাব যখনই খারাপ লাগে আমি স্রেফ একটা সিনেমার কাগজ খুলে বসি।'

'কাগজটা বুঝি টেক্সট বইয়ের তলায় লুকিয়ে বেখে পড়তে বসিস ?'

'তা ছাড়া কি !' পিন্টু গম্ভীর হয়ে গেল। কত আর নাসিরুদ্দিন মামুদ আর গিয়াসুদ্দিন বলবন মুখস্থ করা যায়। কাজেই তখন—'

'কাজেই তখন সিনেমার কাগজটা খুলে দূরের-মাযা বইয়ের নতুন নাযিকা— কি যেন নাম ? নস্তু আমার দিকে তাকাল।

'চামেলী চ্যাটার্জী।' হেসে বললাম।

'চামেলীর মুখখানা দেখি—কেমনবে পিন্টু।' পিন্টুর পিঠে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল নস্তু।

'মাইরি বলছি।' পিন্টু দু চোখ বুজে ফেলল, 'চামেলীকে আমি ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন দেখি।'

'ধেৎ, তার চেয়ে প্রথম-পলাশ-ফুলে যে মেয়েটা নামছে—কি যেন বে নাম, খোকন ?' নস্তু আমার দিকে তাকাল।

'ইরা সোম।' বললাম আমি।

'অনেক বেশি মিষ্টি চেহারা।' নস্তু চোখ দুটো প্রায় বুজে ফেলল।

'আমার ভাই স্বাতী সেনের মুখটাই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। মরুর-বুকে ছবির নায়িকা।' বললাম, 'তোদের বলতে বাধা নেই, জিওম্যাট্রি পড়ার আগে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্বাতীর মুখখানা দেখে নিই।'

'জিওম্যাট্রি বইয়ের ভিতর স্বাতীর ফটো লুকিয়ে রাখিস নিশ্চয় ?' নস্তু প্রশ্ন করল।

'তা ছাড়া কি।' আমি হাসলাম।

সত্যি, কত আর ট্রাপিজিয়ম আর রম্বস মুখস্ত করা যায়।' পিন্টু এতক্ষণ পর

আবার হাসল ! 'আয় এইবেলা সিগারেট খাওয়া যাক।' পিন্টুর জামার পকেট থেকে তকতকে ঝকঝকে একটা নতুন প্যাকেট বেরিয়ে এল। তিনজন প্রাণভরে লেকের ধারের মিষ্টি হাওয়া খেতে খেতে সিগারেট টানলাম। বাড়িতে লুকিয়ে সিগারেট খেয়ে আরাম হত না বলে তিন বন্ধু রোজ সন্ধ্যার দিকে এমন একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে ধূমপানের আসর জমাতাম।

একটু রাত করে বাড়ি ফিরলাম। যেন মাংস রান্না হচ্ছিল। গন্ধ পেলাম। আশ্বস্ত হওয়া গেল। মা যেদিন মাংস রান্না করে বাবা সেদিন রান্নাঘরে বসে থাকবেনই। অসীম উৎসাহ তাঁর এ-ব্যাপারে, দরকার হলে হাতা দিয়ে উনুনের হাঁড়িটা দুবার নেড়েচেড়ে দেন তিনি। কাজেই রাত করে বাড়ি ফেরার জন্য আর ভয় রইল না, বাবার সামনে পড়তে হল না, চট করে বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে সোজা পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম। আলো জ্বেলে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের বইয়ের সারিটা একবার দেখে নিলাম, টানা খুলে ভিতরটা একবার পরীক্ষা করলাম। দুশ্চিন্তা দূর হল। গণেশচন্দ্র তা হলে এবেলাও আমার ঘরে ঢোকেনি। নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারে বসে জ্যামিতি বইটা টেনে আনলাম। না, আনতে গেছি, হঠাৎ যেন চৌকাঠের কাছে পায়ের শব্দ হল। বই থেকে হাতটা আপনা থেকে সরে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাতে দেখলাম দরজায় সেই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, হাঁ করে আমাকে দেখছে। ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো দিয়ে আমাকে গিলছে মনে হল।

'কি চাই ?' এই প্রথম আমি তার সঙ্গে কথা বললাম, 'এখন না, এখন এ-ঘরে না। আমি পড়াশোনা করব—আমার অনেক পড়া।'

ঠিক তখন মা এসে দরজায় দাঁড়াল।

'আহা এমন করিস কেন—তোর ভাই, খুব ভাল ছেলে গণেশ। সারাদিন আশায় আশায় থেকেছে কতক্ষণ তুই ওর সঙ্গে কথা বলবি।'

চুপ করে গেলাম।

মা আবার বলল, 'তখন তুই স্কুল থেকে এসে খেয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলি। ও খুঁজল তোকে, বারান্দায় গেল, বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখল—তুই নেই।'

'আমি আমাদের ক্লাবে গিয়েছিলাম।' অন্যদিকে তাকিয়ে রুষ্ট গলায় বললাম, 'ছুটির পর বাড়ি এসে রোজ ক্লাবে চলে যাই, তুমি তো জানই।'

'আমিও গণেশকে বললাম। ও চাইছিল তোর সঙ্গে বেড়াতে যেতে, বলছিল, দাদা এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলল না মাসিমা।'

রান্নাঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ ভেসে আসতে শুনলাম। বাবাকে হাঁড়ির

কাছে বসিয়ে রেখে মা বোনের ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছে আমার সঙ্গে মেলামেশার কথাবার্তা চালানোর সূত্রটা ধরিয়ে দিতে। যেন কচি খোকা। হাঁটি হাঁটি পা পা। অথচ কতবড একটা শরীর। ছ ফুট লম্বা হবে। কাজেই একটা মস্ত 'ইডিয়ট' ছাডা আর কিছুই না। মনে মনে বললাম।

'এখন পডাশোনা কর, তারপর খাওয়াদাওয়া হয়ে যাক—ওর সঙ্গে কথা বলবি। খুব দুঃখ করছিল গণেশ তুই কথা বলছিস না বলে।' মা ঘুরে দাঁড়াল, 'দেখি, মাংসটা বোধ করি হয়ে এল।' রান্নাঘরের দিকে আবার চলল মা। সেই মূর্তিও আর দাঁড়াল না। মাথাটা নীচু করে মার পিছে পিছে চলে গেল। আমার রকমসকম দেখে বুঝতে পেরেছে সে আমি তাকে ভয়ংকর অপছন্দ করছি। তাই আমি বুঝতে দিতে চাইছিলাম।

বাবা ও মার কথার ধরনে বুঝলাম গণেশ পাকাপাকিভাবে এবাডিতে থেকে যাবে। ভাদ্র মাস। এখন স্কুলে ভর্তি হওয়ার অসুবিধা আছে। নতুন সেশন আরম্ভ হলে আমার স্কুলে ভর্তি হবে। মাংস ভাত খাচ্ছিলাম। কিন্তু তবু মুখে কেমন তেতো তেতো লাগছিল সব। আমার এপাশে বাবা বসে খাচ্চেন, ওপাশে খেতে বসেছে বুনোটা। আডচোখে তাকিয়ে দেখলাম কী ভীষণ খেতে পারে মার সোদপুরের বোনের ছেলে। এক থালা ভাত উডে গেছে কখন। মা আবাব থালায় এত ভাত ঢেলে দিয়েছে। তা-ও সে সাবাড করে আনল, অথচ আমার এক বারের ভাত নডছে না। বাবা আর কটা ভাত খান। তবু মা বোনপোর সামনে বসে থেকে বারবার সাধাসাধি করছিল, 'এটা খা, ওটা খা—আর দুটি ভাত খেযে নে।' দুটি মানে আর এক থালা। রাগে আমার শরীর ফেটে যাচ্ছিল। আবার হাসিও পাচ্ছিল। এই আদর কদিন! ইস্কুলে ভর্তি হোক। ওই সেভেন ক্লাসেই তিনবার ডিগবাজী খাবে এই ছেলে। তখন দেখা যাবে থালা থালা ভাত খাচ্ছে দেখে মা কী করে। আমি জানি মা কোনদিন বেশি ভাত খাওয়া দেখতে পারে না। সুদাস নামে আমাদের এক চাকর ছিল। এইটুকুন ছেলে। অথচ পারলে হাঁডির সব ভাত খেয়ে নিত। মা এক একদিন এমন বিরক্ত হত। বাবা বলতেন, যাদেব ব্রেন-ওয়ার্ক অর্থাৎ মাথার কাজ করতে হয় না তারা বেশি ভাত খায়। যেমন মুটে মজুর রিকশাওয়ালারা। অতিরিক্ত ভাত খাওয়া ছোটলোকের লক্ষণ। মা বলত, দারিদ্র্যের চিহ্ন। অথচ আজ বাবা তো চুপ করে আছেনই, মা আদর করে আর একজনকে ঠেসে ঠেসে খাওয়াচ্ছে। কাজেই আমি চুপ করে রইলাম। যারা ভাত দেবার মালিক তাদের চোখে যদি এই রাক্ষুসে-খাওয়া ভাল লাগে তো আমি কী করতে পারি। বস্তুত এত ভাল মাংস রান্না হওয়া সত্ত্বেও আমি তেমন

করে খেতে পারলাম না। মার আদর দেখে হিংসায় আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছিল।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে মা আবার তাকে সঙ্গে করে আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। মার হাতে একটা বড় বালিশ।

'গণেশ এ-ঘরে তোর সঙ্গে শোবে।'

'এইটুকুন তো একটা খাট।' আমার মুখ কালো হয়ে গেল। করুণ চোখে মার দিকে তাকালাম। 'তোষকটাও ছোট—দুজনের অসুবিধা হবে।'

'তোমার সবতাতেই অসুবিধে—এমন কোনো ছোট বিছানা না তোমার—দু ভায়ে বেশ শুতে পারবে।'

তবু আমি বিড়বিড় করছিলাম।

'বাবার বসবার ঘরটা তো খালি পড়ে থাকে—সেখানে একজন শুতে পারে।'

'সে ঘরে বঙ্কু শোয় তুই জানিস না।' আগের চেয়েও জোরে ধমক লাগাল মা। 'চাকরের সঙ্গে গণেশকে শুতে বলব নাকি—কেন তোমার ঘর থাকতে—' বলতে বলতে মা ভিতরে ঢুকল, হাতের বালিশটা আমার বিছানার ওপর রাখল। 'আয় ভিতরে আয় গণেশ।'

গণেশ ভিতরে ঢুকল। মুখখানা এখন হাসি হাসি। অর্থাৎ আমার আপত্তি টিকছে না বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে। ঈশ্বর জানে, রাগে আমার তখন কী করতে ইচ্ছা করছিল! কিন্তু মার জন্যে সব সহ্য করতে হল। বিছানার চাদরটা টেনেটুনে ঠিক করে দিয়ে দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে মা ঘুরে দাঁড়াল।

'তুই এখন শুবি?'

'আমার অনেক পড়া আছে।' মার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না।

'গণেশ, তোর তো ঘুম পেয়েছে—শুয়ে পড়।'

'আমি পরে শোব, মাসিমা।'

'বেশ তো, খোকন, তোর একটা গল্পের বইটই থাকে তো ওকে দে, বসে বসে দেখুক।'

'গল্পের বই আমি রাখি না। সব টেক্সট বই।' দুজনের কারোর দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর গলায় উত্তর করলাম।

'বেশ, গণেশ তুই ততক্ষণ বারান্দায় এসে একটু বোস—চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া ওখানটায়।'

মা চৌকাঠের দিকে সরে গেল। আড়চোখে আমি তাকিয়ে দেখছিলাম যাকে বারান্দায় যেতে বলা হল সে কি করে। গেল না বারান্দায়। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাকে দেখছে, টেবিলটা দেখছে, বইগুলি দেখছে। যেন

আজব দেশে এসেছে। আমি আজব দেশের মানুষ। রাগ হচ্ছিল, হাসি পাচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে অহংকারে গর্বে বুকের ভিতরটা ফুলে উঠেছিল। দেখবেই তো আমার দিকে বার বার তার না তাকিয়ে উপায় কি! মোটে ছ মাসের বড হয়ে আমি দু ক্লাস উঁচোয় পড়ছি। আমার কত বই! আর সবগুলি বই কেমন চমৎকার বাঁধান চকচকে। কতবড একটা টেবিল আমার, সুন্দর একটা টেবিল-ল্যাম্প, একটা চেয়ার, ধবধবে বিছানা। একলা আমি পড়াশোনা করব বলে থাকব বলে এই ঘর। দেওয়ালের গায়ে ব্রাকেটে আমার শার্ট প্যাণ্ট ধুতি পাঞ্জাবি গেঞ্জী পায়জামাই বা ঝুলছে কত। সোদপুর থেকে খালি পায়ে ও হেঁটে এসেছে। আর আমার জুতো চটি মিলিয়ে চার পাঁচ জোড়া। তাই অবাক হয়ে চোখ ঘুরিয়ে সব দেখছে সে। বিছানা জামাকাপড জুতো বই চেয়ার টেবিল সব দেখা শেষ করে তারপর এসবের যে মালিক তাকে দেখছে; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে আমার গাল মুখ কত পালিশ পরিচ্ছন্ন—মাথার চুল কেমন পরিপাটি, হাতের নখগুলি কত সুন্দর মসৃণ করে কাটা। গাঁয়ের মানুষ। কাজেই তার জানবার কথা না আমাদের শহরের ছেলেদের সারাক্ষণ কেমন পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে হয়। বেশভূষায় চেহারায় চালচলনে আমরা পান থেকে চুনটুকু খসতে দিই না। আস্তে আস্তে জানবে কেন আমাদের এত ফিটফাট মাজাঘষা চেহারা হয়ে থাকতে হয়। রোজ চন্দন সাবান গায়ে মেখে আমি স্নান করি, মাথায় ভাল সেণ্টেড তেল মাখি, স্নো ক্রীম পাউডার উঠতে বসতে মুখে মাখছি। বুনো জংলাদের এসব জানবার কথা না, এসবের খোঁজ খবরও রাখে না তারা। তাই আমার চকচকে চেহারা তাকে এত অবাক করেছে।

সকালের মতন টেবিলের কাছে সরে এসে দাঁড়াল সে।

'কি চাই?'

'কিছু না।' এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিল সে। দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। খামখা হাসবার অভ্যাস, বুঝলাম।

'কিছু চাই না তো ওদিকে সরে দাঁড়া।' বিরক্ত গলায় বললাম, 'আমি এখন পড়ব।'

'আমি তোমার ইস্কুলে ভর্তি হব, মাসিমা বলেছেন।'

'ওই চেহারা নিয়ে বালিগঞ্জ বয়েজ স্কুলে ঢুকতে হবে না।'

'কেন!' যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন চেহারা করে ফেলল সোদপুরের মাসিমার ছেলে। চেহারাটা দেখে আমার ভাল লাগল। মুখটা অনেকক্ষণ ভার করে রেখে পরে একটা ঢোক গিলল।

'তোমার সঙ্গে যাব—তুমি আমার দাদা—ঢুকতে দেবে না কেন?

'দাদা বললে তো তারা তা বিশ্বাস করছে না।'

চুপ করে রইল সে।

'থুতনিতে পেঁয়াজের শিকড়ের মতন কী কতগুলো ঝুলছে, ঝাঁটার মতন মাথার চুল, বড় বড় নখ হাতে পায়ে—ইস্কুলের ছেলেরা গাড়ল ছাড়া আর কিছুই ভাববে না—'

হাঁ করে তাকিয়ে থেকে আমার কথাগুলি শুনল সে, তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। বনের পশুকে আঘাত করার যে আনন্দ সেরকম একটা কিছু আমি ভিতরে ভিতরে অনুভব করছিলাম।

আর কিছু আপাতত বলার প্রয়োজন নেই। ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। চিন্তা করে একটা পড়ার বই টেনে এনে মনে মনে পড়তে সুরু করে দিলাম। অবশ্য পড়ায় আমার এক ফোঁটাও মনোযোগ ছিল না। আড়চোখে দেখছিলাম, গাড়লটা মেঝের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ দুর্ভাবনার অথই জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার ভাল লাগল। অন্তত রাক্ষুসে দাঁতগুলো বার করে সামনে অকারণে আর সে হাসবে না। বলতে কি ওই বোকা হাসিটাই আমার মাথা গরম করছিল বেশি।

কিন্তু দেখা গেল আমার কথাগুলি সে মনেপ্রাণে ধরে রেখেছে। পরদিন সকালে মার কাছে আর্জি পেশ করল। মা তৎক্ষণাৎ বঙ্কুকে দিয়ে বোনের ছেলেকে চুল কাটার সেলুনে পাঠিয়ে দিল। রাত্রে তার পাশে শুয়ে সত্যি আমার ঘুমোতে কষ্ট হচ্ছিল। গায়ের ঘাম ময়লার উট্‌কো গন্ধে বমি আসছিল। আমি বার বার উঃ আঃ করছিলাম। দুর্গন্ধ শব্দটাও উচ্চারণ করেছিলাম। তাই পরদিন দেখলাম সেলুন থেকে চুলটুল কেটে এসে গণেশচন্দ্র বাথরুমে বসে দারুণ-ভাবে সারা গায়ে সাবান মাখছে। খুশি হলাম। বুনোটা আমার মতন হতে চাইছে। স্নানের পর ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরল। এগুলো বাবার। ছ ফুট লম্বা শরীরে আমার সার্ট পাঞ্জাবী প্যাণ্ট পায়জামা ধরবে না। না হলে পুরোনো বা একটু ছেঁড়ামতন সার্ট প্যাণ্ট আমারই কি কম বাক্সে তোলা আছে। আমার মতন বাবারও ভয়ংকর নাক টান। একটু সুতো উঠে গেলে কি জেলজেলে হয়ে গেলেই সার্টটা পায়জামাটা আর গায়ে তুলতে চান না তিনি। মা সেগুলি ধুইয়ে এনে তুলে রাখে। এখন সেসব কাজে লাগল।

দেখতে মন্দ লাগছিল না সোদপুরের মাসির ছেলেকে। রংটা ফর্সা তো। চুল কেটেছে, গায়ের ময়লা পরিষ্কার করেছে; তার ওপর ধোয়া পাঞ্জাবি পায়জামা গায়ে চড়িয়েছে। আমার পড়ার ঘরে ঢুকে দাঁত বার করে সে হাসছিল, ধরে নিয়েছে আমি তার ওপর এখন বেজায় সন্তুষ্ট। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ আমি

প্রকাশ করলাম না। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ঐ বুনোই থেকে গেলি ?'

'কেন ?' তার মুখের হাসি নিভে গেল।

আমি আঙুল দিয়ে থুতনিটা দেখালাম।

নিজের থুতনির ওপর হাত বুলিয়ে সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কিন্তু যেন এখানে তার কিছু করবার নেই—সম্পূর্ণ নিরুপায়, এমনভাবে সে আমার দিকে তাকাল। তেমনি গম্ভীর থেকে আমি টেবিলের টানা খুলে সেফ্‌টি রেজারটা বার করলাম, চটপট হাতে রেজারে নতুন ব্লেড পরালাম, দেওয়াল থেকে ছোট আরশিটা নামিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলাম, মুখে সাবান মাখা বুরুশ ঘষলাম—তারপর পাঁচ সাত মিনিটের কাজ। আমার মুখটা দেখতে দেখতে ডিমের মতন মসৃণ তকতকে হয়ে উঠল। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে গণেশ এতক্ষণ আমায় দেখছিল। দেখা শেষ করে সে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। এখন আর দাঁত বার করল না, অল্প হেসে আস্তে আস্তে বলল, 'মুখের চুলগুলি একদিন কাঁচি দিয়ে কাটতে গেছলাম—আর বাবা দেখতে পেয়ে এমন মার দিল—'

'বাবার সামনে কাটতে গেলে মার দেবেই।' দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে অল্প হেসে বললাম, 'বাবা মা-কে দেখিয়ে সব কাজ করতে গেলে তবেই হয়েছে।'

প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলল গণেশ।

'আমার তো ওই যন্তরটন্তর কিছু নেই।'

'এটা দিয়েই এখন কাজ চালাবি—আর একটা নতুন ব্লেড দেব ওটা পরিয়ে নিবি—দুপুরে মা যখন ঘুমোবে তখন এ ঘরে বসে চুপি চুপি—বুঝলি ?'

খুশি হয়ে সে ঘাড় কাত করল।

'কিন্তু সাবধান—আমার সেফটি রেজার খুব ভাল করে ধুয়ে মুছে রাখা হয় যেন—নোংরামি আমি একেবারে পছন্দ করি না।'

গণেশ এবারও ঘাড় কাত করল।

এক সেকেণ্ড কথাটা চিন্তা করলাম, তারপর চোখের ইশারায় দোরটা আর একটু ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে আসতে বললাম গণেশকে। দেখলাম, আমি যা বলছি, যা করছি তাতেই তার প্রচণ্ড উৎসাহ।

আমার উৎসাহ অবশ্য অন্যদিক থেকে। একটা বুনোকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলছি। যেমন খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের দলের লোকেরা বনের পশুকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোলে। সার্কাসের সিম্পাঞ্জী দাড়ি কামায় সিগারেট টানে খবরের কাগজ পড়ে আমার দেখা আছে। যেন সোদপুরের গণেশ সম্পর্কেও আমার সেই ধরনের উৎসাহ।

সিগারেটটা প্রায় শেষ করে এনেছি। গণেশ একভাবে তাকিয়ে আছে।

মাঝে মাঝে ঢোক গিলছে।

'অভ্যাস আছে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম।

গণেশ মাথা নাড়ল।

সিগারেটের টুকরোটা তার হাতে তুলে দিলাম, বললাম, 'অভ্যাস নেই যখন খুব আস্তে টান দিবি।'

আস্তে আস্তে টানল সে। কিন্তু তা হলেও চোখমুখ লাল হয়ে গেল। দুবার খুক করে কাশল।

'থাক আর দরকার নেই—ফেলে দে, প্রথমটায় বেশি ধোঁয়া গিলতে গেলে বেদম কাশতে শুরু করবি।'

আর একটা বড় টান দিয়ে গণেশ জলন্ত টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিল। আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিলাম। তারপর সেটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে জানালা গলিয়ে দূরে বাগানের ঝোপের ভিতরে ফেলে দিলাম।

গণেশের চোখমুখের লাল ভাবটা তখনো কাটেনি। নাকের ছিদ্র দিয়ে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

'মাসিমা জানতে পারলে ভীষণ বকুনি দেবে।'

'মাসিমাকে জানাচ্ছে কে আহম্মক।' চাপা গলায় গর্জন করে উঠলাম। ধমক খেয়ে মার বোনপো রাগ করল না। বরং যেন নিশ্চিন্ত হল।

'বাবা আমায় কেবল বলত, সাবধান কারো সঙ্গে মিশে বিড়ি সিগারেট যেন আবার অভ্যাস করতে আরম্ভ করিস না, তা হলে মগজ পেকে যাবে—লেখাপড়া হবে না।'

কথা শুনে হাসলাম।

'ছ ফুট লম্বা হয়েছিস মাথায়—এখনো কি তোর মগজ কাঁচা আছে ধরে নিয়েছিস।' একটু থেমে পরে বললাম, 'গাঁয়ের মানুষ তোর বাবা—কি খেলে কি হয় আর কি না খেলে না হয় বড় জানে কিনা, বিড়ি সিগারেট না খেয়ে তুই কোন্ পি. আর. এস. পি. এইচ-ডি হয়েছিস শুনি?

ইংরেজী শব্দগুলি বুঝল না, কিন্তু আমার কথাটা বুঝতে পারল তার চোখ দেখে টের পেলাম। মুখ নীচু করে আছে। আমি যে অতি সত্যি কথা বলেছি, তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হচ্ছে না। সিগারেট টেনে টেনে আমি ঠোঁট কালো করে ফেললাম অথচ নাইন ক্লাসে পড়ছি—এত এত বই আমার; কথাটা সে না ভেবে পারে না। তাই আমি চুপ করতে চোখ তুলে সে আমার হাতের সিগারেটের প্যাকেটটা দেখতে লাগল। তাজা মাছ দেখে বিড়াল যেমন করে তাকায়। বুনোটার এই তাকানো আমার ভাল লাগল।

মা মহাখুশি। গণেশ আর আমার কাছ ছাড়া হয় না। যতক্ষণ আমি বাড়িতে গণেশ আমার সঙ্গে আছে, আমার ঘরে আছে। আমার সঙ্গে সে কথা বলছে এবং গেঁয়ো ছেলেটা সম্পর্কে আমিও আর মার কাছে কোনরকম খুঁত খুঁত করছি না। 'গণেশ একটু বাবু হয়েছে,' মা মাঝে মাঝে বলে, 'খোকনের সঙ্গে থেকে এটা হয়েছে।' শুনে আমি চুপ করে থাকি। তা তো হবেই, মনে মনে বলি, গেঁয়োটাকে আমি বাবু সেজে থাকতে শিখিয়েছি, সিগারেট ফুঁকতে শিখিয়েছি, একদিন অন্তর দাড়ি গোঁফ কামাতে শিখিষেছি, আর যখন তখন আমার টেবিল থেকে সিনেমার কাগজগুলি টেনে নিযে সুন্দরী অভিনেত্রী রেবা, চামেলী, স্বাতী বা অন্য কোন মেয়ের ওপর উপুড় হয়ে থাকতে শিখিয়েছি।

একটা খেলা আমার—একটা আনন্দ। যেন আমার মনের ভাবটা এই পোষা জন্তুটা আমার সব কিছু অনুকবণ করুক, শিখুক; তারপর কী দাঁড়ায়, কতটা যায় দেখা যাবে।

আমার সেই গোপন চিঠিগুলিও সে দেখল, পডল। মিষ্টি হাতের লেখা আদুবে চিঠি, অভিমানের চিঠি, কান্নার চিঠি, উচ্ছ্বাসের অস্থিবতার চিঠি। কে লিখেছে, কাকে লেখা এতসব গোপন পত্র হযত বোকাটা বুঝল না। এবং এইজন্য তার মাথা ব্যথাও নেই মনে হত। সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মুখগুলি দেখতে দেখতে যেমন মাঝে মাঝে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলত তেমনি মিষ্টি মিষ্টি চিঠিগুলি পডা শেষ করে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকত আর কী যেন ভাবত।

বুনোটার এই চুপ করে থাকা ও দীর্ঘশ্বাস ফেলাটা আমি উপভোগ করতাম। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না—আর কিছু শেখানো হবে না। এটা বলেছিল আমাকে আমার ক্লাবের বন্ধুরা। কেননা স্কুলে ক্লাসের কোনো ছেলের কাছে ঘুণাক্ষরেও আমার এমন এক বোকারাম মাসতুত ভাই আছে প্রকাশ করিনি। কিন্তু ক্লাবের নন্তু পিণ্টুদের কাছে গোপন করিনি। বুনোটা সম্পর্কে তাদের সঙ্গে নানা পরামর্শ করার দরকার ছিল বৈকি। লেকের ধারে নির্জন অন্ধকারে বসে তিনজন সিগারেট টানতে টানতে অদৃশ্য গণেশচন্দ্রকে নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করতাম। নন্তু বলত 'ছ ফুট লম্বা তার ওপব গায়ের রংটা খুব ফর্সা বলছিস, কাজেই যেটুকু শেখানো হয়েছে ঐ থাক—আর বেশি শেখাতে গেলে তোর ভাত মারা যাবে।' নন্তুর ইঙ্গিতটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। পিণ্টু বলছিল, 'হুঁ, ঐ একটা জায়গায় ফাঁক রাখবি—গেঁয়ো গোঁয়ার মানুষ—সব কিছু শেখাবার বিপদ আছে বৈকি।' বন্ধুদের কথা শুনে আমি হেসেছি। আমি যে অনেক বেশি চালাক বন্ধুরা হয়তো ঠিক চিন্তা করে দেখেনি। যদি বুনোটাকে সব কিছু দেখানো শেখানোর মন থাকত তো তাকে নিয়ে নিশ্চয় অন্তত এক আধদিন আমি

বাইরে বেড়াতে বেরোতাম। একদিন তাকে আমাদের লেক-ক্লাবের আড্ডায় আনিনি। কি স্কুলের খেলার মাঠে। ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি কোনোদিন রাস্তায় বা পার্কেও যেতাম না। যতটা মেলামেশা বা যেটুকু প্রশ্রয় দেওয়া বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে থেকে। আমার বাইরের জগতে উঁকি দেবার ছাড়পত্র সে পায়নি।

মা মাঝে মাঝে ঘ্যানঘ্যান করত। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেড়াতে যাই না কেন। চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, জাদুঘর কত কি দেখবার আছে। আমি মুখ ভার করে বলতাম, 'আমার সময় নেই।' কাজেই বঙ্কুকে সঙ্গে দিয়ে মা সোদপুরের বোনের ছেলেকে এটা ওটা দেখতে, রাস্তাঘাট চিনতে পাঠাত। আমার কাছে গণেশচন্দ্র এসব আশা করত না যদিও। কেননা বাড়িতে থেকে আমার পড়ার ঘরের দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে তাকে যেটুকু দেখিয়েছিলাম চিনিয়েছিলাম তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট ছিল। বস্তুত যদি বা কোনোদিন হাবেভাবে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার ইচ্ছা প্রকাশ করত তো তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে আমি মাথা নেড়ে বলতাম, 'এখনো সময় হয়নি, এখনো তোর জংলী ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি—তুই আমার মাসতুত ভাই বন্ধুরা যখন শুনবে ভীষণ হাসাহাসি করবে।' সঙ্গে সঙ্গে সে চুপ করে যেত। দেয়ালের দিকে চোখ রেখে ভাবত। তারপর সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মুখগুলি দেখত। তাকে খুশি রাখতে চট করে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দিয়ে খাতাবই বগলে নিয়ে আমি স্কুলে বেরিয়ে গেছি। স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার একটা সিগারেট তার কোলের 'ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ক্লাবে ছুটে গেছি। আমার পডার ঘরে বসে বাবা মা কি চাকর বঙ্কুকে টের পেতে না দিয়ে সে যে লুকিয়ে সিগারেট খেতে শিখেছে এই জন্য আমি খুশি ছিলাম। একটু একটু করে বুনোটার বুদ্ধি বাড়ছে, মনে মনে বলতাম।

ছুটির দিনটাই মুশকিল। অথচ ছুটির দুপুর, রবিবারের দুপুরটাই সবচেয়ে লোভনীয়। বাবা বাড়িতে থাকেন বলে মার চোখে সেদিন আর এক ফোঁটা ঘুম থাকে না। আর সেদিন চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরোবার মতলব করে জামাটা আমি গায়ে চড়িয়েছি কি মা কেমন করে জানি টের পেয়ে আমার ঘরের দরজায় ছুটে আসে।

'গণেশকে সঙ্গে নিয়ে যা—এখন তো আর স্কুলে যাচ্ছিস না, ক্লাবে যাচ্ছিস না।' মা হেসে বলত। 'গাঁয়ের ছেলেকে তোদের ক্লাবে নিয়ে যেতে লজ্জা করে বলিস, এমনি না হয় ওকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আয়।'

সঙ্গে সঙ্গে জামাটা খুলে ফেলি।

'নাঃ বড্ড গরম। বেরোব না।'

মা আর হাসত না, গম্ভীর হয়ে যেত।

'এসব তোমার বাঁদরামি। গণেশকে সঙ্গে নেবার নাম করতে তোমার মাথা ব্যথা শুরু হল। আশ্চর্য! নিজের মাসতুত ভাই, ধরতে গেলে নিজের মায়ের পেটের ভায়ের মতন!'

আঘাত পেয়ে মা চলে গেছে। আর আমি মনে মনে বলেছি, 'বরং এই বুনোটাকে আমি সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেতে পারি, ক্লাবেও হয়তো এক আধদিন যাওয়া চলে, কিন্তু এখন আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে অসম্ভব। ভাই বলে, ভাই বোন বাবা মা আত্মীয় বন্ধু—পৃথিবীর কাউকে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলে না। এক যেতে পারে আমি আর আমার ঈশ্বর। আর তাই তো আমি এমন একটা নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুরের অপেক্ষায় ছিলাম। তার ওপর এখন শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। নারিকেল পাতার ঝালর থেকে উজ্জ্বল রৌদ্র চুইয়ে পড়ছে। নীচে দীঘির জল আয়নার মতন স্বচ্ছ স্থির। আয়নার বুকে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছবি, সাদা মেঘের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব। আর জলের কিনারে লম্বা সবুজ ঘাস, ঘাসের ডগায় হলদে ফড়িং।

ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে গেছে যার জন্য— নষ্ট হয়ে গেছে। এমন করে দুটো রবিবারের ছুটির দুপুর নষ্ট হয়ে গেছে। গণেশকে সঙ্গে নিয়ে যা।

আমার কান্না পায়।

আমার সব কিছু থেকে ঐ দুপুর ঐ ছায়া ঐ রং ঘাস জল মেঘের ছবি আলাদা করে রেখেছি। আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, থাকতে পারে না।

এর সঙ্গে আমার সিগারেট খাওয়া লুকিয়ে দাড়ি কামানো, লুকিয়ে সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মেয়ের মুখ দেখার কোনো যোগাযোগ নেই। মিষ্টি চিঠিগুলিরও না। চিঠি চিঠি। আর কারোর হতে পারে অন্য কেউ লিখতে পারে। বললেই হল। লেখা হয়ে গেলে পড়া হয়ে গেলে কয়েক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কি! সে সব এক দিকে।

আর এখন, পর পর দুটো রবিবার নষ্ট হবার পর, আজ এই তৃতীয় রবিবারের ছুটির দুপুরে আমি যেখানে যেতে চাইছি—আমার একান্ত গোপন সুন্দর নিভৃত জগতে, আর কেউ না, যাকে দেখলে আমি হাসি, ঘৃণা করি, অনুকম্পা করি, সোদপুরের আধা জানোয়ার আধা মানুষের চেহারার বোকারাম গণেশচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে আমি পায়ে মাথায় শিউরে উঠলাম।

অথচ আজ পরম সুযোগ। কি একটা কাজে বাবা কলকাতার বাইরে গেছে। মা ঘুমোচ্ছে। আকাশটাও আজ বড় বেশি নীল। মেঘের টুকরোগুলি

অতিরিক্ত সাদা। নারিকেল পাতার ঝালর চুইয়ে হীরার মতন উজ্জ্বল রাশি রাশি রৌদ্র আয়নার মতন স্থির স্বচ্ছ দীঘির বুকে ঝরে পড়ে না জানি কী শোভা ধরেছে কল্পনা করে আমি যখন জামাটা ব্র্যাকেট থেকে টেনে আনতে যাব আমার দুই চোখ স্থির হয়ে গেল।

'আমি যাব দাদা।'

'কোথায় ?'

'তুমি যেখানে যাচ্ছ।'

'আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।'

'ঐ তো জামা পরছ।'

স্থির শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে দরজায়। বাবার একটা পুরোনো সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়েছে, সদ্য পাটভাঙা পায়জামা পরেছে। যেন মাকে দিয়ে বাক্স ঘেঁটে এগুলি বার করে নিয়েছে। অথচ আজ মা উপস্থিত নেই সামনে— পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার জন্য গণেশ চুপ করে বসে নেই। সেজেগুজে তৈরী হয়ে আছে, আমার সঙ্গে বেরোবে। বুঝলাম কদিনে আর একটু চালাকচতুর সাবালক হয়ে উঠেছে বুনোটা। দাদার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য মাসিমাকে দিয়ে আর্জি পেশ করানোর দরকার বোধ করছে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আধুলির সাইজের দাঁতগুলি বার করে সে হাসছিল। দেখে মাথাটা গরম হয়ে গেল। তথাপি জামাটা গায়ে চড়ালাম। 'আমি কাজে বেরোচ্ছি।' কঠিন গলায় বললাম, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোকে নিয়ে যাওয়া চলে না।'

'কেন চলবে না, তুমি তো এমনি বেড়াতে যাচ্ছ—কাজ আবার কি! আমি যাব।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। চিরুনি বুলিয়ে মাথাটা ঠিক করছিলাম। হাতের মুঠোয় চিরুনিটা স্থির হয়ে গেল।

'এমন গেঁয়ো জংলীকে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করবে।' রাগে আমার ঠোঁট কাঁপছিল।

'মোটেই আর আমি জংলী নই।' রাগ না করে গণেশ নরম গলায় বলল, 'কাল তুমিই বলছিলে; এখন আমাকে রীতিমত শহুরে ছেলে বলা যায়, তোমার মতন রোজ গায়ে সাবান মেখে স্নান করি, দাড়ি কামাই, সিগারেট খাই, পরিষ্কার জামাকাপড় পরি—সিনেমার কাগজ-টাগজ নাড়াচাড়া করি—'

ঠাট্টা করে কাল কথাটা বলেছিলাম বটে। মজা দেখতে যে বুনোটাকে আমি আমার সব কিছু শিখিয়েছি দেখিয়েছি তা তার বুঝবার ক্ষমতা থাকত যদি! তাই আর রাগ না করে হাসলাম।

'হুঁ তোর বাইরেটা শহুরে হয়ে গেছে আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু ভিতরটা? মনটা? এখনো কাঁচা, এখনো গেঁয়ো ভাবটা পুরোপুরি রয়ে গেছে —আর একটু চালাক-চতুর না হলে—

ড্যাবড্যাবে চোখে ছ ফুট লম্বা মানুষটা আমার মুখ দেখল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন সামনে একটা আরশি পেলে তক্ষুণি সে নিজের মুখটা শরীরটা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করে। এখনো গেঁয়ো বোকা রয়ে গেছে আমার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছে না।

চিরুনি চালিয়ে চুলটা ঠিক করে ফেললাম।

'দরজা থেকে সরে দাঁড়া।' রুমালে খানিকটা সেণ্ট ঢেলে সেটা পকেটে পুরলাম। গণেশ দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর থেকে আমাকে বেরোতে না দেবার মতলব? হেসে বললাম, 'ভাদ্দরের কাঠ ফাটা রোদ উঠেছে দেখছিস তো, এখন বাইরে হাঁটতে মোটেই ভাল লাগবে না। তার চেয়ে ফ্যানটা খুলে দিয়ে আমার টেবিলে বসে আরামসে সিগারেট খা, সিনেমার কাগজটা ত্থাখ, মিষ্টি চিঠিগুলো আর একবার পড়তে পারিস।' পকেট থেকে সিগারেট বার করলাম।

কিন্তু আজ আর সিগারেটেব জন্য সে হাত বাড়াল না। চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল। 'চিঠি পড়ে আর ছবি দেখে কেবল কী হবে। অনেক দেখা হয়েছে—অনেক পড়া হয়েছে—তুমি আমায় বাইরে নিয়ে চল।'

'বাইরে তোমার যাওয়া চলবে না। আমার সঙ্গে চলবে না। বন্ধুর সঙ্গে যেতে পার।' রাগে গজ গজ করে উঠলাম। ঐ চেহারা ঐ বুদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইছে, কী আস্পর্ধা!

বললাম বটে, বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যেন হঠাৎ একটা আগুনের ঝিলিক দেখলাম সোদপুরের মাসির ছেলের চোখে। অথচ দাঁতগুলি ঢেকে রেখে কেমন করে যেন হাসছে, শয়তানের মতন। অস্বস্তি বোধ করলাম।

'রাস্তা ছেড়ে দে।' রুখে উঠলাম আমি।

'আমি সব বলে দেব মাসিমাকে।' গণেশ গম্ভীর হয়ে বলল।

'কি বলবি শুনি?'

'তুমি আমায় সিগারেট খেতে শেখাচ্ছ, এই বয়সে গালে রেজার চালাতে শেখাচ্ছ, সিনেমার মেয়ের মুখ রাতদিন দেখাচ্ছ—'

'হায়রে গর্দভ, হায়রে মূর্খ!' মনে মনে বললাম, 'এসব অপরাধের সঙ্গে তুইও জড়িয়ে আছিস, কাজেই বাবা মার কাছে শাস্তি পেলে একলা আমিই পাব না, তুইও পাবি, কথাটা ভেবেছিস?' কিন্তু তথাপি আমার বুকের ভিতর গুরগুর

করতে লাগল। গেঁয়ো গোঁয়ার মানুষ, কী বলতে আরো সব কী বলে দেয় মাকে চিন্তা করে চট্ করে রাগটা সংবরণ করলাম। পায়চারি করতে লাগলাম ঘরের ভিতর। এদিকে বাইরে রোদ কমলা রং ধরতে শুরু করেছে—সাদা মেঘের ধারগুলি থেকে এখনি পাটকিলে রং ফুটে বেরোবে—নারিকেল গাছের ছায়ারা লম্বা হতে থাকবে, দীঘির জলের স্বচ্ছ আরশিটা কালো হয়ে নিভে যাবে একসময়। বুকের ভিতর হায় হায় করে উঠল। আমার আর একটা ছুটির দুপুর চিরদিনের মতন নষ্ট হতে চলল হারিয়ে যেতে লাগল। কেমন অস্থির হয়ে উঠলাম। অস্থিরতার মধ্যে বুদ্ধি ঠিক করে ফেললাম।

'আচ্ছা, তাই হবে, চ——তুইও সঙ্গে যাবি।' বুনোটার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সেও হাসল। অতিরিক্ত খুশি হবার দরুন দাঁতগুলি আবার বেরিয়ে পড়ল। দুজন ঘরের বাইরে চলে এলাম।

'চমৎকার দুপুর।'

আমি কথা বললাম না।

'আকাশটা নীল—মেঘগুলো কী সাদা!' আমার পিছনে থেকে সে কথা বলছিল। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

'সত্যি দাদা, তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোনো আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।' একটু পর আবার বলল ও।

আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোলেই কি আর আমার সমান হওয়া যাবে, মনে মনে বললাম ও হাসলাম। সত্যি, সেখানে গেঁয়োটাকে নিয়ে যাচ্ছি বলে একটু আগে যে ভয়টা হচ্ছিল সেটা ততক্ষণে কেটে গেছে। আমার ক্লাবে কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না, ক্লাসের কোনো ছেলেকেও না। পোষা কুকুরটুকুর যেমন লোকে সঙ্গে নিয়ে যায় তেমনি সোদপুরের এই গাড়লটা আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের বালিগঞ্জের ছেলেদের সে কতটুকু দেখেছে, কী জানে! বাড়িতে দেখেছে আমাকে, আমার পড়ার ঘরে দেখেছে, বাবার সামনে দেখেছে মার সামনে দেখেছে। তাতে আমার কতটুকু জানা হয়েছে। তাই মনে মনে হাসলাম।

বরং ওটা সঙ্গে যাচ্ছে বলে উৎসাহ ক্রমেই বাড়ছিল।

অর্থাৎ বুনোটাকে এই কদিনে অনেক কিছু দেখিয়েছি শিখিয়েছি—না হয় আর একটু দেখবে শিখবে। আমার বুদ্ধির শিকল দিয়ে যখন ওকে বেঁধে রেখেছি, তখন আর ভয় কি! বরং নতুন একটা খেলা হবে। আর একটু দেখে শিখে গেঁয়োটা কতটা অগ্রসর হয় মজা দেখা যাবে।

ট্রামডিপো পিছনে রেখে সরু পথ ধরেছি। তখন থেকে পথের দুধারে

নারিকেল গাছের সারি শুরু হল। একটা দুটো পাখি ডাকছিল মাঝে মাঝে।

'মনে হয় গাঁয়ের রাস্তায় এসে গেছি, দাদা।'

'হুঁ, তোদের সোদপুরের জঙ্গল।'

ঠাট্টাটা সে বুঝল না। সত্যি কোন জঙ্গলের কাছে এসেছি কিনা দেখতে অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকায় আর চপ্পলের শব্দ করে হাঁটে। বাবার এক-জোড়া পুরোনো চপ্পল পরে এসেছে।

'তুই সাঁতার জানিস ?'

'খুব।' উৎসাহে লম্বা পা ফেলে আমার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল বুনোটা। 'আমরা কোনো দীঘিটিঘির ধারে যাচ্ছি বুঝি ?'

'হুঁ', সংক্ষেপে বললাম, 'পদ্মদীঘি।'

'যদি পদ্ম ফুটে থাকে, আমি সাঁতার কেটে জল থেকে এন্তার ফুল তোমার জন্যে তুলে আনব, দাদা।'

'তাই আনবি।' খুশি হয়েছি এমন ভান করে বললাম, 'এখন শরৎকাল, এখন তো পদ্ম ফোটার সময়।' মনে মনে বললাম বোকাটাকে সঙ্গে এনে ভালই করেছি। আমি সাঁতাব জানি না, অথচ মাঝে মাঝে পদ্ম ফোটে, ইচ্ছা থাকলেও দুটো একটা ফুল আমি ওকে তুলে এনে দিতে পারি না।

'এই শোন্।' বললাম, 'গাছে চড়তে পারিস ?'

'খুব।' অতিরিক্ত খুশির দরুন গলায় এমন ঘোঁৎ শব্দ করে সে হাসল যে প্রথমটায় চমকে উঠলাম, যেন এটা পশুর গলার শব্দ শুনলাম। গলা বড় করে গণেশ বলল, 'গাঁয়ে থেকে মানুষ, গাছে চড়তে শিখব না!'

ভাল, মনে মনে বললাম, ওদের দীঘির পাড়ের বাগানের পেয়ারা গাছে কত পেয়ারা পেকেছে, কামরাঙা গাছে কামরাঙা, অথচ গাছে চড়া শেখা হয়নি বলে একটা ফলও আমি ওকে পেড়ে দিতে পারি না। আজ গাড়লটাকে দিয়ে পদ্ম তুলে আনা, গাছের কল পাড়া চলবে।

যেন দাদার সব কাজ করে দেবার বল বিক্রম নিয়ে ছ ফুট লম্বা কাঠামোটা আগে আগে হেঁটে চলল। এখন আর তার ওপর আমার বিদ্বেষ নেই, তার জন্য লজ্জা পাবার কারণ নেহ। এমন একটা প্রয়োজনীয় জন্তু সঙ্গে থাকা দরকার চিন্তা করে হাল্কা মনে আমিও হাঁটতে লাগলাম।

'বাঁয়ে।' পিছন থেকে হেঁকে উঠলাম। গণেশ বাঁ দিকে মোড় নিল। প্রথমে মেহেদীর বেড়া, তারপর মাধবীর ঝোপ, তারপর কাঠমালতির জঙ্গল পার হয়ে সবুজ ফ্রেমে আঁটা সেই আশ্চর্য দীঘির কাছে আমরা এসে গেলাম।

না, জলের আয়নায় নারিকেল গাছের ছায়া, সাদা মেঘ, নীল আকাশের ছবি

দেখবার আগে আমার চোখ সরে গেল ওদিকে। করবী গাছের ছোট্ট ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও। আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নিশ্চয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আমার দেরি হয়ে গেল গাড়লটার সঙ্গে তর্ক করতে। শেষ পর্যন্ত যদিও ওটাকে সঙ্গে আনতে হল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিশ্চয় রাগ করেছে ও আমার এত দেরি দেখে। অন্যদিন দেখা হওয়া মাত্র ছুটে এসেছে। আজ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার বেশভূষা অন্যরকম। ফ্রক না, শাড়ি পরেছে। মেঘের রং। চট করে মনে পড়ে গেল। ওটাই তার মেঘডম্বুর শাড়ি। টালিগঞ্জের মাসিমা জন্মদিনে উপহার দিয়েছে, সেদিন বলছিল। এখানেও মাসিমা। কথাটা মনে পড়ে একটু হাসি পেল।

'এই, তুই বোস, নারকেল গাছের ছায়ায় চুপ করে বসে থাক।' বুনোটাকে বসিয়ে দিয়ে আমি করবী গাছের কাছে ছুটে গেলাম।

'চুপ করে আছ কেন?' ওর হাত ধরলাম।

হাত ছাড়িয়ে নিল ও। দু হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই নিয়ে দুদিন আমি তাকে খোঁপা পরতে দেখলাম। যদিও এমনি বেণী করে রাখলেও ওকে কম সুন্দর দেখায় না। কিন্তু খোঁপা পরলে বেশি সুন্দর লাগে। মেঘডম্বুর শাড়ির সঙ্গে মেঘের থোকার মতন খোঁপাটাই চমৎকার মানিয়েছে। যেমন ফ্রকের সঙ্গে চেরাবেণীটা ভাল লাগে। 'কথা বলছ না কেন?'

'দু রবিবার আসনি কেন?'

'ও, তাই অভিমান।' অল্প হাসলাম। কিন্তু বলতে পারলাম না ওই বুনোটা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, লজ্জা করছিল ওটাকে সঙ্গে করে এখানে আসতে। বললাম, 'শরীরটা খারাপ ছিল, তাই আসা হয়নি।'

'যত সব বাজে ওজর, ইস্ কী মিথ্যা কথাই না বলতে পার তোমরা বালিগঞ্জের ছেলেরা!'

'বিশ্বাস কর!'

'মোটেই বিশ্বাস করি না তোমার কথা,' ঠোঁট ফোলাল ও, ভুরু কোঁচকালো। 'নিশ্চয় তুমি আর কারো সঙ্গে প্রেম করছ।'

'আর কে, আবার কে!' হাসতে গিয়ে অবাক আমি ওর ফোলা ঠোঁট কোঁচকানো ভুরু জোড়া দেখলাম।

'তা কত মানুষ থাকতে পারে।' আকাশের দিকে চোখ ঘোরালো ও। 'নন্তুর বোন হতে পারে, পিণ্টুর ছোট পিসি হতে পারে।'

'মোটেই না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ওদের দিকে তাকাতে আমার ঘেন্না করে।' ও দেখতে পায় এমন করে ঘাসের ওপর থুথু ফেললাম। 'নন্তুর বোনটাকে

দেখলে আমার শাকচুন্নির কথা মনে হয়, পিন্টুর ছোট পিসিকে মনে হয় পেত্নী একটা।'

এবার ও ঘাসের দিকে তাকায়, দুই ঠোঁটের মাঝখানে হাসির রেখা জাগল।

'তোমরা বালিগঞ্জের মেয়েরা এমন ভুল বোঝাবুঝি কর—সত্যি দুঃখ হয়।' ওর হাত ধরলাম, এবার হাত ছাড়াল না ও।

আমি হাসলাম।

'আসলে আমার অসুখ করেনি, বুঝলে, ওই যে নারকেল গাছের ছায়ায় উল্লুকটা বসে আছে, ওটার জন্য আসা হয়নি—দুটো রবিবার নষ্ট হল।'

'কে ও।' রুবি নারকেল ছায়ার দিকে চোখ ফেরায়।

'সোদপুরের ছেলে। মা ব'লে, আমার মাসতুত ভাই—কিন্তু আমি ভাই বলে স্বীকার করি না।'

কিন্তু রুবি একটু বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে চোখ ফেরায়।

'রংটা খুব ফর্সা, কেমন না?'

'ওই ফ্যাসফেসে রংই একটা আছে—আর কিছু নেই।'

'উঁচু লম্বা আছে ছেলেটা।'

'ওই মাথায় তালগাছের মতন লম্বা হয়েছে—ভেতরে কিছু নেই।

'কেন!' ছোট একটা ঢোক গিলল রুবি।

'বোকা—একেবারে বোকা।' আবার ঘাসের ওপর থুথু ফেললাম আমি। নারকেল গাছের ছায়ার দিকে চোখ ফিরিয়ে রুবি আবার একটু সময় কী ভাবে।

'লেখা পড়া জানে না?'

'সেভেন পর্যন্ত বিদ্যা।' অল্প হাসলাম। 'হয়তো তা-ও না, বলে বটে।'

'একবার কাছে ডাক না।' রুবি আর একটা ছোট ঢোক গিলল।

'কি হবে কাছে ডেকে। ভয়ংকর বুনো। কথা বলে সুখ পাবে নাকি ওর সঙ্গে।' আমি নাক কোঁচকালাম। 'সদ্য পাড়া গাঁ থেকে এসেছে। যখন আমাদের বাড়িতে এসে উঠল তুমি যদি চেহারাটা দেখতে। এই লম্বা চুল মাথায়, থুতনিতে দাড়ির জঙ্গল, কী নোংরা যা বেশভূষা! তবু তো আমাদের এখানে থেকে থেকে কদিনে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখেছে।'

'জলের দিকে তাকিয়ে আছে।' রুবি অল্প হাসল।

'হুঁ পদ্মফুল দেখছে। দেখছ না কেমন হাবার মত একদিকে তাকিয়ে আছে।' নীচু গলায় হাসলাম। 'তুমি যে একটি মেয়ে—আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, দেখতে পাচ্ছে, অথচ এদিকে তাকাচ্ছে না। অর্থাৎ মেয়েটেয়ে সম্পর্কে

কোনো জ্ঞানই তার নেই, সেসব কোনো বোধই ঈশ্বর তার ভিতর দেয়নি। হাঁ করে তাকিয়ে জল আর জলের পদ্ম দেখছে তো দেখছেই।'

'সরল—সাদাসিধা খুব, কেমন না?'

'গরু—গাধাও বলতে পার।' রুবির চোখের ভিতর তাকালাম। 'কাজেই এখানে, তোমার ও আমার মধ্যে ওটাকে আনতে পেরেছি। কেননা, মাথায় কিস্সু নেই যার তাকে দিয়ে ভয়ও নেই—গোড়ায় ভয় করছিলাম সঙ্গে আনতে। তাই তো দুটো রবিবার আসা হল না।'

রুবি লম্বা মতন একটা নিশ্বাস ফেলল। চোখের পালক ঘাসের দিকে নেমে গেল ওর। একটু চুপ থেকে আমি আবার হাসলাম।

'অবিশ্যি আমার সঙ্গে থেকে একটু একটু শহুরে হতে শিখছে—ঐ দেখে যেটুকু অনুকরণ করার—তার বেশি না, নিজে থেকে কিছু করবার বুঝবার ক্ষমতাই ঈশ্বর তাকে দেয়নি।'

'কি শিখেছে শুনি!' রুবি হাসল না।

'আমরা বালিগঞ্জের ছেলেরা কী করি কেমন করে থাকি তুমি কি জান না। এই ধর যেমন রোজ গায়ে সাবান মাখা। আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। সাবান মেখে স্নান না করলে আমি আমার বিছানায় ওকে শুতে দেব নাকি। আমি একদিন অন্তর শেভ করি—বলে কয়ে ওটাও ওকে অভ্যাস করিয়েছি। রামছাগলের মতন মুখ করে রাখলে আমি আমার ঘরে ঢুকতে দিতাম না ওকে।'

'আর?' রুবি এবার মুচকি হাসল।

'আমি স্মোক করি তুমি জান, দেখাদেখি একটু আধটু সিগারেট টানে এখন বোকাটা। আমি সিনেমার কাগজ রাখি তুমি জান। আমার দেখাদেখি সেগুলি নাড়াচাড়া করে মাঝে মাঝে, সুন্দর মেয়ের মুখ থাকলে ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।'

'তবে আর কি, তবে তো একরকম পাকিয়ে এনেছ।' রুবি হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

'ধেৎ—ও আবার পাকবে কি, পাকতে যাওয়ার জন্যেও বুদ্ধি থাকা চাই; ওই তো বললাম, যেটুকু দেখছে সেটুকু করছে—তার বেশি না। যেমন একটা বানরকে সিগারেট খাওয়া শেখালে সিগারেট খাবে এ-ও তেমনি।'

'ইস্—ভীষণ বাড়িয়ে বলছ তুমি তোমার ওই মাসতুত ভাই সম্পর্কে।' রুবি আবার আকাশের দিকে চোখ তুলল, কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছে ও—চেহারা দেখে বুঝলাম।

'মোটেই না।' আমারও খারাপ লাগল বোকাকে বোকা স্বীকার করে নিতে

রুবির আটকাচ্ছে কেন। 'তুমি বললে বিশ্বাস করবে? তোমার সব কটা চিঠি ওই গাড়লটা পড়েছে, আমি পড়তে দিয়েছি—'

'মাইরি?' চমকে উঠল ও, চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল।

'তাতে কি।' ব্যাপারটাকে সহজ করে দিতে আমি হাল্কা গলায় হাসলাম। 'ওই পড়াই সার—একটা চিঠি পড়ে তা থেকে কোন আইডিয়া করে নেওয়ার ক্ষমতা ভগবান ওকে দিয়েছে নাকি। যখন পড়ল, তখন পড়ল যেমন সিনেমার কাগজ উল্টে একটা সুন্দর মেয়ের ছবি যখন দেখল—দেখল, ব্যস তারপর এই নিয়ে কিছু ভাবা বা চিন্তা করা ওই উজবুকটার কাছ থেকে তুমি আশা করতে পার না।'

কিন্তু তবু রুবির দুশ্চিন্তার ভাব কাটছে না।

আমি আর এক দফা হাসলাম।

'যদি তাই হত তো চিঠি পড়া শেষ করে আমায় নিশ্চয় এক আধবার সে জিজ্ঞেস করত, কার চিঠি কে লিখেছে বা কেন এত মিষ্টি মিষ্টি কথা লেখে—চিঠিতে আমার বা তোমার নামধাম নেই যখন।'

'হ্যাঁ, তা-ও বটে।' এবার একটু খুশি হল ও। আমার চোখের দিকে তাকাল। 'ডাকব কাছে? তুমি কথা বলে দেখবে?' আবার আমি নাকের আগাটা কোঁচকালাম। 'তখন বুঝবে কেমন বুনো জংলী মার ওই সোদপুরের বোনের ছেলে।'

রুবি অস্পষ্টভাবে ঘাড় কাত করল।

'এই গণেশ।'

গণেশ চমকে উঠে চোখ ফেরাল। জল দেখা শেষ করে এখন বুঝি ওধারের বাগানের পেয়ারা আর কামরাঙা গাছ কটা দেখছিল গুণছিল।

'ইদিকে আয়।' হাত তুলে ডাকলাম।

ছ ফুট লম্বা শরীর নিয়ে হাদারাম উঠে দাঁড়াল। কাছে ডেকেছি বলে বেজায় খুশি। আমি ঈশ্বরকে ডাকছিলাম রুবির সামনে না বাতাসার মতন গোল মাথার দাঁতগুলি বার করে দিয়ে বুনোটা হাসতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঈশ্বর আমার ডাক শুনবে কেন, যার যেমন স্বভাব গড়ে দিয়েছে—দু হাত দূরে থাকতে সব কটা দাঁত সে মেলে ধরল। তা-ও যদি শব্দ করে হাসত উজবুকটা। কাঁঠালের কোয়ার মতন এতগুলি দাত বার করে চুপ করে হাসতে থাকলে যে কেউ তাকে ইডিয়ট ছাড়া আর কিছু মনে করবে না, করতে পারে না। অবশ্য রুবি চুপ করে ছিল। কিন্তু ওর চোখ মুখের অবস্থা কেমন হল আমি দেখিনি। আমার লজ্জা করছিল তখন রুবির দিকে তাকাতে, ঘাসের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অবস্থাটা একটু সয়ে আসতে কটমট করে আমি গণেশের দিকে তাকালাম। যেন আমার

এই তাকানোর অর্থ সে বুঝল। দাঁতের সারি বুজিয়ে ফেলল। রুবি একদৃষ্টে গণেশকে দেখছিল, ওর চেহারার কোন পরিবর্তন বোঝা গেল না। কেবল হাত তুলে খোঁপাটা ঠিক করছিল।

'গণেশ চমৎকার সাঁতার কাটতে জানে।' বললাম রুবিকে।

'তাই নাকি।' আমার দিকে চোখ ফেরাল ও।

'যদি তুমি চাও তো ওই সুন্দর পদ্মফুলটা সে তোমাকে তুলে এনে দিতে পারে। কেমন পারবি না, গণেশ?' আবার সে দাঁত বার করছিল, কিন্তু আমি চোখের ইশারায় ধমক দিতে সেগুলো আর বার করতে সাহস পেল না, ঠোঁট বোজা রেখে গণেশ হেসে ঘাড় কাত করল।

'নীচে ইজের আছে না তোর?'

'আছে।'

'তবে ওই ঝোপের পাশে গিয়ে পাজামাটা খুলে আয়।'

কথা না কয়ে গণেশ কেয়াফুলের বড় ঝোপটার ওপাশে ছুটে গেল। রুবির দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'আমি যা বলব তাই শুনবে। বুদ্ধি না থাকায় একটা মস্ত সুবিধে। পোষা কুকুরের মতন, ওকে দিয়ে আমি যা ইচ্ছা করাতে পারি।'

রুবি কথা বলছিল না। কেয়ার ঝোপের দিকে ওর চোখ। গণেশ ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলাম ওটা বাবার পুরনো ইজের—দু জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে; তাল গাছের গুঁড়ির মতন ইয়া লম্বা দুটো পা, তার ওপর চুলে ভর্তি—আমার কেমন ঘেন্না করছিল গাড়লটার দিকে তাকাতে, তবু এতক্ষণ পায়জামা পাঞ্জাবিতে একরকম লাগছিল, এখন বনের পশু ছাড়া কিছু কল্পনা করা যায় ওকে? আর ঐ অবস্থায় রুবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি ধমক লাগালাম।

'এখানে এলি কেন, জলে নেমে পড়—ফুলটা তুলে আন।'

'বোঁটা শুদ্ধ তুলে আনবে।' রুবি বলল, রুবি এই প্রথম বুনোটার সঙ্গে কথা বলল। বস্তুত তাতে তার একটু বেশি খুশি হবার কথা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ জলের দিকে ছুটে গেল বলে চেহারা দেখতে পেলাম না। আমার মনে হয় না একটি মেয়ের মুখে একথা শোনার পরও গণেশের চেহারার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছিল—কেননা, ফুলটাই এখানে তার লক্ষ্য, ওটা এনে কোন মেয়ের হাতে তুলে দেবার মধ্যে যে উত্তেজনা—একটা অন্য ভাব থাকতে পারে তা ভেবে দেখার মতন মগজ তাকে দেয়নি ঈশ্বর।

'এসো আমরা জলের কাছে যাই।' রুবি বলল। রুবির হাত ধরে আমি দীঘির দিকে এগোই। তখন রোদ্রের কমলা রং ধরেছে। জলে নেমে এত জোরে

গেঁয়োটা সাঁতার কাটছে, হাত পা ছুঁড়ছে যে ঈষৎ লাল হয়ে আসা মেঘের ছায়া, নীল আকাশ, নারকেল গাছের সুন্দর ছবিগুলি ভেঙেচুরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সবটা দীঘির জল তোলপাড় করে একটা জানোয়ার সাঁই সাই করে পদ্মবনের দিকে ছুটেছে। দৃশ্যটা কেমন অস্বস্তিকর লাগছিল, অথচ রুবির জন্য ডাঁট শুদ্ধ পদ্ম ফুল ছিঁড়ে আনতেই হবে। আড়চোখে রুবিকে দেখলাম, দৃশ্যটা তার ভাল লাগল কি খারাপ লাগল বোঝা গেল না। মুখের রেখায় কোন পরিবর্তন ছিল না। চোখের কালো লম্বা পালকগুলি স্থির করে ধরে রেখে ও জল দেখছিল।

ফুল নিয়ে গণেশ ফিরে এল। কোমর জলে দাঁড়াল। রুবি হাত বাড়াল ফুলটা ধরতে।

'না,' আমি বাধা দিলাম, 'তুই আর একটু কাছে উঠে আয়, গণেশ।'

আমার কথামত সে তীরের কাছে উঠে এল।

'ওর খোঁপায় গুঁজে দে পদ্মটা।'

রুবি চমকে উঠল, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আমি আদেশ করলাম, 'দে, সুন্দর করে গুঁজে দে ওটা ওর চুলে।' গম্ভীর হয়ে গণেশ দাঁতগুলি বার করতে চেয়েছিল, আমার চোখের ধমক খেয়ে নিজেকে সংশোধন করল। রুবি ঘাড় নোয়াল! গণেশ ওর খোঁপার চুলের ভিতর ফুলটা আটকে দিল। খোঁপাটা একটু নড়ে গেল। রুবি হাত দিয়ে ওটা ঠিক করতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল বাঘের থাবার মতন বিশাল দুটো হাতের তেলো দিয়ে চেপেচেপে গণেশই ওটা ঠিক করে দিয়েছে। রুবি একটু লাল হয়ে উঠল।

'যা, আর একটা ফুল নিযে আয়।'

বলা মাত্র পশুর মতন ঝাঁপিয়ে গণেশ জলে পড়ল।

'ইস্, এমন লজ্জা করছিল আমার।' রুবি বলল।

'কেন, কাকে লজ্জা', আমি হাসলাম, ওর মাথায় কিছু আছে নাকি ; তোমার চুলে গুঁজে দিচ্ছিল বলে অন্যকোনরকম ধারণা তার মনে এসেছিল, তুমি আশা করতে পার না—যদি ওই বোকাটাকে দিয়ে তোমার লজ্জা করে তবে একটা গাছকে দিয়েও তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।'

রুবি ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

'আহা, তা হলেও তো পুরুষ।'

'তার সে খেয়ালই নেই সে একটা পুরুষ, আর—আর তুমি এমন ফুটফুটে চেহারার একটি নরম মেয়ে।'

রুবি ঢোক গিলল, চুপ করে রইল।

'বরং আমার ভয় হচ্ছিল বুনোটার হাতের নখগুলির জন্য, বাঘের নখের মতন এত বড় একটা নখ, যখন তোমার খোঁপা ঠিক করে দিচ্ছিল ঘাড়ের নরম চামড়ায় ওই নখের আঁচড় না লাগে, রক্ত না বেরোয়।'

'না, কিছু হয়নি।' রুবি নরম গলায় হাসল ও হাত দিয়ে নিজের কাঁধটা ছুঁয়ে দেখল। গণেশ ততক্ষণে সাঁতার কেটে পদ্মবনের কাছাকাছি চলে গেছে।

'তুমি ফুলটা গুঁজে দিলে না কেন?' রুবি প্রশ্ন করল।

ঘাড় কাত করে হাসলাম।

'আমি তো অনেক গুঁজেছি—তোমার খোঁপায় কম ফুল গুঁজে দিয়েছি! আজ বুনোটাকে দিয়ে কাজটা করালাম।'

'আর একটু শহুরে হতে শেখাচ্ছ বুঝি ওকে?'

'হ্যাঁ, তা ও বলতে পার।' অল্প শব্দ করে হাসলাম, 'বা বলতে পার মজা দেখছিলাম, খেলছিলাম, একটা পশুকে নিয়ে খেলতে তোমার ভাল লাগে না? কেমন করে ও তোমার খোঁপাটা হাটকায় মাথাটা দু হাতে চেপে ধরে?'

রুবি আর কথা বলল না, একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

গণেশ পদ্ম নিয়ে ফিরে এল।

রুবি আবার হাত বাড়াল। আমি বাধা দিলাম না। গণেশ ওর হাতে ফুলটা তুলে দিতে রুবি সেটা তাড়াতাড়ি ব্লাউজের ফাঁকে বুকের ওপর গুঁজে রাখল।

'আয়, এইবেলা জল্ থেকে উঠে আয়।' গম্ভীর হয়ে গণেশকে ডাকতে সে তীরে উঠে এল। যেন আমি তার ওই অবস্থায়—ভিজা গা-মাথা নিয়ে গাড়লের মূর্তি হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই পছন্দ করব না অনুমান করে কাপড় বদলাতে সে ঝোপের দিকে ছুটে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিলাম।

'উঁহুঁ, আরো কাজ আছে, ফল পাড়তে হবে—পা'জামা পরে গাছে চড়া সুবিধা হবে না।' রুবির দিকে ঘাড় ফেরালাম, 'কটা পাকা পেয়ারা পেড়ে দিক তোমাকে?'

রুবি কিন্তু খুশি হল কিনা বুঝলাম না, কেবল ছোট ঘাড়টা একটু কাত করল ও। আমরা বাগানের দিকে চললাম। গণেশ আগে, আমি ও রুবি পিছনে। গাছের ছায়া তখন লম্বা হয়ে গেছে, রোদের রং আরো গাঢ় হয়েছে, ঝিঁঝি ডাকছিল।

গণেশকে গাছে তুলে দিয়ে দুজনে নিচে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এখন যেন রুবির উৎসাহ একটু একটু করে বাড়তে আরম্ভ করেছে। আঙুল দিয়ে গাছের ডাঁশা পেয়ারাগুলি ও দেখিয়ে দেয়, আর এক ডাল থেকে আর এক ডালে ঝুলে পড়ে গণেশ সেগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে।

'এখন অনায়াসে একটা বানর কি শিম্পাঞ্জী বলে ধরে নিতে পার তুমি

গণেশকে, ত্মাখ ঐ মগডাল থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে কেমন করে পেয়ারা ছিঁড়ছে।' কবি আমার সঙ্গে হাসল না, পেয়ারা কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টুপ টাপ করে গাছ থেকে ক্রমাগত পেয়ারা পড়ছে মাটিতে। একটা পেয়ারা ওর খোঁপার ওপর পড়ল, পদ্মের দুটো পাপড়ি খসে পড়ল পেয়ারার বাড়ি লেগে, একটা এসে পড়ল কবির বুকের ঠিক মাঝখানে। যদি আমি এমন করতাম, গাছে চড়তে না জানি, যদি মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেও এভাবে ওর চুল কি বুকের ওপর পেয়ারা ছুঁড়ে ফেলতাম কবি খিলখিল করে হেসে সারা হত। কিন্তু এখন ও হাসছে না, কেননা ইচ্ছা করে বা দুষ্টামী করে কেউ তার মাথা বা বুক লক্ষ্য করে পেয়ারা ছুঁড়ে মারছে না। গাছের ওপর যে আছে তার সেরকম দুষ্টামী করার, ছেলে মানুষী খেলা খেলবার বুদ্ধিই নেই কবি এটুকু বুঝে ফেলেছে, তাই না ও এত গম্ভীর। কবির জন্য আমার কষ্ট হল।

'কেবল কুড়াচ্ছ, একটা খাও না, খেয়ে ত্মাখ কেমন মিষ্টি।' একটা পেয়ারা তুলে আমি কবির দিকে বাড়িয়ে দিলাম, এতক্ষণ পর ও হাসল।

'তুমি খাও, তুমি বসে বসে পেয়ারা খাও, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি।' কবি এক ডজন পেয়ারা আমার সামনে ঘাসের ওপর জড়ো করে রাখল। খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাসের ওপর চেপে বসলাম। কবির দেওয়া একটা পেয়ারায় কামড় দিয়ে মনে হল অমৃত। ও ঘামছিল। ছুটে ছুটে পেয়ারা কুড়াচ্ছে বলে খোঁপাটা আবার ঢিলে হয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা করছিল হাত দিয়ে চেপে খোঁপাটা জায়গামতন বসিয়ে দিই। আর সেই সঙ্গে আমার হাতের নখগুলির ওপর নজর পড়ল। কত পরিচ্ছন্ন মসৃণ। কবির গলা বা ঘাড়ের চামড়ায় এই নখ লাগালে ও বুঝতে পারবে না—টেরই পাবে না—এমন পালিশ করে কাটা, আর সেই তুলনায় গাছের বুনোটার প্রত্যেকটা আঙুলের নখের কী বিশ্রী বীভৎস চেহারা। বলতে কি গণেশের নখগুলির কথা মনে পড়তে মুখের পেয়ারাটা পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে গেল। ইচ্ছা করছিল কবিকেও আবার কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে দুজনে একসঙ্গে হাসি।

হঠাৎ চোখে পড়ল পেয়ারা কুড়াতে কুড়াতে কবি একটু দূরে সরে গেছে। গাছের গায়ে গাছ, বুঝলাম একটা গাছের ডাল বেয়ে গাড়লটা আর একটা গাছে চলে গেছে। 'আর পেয়ারা দিয়ে কী হবে, অনেক হয়েছে', ডেকে বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু চুপ করে রইলাম। কবি ফলগুলি কুড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছিল, ওকে বাধা দিলাম না।

অগত্যা সিগারেট ধরালাম। পেয়ারা কত খাওয়া যায়। দুটো খেয়ে আমার ঢেকুর উঠছিল। সিগারেট ধরিয়ে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণেশও গাছ থেকে নেমে পড়ল।

'কি হল, হয়ে গেল ?' আমি হাসলাম, রুবির দিকে তাকিয়ে হাসলাম, ও আমার কাছে চলে এল। বোকাটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ঐ পোশাক নিয়ে আমার সামনে হুট করে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সত্যি, ঈশ্বর এই বয়সেই মার বোনের ছেলেকে কী প্রকাণ্ড একটা শরীর তৈরী করে দিয়েছে—অসুরের মতন কোমর হাত পা ও বুকের চেহারা, কোমরে হাত রেখে পেয়ারাতলায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার আদেশের অপেক্ষা করছে, আমি ডাকলে তবে কাছে আসবে, যতক্ষণ ডাকব না আসবে না। কথাটা চিন্তা করে এত ভাল লাগছিল। রুবিও বুঝতে পেরেছে, অতবড একটা শরীর ঐ বুনোটার, অথচ তুলনায় কত ছোটখাট একটি মানুষ হয়ে আমি তাকে হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছি।

আঁচলের পেয়ারাগুলি রুবি আমার সামনে ঘাসের ওপর রাখল। পেয়ারার পাহাড় জমে গেল। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার দরুন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল ওর।

'একটু জিরিয়ে নাও এখানে বসে।' বলতে চেয়েছিলাম, তার আগেই রুবি সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'চলি।'

'কোথায় আবার।' আমি ঢোক গিললাম। ও অল্প হাসল।

'কামরাঙাগুলো পেকে আছে কদিন ধরে—সেগুলো পেড়ে দেবে।'

খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করলাম।

'হুঁ গাডলটাকে দিয়ে সব কটা পাড়িয়ে নাও।' আস্তে বললাম, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিয়ে গণেশকে বললাম, 'এই গণেশ, এখন কামরাঙা গাছে উঠতে হবে।'

গণেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড কাত করল। রুবির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ঠোঁট টিপে হাসলাম। যদিও এই হাসিটাকে 'মেয়েলী হাসি' বলে ও মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, এখন করল না; এখন ও পাল্টা ঠোঁট টিপে হাসল। এখানে আমার হাসির অর্থ রুবি চট্ করে বুঝে নিয়েছে। আর দাঁড়ায় না ও, কামরাঙা গাছের দিকে ছুটে গেল। গণেশ আগেই চলে গেছে।

যেন আর একটা কি কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঝাঁকড়া মাথার বাতাবীলেবু গাছটার জন্য রুবিকে দেখা গেল না।

আমি নিশ্চিন্তমনে হাতের সিগারেটটা টানতে লাগলাম। রোদটা একেবারে মজে গেছে। ঝিঁঝির ডাক ক্রমে খরতর হয়ে উঠছে। সুন্দর একটি হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে বলে বাতাবীলেবুর পাতাগুলি থেকে থেকে দুলছিল। দুজনকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু রুবির গলা শুনছিলাম।

ওর গলার স্বর শুনে আমি বুঝতে পারছিলাম, উৎসাহ বেড়ে গেছে। 'ওই যে, আর একটা, পেকে টুসটুসে হয়ে আছে, কেমন হলদে হয়ে আছে ঐ

কামরাঙাটা।' চেঁচিয়ে বলছিল ও। একটা পাখি ডাকছিল। কিন্তু পাখির স্বরের চেয়েও রুবির গলা যে অনেক বেশি মিষ্টি সিগারেট টানতে টানতে আমি তা অনুভব করছিলাম। একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাসলাম। কেননা রুবির ছোট্ট একটা খিলখিল হাসি ইতিমধ্যে আমার কানে এসেছে। অর্থাৎ এতক্ষণ পর, অনেকক্ষণ চেষ্টার পর রুবি বুনোটাকে নিয়ে খেলতে পারছে, রুবি নিশ্চয় হাসি দিয়ে তাকানো দিয়ে বোকারাম গণেশের মধ্যে দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগাতে পেরেছে; বোধ করি ইচ্ছা করে ওর খোঁপা লক্ষ্য করে এক আধটা কামরাঙা ছুঁড়ে ফেলতে পারে; তাই রুবির হাসি।

জড়বুদ্ধির একটা মানুষকে আমি বাধ্য করে ফেলেছি, হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি, তাই আমার আনন্দের অবধি ছিল না; এখন রুবিও সেটা পারছে, একটা জানোয়ারকে বশ করে ফেলেছে, তাকে নিয়ে খেলছে। রুবির সঙ্গে এই নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে চিন্তা করে আমি তখনি উঠলাম না, চুপ করে বসে সিগারেট টানতে লাগলাম, যেন আশা করছিলাম রুবির খিলখিল হাসিটা আর একবার শুনব।

একটা দমকা হাওয়া উঠল, আবার সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। কেননা একটু সময়ের জন্য বাতাসটা কেমন যেন অস্বস্তি জাগিয়ে দিয়ে গেল। বাতাস বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকটা যেন বেশি চুপচাপ হয়ে গেল। গাছের পাতা আর নড়ছে না। রুবির গলা শুনছি না, বা ওধারে গাছের ডালে উঠে কেউ ফলটল পাড়ছে সেরকম কিছু আভাষ পাচ্ছি না। পাতার খসখস কি ছোটপাট ডাল ভাঙার শব্দ—কিছু না। ঝিঁঝির ডাকটাও থেমে আছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

উঠে আস্তে আস্তে বাতাবীলেবু গাছটার দিকে এগোলাম। এক সময় লেবু গাছ পিছনে ফেলে, জঙ্গল মতন জায়গাটা, যেখানে সারি সারি তিনটে কামরাঙা গাছ, সেখানে চলে গেলাম। কাউকে দেখলাম না। অতি সূক্ষ্ম আওয়াজ করে কি একটা পোকা যেন কোন গাছের শুকনো ডাল না শিকড় যেন কুরে কুরে খাচ্ছিল। কেমন ভয় হল মনে। বস্তুত সেখানে কোনো মানুষ চুপ করে বসে বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বিশ্বাস করতে বাধছিল, এত নির্জন, এমন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল বাগানের ভিতরটা। কামরাঙা গাছ দেখা শেষ করে আমি লিচু গাছের কাছে গেলাম। লিচুর সময় না, কাজেই জায়গাটা আরো শূন্য স্তব্ধ মনে হল। দুবার আমি রুবির নাম ধরে ডাকলাম, তিনবার গণেশকে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। বা বলা যায় আমার ডাকের উত্তরে আতাবনের ওদিকটা থেকে বাদুড়ের পাখার ঝাপটা ভেসে এল। আতাজঙ্গলের দিকে যাব কি, বেশ

অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে, সাপের হিসহিস শব্দের মতন একটা শব্দও ভেসে আসছিল ওদিক থেকে। তা ছাড়া আতা পাকতে আরম্ভ করেনি যে ওরা ওখানে যাবে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম ওরা সেখানে নেই ; আবার পেয়ারাতলায় ফিরে এলাম, দীঘির ধারে ছুটে এলাম। জলের বুক কালো হয়ে গেছে। অন্যদিন এসময়টায় ঝিকিমিকি ছবি ধরে রাখে দীঘিটা আবসি হয়ে—আজ সে রকম কোনো ছবি ছিল না, অথবা ছিল, আমিই দেখিনি, দেখার চোখ ছিল না, চোখদুটো কেমন ঝাপসা হয়ে উঠল একটু সময়ের মধ্যে। ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে যে-কথাটা ভাবতে ভাবতে আমি বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তা ঠিকই হয়েছিল। আর দশজনের ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিলে গিয়ে তা চিরকালের সত্য হয়ে রইল।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ওরা বাগানেই ছিল, বাগান থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি। সেই সন্ধ্যার ছবিটা আমার মনে পড়ত। যাকে বুনো বলতাম গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে কবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।

তারিণীর বাড়ি-বদল

টেনে-টেনে ওরা সব এনে ঠেলাগাড়িতে তুললো। কুনো ডেক্‌চি, মশারি, ছাতা, লণ্ঠন, মাতুর, বালিশ, জুতো, ফুটো একটা কড়াই। একটা ফানুস, রং-চটা ফাটল-ধরা গণেশের মূর্তি, ছুটো হাতি, গাম্‌লা, ইঁছুর-মারা কল, বাক্স, জীর্ণশীর্ণ একটা স্যুটকেস।

তার অর্থ তারিণী চ'লে যাচ্ছে।

তারিণী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র স'রে পড়ছে। পরিষ্কার বোঝা গেলো। প্রতিবেশীদের কারো বুঝতে কষ্ট হ'লো না ব্যাপারটা কি।

চৈত্রের গনগনে রোদ।

ছুপুরবেলা, রাস্তার দোকানপাট অধিকাংশ বন্ধ।

এমন সময়, এমন অসময়ে প্রেসে না গিয়ে জামার আস্তিন কনুইয়ের ওপর গুটিয়ে খালি-পা রুক্ষ-চুল ব্যস্তসমস্ত তারিণী ঘরের তৈজসপত্র ও স্ত্রীপুত্রকন্যা-সহ কোনদিকে যাত্রা করছে, দাঁড়িয়ে যার-যার দরজা-জানলায় মুখ বাড়িয়ে পাড়ার লোকজন নিজেদের মধ্যে গুন্‌গুন্‌ স্বরে নানারকম গবেষণা করলো।

ওরা কতকালের বাসিন্দা। ঠিক কবে এসেছিলো এই গলির মধ্যে, সতেরো নম্বর ঘরে, অনেকেই জানে না। বুঝি ওটা সতেরোর বি, কেউ-কেউ ভাবলো।

এখন মনে পড়ে, এখন শুধু চোখের ওপর ভাসছে সবারই, তারিণীর বউ ঘরের সামনের ছোট্টো রক্‌টুকুর ওপর রোজ সকাল সন্ধ্যা একটা তোলা-উনুন ধরিয়ে নিয়েছে। প্রেস-ফেরত তারিণী রেশনের থলে, কখনো-বা বাজার অর্থাৎ বার্লির ডিবি কি ডাঁটামুলো নিয়ে ঘরে ফিরছে লম্বা পা ফেলে। আর তারিণীর এক-দঙ্গল ছেলেমেয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত হোস-পাইপের মুখে, রাস্তায়, লোকের বারান্দায়, উড়ের পানের দোকানের সামনে, যোগেশ রুদ্রের ডাইংক্লিনিং-এর দরজায় হুড়ো-হুড়ি ছুটোছুটি মারামারি ক'রে পাড়া গরম রেখেছে, রাখছিলো এ-অবধি।

আজ সব ঠাণ্ডা।

যার যেমন জামাটি জুতোটি প'রে, ঠেলায় ধরছে না এমন এক-একটা বস্তু, যেমন হাতপাখা, খুন্তি, ভাঙা হারমোনিয়ামের খোলা রীড, বাঁধানো ফটো, কি ছেঁড়া-মলাট তেলচিটে বছর-পুরোনো গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাটি হাতে ক'রে গাড়ির

সামনে-পিছনে দু-পাশে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তখনো জিনিস বার করা হচ্ছিলো।

তারিণীর স্ত্রীর খোঁপা খুলে গিয়ে পিঠের ওপর লুটোপুটি। ঘোমটার আঁচল একটা ব্র্যাকেটের বোল্ট এর সঙ্গে আটকে গিয়ে জড়িয়ে প্রায় কোমরের কাছাকাছি নেমে এসেছে। ব্র্যাকেটের আর-এক প্রান্তে হাত রেখে ওটাকে জোরে টানতে-টানতে তারিণী শাসাচ্ছে, গর্জাচ্ছে। তারিণীর স্ত্রীর মুখ কান গরমে লাল ঘামে ভেজা দুঃখে কালো হয়ে গেছে, অনেকের চোখে পড়লো।

কোথায় যাচ্ছে, তার আগে গবেষণা চললো কেন যাচ্ছে, হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবার কি হ'লো।

পানের দোকানের উড়ে চোখ টিপে তারিণীর বড়ো মেয়ে এগারো বছরের ধিন্দিকে কাছে ডাকলো। ধিন্দি নয়, ধন্‌দি। ছোটোগুলোর ডাক শুনে উড়ে কুমারী মীরা ব্যানার্জির এই নাম ঠাউরে নিয়েছে। মীরা এখন বাপের সামনে শান্ত-শিষ্ট, অন্য সময়, তারিণী যখন বাইরে থাকে, ছুটে গিয়ে উড়ের পিঠে কিল্ বসিয়ে দেয় আর ওর কাটা-সুপুরি এলাচদানা মুঠো-মুঠো ক'রে মুখে পুরে খিল্‌খিল্ হাসে।

সেই দস্যি মেয়ে ধিন্দিকে আর দেখতে পাবে না, কাছে পাবে না ভেবে এবং মেয়ের গায়ে বাক্স-পুরোনো বেজায় জ্যালজেলে টিয়ে-রঙের লম্বা একটা জামার দিকে চেয়ে অবাক চোখে উড়িষ্যার মধুসূদন চুপ ক'রে গেলো। আর চোখ টিপলো না।

ডাইংক্লিনিং-এর ছোক্‌রা নরেশ তারিণীর দ্বিতীয় ছেলে সমবয়সী ডাণ্ডা, মানে সন্তোষকুমারকে কাছে ডাকলো না। সাহস পেলো না ডেকে জিজ্ঞেস করে ঘর ছেড়ে রাতারাতি ওরা কোথায় চললো, কেন গেলো।

ডাইংক্লিনিং-এর ধোবার কাছ থেকে ডাণ্ডা অনেক নীল অনেক চুম্‌কি মুঠ-মুঠ ক'রে নিয়ে গেছে লুঠ ক'রে, অনেক সময় চুরি ক'রেও। নরেশ সমবয়সী বন্ধুর অত্যাচার সহ্য করেছে—করতো। আজ অবাক চোখে দেখলো, ডাণ্ডা চটি ও পেণ্টুলন প'রে ভদ্র হ'য়ে একটা আরশি হাতে ঠেলার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

তেলেভাজার গিরীশ তারিণীর বাকি ছোটো আটটার উৎপাতে উত্তেজিত হ'য়ে বেসনের কাই মাখিয়ে দিতো সবগুলোর মুখে, তবু ওরা তেলেভাজা খাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়নি। সারা প্রহর মাছির মতো ভন্‌ভন্ ক'রে উড়তো, ঘুরতো, গিরীশকে জ্বালাতন ক'রে মারতো। আজ সব চললো কোথায়।

গিরীশ একটিকেও ডাকলো না, তেলেভাজার ঝুড়ি সামনে নিয়ে তারিণী আর তারিণীর স্ত্রীর ব্র্যাকেট তোলা দেখতে লাগলো ঠেলার ওপর। তারিণী তুলছে,

বউ ঠেকা দিচ্ছে। বউ ঠেলছে, তারিণী শক্ত ক'রে ধরেছে।

ঠেলাওয়ালা কোমরে গামছা বেঁধে হাত লাগাতে এসেছিলো। তারিণী হটিয়ে দিয়েছে। নিজের জিনিস সে নিজে দেখেশুনে নেবে। একটা-কিছু ভেঙে গেলে এ-জীবনে আর করা হবে না, গজগজ ক'রে তারিণী বলছিলো, তার মুখের ভাবে সবাই বুঝলো। জিনিস তুলতে জিনিস বাঁধতে তারিণীর যত্নের ও পরিশ্রমের অন্ত ছিলো না, আর থেকে-থেকে, বউ ধমক খাচ্ছিলো, 'ওটা এমন ক'রে রাখলে কেন, জ্বালা!'

'ইজেক্ট্‌মেণ্টের নোটিস এসে গেছে।' হোমিওপ্যাথ হেমাঙ্গবাবু হুঁকো-হাতে ডিস্‌পেনসারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও-বাড়ির রিটায়ার্ড ওভারসিয়র মঙ্গলবাবুর সঙ্গে মৃদুমন্দ গলায় আলোচনা করেন।

'এই বাবুনে গুষ্টি নিয়ে এ দিনে ও এ-পাড়ায় কি ক'রে ছিলো,' বলছিলেন রিটায়ার্ড মুন্সেফ তারকবাবু প্রতিবেশী সোমনাথবাবুকে। 'ঘরেব ভাড়া তো কম নয়।' সোমনাথবাবু হাহা ক'বে শুধু হাসলেন।

সামান্য একটা প্রেসে চাকরি যার, যার এতগুলো ছেলেমেয়ে, এই দুর্মূল্যের বাজারে সবদিক সামাল দিয়ে শহরের মোটামুটি সচ্ছল একটি পাড়ায় রীতিমতো দুই-কোঠার একটি ঘর দখল ক'রে প্রতি মাসের ভাড়াটি মিটিয়ে যাওয়া তারিণীর পক্ষে আর কোনোমতেই সম্ভব ছিলো না, তারকবাবুর অভিজ্ঞ পাকা হাসিতে সে-কথা ঝ'রে পড়লো। সোমনাথবাবু মাথা নাড়েন।

'ওর চাকরিটিও যে না-গেছে বিশ্বাস কি।' কে একজন বললো।

'হবে।'

'হাহাকার প'ড়ে গেছে দেশে। মানুষ মোটা মাইনের ওপর দাঁড়িয়েও একলা চালাবার মতো ক'রে ঠিক পেটটি চালাতে পারছে না, আর এ তো—'

'আ-হা, এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী এখন দাঁড়ায় কোথায়।' কে-একজন মহিলার দরদভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। গোলাপের জঙ্গলে জানলা আবৃত। তাই সুভাষিণীর মুখ দেখা গেলো না।

'তেমন বয়েসও যে হয়নি দু'জনের।' কে আর-একজন মহিলার গলা শোনা গেলো।

একটা সুন্দর প্রজাপতি উড়ছিলো জানলায়। কয়েক জোড়া কালো ঠাণ্ডা চোখ তারিণী আর তারিণীর স্ত্রীকে নিরীক্ষণ করছিলো।

কিন্তু কারো দিকে তাকাবার, কারো কথা শোনার সময় ছিলো না তারিণীর, তারিণীর স্ত্রীর।

তারিণীর শার্টের কলার ছিঁড়ে গেছে ব্র্যাকেটের একটা জং-ধরা-পেরেকের

খোঁচা লেগে।

তারিণী স্ত্রীকে বকছিলো।

বউ-এর শাড়ির আঁচলও ছিঁড়েছে দু-জায়গায় ব্র্যাকেটের খোঁচায়। পাছে তারিণীর চোখে পড়ে, আবার বকুনি খাবে ভয়ে বউ আঁচলের ছেঁড়ার দিকটা বাঁ-মুঠোর মধ্যে গুঁজে ডান-হাতে ব্র্যাকেটের শেষ প্রান্তটি ধ'রে অনবরত ঠেলছিলো, ডেক্‌চি ও কলসীর কানার ফাঁকে কায়দা ক'রে ওটাকে ঢুকিয়ে রাখা চলে কিনা। তারিণীও গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে তার চেষ্টা করছিলো। এবং শেষ পর্যন্ত পারলেও।

বউ-এর ফর্সা আঙুলে হলুদের দাগ প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদের চোখ এড়ালো না।

'ছেলেপুলের মুখে দুটি গুঁজে দিতে পেরেছে যাত্রার আগে?' কে-একজন বললো।

'কিন্তু যাচ্ছে ওরা কোথায়?' একজন আবার প্রশ্ন করলো।

'বেলেঘাটায় নাকি ঘর পেয়েছে, শুনলাম।' উত্তর হ'লো।

অদৃশ্য মুখ, অস্ফুট গলার গুঞ্জন।

তারিণী ততক্ষণে মালপত্র বাঁধার কাজ শেষ করেছে। চৈত্রের বাতাসে ছোটো একটা ধুলোর ঘূর্ণি উড়লো, তারিণীর স্ত্রীর পায়ের কাছে শুকনো পাতা ও ছেড়া কাগজের টুকরো গিয়ে উড়ে-উড়ে পড়ছিলো।

এইবার রওনা হবে।

বউ মাথায় কাপড় তুলেছে। একটা বিড়ি পকেট থেকে বার ক'রে টানতে-টানতে তারিণী ঠেলার সঙ্গে হাঁটবে ভেবে সবে মুখে গুঁজেছিলো। চমকে উঠলো। বিড়িটা প'ড়ে গেলো মাটিতে।

'শালা, আমার বিল না মিটিয়ে পালাচ্ছো কোথা? উনিশ টাকা চোদ্দ আনা এখানে রেখে যাও।' মুদি। পাড়ার মুদি এককড়ির গলা, সবাই বুঝলো।

আমাদের জানলাগুলো আস্তে-আস্তে বন্ধ হচ্ছিলো! 'এই শালা ডাণ্ডা, মেরা ঢাই মণ কয়লাকো দাম জল্‌দি মেটাও।'

কয়লার দোকানের রামশরণের গলা।

এসেই রামশরণ তারিণীর বড়ো ছেলে ডাণ্ডার, সন্তোষের, হাত চেপে ধরেছে। তারিণী অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলো ব'লে শেষবারের কয়লাটা সন্তোষই নাকি ধারে এনেছিলো।

কয়লাওলা গলা বড়ো ক'রে প্রতিবেশীদের দরজা-জানলার দিকে মুখ ক'রে কথাটা প্রচার করলো।

'ভদ্রলোকদের সঙ্গে কারবারে এ-দিনে এই লাভ!' রামশরণ পরিষ্কার বাংলা

ভাষায় কথা বললো, 'আড়াই মণ জ্বালানির দাম না মিটিয়ে তারিণীবাবু চোরের মতো ঠিকানা পাল্টাচ্ছে।'

পরনে জুতো, গায়ে শার্ট।

তারিণী যে বাবু-শ্রেণীর, কথাটা অস্বীকার করার উপায় ছিলো কি। পুরোনো এবং জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেলেও ছেলেমেয়েগুলোর প্রত্যেকের গায়েই জামা ছিলো। সম্ভবত বিয়ের সময়ের পুরোনো একটা বেনারসী জড়িয়েছে তারিণীর স্ত্রী। দুই পায়ের গোড়ালিতে ক্যাকাসে একটুখানি আলতার পোঁছও দেখা যাচ্ছে।

'বড়ো যে সাজগোজ ক'রে চললে বৌঠান, মোট এগারো সের দুধের দাম পাওনা, ওটি মিটিয়ে যাও।' মিশিমাখা কালো দাঁত বের ক'রে গয়লা-বউ প্রথম তারিণীর স্ত্রীর দিকে, তারপর কটমটে চোখে ঠেলার ওপর স্তূপীকৃত মালপত্রের দিকে, তারিণীর দিকে, তারিণীর ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে রইলো। গয়লানীর হাতে শূন্য দুধের বালতি। দুধ বিলানো শেষ ক'রে ঘরে ফিরছিলো।

প্রস্থানোদ্যত তারিণীর পা সরলো না। আনত চক্ষু। ছেলেমেয়েগুলো নীরব। হেটমুখ হ'য়ে ওরা পোকায়-খাওয়া ফটো, খুন্তি, পঞ্জিকা, হাতপাখা, হারমোনিয়ামের কতকগুলো ভাঙা রীড, যার যেটি ব'য়ে নেবার শূন্যের ওপর ঠিক ধ'রে রেখে অপেক্ষা করছিলো কখন বাবার আদেশ হবে 'হাঁটো'—ঠেলার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা হাটবে, বলতে গেলে ঠেলাগাড়ির চাকা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। এই শহরের রাস্তায় ট্র্যাম বাস ট্যাক্সি রিক্‌শা লাখো-লাখো দ্যাখে ওরা, দেখছে। গাড়িতে না চাপুক, গাড়ির সঙ্গে কি পিছু-পিছু ছুটে যাবার কল্পনা করছিলো রোজ। আজ অসময়ে, হঠাৎ দুই চাকার এই কাঠের গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়ালো, তার ওপর উনুন ঝাঁটা ডেকচি মশারি পিঁড়ি কম্বল, সব-ঘরের সব-কিছু চাপিয়ে ওরা গাড়ির সঙ্গে হেঁটে দীর্ঘ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড পার হবে, তারপর এক-সময়ে সার্কুলার রোড হ'য়ে বেলেঘাটার সড়কে গিয়ে পড়বে। অচেনা জায়গা, নাম-না-জানা ঠিকানায় নতুন নম্বরের বাড়ি। ভাবছিলো প্রত্যেকটি শিশু। প্রত্যেকটির চোখে ছিলো সেই শঙ্কা, উত্তেজনা, আশা, ভয়, শিশিরের ফোঁটার মতো টলটলে কম্পমান কৌতূহল।

তারিণীর স্ত্রী হাত বাড়িয়ে সবচেয়ে ছোটোটার নাকের সিক্‌নি মুছে দিলো।

'কখন যাবো মা ?' বলছিলো ওর বড়োটি।

তারিণীর স্ত্রী চোখের ধমকে থামিয়ে দিয়েছে। 'আমি ঠিকানা দিচ্ছি,' বলছিলো তারিণী এককড়ির হাত ধ'রে, 'যেয়ো, সামনের মাসে টাকাটা দিয়ে দেবো।'

'ঠিকানা দিচ্ছি !' ব'টকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এককড়ি ভেংচি কাটলো,

'কত শালা ঠিকানা দিয়ে পালালো, নতুন ঠিকানায় পা দিতে না দিতে বেঠিক হ'লো। হামি ছাড়চিনে তারিণীবাবু, তোমার মালপত্র আট্‌কাবো, টাকা ফেলো।'

'হ্যা, এইসা বাত্‌।' রক্তচক্ষু রামশরণ ঠেলার পিছনটা চেপে ধরেছে।

'হামি বেইজ্জত করবো তারিণীবাবু টাকা লা দিয়ে গেলে।'

কথা কাটাকাটি চলছিলো গয়লানী আর তারিণীতে। গয়লা-বউ শক্ত হাতে ঠেলার মাথা চেপে ধরলো। 'হামি মালসাটি ছাড়বো না দুধের দাম লা মিটিয়ে গেলে, অত সময় নেই রোজ তোমার বেলেঘাটার ঘরে গিয়ে তাগিদ লাগাবো।'

তারিণী চুপ।

আর-একটা ধুলোর ঘূর্ণি উড়লো।

একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে থেমে গেলো।

ডিস্‌পেনসারীর বারান্দা ছেড়ে হেমাঙ্গবাবু ভিতরে চ'লে যান। সোমনাথবাবু স'রে পড়েন।

আরো দু-জন প্রতিবেশীর জানলা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হ'লো, যেন শার্সি-গুলোও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

'তুম শালা চোট্টা আছো।' তারিণী কথার উত্তর দিচ্ছে না তাই রামশরণ গর্জে উঠলো।

তারিণী প্রতিবেশীদের দরজা-জানলার দিকে একবার সকাতরে তাকালো।

তাতে ফল্‌ হ'লো না বিশেষ।

'বড্ডো দেরি ক'রে ফেলেছে,' নিচু-গলায় প্রতিবেশীরা বলাবলি করছিলো, 'ঋণের দায়ে পালাচ্ছে, স'রে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা কি আগে জানতাম, না, কোনোদিন এসেছিলো ও কারো কাছে। অমন একটাকা দু-টাকা ক'রে সাহায্য করলেও তো তারিণী অনেকটা হাল্‌কা হ'তে পারতো, পাড়ায় এতজন ছিলুম আমরা।'

তারিণী শুনলো কি শুনলো না ঠিক বোঝা গেলো না।

'আত্মসম্মানবোধ টন্‌টনে।' মৃদু-গলায় কে আর-একজন মন্তব্য করলো, 'আট গণ্ডা ছেলেপুলের বাপ, একটা সুবৃহৎ তরণীর হাল ধ'রে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে। চাকরি করছে বাজারে নামও লিখিয়েছে। এখন ওর খুকির দুধের দাম, রেশন খরচের জন্যে আমাদের দরজায়—বুঝলে না?'

'মানুষের দুর্বুদ্ধি।' আর-এক জন প্রতিবেশীর ঘন নিশ্বাসপতনশব্দ শোনা গেলো।

কি, তারিণীর ধার করতে যাওয়া, না সে-সব শোধ না ক'রে পালিয়ে যাওয়ার মতলব, প্রতিবেশীদের আলোচনা থেকে এর পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেলো না।

হঠাৎ দেখা গেলো তারিণী উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, ঘাড় সোজা ক'রে এককড়িকে বলছে, 'টাকা পাবে কোর্টে গিয়ে নালিশ করো, খবরদার, মালপত্রের গায়ে হাত দিয়ো না, ফ্যামিলীম্যান, আমি ভদ্রলোক, এই—এই'—

কিন্তু শোনে কে।

এককড়ি ঠেলা ধ'রে ঝাঁকুনি মেরেছে। রামশরণ সাহায্য করছে। আর হাততালি দিয়ে মজা দেখছে গয়লা-বউ। হাসছিলো না, বরং দাঁতে দাঁত ঘ'ষে কঠিন শপথবাণী উচ্চারণ করছিলো তারিণীকে, তার পরিবারকে। গয়লা-বউ আরো ছু-জায়গায় ঠকেছে এমন ক'রে।

টাকা না দিয়ে সব পালিয়েছে।

বছর-ভর ভদ্রলোকদের বাচ্চাদের সে দুধ খাওয়ায় আর গরিব গয়লানীকে তারা এমনভাবে ঠকায়। রুপোর বৈঁচিপরা ছু-খানা হাত বার-বার শূন্যে উত্তোলন ক'রে দুধওয়ালী পাড়ার বাতায়নবর্তিনী অন্যান্য প্রতিবেশিনীদের কানে যায় এমন চড়া গলায় বললো, 'টাকা দিতে পারে না তো বছর-বছর নতুন ছানা ছাড়বার শখ কেন। বেশ তো, ছানা আটকাতে না পারো নুন খাওয়াও, পানি পিয়াও, কমলার বাল্তির একটাকা সেরের দুধ বাচ্চার গলায় ঢালবার বাবুগিরি কেন!'

যেন কমলার জিহ্বা থেকে আগুন ঝরছিলো।

বাগে পেয়েছে ও, সস্তা-চটি-পায়ে প্রেসের বাবুর স্ত্রীকে দুটি কথা শোনাচ্ছে।

গয়লানীর পায়ে জুতো নেই, কিন্তু পরনের শাড়ি তারিণীর স্ত্রীর শাড়ির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। দামী! পাড় ও আঁচল অনেক বেশি জমকালো। পান দোক্তার রসে জিহ্বা ও ঠোঁট রক্তিম। চোখে প্রচুর রসিকতা।

কথা শেষ ক'রে পুরুষ পাওনাদার দু-জনের দিকে চেয়ে তেরছা ঠোঁটে কমলা হাসলো।

এককড়ি মুদি চড়া গলায় জানিয়ে দেয়, টাকা শোধ না ক'রে তারিণীবাবু ঘরের একটা ভাঙা পিঁড়িও সরাতে পারবে না।

ব'লে সে ঠেলার পিছন ধ'রে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিলো যে জিনিসপত্রের মচমচ আওয়াজ শোনা গেলো, এখনি কোনটা পড়ে, কোনটা ভাঙে।

একটা অপমান, উলঙ্গ লজ্জা ভদ্রপাড়ার মাঝখানে যেন ঝুলছিলো। রক্ষা, প্রতিবেশীদের শেষ জানলাটিও বন্ধ হ'য়ে গেছে।

তারিণী ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে দেখছে।

ঠেলার বাঁ-দিকে বেতের মোড়ার ওপর চিৎ ক'রে দুটো কড়াই বসানো। কড়াই দুটোর পেটের মাঝখানে তারিণী খুব সাবধানে শিশি ও কাঁচের বয়ামগুলো বসিয়ে দিয়েছে।

এককড়ির হাতের প্রথম ধাক্কায় একটা বড়ো বয়ামের গলা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেলো।

দ্বিতীয় ধাক্কায় ভাঙলো তারিণীর স্ত্রীর উনুনের চূড়া। আলগা হ'য়ে গেলো।

তারপর ভাঙলো তারিণীর অনেক কষ্টে গ'ড়ে-তোলা বৈঠকখানার বাজার থেকে কিনে-আনা গড়গড়াটা। গাড়ির মাঝামাঝি এক জায়গায় লেপ-তোশকের ভাঁজের ভিতর বেশ কায়দা ক'রে তারিণী ওটা বসিয়ে নিয়েছিলো।

বিড়িতেও কম পয়সা যায় না, রোজ বউকে অনেক বুঝিয়ে এক মাসের মাইনে থেকে টেনে-হিঁচড়ে পাঁচটা টাকা বের ক'রে তারিণী কবে যেন বেশ দুঃসাহসে ভর করেই ওটি কিনে ফেলেছিলো। অনেক আগে। একমাত্র বিলাসের সামগ্রী গড়গড়াটা ভাঙবার পর তারিণীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো।

কিন্তু তারিণী হঠাৎ এমন কাণ্ড করবে কারো জানা ছিলো না।

পা-দুটো ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে, জুটফ্লানেলের শার্ট গায়ে, ক্ষীণদেহ, অম্বলরোগী এই শহরেরই কোনো প্রেসের স্বল্পবেতনভোগী কর্মচারী তারিণী দত্ত গরম ক'রে এমন কাণ্ড বাধাবে কেউ কোনোদিন কল্পনায় আনেনি।

'এই হয়,' প্রতিবেশীদের মধ্যে পরে একজন মন্তব্য করেছিলো, 'অক্ষমের এত রাগ ভালো না। প্রবল আত্মসম্মানবোধ সক্ষমের অঙ্গভূষণ, গরিবের পক্ষে তা আত্মঘাতস্বরূপ।'

তারিণী শেষ মুহূর্তে তুব্‌ড়ির মতো ফেটে পড়ছিলো রাগে।

কারো সাহায্য চাওয়া দূরে থাক, ঠেলাওলাকে বরং ধমকাচ্ছিলো সে চিৎকার ক'রে।

'আমি বলছি, তুমি গাড়ি টানো। আমি বলছি আমি পিছন থেকে ঠেলবো ডরো মৎ। ক'টা মোট!' কিন্তু বোঝার ভয়ে ঠেলাওলা গাড়িতে হাত ঠেকানো বন্ধ রাখেনি।

'মেরে কাঠ ক'রে দেবো।' শাসাচ্ছিলো এককড়ি ঠেলাওলাকে। 'তফাত থাক্।'

কাঠের মতো শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঠেলাওলা হাঙ্গামা দেখছিলো। বাড়ি-বদলের সময় অনেক বাবু আজকাল এরকম ফ্যাসাদে পড়ছে। হাঙ্গামার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই নিরাপদ, অভিজ্ঞ ঠেলাওলাকে বেশি বলতে হ'লো না। তার ঠেলা তো স'রে যাচ্ছে না ও গিয়ে না হাত ঠেকানো তক্।

কিন্তু আশ্চর্য, ঠেলা সরলো, ঠেলার চাকা ন'ড়ে উঠলো।

'আমার মাল আমি নিয়ে যাবো, দেখি কোন্ শালা আটকায়।' তারিণী আস্তিন গুটিয়ে ঠেলার সামনের ডাণ্ডা দুটো চেপে ধরেছে। 'হ্যাঁ, তুমি পেছন

থেকে ঠ্যালো ; এই, তোরা সামনে আয়।'

সত্যিই তারিণীর স্ত্রী পিঠের আঁচল কোমরে বেঁধে গাড়ির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো, ছেলেমেয়েরা গেলো সামনে।

কোঁক করে একটা শব্দ হ'লো—তারপর ঠেলাটা গড়গড় ক'রে নেমে গেলো নিচে, বড়ো রাস্তায়, উঁচু পেভমেণ্ট্ ছেড়ে গিয়ে পড়লো গরম অ্যাশফণ্টে।

এককড়ি মুদি চুপ।

ঠেলাওয়ালা ও কয়লাওয়ালা হাঁ ক'রে কেবল দেখছিলো।

কেউ কিছু বললো না।

একটা গুমোট, অবিশ্বাস্যরকম স্তব্ধতা।

গাড়ি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলো কুকুরটা গিয়ে শূন্য জায়গাটা বার-বার শুঁকতে লাগলো।

ঠেলা মোড় ঘুরে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে বৈঁচি-পরা হাত শূন্যে তুলে চিৎকার ক'রে কমলা গয়লানী তারিণীকে, তারিণীর স্ত্রীকে এবং দশটি সন্তানকে নানারকম অভিশাপ দিতে-দিতে একদিকে স'রে পড়লো।

'জেদী—' খৈ ফোটার মতো প্রতিবেশীদের মুখে কথা ফুটছিলো। 'মূর্খ।' বললো আর-একজন, 'তারিণী রাস্তায় বিজ্ঞাপন দিতে বেরোলো।'

'বিজ্ঞাপন ? কিসের বিজ্ঞাপন ?'

'ওই যে, একলা ঠেলতে পারছে না, বড় ছেলেমেয়েগুলোকে রাস্তায় নামালো তার সংসার-তরণীর হাল ঠেলতে।'

'বাহাদুর !' কার ঠাট্টার সুর শোনা গেলো। 'আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে সম্মানে বাধছিলো, এখন, এখন লোকে বলছে কি ! ছি-ছি—'

'ভাবতেও পারছি না এ-পাড়ায় ও কী ক'রে এতকাল ছিলো, আমাদের মধ্যে !'

'ঠেলা নিয়ে তারিণী বেলেঘাটায় পৌঁছুবে কখন ?'

'কে জানে, আদৌ পৌঁছবে কিনা তা-ই বা কে জানে !'

বিকেলের পর থেকে খবর আসতে লাগলো।

না, বেলেঘাটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি তারিণী, তার আগেই অ্যাক্সিডেণ্ট হ'লো রাস্তায়।

'কি রকম ?' প্রতিবেশীরা উৎসুক।

প্রত্যক্ষদর্শী বললো, 'কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের জংশন পার হবার সময় একটা ট্র্যাম এসে পড়েছিলো ঠেলার ওপর। তারিণীর ঘাড় মচ্‌কে গেছে,

হাসপাতালে, বাঁচবে না বোধ হয়।'

'আঃ,' কেউ বললো, 'ওই হয়, মূর্খ এমন ক'রেই মারা পড়ে।'

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।

একটু পরে আর-একজন এলো খবর নিয়ে। নিজের চোখে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে ঘটনা।

'শুনি শুনি।'

তারিণী আত্মহত্যা করেছে। অ্যাক্সিডেণ্ট তো বটেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় সে ঘটিয়েছে তা। কি রকম ? প্রতিবেশীরা আবার উৎসুক।

'ছেলেমেয়েগুলো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, হাঁটতে পারছিলো না কেউ। তারিণীর স্ত্রীও হয়রান হ'য়ে গেছে ঠেলা ঠেলতে-ঠেলতে।'

'তারপর ?'

'তারিণী আর-একটা ঠেলাওলাকে ডেকেছিলো কিন্তু বেনামী গাড়ির মাল নিজের গাড়িতে তুলে নিতে লোকটা রাজী হয়নি।'

'তা তো হবেই না,' প্রতিবেশীরা একসঙ্গে মন্তব্য করলো, 'বেওয়ারিস মাল নিয়ে তারিণী পালাচ্ছিলো না তার প্রমাণ কি।'

প্রত্যক্ষদর্শী আস্তে-আস্তে বললো, 'রাস্তায় বউ-এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তারিণীর। বউ শুধু বলছিলো, "এমন জিদ্ ক'রে রওনা না হ'লেও পারতে, এখন—এখন যে আর পারা যাচ্ছে না,"—সকলের ছোটটাকে সে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলো।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি, তারিণীর মাথা গরম হ'য়ে যায়। মুখিয়ে উঠেছিলো সে স্ত্রীকে, রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে, গলা ফাটিয়ে তারিণী বলছিলো বউকে, ছেলেমেয়েগুলোকে—"বেশ তো, জিরিয়ে-জিরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে আয় সব। দরকার নেই ঠেলা ধ'রে—আমি একলাই পারবো টেনে নিতে।"

'তারপর ?'

'তারপর তারিণী ঠেলা নিয়ে একলা পাগলের মতো ছুটে যায়। ভিড, ভয়ানক ভিড ছিলো ট্র্যাফিকের তখন, একটা বাস এসে হুড়মুড় ক'রে পড়ে তারিণীর ঘাড়ের ওপর, গাড়ির ওপর।'

'পাগল, পাগল। সংসার চালাবার জন্যে তারিণী উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলো।' প্রতিবেশীরা আলোচনা করছিলো।

কিন্তু ছেলেমেয়ে ও বৌকে পিছনে ফেলে তারিণী যে কেবল ডেক্‌চি-বিছানা ঘটি-বাটি লণ্ঠন ঠেলায় চাপিয়ে বাসের তলায় ছুটে গেলো, সে-খবরও ঠিক নয়।

সঠিক সংবাদ পাওয়া গেলো সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ প্রত্যাগত এক প্রতিবেশীর নিকট। ঠেলার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ছেলেমেয়েগুলো ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, একটি দুটি ক'রে তারিণী আটটিকে গাড়িতে তুলে নেয়। তারপর আর পারেনি।

'বেলেঘাটার পুলে উঠতে কষ্ট হচ্ছিলো বুঝি?' একজন প্রশ্ন করলো।

'উঠেছিল ঠিক।' প্রত্যক্ষদর্শীর গলার স্বর গম্ভীর হ'য়ে গেলো। 'হ'লে হবে কি। পুলে উঠতে-না-উঠতে তারিণীর স্ত্রীর পা কাঁপছে, চোখে জল এসে গেছে, বাকি দুটি সন্তানকেও ঠেলার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়, ইচ্ছা করেই তারিণী বসিয়ে দেয়। "আর ভয় নেই,"—তারিণী বলছিলো, "এখন ঢালু পথ, ঠেলা হুড়হুড় ক'রে পুল থেকে নেমে যাবে। তোরা সবাই চেপে বোস।" '

'তারপর?'

প্রত্যক্ষদর্শী আস্তে-আস্তে বললো, 'বউ প্রথমটায় আপত্তি করে, কিন্তু তারিণী তা গ্রাহ্য করে না, চিরকালই জেদী একগুঁয়ে লোক, বউকে মুখ ঝাম্‌টা দেয়, বলে, "শেষটায় তুমিও শত্রুতা আরম্ভ করলে, যা বলছি শোনো, হ্যাঁ, একলাই আমি চালাবো গাড়ি, না-পারবে তো সংসার গড়েছি কেন।" '

'অর্থাৎ বউকেও ঠেলায় বসিয়ে দেয়, এই তো?' মৃদু হেসে হোমিওপ্যাথ হেমাঙ্গবাবু মন্তব্য করেন।

ঘাড় নেড়ে প্রত্যক্ষদর্শী বললো, 'পুল থেকে নামবার সময় ঠেলাটা হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে একদৌড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তার ফল কি দাঁড়াতে পারে বুঝতেই পারেন।' বক্তা থামলো।

শ্রোতৃবৃন্দ নীরব।

প্রতিবেশী একজন বললো, 'তা যাবেই, এমন ভারী বোঝা নিয়ে গাড়ি একবার সামনের দিকে ঝুঁকলে আর রক্ষে থাকে! ঠেলাটা তারিণীর ওপর দিয়ে চ'লে গেছে তো? মূর্খ তারিণীর এভাবে ঘাড় ভাঙবে, বুকের হাড় ভাঙবে, আমরা ধ'রে রেখেছিলাম।'

ছেলেমেয়ে এবং তারিণীর স্ত্রীর অবস্থা কি, কোথায় তারা আছে সে-সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করলো না। প্রত্যক্ষদর্শী ধীরে-ধীরে গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

সবাই চুপ।

চুপ থেকে কুকুরটা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত লেজ নাড়ছিলো।

হঠাৎ একজন কথা বললো, 'কিন্তু ও কি জানতো না, ঠেলা যখন ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করে তখন তার আগে থাকতে নেই, পিছন ধ'রে চলাই নিরাপদ, সবাই তা করে।'

সে-কথার উত্তর দিতে কেউ নেই, যে যার ঘরের দিকে চ'লে গেছে। দেখা গেলো, অদূরে লম্বা টর্চ হাতে তারিণীর পরিত্যক্ত ঘরের দরজার তালা খুলতে-খুলতে বাড়িওলা নতুন কোনো-এক ভাড়াটাকে বাড়ির জলকল পায়খানা ও রসুই-ঘরের চমৎকার ব্যবস্থার কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শোনাচ্ছে।

সেদিন বুঝলাম, আমাদের সংসার ছাড়াও সংসার আছে, আমাদেব পৃথিবীর বাইরেও পৃথিবী আছে।

অহরহ শোক তাপ অভাব অনটন আধিব্যাধি অর্ধাঙ্গিনীর অব্যক্ত গুঞ্জন এবং আধ-ডজন অপোগণ্ডের দুড়দাড় মাতামাতি একদিন, একদিন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গিয়েছিলো। সবাই অবাক হ'য়ে দেখলো নতুন সেই গ্রহ।

আমরা ভাবতে পারিনি, আমি, আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা। যে-বাড়ির ইঁট সিমেণ্ট খ'সে পড়ছে, উঠতে-নামতে দুর্বল হৃৎপিণ্ডের মতো সিঁড়িটা কাঁপে, ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ছে এখন তখন, সেখানে হঠাৎ শাড়ি গয়নার ঝলক, সাবান পাউডার দামি সিগারেটের ঘি গরমমশলা মাংসের গন্ধ কেমন অদ্ভুত লাগলো। আমাদের ঘরের টিকটিকিটা পর্যন্ত অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখছিলো প্যাসেজের ওপারে লাল আলোয় ভরা জানলাটার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে বুঝি এসে উঠেছিলো। এরই মধ্যে জিনিসপত্র জায়গা মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে ফিটফাট। কোনো ঝামেলা, কোনো ঝঞ্ঝাট, একটু শব্দ পর্যন্ত না।

রেশনের আটার সংক্ষিপ্ত ক'খানা রুটি গলাধঃকরণ ক'রে আস্তে-আস্তে আমার সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়লো। টারপিনের অভাবে কেরোসিন আর কর্পূরের এক রাসায়নিক মিশ্রণ তৈরি ক'রে গৃহিণী তখন দেয়ালে পিঠ রেখে মেঝেয় ব'সে পায়ে মালিশ করছে। আর আমি, লাল-ফিতে-বাঁধা আপিসের ফাইল সামনে নিয়ে ব'সে কখনো ঢুলছি, হাত দিয়ে মশা তাড়াচ্ছি একেক বার। লাল, মঙ্গলগ্রহের মতো লাল স্তব্ধ সেই ঘরের দিকে চোখ পড়তে সত্যি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না।

সস্তা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা থাকে না। আমি কখনো মোমবাতি, কোনোদিন রেড়ির তেল দিয়ে কাজ সারি। কেরোসিন যা যোগাড় করি হেমলতার বাতের দৌলতে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তেমনি এ-বাড়ির অন্য সব ঘরে। কারো টিমটিমে, কারো-বা তা-ও না। কাজেই অন্ধকার এই জগতে এমন চমৎকার আলোয় টলটলে একটা ঘর যদি অনেক রাত অবধি জেগে থাকে সেদিকে চেয়ে আপনিও কি জেগে থাকবেন না! তাকিয়ে থেকে ভাববেন, এরা কারা। কেমন এই নতুন গ্রহের বাসিন্দারা। বুঝলাম হ্যাজাক জলছে। আর

ডোমটা সাদা না হ'য়ে লাল হওয়াতে ঘরটা যেন আরো সুন্দর রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে। আমার চোখের পলক পড়লো না। মেয়েটি মেয়ে কি মহিলা তখন ঠিক বুঝলাম না। জানলার কাছে দু-বার এলো। একবার একটা ডিশ নিয়ে গেলো, একবার এসেছিলো সস্প্যান নিতে। থমথমে যৌবন, বিশাল বিকশিত খোঁপা। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে আমি চুপ ক'রে দেখছিলাম। অনেক রাতে একটা লোক ঢুকেছিলো ঘরে। রোগা টিংটিংয়ে টাই-স্যুট পরা। যেন অনেক হাঁটাহাঁটি ক'রে অনেক ক্লান্তি নিয়ে এখন এখানে তার আশ্রয়। সিগারেট টানলো ওই জানলার ধারে ব'সে আট-দশটা। দৃশ্যটা আর ভালো লাগছিলো না ব'লে শুয়ে পড়লাম। যেন লোকটা না হ'য়ে সেই মেয়েটি যদি আরো দু-একবার জানলায় আসতো, একটু দাঁড়াতো, ভালো লাগতো। শুয়ে-শুয়ে ভাবলাম, কালো-স্যুট-পরা মূর্তিটা, চাঁদের কলঙ্কের মতো হুট্ ক'রে ওখানে এসে ওটা কেন জুটলো। বেশ তো ছিলো।

সকালে অবশ্য আমার সংসার আগে জাগে, তারপর পাশের ললিত নন্দীর ঘর, ফালু পালের। আমরা কেরানী, আমাদের আগে জাগতে হয়। এখন আমাদের সংসারে শব্দ বেশি, তাডাহুডা খুব। চিৎকার ক'রে ছেলে দুটো ইস্কুলের পডা তৈরি করছে, প্রীতি বীথি অথাৎ আমার বড়ো দু-মেয়ে রান্নাবান্না করছে। অসাড় পা দুটো মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে হেমলতা চালের কাঁকর বাছচে। আডচোখে ওদিকে চেয়ে দেখলাম প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের গায়ে হলদে রোদ এসে গেছে। কিন্তু সেখানে এখনো ঘুম। দরজাটা বন্ধ।

না, রাত্রে ওদের ঘরের উজ্জ্বল আলো আর আমাদের ঘরের রেডির বাতির বৈষম্যটা যতই চোখে লাগুক, যতই উজ্জ্বল ও অদ্ভুত ঠেকুক না কেন, এখন, সকালে, যখন একই রকমের বিবর্ণ ধূসর কাকগুলোকে ওদের ছাতের কার্নিশে এবং আমার ঘরের কার্নিশেও ব'সে থাকতে দেখলাম তখন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। হোক বডলোক—ভাবলাম—এক বাড়িতে যখন ঘর ভাডা নিয়েছে তখন সেই শ্যাওলা-পড়া পুরোনো চৌবাচ্চার জলই মুখে দিতে হবে, পচা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। উপায় নেই। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মনের ভাবটা হ'লো আমার। হঠাৎ যদি সচ্ছল সম্ভ্রান্ত কোনো যাত্রী এসে ওই কামরায় ঢোকে এবং একই বেঞ্চিতে আমার পাশে বসে তখন কি এই ভেবে উৎফুল্ল হবো না যে আমার অসুবিধাগুলি তোমাকেও ভোগ করতে হবে, বৈষম্যটা অন্ততঃ এদিক দিয়ে থাকবে না। ধীরে-ধীরে আলাপ-পরিচয় যে না হবে তা-ই বা কে বলতে পারে এবং তাই তো স্বাভাবিক। নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত সাফ করার অছিলায় ওদিকের পার্টিশন-সংলগ্ন দরজাটার দিকে অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলাম। যেন একটা কাজ পেয়েছি।

হঠাৎ পিছনে যেন কে এসে দাঁড়ালো।

'বাবা স্নান করো, অফিসের বেলা হ'লো।'

চমকে উঠলাম। প্রীতি। রুষ্ট হ'য়ে উঠি।

'অফিসের বেলা হ'লো আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না ?'

প্রীতি একটু অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। কেননা বেলা আটটা না বাজতে আমার তরফ থেকে রোজ রান্না নামানোর তাগিদ হয়, ওরা দু-বোন জানে। চুপ ক'রে ঘরে ঢুকলাম।

দেখি আমার বড়ো ছেলে মণ্টুর কাঁদো-কাঁদো চেহারা। রাগ আরো বেড়ে গেলো।

'কি হয়েছে শুনি ?'

'আমার জ্যামিতি পড়া তুমি আর বুঝিয়ে দিলে না বাবা।'

'অফিসের চরকায় তেল দিয়ে কূল পাই না, তোর পড়া দেখিয়ে দিই কখন।'

চুপ হ'য়ে গেলো মণ্টু। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসি। ভাত দেয় ছোটো মেয়ে বীথি। বুঝি হাত থেকে চার-ছটা ভাত গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। রীতিমতো গর্জন ক'রে উঠলাম। 'একটু সাবধান হবি—অমন ক'রে জিনিস লোকসান ক'রে আমায় রাস্তায় বসাবি নাকি। যে কোনো-দিন রেশন বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।'

অধোমুখে বীথি সামনে থেকে স'রে গেলো। সাদা নিষ্প্রভ দুটো চোখ মেলে হেম আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ওর মুখের দিকে না তাকিয়েও বেশ টের পাই। কর্পূর-কেরোসিনের গন্ধটাও যেন নতুন ক'রে নাকে এসে লাগে।

জামা-কাপড় প'রে ধনেচাল চিবোতে-চিবোতে যখন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, দেখি প্যাসেজের ও-পাশের দরজা খুলেছে। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো। এবং ঘুম যে ভেঙেছে চোখেই দেখতে পেলাম। শুকনো খোঁপার আধখানা মুখ থুবড়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। ভাঙাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা রোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে। মেয়েটি—মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেলো না—ওদিকের গলির দিকে মুখ ক'রে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। তাই মুখখানা ভালো দেখা হ'লো না।

অবশ্য বুঝলাম রাত্রে দু-বার যাকে জানলায় দেখেছিলাম। একবার এসেছিল ডিশ নিতে, একবার এসে একটা সস্‌প্যান নিয়ে গেলো। যেন জানলার গায়ে ঠেকানো ছোট একটা সেলফ্‌ বসানো হয়েছে ও-ধারে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে রাত্রের ছবিটা ভাবি।

রাস্তায়, এমন কি ট্রামের ভিড়ে দাঁড়িয়েও রৌদ্রে-দাঁড়ানো সেই মূর্তিটা মনে-

মনে আঁকি। অফিসে লেজারের সামনে ব'সেও। তারপর সেই স্যুট-পরা আদমীর চেহারা যখন মনে পড়লো ভিতরটা কেমন ভার হ'য়ে গেলো। কাজে মন দিলাম।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি মণ্টুর হাতে চকোলেটের বাক্স, ফণ্টুর হাতে আপেল।

'কোথা পেলি এ-সব, কে দিলে ?' চোখ বড়ো হ'যে গেলো আমার।

প্রীতি পেয়েছে ব্লাউজের টুকরো, বীথি পেয়েছে শাড়ি।

'কে দিয়েছে শুনি না ?'

'লীলাদি,' বীথি বললে খুশি চোখে।

'খুব বড়লোক,' প্রীতিও সামনে এলো। 'লীলাদির বর ইঞ্জিনিয়ার।'

আমার কাপড় জামা বদলানো হ'লো না। হাত-মুখ-ধোওয়া নেই। হাতে নিয়ে জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি। 'পাটনা থেকে এসেছে ছুটিতে,' বললে বীথি, 'ভালো বাড়ি পাওয়া গেলো না, তাই এখানে।' বীথির মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাতে যাবো এমন সময় দরজায় ছায়া পড়লো।

মেয়ে নয়, মহিলা।

খোঁপায় চওড়া কালো-পাড় আঁচল উঠেছে। জোড়া ভুরু ধনুকের মতো বাঁকা। তনু মধ্যম গড়ন। জীবনে এই আমি প্রথম দেখলাম পরিপূর্ণ যৌবন।

প্রীতি বীথি বাইশ উনিশে পা দিয়েছে। যৌবনের দেখা পায়নি ওদের শরীর। আর সেই বীথি যখন পেটে, কুড়ি বছর বয়স থেকেই হেমলতার বাত, তখন থেকে আজ অবধি দু-পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে ও দাঁড়াতে পারেনি। আমার চোখ তখন মাটির দিকে, স্যাণ্ডেলের ফাঁকে, পায়ে আলতার ছোপ।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ', ঘাড় তুললাম, মুখখানা আবার দেখলাম। কপালে হাত ঠেকিয়ে মহিলা নমস্কার জানালে। আমিও।

'একটু কষ্ট করবেন,' চৌকাঠের গায়ে একটা হাত রাখলো লীলাময়ী, এক-পা বাড়ালো সামনে। 'ওকে দিয়ে তো কাজ হবে না, কলকাতায় এসেছে কেবল ঘুরতে। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ফুরোয় না।'

হেসে বললাম, 'বলুন, কিছু করতে হবে ?'

লীলাময়ী হাসলো লজ্জায়, নাকি চট ক'রে আমি রাজী হয়েছি ব'লে। 'একটু মাংস এনে দিতে হবে বাজার থেকে।'

'ও আবার একটা কাজ,' নুয়ে পড়েছিলাম, সটান সোজা হ'য়ে দাঁড়ালাম। 'এখুনি এনে দিচ্ছি।'

চোখে ঠোঁটে হাসির ঝলক লেগে আছে তখনো। লীলাময়ী হাত বাড়িয়ে

একটা দশ টাকার নোট দিলে।

'দু-বার ভেবেছি আপনাকে বলবো কিনা, আমার তো আর লোকজন নেই।'

'ছ্যাখো কথা,' হেসে বললাম, 'এতে লজ্জার কি আছে, তবে আর একবাড়িতে থাকা কেন।' ব'লে প্রীতির চোখের দিকে তাকালাম। ও অন্যদিকে চোখ সরিয়েছে। বীথি নেই আর সেখানে।

'আপনার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' লীলাময়ী বললো, 'আমাদের বউদি বুঝি ইন্‌ভ্যালিড ?'

কৃতার্থের হাসি হেসে চৌকাঠ পার হ'যে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। আমার পিছনে ও সিঁড়ি অবধি এলো।

'নতুন জায়গায় এসে উঠলে কত কি দরকার, ওর তো কোনোদিকে মনোযোগ নেই, কী মুশকিলে না পড়েছি আমি।'

'আ, কেন আপনি মন খারাপ করছেন।' নির্জন সিঁড়ি পেয়ে আমার গলা আরো ঝরঝরে হ'যে গেলো। 'যখন যা দরকার বলবেন, এটুকুন উপকার যদি না করলুম তবে আর একত্র বসবাস কেন।' নিবিড় পরিচ্ছন্ন যৌবনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাব শুকনো বুকের ভিতরটা কাঁপছিলো। চোখে পলক পড়লো না।

'বেশ কচি পাঁঠার মাংস হয় যেন।'

'তা আব বলতে হবে না।' লম্বা পা ফেলে বাজাবের দিকে ছুটলাম।

এই লীলাদি। লীলাময়ী বা লীলাবতীও হ'তে পারে। আমার যেন লীলাময়ী মনঃপূত হ'লো। একদিনে এতটা অগ্রসর, এ যেন স্বপ্নের অতীত। না, এমন পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখে কোন নারী আমার দিকে তাকায়নি, এমন সুন্দর সহজ গলায় কথা বলেনি। আমার যৌবনের বা কেরানী-জীবনের ইতিহাসে তার চিহ্ন নেই। আমার নিজের মেয়ে তো প্রীতি বীথি। বলতে পারো বয়স হয়েছে আজো পাত্রস্থ করা হয়নি ব'লে মন ভার, মুখ ভার। কিন্তু ভালো ক'রে বাপের সঙ্গে দুটো কথা বলতে আপত্তি কি। ভয়ে চোখে-চোখে তাকায় না, যেন আমি দানো, খেয়ে ফেলবো কি গিলে ফেলবো। সুন্দর চোখের কথা না-হয় না-ই বললাম। আর তাকাবে কে ? হেমলতা ? মরা মাছের মতো সাদা ফ্যাকাসে চোখ দুটো মেলে ও আমার দিকে তাকায় ঠিক বলা চলে না, কোনোমতে জেগে থাকে। নীচে কলতলায় ললিত নন্দীর বউ-এর সঙ্গে একদিন চোখাচোখি হয়েছিলো, হয়েছিলো মানে হবার উপক্রম হচ্ছিলো, সাত হাত এক ঘোমটা টেনে হাতের শূন্য বাল্‌তি চৌবাচ্চার ধারে রেখে স'রে গেছে আমাকে কল ছেড়ে দিয়ে। ফালুর জেনানাকে আমি কলতলায় দূরে থাক, কোনেদিন জানলায় আসতেও দেখলাম না। আর তাকাবে কে ? ট্র্যামে-বাসে ? পঞ্চাশের কাছাকাছি

বয়েসের কোনো কেরানীর দিকে কেউ কি কখনো তাকায় ?

পাঁচ-সাতটা দোকানে ঘোরাঘুরি ক'রে কচি ও তাজা পাঁঠার মাংস যোগাড় ক'রে বাড়ির দিকে চললাম। ভাবছি তখন, ভাবতে-ভাবতে চলেছি। কথাটা কানে লেগে আছে: ওর কোনোদিকে মনোযোগ নেই। মনোযোগ যে নেই কাল রাত্রে দূর থেকে একবার দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ফিরিঙ্গি ছোঁড়াদের মতো বাউণ্ডুলে চেহারা। আট-দশটা সিগারেটই শেষ করলো জানলায় দাঁড়িয়ে। হাওয়া-খোর।

সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আমার অন্ধকার ঘর। বুঝলাম আজ মোম, রেড়ি কোনোটাই যোগাড় করা হয়নি। যদি-বা কিছু সঞ্চিত থাকে আমার অপেক্ষায় রেখে দেওয়া হয়েছে। তেমনি ফালুর ঘর অন্ধকার। ললিতের ঘরে টিম্‌টিমে কি-একটা জ্বলছে যেন। না-থাকার সামিল। কেবল একটি জানলায় তীব্র উচ্ছ্বসিত আলোর বন্যা। সত্যি যেন আমাদের ঘরের পাশে নতুন এক গ্রহ এসে বাসা বেঁধেছে।

প্যাসেজ পার হ'য়ে পার্টিশনের কাছে যেতে ও বেরিয়ে এলো। যেন এইমাত্র কল-ঘর থেকে ফিরেছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে, এলোচুল। বৃষ্টি-ধোওয়া কদমফুলের সৌরভের মতো মিষ্টি একটা গন্ধ আমার নাকে লাগলো।

'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম।'

'কেন ও-কথা ব'লে বার-বার মনে কষ্ট দিচ্ছেন।' মাংসের পুঁটুলি লীলাময়ীর পায়ের কাছে সিমেন্টের ওপর রাখলাম।

'একটা চাকর পর্যন্ত না,' নুয়ে পুঁটুলিটা ও হাতে তুলে নিলে। 'আমরা যখন ছুটিতে যাচ্ছি চাকর দুটোকে ছেড়ে দাও, ঘুরে আসুক ক'দিন দেশ থেকে—কী বুদ্ধিমানের কথা শুনুন—কলকাতায় ঢের লোক পাওয়া যাবে।'

বুদ্ধিমানটি কে আন্দাজ করতে কষ্ট হ'লো না। এবং বুদ্ধির বহরটা আরো বড়ো ক'রে দেখাবার সুযোগ এলো আমার, গম্ভীর গলায় বললাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেও চাকর জুটবে না, বাড়ি পাওয়ার মতোই কঠিন। উনি এখনো ফেরেননি বুঝি ?'

'রাত বারোটার আগে! কৌতুকোজ্জ্বল কালো চোখ আমার মুখের ওপর মেলে দিয়ে যুবতী হাসলো। 'ভালো লোক ঠাওরেছেন।'

'রোজই এমন করেন নাকি ?' কৌতূহল খুব বেশি হ'লো, একটু হাসলামও। 'অনেক রাতে ফেরেন বুঝি ?'

'রোজ, চিরকাল।' যেন চিরকালের এই অভ্যাসটা ধাতস্থ হ'য়ে গেছে লীলাময়ীর, খারাপ লাগে না, নইলে এমন ঝরঝরে গলায় হাসবে কেন। 'ওখানে

যেমন করেছে, এখানে এসেও দেখছি তাই, বন্ধুর ওর শেষ নেই, হয়তো দুপুর রাতে এসে বলবে, খেয়ে এসেছি অমুকের বাড়িতে, কি অমুকের সঙ্গে হোটেলে, আমি খাবো না, এই রকম।'

রকমটা কি ভালো? মুখ দিয়ে আমার প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো, গম্ভীরভাবে বললাম, 'না, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক না।'

চৌকাঠের ওপর চোখ রেখে কি যেন ও ভাবলো। নাকি ভাবনা ঝেড়ে ফেলার জন্য ফের লীলাময়ী ঠোঁটে হাসি টেনে আনলো। এবার আমার প্রসঙ্গ।

'বেশ পরিশ্রম করতে পারেন আপনি।'

'নিশ্চয়,' দৃপ্ত পৌরুষের গলায় বললাম, 'পুরুষের এত গা ভাসিয়ে দিলে সংসার চলে না। সন্ন্যাসী বাউলের সংসার নেই।' ইঙ্গিতটা ইচ্ছা ক'রেই একটু ভালোর দিকে রাখলাম।

ছুরির ফলার মতো ধারালো চকচকে দুটো চোখ আমার আপাদমস্তক বিদ্ধ করলো। ছেঁড়া জামা আমার? ছেড়া জুতো গরিব কেরানী? না, এ-চাউনির অর্থ অন্যরকম। এ স্বতন্ত্র।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন, এই আবার ছুটলেন বাজারে, একটু আলসেমি নেই।'

'আলসেমিটা মনের', ঠোঁট টিপে হাসলাম, 'নাকি এ-বয়সে এতটা ছোটাছুটি মানায় না বলছেন আপনি?'

কিছু বললো না, লীলাময়ী ঠোঁট টিপে হাসলো।

বললাম, 'যাই, আপনার কাজকর্ম আছে।'

'হ্যাঁ, তা আছে বৈকি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবতী ঘাড় ফেরালো, শরীর ঘোরালো। অপরূপ দীর্ঘ দেহ। ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাড়ি পরনে। মনে হ'লো মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিণী কোনো বাঘিনী। মাংসের পুঁটুলিটা হাতে ক'রে চৌকাঠের ওপারে পার্টিশনের আড়ালে অদৃশ্য হ'লো। সুন্দর, গর্বিত, নির্ভীক। আমি চেয়ে রইলাম।

ঘরে ঢুকতে অন্ধকারে একটা ফুঁসফাঁস শব্দ কানে এলো। মেজাজ কেমন গরম হয়, ভাবুন একবার। দরজার কাছে, অনুমান করলাম, বীথি ওটা।

'কি হয়েছে শুনি, কাঁদছে কে?'

'মণ্টু।' বুঝলাম প্রীতির গলা। 'ইস্কুলে জ্যামিতি পড়া দিতে পারেনি, মাস্টার মেরেছে।'

'বেশ করেছে,' হাল্কা গলায় বললাম, 'এক-আধটু মার খাওয়া ভালো।'

প্রীতি আধ-ইঞ্চি সেই মোমের টুকরোটা জ্বাললো। জামা কাপড় ছেড়ে মুখ-

হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। বললাম, 'এ-বয়সে ইস্কুলে সবাই মার খায়। মার না খেয়ে কেউ মানুষ হয়েছে ? উকিল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কেরানী, প্রোফেসার—মার একদিন সবাই খেয়েছে।' মণ্টু আমার কথাগুলি কান পেতে শুনলো। প্রীতি, বীথি, মণ্টু আর ওদের মা। যেন এমন মিষ্টি কথা আমার মুখ দিয়ে কোনোদিন বেরোয়নি। গলামোমের মাঝখানে সল্‌তের টুকরোটা সাঁতার কাটতে-কাটতে ফুটুস ক'রে এক-সময়ে নিভে গেলো। আমারও খাওয়া হ'য়ে গেছে। এবং অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকার কোনো মানে হয় না বা এতগুলি মিষ্টি কথার পর আবার কি অপ্রিয় কথা ব'লে হেমলতার সংসারকে হতচকিত ক'রে দিই এই ভয়ে আস্তে-আস্তে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ললিতের ঘরের টিম্‌টিমে আলোটাও নিভে গেছে এখন। পাড়াটাই ঝিম্ মেরে যায় রাত আটটার পর। তাই ও-ঘরের লাল-আলো-জ্বলা জানলাটা আরো বেশি কাছে মনে হচ্ছে যেন। হাত বাড়ালে নাগাল পাবো।

পায়ের শব্দ শোনা যায় ? বাসনের ঠুন্‌ঠান্ আওয়াজ ?

কান পেতে রইলাম। দেখলে মনে হয় যেন ও-ঘরে এই সবে সন্ধ্যা নেমেছে, গা ধুয়ে চুল বেঁধে পরিপাটি ক'রে লীলাময়ী রাঁধতে বসেছে। আঁটোসাঁটো নিটোল নিখুঁত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ধ্যানস্থের মতো জানলাটার দিকে চেয়ে রইলাম। না, এদিকে কিন্তু একবারও এলো না, ডিশ বা বাটি নিতে। কেবল ওদিকের দেয়ালে একবার গোল-মতো একটা ছায়া দেখলাম। বুঝলাম দেয়ালে-ঢাকা ওই অংশটায় ব'সে লীলাময়ী রাঁধছে। আর উল্টোদিকে ছায়া পড়েছে। একবার কাঁপছে আবার স্থির হ'য়ে আছে।

বিড়িটা নিভে যেতে আর-একটা ধরাতে যাবো হঠাৎ যেন নিচের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। ইঞ্জিনিয়ার ?

শ্বাস বন্ধ ক'রে কান পেতে রইলাম। আর শব্দ নেই। বোঝা গেলো ইঁদুর। পুরোনো বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি। ময়লা বেরোবার পাইপ বেয়ে নির্বিবাদে ওরা ওপরে উঠে আসে। মোটা ধোঁয়া-রঙের বিশাল এক-এক ইঁদুর।

লীলাময়ীর ঘরে ইঁদুর ঢোকে ? কথাটা কেন জানি মনে হ'লো। জানলার দিকে চেয়ে ঢোক গিললাম। কল্পনা করলাম, সত্যি যেন একটা নোংরা হোঁৎকা ইঁদুর ঢুকেছে ও-ঘরে। লীলাময়ী আঁৎকে উঠবে ভয়ে ? না চিৎকার ক'রে উঠবে ! না রাগে দাঁত ঘ'ষে হাতের তপ্ত খুন্তিটা ইঁদুরের মস্তকে ফুঁড়ে দেবে ! নাকি ঘাড় ফিরিয়ে নরম ঠাণ্ডা চোখে একবার মাত্র তাকাতে বাসনকোষনে গা না ঠেকিয়ে ইঁদুরটা ভালোমানুষের মতো লীলাময়ীর সাদা সুন্দর পায়ের কাছ দিয়ে সুড়সুড় ক'রে নর্দমার পথে বেরিয়ে গেলো।

তাই—তাই হবে। এ তো আমাদের ঘরে ইঁদুর ঢোকা নয় যে ওটাকে দেখেই মালিশরতা হেমলতা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠবে, প্রীতি বীথি মোটা থপ্‌থপে পা ফেলে ঝাঁটা নিয়ে আসবে ছুটে ইঁদুর মারতে, মণ্টু ফণ্টু ঘরময় দাপাদাপি করবে, সে এক কাণ্ড! শুনলাম দূরের পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে দশটা বাজলো।

পা বদল ক'রে ফের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াবো এমন সময় প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের দরজা ন'ড়ে উঠলো। প্রথমে আলোর একটা রেখা, তারপর আলোর রেখার মতোই উজ্জ্বল দীর্ঘ সেই দেহ। বুকের ভিতর ঢুব্‌ঢুব্‌ করছে আমার। প্যাসেজের মাঝামাঝি যখন এলো মুখখানা আর ভালো দেখা গেলো না। আশ্চর্য, লীলাময়ী এদিকেই আসছে, আমার ঘরের দিকে।

রেলিং ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

'ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে? ছেলে-মেয়েরা?'

'প্রীতি বীথি? মণ্টু-ফণ্টু?' বললাম, 'কিছু দরকার আছে?'

'একটু কারী খাবে ওরা।'

অন্ধকারে আন্দাজ করলাম ওর হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটি।

'এত রাত্রে ওটা আপনি হাতে ক'রে এনেছেন! তা ছাড়া ওইটুকুন তো ছিলো, আমি নিজে বাজার করেছি।'

'তাই ব'লে সব একলা খেতে হয়!' হাসলো লীলাময়ী, অন্ধকারে বৃষ্টির ফোঁটার মতো সে-হাসির শব্দ।

বললাম, 'তা ছাড়া ঘুমের চোখে উঠে খাবে, স্বাদ বুঝবে না, কাল হয়তো আপনাকে রান্নার নিন্দেই শুনতে হবে।'

'বেশ তো, আপনি জেগে আছেন, একটু চেখে স্বাদ বুঝে রাখুন, সাক্ষী থাকবেন।'

'অর্থাৎ আমার জন্যেও এসেছে,' হেসে হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলাম। 'পারতাম খেতে খুব এককালে মাংস—এখনো, এখনো পারি এমন—'

'না পারার আছে কি,' অন্ধকারে আর-এক ঝলক হাসি উঠলো। দাঁত ক'টি সকালে নড়বে ব'লে তো মনে হয় না।'

মনে পড়লো, সন্ধ্যাবেলা সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম ধারালো চকচকে চোখে ও আমার দাঁতগুলির দিকেও দু-বার তাকিয়েছিলো।

'আপনার তো খাওয়া হয়নি।'

'এইবার খাবো, নাকি রাত দুপুর অবধি আমিও জেগে ব'সে থাকবো খাবার সামনে নিয়ে? চললাম—'

হাসলো ও, যেন তারের যন্ত্রে ছড় টেনে গেলো।

মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করছিলো। না, এ আমাকেই দেওয়া, আমাকেই দিতে আসা। আমার ঘর রাত আটটা থেকে নিভে গেছে, ঘুমে তলিয়ে আছে, পাঁচ-সাত হাত দূরে আর-এক ঘরে ব'সে ওর টের না পাওয়া খামোকা কথা।

মনে মনে হাসলাম। কেননা একটা ছবি তখন আবার মনে এসে গেছে। টিং-টিং ক'রে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছে পেন্ট্‌লন-পরা সেই মূর্তি। বন্ধুর আড্ডা ছেড়ে আর-এক বন্ধুর আড্ডায়। সিগারেটের ধোঁয়া হ'য়ে চিরকাল তুমি উড়তে থাকো, ভেসে যাও, বললাম মনে-মনে।

সোজা চ'লে গেলাম নিচে কলতলায়। জায়গাটা এখন সবজনপরিত্যক্ত। নিরাপদ।

না, প্রীতি বীথিকে অর্থাৎ হেমলতার সংসারকে আর নাড়া দিলাম না এই ভেবে, ওদের মন পরিষ্কার নেই। বিশেষ ক'রে বুড়ি মেয়ে দুটো। আমি মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলি ওটা যেন ওরা পছন্দ করে না এমন ভাব। না হ'লে সকালে আমার অফিসে যাওয়া নিয়ে বীথির অত মাথাব্যথা উঠেছিল কেন? সন্ধ্যাবেলা আমি ঘরে না ফেরা তক প্রীতি অন্ধকারে চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিলো কেন? এখন এই মাংসের ব্যাপারটাও ভালো চোখে দেখবে না। দেখতে পারে না কুটিল যাদের মন।

চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে গরম উপাদেয় মাংসখণ্ডগুলি একে-একে সব সাবাড় ক'রে বাটিটা জলে ভিজিয়ে রেখে মুখ-হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসে আবার আগের জায়গায় রেলিং ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার পরিষ্কার চোখে পড়লো, জানলার ওপারে, টেবিলের ওপর থালা রেখে লীলাময়ী খেতে বসেছে। দেখলাম অনেকক্ষণ ধ'রে ওর ধীরেসুস্থে চিবিয়ে রসিয়ে খাওয়া, তারপর হাত-মুখ ধোওয়া, মুখ মোছা, পান খাওয়া, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পানের রসে রাঙানো ঠোঁট উল্টেপাল্টে দেখা। আঁচলটা কাঁধ থেকে প'ড়ে গেছে। আলস্যে মন্থর। একদিকের দেওয়াল থেকে লীলাময়ী অন্য দেয়ালে চোখ ফেরালো, এলো একেবারে জানালার কাছে। জানি না রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ানো আমার আবছা মূর্তি ওর চোখে পড়েছিলো কি-না, ঈশ্বর জানে, তবে আমি তো দেখলাম অন্ধকারে চোখ রেখে ও ব্লাউজের হুক্ খুললো।

অবশ্য একটু পরেই আলো নিভলো। আমার দু-কান দিয়ে তখন গরম হাওয়া বইছে। যেন কান পেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবনতপ্ত শরীরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফেরার শব্দ।

আস্তে-আস্তে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। সেই পেন্ট্‌লন-পরা আদমী রাতের কোন্ ভুতুড়ে প্রহরে ঘর নিয়েছিলো জেগে ব'সে থেকে দেখবার আমার দরকার

ছিলো না। 'আমাদের মধ্যে ও ছিলো না।

সকালে বড়ো একটা নিমের ডাল নিয়ে দন্তধাবনে ব্যস্ত ছিলাম। একটা-কিছু না ক'রে এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকিই বা কি ক'রে। তবু বীথি, কুবুদ্ধির হাঁড়ি, দু-বার দরজায় এসে উঁকি দিয়ে গেছে। দেখুক। আমার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এ তো আর কেউ অস্বীকার করবে না। অটল ও অনড় হ'য়ে আমি ওধারের দরজার গায়ে হলদে রোদের পরিধিটা মনে-মনে জরিপ ক'রে চললাম। যেন আজ আরো বেশি বেলা হচ্ছে। ঘুম আর ভাঙে না।

এক-সময়ে দরজা ন'ড়ে উঠলো। ইতস্তত করছিলাম নিমের ডালটা মুখ থেকে নামিয়ে নেবো কিনা, তার আগেই দরজা ফাঁক হ'লো।

বেরোলো, সে নয়, টাই-স্যুট-পরা তালপাতার সেপাইটি।

বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিই। এতৎসত্ত্বেও ছোঁড়া আমার দিকেই এগিয়ে এলো। হাসি-হাসি চেহারা।

'দয়া ক'রে একটা রিক্‌শা ডেকে দিন না।'

নিমের তিক্তরসমিশ্রিত একটা ঢোক গিললাম। রইলাম চুপ ক'রে।

'আপনি কুলদাবাবু ?'

'কুলদারঞ্জন পাইন,' মুখ খুলতে হ'লো এবার, 'পার্কার অ্যাণ্ড পার্কার কোম্পানীর সিনিয়র-গ্রেড ক্লার্ক। এ-বাড়িতে আমি সতেরো বছর।' ভাবলাম, পাটনায় তুমি ইঞ্জিনিয়ার না লাটসাহেব, এখানে কি।

'তাই বলছিলো ও,' মাথা নেড়ে কাপ্তেন নতুন সিগারেট ধরালো। 'খুব করছেন আমাদের জন্যে, শুনলাম।'

মনটা একটু নরম হ'লো।

'না, খুব আর কি,' বললাম, 'এক জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'দ্যাট্‌স রাইট, ও তাই বলছিলো আপনি থাকাতে আমাদের অনেক সুবিধে হচ্ছে।'

'আবার বেরোনো হচ্ছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে, ইফ্‌ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, দয়া ক'রে একটা রিক্‌শা ডেকে দিন না।'

'ও আবার একটা কাজ নাকি।' রাগটা একদম চ'লে গেছে তখন আমার। 'আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।'

'ছুটিতে এলাম, ওদের সবাইর সঙ্গে দেখা না-করাটা কি ভালো ?'

'সে তো ঠিকই, কেন দেখা করবেন না। না-করার আছে কি।' হৃষ্টমনে নিচে গিয়ে রিক্‌শা ডেকে আনি। 'বন্ধুবান্ধব নিয়েই তো সংসার, এ-দিনে ক'টা

লোক হ'তে পারে বন্ধুবৎসল।' পর্যন্ত তুটো উপদেশও দিলাম।

তারপর ঠুন্‌ঠুন্ ক'রে রিক্‌শার তো ঘণ্টা বাজলো না, আমার বুকের ভিতর ঘণ্টা বাজতে লাগলো।

শিস দিতে-দিতে ওপরে উঠছিলাম ডবল সিঁড়ি ডিঙিয়ে, যেন বুকের একটা ভার নেমে গেছে। কিন্তু মনের এই প্রফুল্ল ভাব নষ্ট করে দিলে ধুমসি মেয়েটা। সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি। যেন গোরু চরাতে এসেছে।

'তোমার বেলা হ'য়ে গেলো, বাবা।'

'তুই আমার অফিস করবি নাকি ?' রাগে রুখে উঠলাম এবং আরো কি বলতে গেছি, দেখি, ঘন সবুজ রঙের একটা টুথব্রাশ-হাতে সিঁড়ির মুখে লীলাময়ী। ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ।

ভয় হ'লো রাত্রের মাংসের কথাটা না তোলে হঠাৎ।

কিন্তু লীলাময়ী চালাক মেয়ে। সেয়ানা।

যেন কাল বিকেলের পর এই আমার সঙ্গে দেখা।

'আজ আবার আপনাকে একটু কষ্ট দেবো।' কত যেন দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা। দাঁড়ালো প্রীতির ঠিক পেছনে।

'কষ্ট আর কি,' বললাম, 'এক-জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'এ-বেলা পারবেন না। সময় নেই আপনার। ও-বেলা অফিস থেকে সময়—'

'বলুন-না কি করতে হবে,'—যেন সংকুচিত আমিও, সন্ত্রস্ত। চোরা চোখে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো প্রীতির চোখ তুটো দেখে নিলাম। 'কিছু আনতে হবে বুঝি ?'

'ইলিশ মাছ, গঙ্গার ইলিশ পান তো।' লীলাময়ী আমার চোখে তাকালো। পরে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

'ও আবার কষ্ট কি।' হেসে লীলাময়ীর মুখের দিকে তাকালাম। লালরঙা ডবল নোট তুটো আলগোছে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে যুবতী ধীর মন্থর পায়ে দাঁত ঘষতে-ঘষতে প্যাসেজের দিকে চ'লে গেলো।

একটা ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রীতির মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আমিও ঘরে চ'লে এলাম।

যেন স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা আমি এই গোষ্ঠী থেকে। মণ্টু ফণ্টু একসঙ্গে খেতে বসেছে, একবার ওদের মুখের দিকেও তাকাইনি। যদি-বা এক-আধবার চোখে পড়েছে, মনে হয়েছে তুঃখে দারিদ্র্যে অভাবে জমাট এক-একটি শিলাখণ্ড আমার রাস্তা জুড়ে আছে। এ-বেলা পরিবেশন করলো বীথি। রান্না করেছে

নিশ্চয় বুড়ি মেয়েটা। যত বয়েস হচ্ছে মাথায় বদচিন্তা কুটকুট করছে। রান্না। আর রাত্রে এতটা ঘি গরম-মশলার মাংস খেয়ে চিংড়ি ছাঁচি-কুমড়োর তরকারি জিহ্বায় কেমন লাগবে কল্পনা করুন। আর ঘরময় হেমলতার গাত্রোত্থিত মালিশের উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ। যেন উনিশ বছর এই গন্ধটা ছড়িয়ে হেমলতা আমার পরমায়ুকে জীর্ণতর করবার জন্যে বেঁচে আছে। কোনোমতে খাওয়া শেষ ক'রে জামা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অফিসে পৌঁছে, আমার যা প্রথম কাজ, ডেস্প্যাচের অনঙ্গ ধরকে আড়ালে ডেকে নিলাম।

'শঙ্খিনী নারীর লক্ষণ কি, ভায়া?'

'গোপন-স্বভাবা, কিন্তু তেজস্বিনী।'

চুপ ক'রে জায়গায় এসে বসলাম। এ-সব ব্যাপারে অনঙ্গ ধরের পরামর্শ মেনে চলি আমরা, বয়স্করা। নারীচরিত্র ওর নখাগ্রে। এক বিয়ে করেছিলো লোকটা আইন মতো, আরেক বিয়ে সেদিন ক'রে এসেছে আইন ভেঙে, এ-বয়সে। সাহস যেমন, জানেও অনেক। সুতরাং উঠতে-বসতে এ-সব ব্যাপারে আমরা অফিসের তথাকথিত বুড়ো যারা অনঙ্গর মতামতের সঙ্গে লক্ষণ-বিলক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখি। চেষ্টা করি সে ভাবে চলার। নইলে তো এখনকার ছেলে-ছোকরাদের মতো ট্র্যামে-পার্কে-ময়দানে-রাস্তায় ঘুরতে হ'তো মায়াবিনী হরিণীর খুরের ধুলো খেয়ে।

এখনকার ওরা জানে না অন্দরের অন্ধকারেও সুন্দর জন্তু থাকে খেলার—খেলবার। কোথায় সেই স্বৈর্য, সে আবিষ্কার।

লেজার আড়াল করে সারাদিন ব'সে মাথা খাটালাম, চিন্তা করলাম। পাঁচটা বাজতে রাস্তায় নেমে সোজা গঙ্গার ঘাটে।

একটা-একটা ক'রে সতেরোটা মাছ উল্টে-পাল্টে দেখে শেষে বেশ চকচকে চ্যাপ্টা মনের মতন ইলিশ বেছে নিয়ে দাম চুকিয়ে বাড়ির দিকে চললাম। ইচ্ছা করেই রাস্তায় সন্ধ্যা করলাম।

গলির মুখে এসে মাছটা বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে নিলাম। কেননা আমাদের ঘর বারান্দার বাঁয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্যাসেজ ধ'রে পার্টিশনের দিকে যাও যে-কেউ দেখবে হাতে মাছ। কিন্তু তবু সিঁড়ির মুখে মণ্টুটা দেখে ফেললো। আবছা অন্ধকারেও টের পেলো মাছ। কিছু বললে না, কেবল হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো, যেন ওর বিশ্বাসই হয়নি এতবড়ো ইলিশ বাবা ঘরে আনবে।

দেখলে বীথি, চৌবাচ্চার দিকে যাচ্ছিলো ও।

প্রীতি। কালকের মতো চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠিক চোখ মেলে চেয়েছিলো। এবং

সবগুলো চোখকে উপেক্ষা ক'রে, যেন আমি কাউকে দেখিনি, সোজা চ'লে গেলাম ঘাড় গুঁজে প্যাসেজের ওধারে।

কড়া নাড়তে ঘর-দুয়ার লাল আলোয় টল্‌টল্‌ ক'রে উঠলো। এই সবে আলো জললো। বেরিয়ে এলো লীলাময়ী। ফোলা-ফোলা চোখ। যেন অবেলায় অনেক ঘুমিয়ে উঠেছে। খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে খোলা পিঠে। আঁচলের আধখানা মাটিতে লুটোয়।

'দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।'

ইতস্তত করলাম, পিছনের দিকে তাকাই একবার।

'বাঘ, বাঘের খাঁচা এটা!' ধমক দিয়ে লীলাময়ী হাসলো। ফুলের পাপড়ি ছিটকে পড়লো চারিদিকে। ওর হাসির আড়ালে কালো চোখের তারায় দেখলাম স্বচ্ছ নীল স্ফুলিঙ্গ। এক-মুহূর্তের জন্যে।

নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হয়ে আমাকে ভিতরে যেতে হ'লো। ছোট্টো উঠোন। চুপচাপ।

এক হাতে আঁচল গুটোতে-গুটোতে অন্য হাতে সদরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ালো। হাসলো আবার। নিশ্চিত নির্ভয়। এখন আমরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। বুকের ভিতর দুবদুব করছে আমার।

'কি করবো বলুন,' বললাম আস্তে-আস্তে। যেন ওর হাতের পুত্তলি আমি, নির্দেশ মেনে চলবো। 'কোথায় রাখবো মাছ?'

'রাখুন ওখানে।' আঙুল দিয়ে নর্দমার ধারটা দেখিয়ে যুবতী ফের মিটিমিটি হাসলো। 'যেন আপনাকে হুকুম করছি, তাই আবার ভাবছেন না তো?' ব'লে চোখ টিপলো।

'হুকুম করতে জানেন ব'লেই তো করছেন।' মাছটা নামিয়ে রেখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। রসে কৌতুকে আয়ত ঢলঢল চোখ। ভাবলাম, তোমার হুকুম জন্মে-জন্মে মানতে রাজী।

'তাই নাকি! দাঁড়ান, আমি আসছি।'

দীর্ঘ ফর্সা দেহ, সম্রাজ্ঞীর মতো। দু-হাতে খোঁপা ঠিক করতে-করতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এলো থালা আর বঁটি নিয়ে।

'ও, আমায় সামনে রেখে মাছ কুটবেন বুঝি?'

'দেখবো না ভালো কি মন্দ, টাটকা না পচা?' কুটিল আঁকা-বাঁকা হাসি ঠোঁটের কিনারায়। যেন এখন পর্যন্ত সহজ হ'তে পারছে না এমন ভাব। শঙ্খিনী।

'দেখুন।' ঠোঁট টিপে হাসলাম। 'অনেক ঘুরে দেখে-শুনে এনেছি।'

'তাই বুঝি এত রাত হ'লো ?' কুটিলতর চোখে হাসলো ভ্রূবিলাসিনী। এমন চালাক, এমন চাপা। ঠাট ক'রে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বঁটি বিছিয়ে বসলো। কান গরম হ'য়ে গেছে আমার। মাথা ঝিমঝিম করছে। বুঝি আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় ও লোভ একসঙ্গে আমার চোখে ফুটে উঠেছে তখন। আমি পুরুষ। কিন্তু ওরা পারে মনের ভাব অনেকক্ষণ গোপন রাখতে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা। লীলাময়ী ঝপ্‌ করে তখন কিনা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

'আপনার স্ত্রী উঠে দাঁড়াতে পারে না ?'

'একেবারে অচল।' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, অবশ্য অন্য কারণে। ওর হাতের মাছ দু-খণ্ড হ'য়ে বঁটির বুক থেকে থালায় নেমে এলো। তাজা লাল রক্ত। উচ্ছ্বলিত হ'য়ে উঠলাম।

'দেখুন কেমন টাটকা ইলিশ।' বলতে গিযে হঠাৎ চুপ করলাম। রক্তের একটা ফোঁটা ছিটকে ওর গালে পড়েছে, নাকের পাশে। হাতের পিঠ দিয়ে ও তাই মুছতে চেষ্টা করছে বার-বার।

'আরেকটু নিচে।' রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

কিন্তু এবারও ঠিক জায়গায় হাত পৌছলো না।

'হ'লো না,' বললাম, 'আরো ওপরে।'

'দিন-না মুছে।' কাতর চোখে ও আমার দিকে তাকালো। হাত জোড়া, পারছে না নিজে। মনে হ'লো গালে ওর রক্তবর্ণ একটা তিল। হাত কাঁপছিলো আমার, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে। নুয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে রক্তের দাগ মুছে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য লীলাময়ী। অটল অটুট। যেন কিছুই হয়নি, যেন এই স্বাভাবিক। বললো, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, গল্প করুন, আমি মাছ কুটে শেষ করি।'

'ততক্ষণে উনুনের কাঠ ক'খানা তো কাটিয়ে নিতে পারো ওকে দিয়ে।' ঘরের ভিতর থেকে শব্দ এলো, ইঞ্জিনিয়ারের গলা, শুয়ে আছে যেন।

আমার চোখে চোখ চেযে লীলাময়ী মিটিমিটি হাসছে।

'এ-বেলা বেরোতে পারেনি, মানিব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলাম, শুনুন কেমন পাকা সংসারীর মতো কথা বলছে এখন।' পরে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে গলা বড়ো করে বললো, 'তা উনি কেটে দেবেন, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো, কুন্দাবাবুকে দিয়ে তোমার জন্য নিচে থেকে একটিন সিগারেটও আনিয়ে রাখবো ভেবেছি।'

মঙ্গলগ্রহের লাল শক্ত সিমেন্টের ওপর চোখ রেখে কথাগুলি শুনছি আমি।

চোর

আমি যেদিন পেঁপেচারাটা পুঁতলাম ঠিক সেদিন ও আমাদের বাড়িতে এল। তখন শ্রাবণ মাসের বিকেল।

স্কুলে যাবার সময় রাস্তার নর্দমার পাশে সবুজ কচি, আমার আঙুলের সমান, কি তার চেয়েও ছোট লিকলিকে একটা পেঁপেচারা চোখে পড়েছিল। কচু আর কাঁটা-নটের জঙ্গলের মাঝখানে চারাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমার তখনি লোভ হচ্ছিল, ওটা তুলে নিই। কিন্তু ক্লাসে গাছটা রাখবার সুবিধা হবে না, এ ও পাঁচটা ছেলে হয়তো ওটা হাতে নিয়ে দেখতে চাইবে, দেখতে দেখতে হাতের চাপে নরম চারাটাকে চট্‌কে ফেলবে—তা ছাড়া জামার পকেটে লুকিয়ে রাখলেও বেলা চারটে পর্যন্ত জল-মাটি ছাড়া ওইটুকু গাছ শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাবে চিন্তা করে তখন সোজা স্কুলে চলে গেছি। স্কুল ছুটি হওয়ামাত্র অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে কারো সঙ্গে একটা কথা না বলে আবার সোজা সেই নর্দমার পাশে কচু আর কাঁটা-নটের জঙ্গলের কাছে চলে এসেছি। তারপর হাত বাড়িয়ে টুক্ করে পেঁপে গাছটা তুলে নিয়েছি। বর্ষাকাল। জলে ভিজে ভিজে মাটি এমনি নরম হয়েছিল। আমার খুব ভাল লাগল অত তাড়াহুড়ো করে গাছটাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলার পরও যখন দেখলাম দশ নম্বর সুঁচের মতন সরু লম্বা আর দুধের মতন সাদা রঙের মূলটা আর মূলের চার-পাশের চুলের মতন সরু ছুঁচালো শিকড়গুলোর একটাও ছিঁড়ে বা ভেঙে যায়নি। যেন মূল ও শিকড় সমেত চারাটা আমার হাতে উঠে আসতে তৈরী হয়েছিল।

হ্যাঁ, তখন বিকেল। আমাদের রান্নাঘরের পিছনে ছাই আর জঞ্জাল নিয়ে চারহাত পাঁচহাত এক টুকরো জমি দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমনি পড়ে আছে। দিনরাত ছায়ায় ঢাকা থাকে বলে সেখানে কোনো গাছ হয় না। এত বড় একটা যজ্ঞডুমুরের গাছ ডালপালা ছড়িয়ে জমিটা অন্ধকার করে রেখেছে, সেখানে আর অন্য কিছুর চারা বা গাছ মাথা তুলতে সাহস পায় না। শীতের গোড়ার দিকে মা কি-বছর ধনেশাক লাগাতে গেছে, কিন্তু হয়নি। বাবা এই সেদিনও ডাঁটার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। বীজ ফুঁড়ে অগুনতি কুঁড়ি বেরিয়েছিল। কুঁড়িগুলো যখন দু পাতার ছোট ছোট গাছ হয়ে বড় হচ্ছিল, তখন আস্তে আস্তে

সব ফ্যাকাশে রং ধরে শুকিয়ে খড়কের মতন হয়ে-হয়ে মরে গেছে। দুটো-একটা ডুমুরের ডাল কেটে দিয়েও বাবা সুবিধা করতে পারেনি। মুশকিল এই যে, সবটা গাছ কাটা যায়নি। কাটতে গেলে আমাদের পিছনটা একেবারে বে-আব্রু হয়ে পড়বে, এই ভয়ে বাবা ডুমুর গাছটা রেখেছিল।

তা হোক, আমার পেঁপে গাছ বাড়বে না, ছায়ায় থেকে-থেকে ফ্যাকাশে রং ধরে একদিন খড়কের মতন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি যত্ন করে চারাটা পুঁতলাম। পুঁতে বেশ করে খানিকটা বাড়তি মাটি উঁচু করে গুঁড়ির চারপাশে তুলে দিলাম। চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জল মগে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে চারাটাকে প্রায় স্নান করিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি যখন শূন্য মগ হাতে করে সোজা হয়ে দাড়িয়েছি, তখন ও আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়। শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সুকুমারদের বাড়ির সেই যে ছোকরা চাকর—নামটা অবশ্য তখনি মনে পড়ে গেল—মদন। মিট্‌মিট্ করে হাসছে। বগলে একটা ছোট পুঁটলি। পরনে ময়লা ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট। গায়ের গেঞ্জিটা আরো বেশি ছেঁড়া। পিঠের দিকটা কেমন আছে চোখে পড়ছে না, দেখলাম বুকের দিকটা ফুটো হয়ে-হয়ে জামাটার আর কিছু নেই।

'হাসছিস কেন ?' আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম।

'গাছ দেখছি।' আমাকে গম্ভীর দেখে মদনও গম্ভীর হয়ে গেল। 'বটের চারা ?'

'তোর মাথা।' রাগ করে বললাম, 'বাড়ির ভিতর কেউ বটগাছ লাগায় নাকি আহাম্মক। পেঁপেচারা। বটের পাতা এমন হয় ?'

কথা না বলে মদন চোখ তুলে মাথার ওপর যজ্ঞডুমুরের ছড়ানো ডালপাতার দিকে চেয়ে রইল। তখন আমি লক্ষ্য করলাম মদনটা খুব শুকিয়ে গেছে। হাত-পা কাঠির মতন হয়েছে দেখতে। কানের পাশে গলায় ময়লা জমে ছাতা পড়েছে। ওর মাথায় কেমন চমৎকার টেড়ি দেখেছি—তার কিছু ছিল না, যেন অর্ধেক চুল উঠে গেছে, ছোট হয়ে গেছে মাথাটা। এইটুকুন ছোট-ছোট চুল—তা-ও কতকাল যেন তেল-জলের মুখ দেখেনি।

একটা ঢোঁক গিললাম।

'কোথায় ছিলি এতকাল। সুকুমারদের বাড়িতে তো দেখিনি ?'

'ব্যামো হয়েছিল। দেশে গিছলাম।' মদন আমাদের উঠোনের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'মা-ঠাকরুন আছেন ঘরে ?'

আমার চোখে চোখ রেখে যখন ও প্রশ্ন করল তখন হঠাৎ আমার মাথায় কথাটা এল।

'সুকুমারদের বাড়িতে আর তুই চাকরি করিস নে?'

মুখ বেজার করে মদন ঘাড় নাড়ল।

'মা কোথায়?'

চুপ করে ওর রোগা হাত-পা ও ছেঁড়া জামাটা আর-একবার দেখতে দেখতে পরে বললাম, 'মার শরীর খারাপ। সবে আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে। শুয়ে আছে।'

'ভাই হয়েছে বুঝি?'

মুখ বেজার করে আমি মাথা নাড়লাম।

'বোন। রংটা যদিও আমার চেয়ে ফরসা হয়েছে।'

মদন চুপ করে থেকে আমার পেঁপেচারাটা গ্যাখে।

একটা কথা মনে হল। কিন্তু চেপে গেলাম।

'কেন মাকে,—আমার মাকে কি দরকার?'

মদনের চোখের দিকে তাকাই।

মদন অল্প হাসল।

'দরকার আছে।'

'আয় আমার সঙ্গে।'

কলতলায় গিয়ে হাত ও পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলি। মুখটা ধুয়ে ফেললাম। হাতের পুঁটলি চৌবাচ্চার সিমেন্টের ওপর নামিয়ে রেখে মদন হাত ধোয় পা ধোয় তারপর আঁজলা করে ঢকঢক করে অনেকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেয়। রোগা পেটটা ফুলে ওঠে। মাথায় আমরা দুজন সমান। আমার বয়স বেশি কি মদনের বয়স—চিন্তা করছিলাম। হয়তো দুজন এক বয়সের ছিলাম।

'আর ইদিকে আয়।'

ঘরের পইঠায় উঠে মাকে ডাকলাম।

মদন আমার পেছনে দাঁড়ায়।

বাচ্চা বোনটাকে নিয়ে মা সম্ভবত শুয়ে ছিল। আমার ডাক শুনে উঠে বসল। রোগা ফ্যাকাশে মুখখানা দরজার কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কেন, কি হয়েছে।'

'মদন—সুকুমারদের বাড়ির মদন। এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

মা হঠাৎ চুপ করে রইল। মদনকে ভাল করে দেখল।

'কি হয়েছিল তোর?' একটু পর মা প্রশ্ন করে।

'ব্যামো—কালাজ্বর।' মদন এক পা এগিয়ে চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'এখন আর জ্বর হয়?'

মদন মাথা নাড়ল।

আবার কি ভাবল মা। তারপর :

'ও বাড়ি গিয়েছিলি ?'

মদন এবারও কথা না কয়ে ঘাড় কাত করল। মানে সুকুমারদের বাড়ির কথা হচ্ছে। আমি চুপ থাকি।

'গিন্নীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

'হয়েছে।' মদন মার দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকায়। 'আমাকে আর রাখবে না,—গিন্নীমা বলল, অন্য লোক রাখা হয়ে গেছে।'

'সে কি রে !' অবাক হবার সুরে মা বলল, 'তুই ওদের পুরোনো লোক, এতকাল কাজ করলি !' একটু থেমে মা পরে আস্তে আস্তে, যেন অনেকটা নিজের মনে বলল, 'তা অসুখ-বিসুখ তো মানুষের হবেই—অসুখ করল দেশে গেল, এর মধ্যে অন্য লোক রাখা হয়ে গেল ! না হয় রাখল, কিন্তু—' আবার কি ভেবে মা মদনের মুখ ছাখে।

'আর কারো বাড়ি গিয়েছিলি ? কেউ কথা দিলে ?'

মদন মাথা নাড়ল। আর তৎক্ষণাৎ আমি বলে বসলাম, 'সুকুমারদের বাড়িতে "না" করে দিতে ও সোজা এখানে চলে এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'তুমি চুপ কর, তুমি থাম !' মা আমাকে ধমক দিতে আমি চুপ করলাম। চুপ করে মদনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও কাঁদতে আরম্ভ করেছে। কান্নার শব্দ নেই। চোখে জল আসছে আর হাতের পিঠ দিয়ে ক্রমাগত তা মুছতে চেষ্টা করছে।

'তা কর্তা আসুক—,' মা বলল, 'একবার ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি।' বাচ্চা বোনটা কেঁদে উঠতে মা ঘুরে বসল।

চোখ মোছা শেষ করে মদন আমার দিকে তাকায়। আমিও ওর মুখ দেখি। একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ওর ঠোঁটের ধারে উঁকি দেয়। সম্ভবত আমার ঠোঁটের কিনারেও এমন একটা রেখা জেগেছিল। বস্তুত আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না অতবড় বাড়ির চাকর আমাদের বাড়িতে চাকরি করবে। তেতলা বাড়ি, মোটরগাড়ি, রেডিও, আর তিনটে চাকর-চাকরানী, হইচই খাওয়া-দাওয়া— আমাদের ছোট উঠোন, টালির ঘর, কেরোসিনের আলো, টিমটিমে ঠাণ্ডা সংসার।

সন্ধ্যার দিকে বাজারের থলে হাতে ঝুলিয়ে বাবা ঘরে ফিরল।

আমি আমার ছোট্ট ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসার উদ্যোগ করছি। মদন বাইরে পইঠার অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। দুটো পয়সা দিয়েছিল মা ওকে। সেই সকালের ট্রেনে দুটো পান্তা খেয়ে দেশ থেকে ট্রেনে চেপেছিল।

সারাদিন খাওয়া হয়নি। তার ওপর সবে ব্যারাম থেকে উঠে এসেছে। পয়সা দিয়ে মুড়ি কিনে খেয়ে মদন অন্ধকারে বসে ঝিমোচ্ছিল, মাঝে মাঝে চড-চাপড় দিয়ে গা থেকে মশা তাড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি কান পেতে ছিলাম বাবা কি বলে শুনতে। হাত মুখ ধুয়ে বাবা বিশ্রাম করতে বসে। মা উঠে চা তৈরী করে দেয়। বস্তুত এই খারাপ শরীর নিয়েই মাকে রান্না ও ঘরের আরও পাঁচটা কাজ করতে হচ্ছিল। চা খেতে-খেতে বাবা সব শুনল। শুনে হাসল।

'কেন, তিনটে লোক আছে, ড্রাইভার আছে, বাগানের কাজ করতে বাইরের একটা লোক রাখা হয়েছে—না হয় আর-একটা—কত বয়স, আমাদের মিণ্টুর চেয়ে বড় হবে না—কি নাম যেন ছেলেটার? মদন। পুরনো লোক ওদের—এভাবে ওকে মুখের ওপর "না" করে দিলে?' একটু থেমে বাবা শেষ করল, 'বড়লোক কি আর গরিবের দুঃখ বোঝে! এখন বেচারা যায় কোথায়!'

মা যেন ও-ঘর থেকে আরও কি বলল।

বাবা চিন্তা করছে। বুঝতে পারলাম বাবা চিন্তা করে দেখছিল সবটা বিষয়।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে চৌকাঠের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। মদন বাবার পায়ের কাছে চুপ করে বসে আছে। বলতে কি মদনের জন্য আমার বুকের ভিতর ভয়-ভয় করছিল। যদি বাবা 'না' বলে বসে, যদি বাবা বলে যে—

'কত মাইনে দিত ওরা বললি?'

'দশ টাকা।'

'আর দু'বেলা ভাত দু'বেলা জলখাবার?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মদন ঘাড কাত করল। বাবা আবার চিন্তা করছে। মা ছোট বোনটাকে দুধ খাওয়ায়। মার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা প্রশ্ন করে।

'তুমি কি ওষুধটা খেয়েছিলে?'

মা মাথা নাড়ে।

'ওষুধটা ভাল। ওইটুকুন শিশি। ছ'টাকা দাম। তা ভাল জিনিস। খাও। নিয়মিত খেতে থাকলে শরীরে বল পাবে।' ব'লে বাবা আবার মদনকে গ্যাখে। তারপর:

'আমি গরিব। কেরানী মানুষ। অত মাইনে দিতে পারব না। অথচ একটা লোকও চাই। মিণ্টুর মার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। তা বাপু—'

মা মদনের মুখ লক্ষ্য করছে। আমিও তাকিয়ে আছি ওর দিকে। মদন ঘাড় হেঁট করে নখ খুঁটছে।

বাবা বলল, 'দু'বেলা ভাত খাবে—আর সকালে বিকেলে ওই একটু চা রুটি—

আমাদের যা হয়—আর আর—' হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বাবা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

অর্থাৎ বাবা ইতস্তত করছিল। একটা বাড়তি লোকের খোরাক জুগিয়ে অতিরিক্ত দুটাকা একটাকা ঘর থেকে বার করে দিতেও বাবার কষ্ট হবে আমার জানতে বাকি ছিল না। অনেক কষ্ট করে বাবা মার জন্য একটা ওষুধ কিনে এনেছে। আমার স্কুলের দু মাসের মাইনে জমে গেছে। বাবা এসবই চিন্তা করছিল, মুখ দেখে বুঝলাম।

মা মদনের দিকে তাকাল।

'দশ টাকা মাইনে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না বাপু,—তিন টাকার বেশি পাবে না।'

অবাক হয়ে দেখলাম, মদন তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছে।

বাবা খুশী হল।

'তা ছাড়া কাজকর্ম আমার সংসারে আর তেমন কি—অতিথি-অভ্যাগত নেই, বাইরের লোক নেই। তিনজন তো আমরা মানুষ।'

মদন আবার ঘাড় কাত করেছে। হ্যারিকেনের আলোয় চোখে পড়ল ওর মুখে হাসি ফুটেছে। মানে, তাতেই সে রাজী। মদন আমাদের বাড়িতে থেকে গেল। আমার এত ভাল লাগছিল।

বড় বড় চারটে ডুমুরের ডাল কেটে ফেলল মদন। আকাশটা ফরসা হয়ে গেল। আমার পেঁপেচারাটা ফট্‌ফটে রোদের মুখ দেখে হাসতে লাগল।

'এইবেলা গাছটার জোর বাড় হবে,' মদন বলল, 'ওই ডুমুরের ডাল দিয়ে আমি বেড়া তৈরী করে দেব—ছাগল গরু এসে মুখ লাগাতে পারবে না।'

'আরো দু-চার রকমের চারাগাছ এনে পুঁতব,' আমি বললাম, 'জমিতে এখন রোদ লাগছে, এখন গাছ বাড়বে।'

'তার জন্যে চিন্তা কি—আমি যখন এসে গেছি আর চিন্তা নেই, আমি হরেক রকমের চারা এনে লাগিয়ে দেব।' খুশী হয়ে মদনকে চুমো খাবার মতন আমার মনের অবস্থা। সকালে মাকে বাটনা বেটে দিয়ে, জল তুলে দিয়ে, ঘর বারান্দা ঝাঁট দিয়ে একটু অবসর হতে ও ছুটে এসেছিল রান্নাঘরের পিছনে। পেঁপেচারাটা ছায়ায় ঢাকা আছে দেখে তখনি ও কাটারি হাতে করে ডুমুর গাছে উঠেছে। রোগা শরীর। পা দুটো ঠক্‌ঠক করে কাঁপছিল। ভয় পেয়ে আমি নিচে দাঁড়িয়ে বলছিলাম, 'সাবধান, দেখবি পড়ে-টড়ে না যাস!' গাছের ডালে কাটারির কোপ বসাতে বসাতে মদন বলছিল, 'আমরা চাষীর ছেলে, হট করে কি গাছ থেকে পড়ে যাই—' আমি আর কিছু বলিনি।

এতবড় চারটে ডাল কাটা হয়েছে দেখে বাবা চোখ কপালে তুলল। 'এটা করলি কি মদন, বাড়ির আব্রু নষ্ট করে ফেললি!'

মা পিছনে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। বাবা যখন ডুমুর গাছের অবস্থা দেখে খুব একটা হায়-আফসোস করতে আরম্ভ করল, তখন মা মুখ থেকে আঁচল সরাল: 'আমি তো বুড়ো হতে চললাম, তোমার ছেলের বৌ আসতে এখনো ঢের দেরি। অত আব্রু রাখার দরকার কি—তা ছাড়া—'

যেন একটু অবাক হয়ে বাবা মার মুখ দেখছিল।

মা বলল, 'তা ছাড়া আমাদের পিছনটা তো ফাঁকা। পোড়ো মাঠ। মানুষের মুখ দেখা যায় না। আব্রুর দরকার পড়ে না।'

অর্থাৎ মা যে মদনের কাজটা সমর্থন করল আমি বুঝে গেলাম। কেন করবে না। আমি বাগান করতে চাইছি, আর মদন এ বাড়ির কাজে লাগতে না লাগতে আমাকে সাহায্য করছে, মা কি সেটা ভাল চোখে না দেখে পারে!

তা ছাড়া এমনিও মদন মার খুব বাধ্য হয়ে পড়ল। মা শুধু চোখের ইঙ্গিত করতে মদন এটা এনে দেয়, ওটা বাড়িয়ে দেয়। কয়লার গুঁড়ো জমে ছিল। মাটি এনে মদন নিজে থেকে এত এত গুল তৈরী করে ফেলল। মাকে বলতে হল না। রোদে শুকিয়ে সব গুল নিজেই তুলে রান্নাঘরের কোনায় এনে জড়ো করে রাখল। মা বলল, 'গরিবের ছেলে গরিবের সংসারেই তোকে মানিয়েছে বাবা।'

'ও বাড়ি আমি আর ইয়ে করতেও যাব না।' মদন একটা খারাপ কথা বলতে যাচ্ছিল, মা ধমক দিতে ও চুপ করল। তারপর মা কি ভেবে হাসল: 'কেন, ওরা কি তোকে খেতে-টেতে দিত না?'

'ছাই দিত!' যেন কথাটা বলতে মদনের মুখ চুলবুল করছিল। 'সরু চালের ভাত, গাওয়া ঘি, মাছ, ঘন দুধ—এই এতবড় টুকরো মাছের—সব ওরা খেয়েছে। কর্তা খেয়েছে গিন্নী খেয়েছে খোকা খেয়েছে—আমাদের ঝি চাকরের জন্যে মোটা চালের ভাত আর ডাল আর পুঁইচচ্চড়ি—মাসের মধ্যে এক-আধদিন কুচো চিংড়ি পেতাম চচ্চড়িতে—আর ডালের কি চেহারা—গঙ্গাজল!' এমনভাবে হাত নেড়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে মদন সুকুমারদের বাড়ির খাওয়ার বর্ণনা করছিল যে, আমি ও মা একসঙ্গে জোরে হেসে ফেললাম। বাবা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে, কেউ দেখতে পাইনি।

বাবা ধমক লাগায়।

'হয়েছে হয়েছে—একজনেরটা খেয়ে এসে নিন্দে করতে নেই—বলে, যার নুন খাব তার গুণ গাব—নিন্দে করা পাপ।' আমাদের হাসি নিবে গেল। মদন চুপ

করে রইল। আমি সেখান থেকে সরে গিয়ে আমার পেঁপে গাছের তদারক করতে লেগে গেলাম। রান্নাঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি বাবার গলা শুনছিলাম। 'তা অত গুল দেওয়াবার কি দরকারটা ছিল—একটা কচি বাচ্চা পেটের দায়ে নয় এখানে চাকরি করছে—তাই বলে তুমি সব কাজ ওকে দিয়ে সারছ।' বুঝলাম মাকে বলা হচ্ছে। মা বলছিল, 'আমি কিচ্ছু বলিনি—বরং আমি না করেছি—নিজে থেকে ও মাটি এনে বসে বসে এসব দিয়েছে।'

তারপরও বাবা গুমগুম করে কি বলছিল আমি শুনতে পাইনি। না, একটা বাচ্চা ছেলে রাতদিন খাটুক বাবা যেমন পছন্দ করে না, মা-ও তা চায় না। আমি নিজের চোখে দেখতাম। কি, ঘন দুধ, বড় মাছ আমরা কেউ খেতে পেতাম না। মাসের আটাশ দিন ডাল তরকারি শাক চচ্চড়ি হত। কিন্তু তা হলেও যদি মা কোনোদিন পটলটা বেগুনটা ভাজত, কি বড়াটড়া করত, আমাকে বাবাকে তো বটেই, মদনকেও দুটো-একটা না দিয়ে মা শান্তি পেত না, ভাত খেতে পারত না। চোখের ওপর তো দেখলাম, মদন আমাদের বাড়িতে কাজে লাগতে না লাগতে মা আমার একটা ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট সুন্দর করে সেলাই (ভাল বা ছেঁড়া বলতে আমারও অতিরিক্ত প্যাণ্ট ঐ একটাই ছিল) করে ওকে পরতে দিয়েছে। বাবা সামনের মাসে মাইনে পেলে মদনকে একটা গেঞ্জি কিনে দেবে, মা এখন থেকেই বলে রাখছে। যদি মা অল্প ক'দিনের মধ্যে ওকে এতটা আদরযত্ন করতে আরম্ভ না করত তো মদনই কি মার এমন বাধ্য হয়ে পড়ত ? মার মুখে শোনা, আমি স্কুলে চলে গেলে মদন সারাটা দুপুর মার কাছে বসে থাকে, কাগজ জেলে আমার ছোট বোনের দুধ-বার্লি গরম করে দেয়, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেলে ছুটে গিয়ে উঠোনের দড়ি থেকে জামা-কাপড়গুলো তুলে ঘরে এনে রাখে—'মিণ্টু আমার ছেলে, তুইও আমার ছেলে।' আমি ক'দিন মাকে বলতে শুনেছি। শুনে ফ্যাকাশে ড্যাবড্যাবে চোখে মদন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসত।

পাঁচ দিনের মাথায় পেঁপেচারাটার আরো দুটো কুঁড়ি-পাতা দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছ'টা ডাঁটা, আর পুতুলের ছাতার মতো ছোট ছোট ছ'টা পাতা হয়েছে। 'এখন আর চারা না, রীতিমতো একটা গাছ বলা চলে', ভাবতাম আমি, আর অবাক খুশী চোখে বাদলা হাওয়ায় ছোট ছাতার মতন পাতাগুলোর কাঁপন দেখতাম। মদন ডুমুরের ডাল কেটে সুন্দর একটা বেড়া তৈরী করে দিয়েছে।

'আমি আরো কিছু চারা এনে পুঁতব,' মদন বলত, 'আতা, করমচা, বাতাবি

নেবু, পেয়ারার চারা।'

'কোথা থেকে আনবি?' আমি বলতাম, 'পারবি যোগাড করতে? বৌবাজারে এসব চারা পাওয়া যায় রথের মেলায়। এখন তো রথ শেষ হয়ে গেছে।'

'আরে ধেৎ, রথের মেলা—কিনে আনব নাকি? এমনি সব নিয়ে আসব।'

'কোথা থেকে শুনি?' উৎসাহে খোলা বই ফেলে রেখে আমি মদনের বিছানায় গিয়ে বসতাম। আমার পড়ার ঘরেই দুজনের শোবার জায়গা। পাশাপাশি বিছানা। বাবা মা খেয়ে ও-ঘরের দরজায় খিল এঁটে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ত। বেশ একটু রাত জেগে আমি পড়তাম। মদন আমার পড়া শুনতে শুনতে কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়েছে, কোনোদিন একটা-দুটো কথা শুরু করে পরে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বাবা-মা শুনতে না পায়, এমনভাবে নিচু গলায় দুজন কথা বলতাম।

'তুই কি পেয়ারা করমচার চারা দেখে এসেছিস কোথাও?'

'আমি কি এ-পাড়ায় নতুন,' মদন প্রশ্ন শুনে চাপা গলায় হাসত, 'কার বাড়িতে কোন্ গাছ আছে আমি সব জানি।'

'শুনি না কোথা থেকে করমচার চারা যোগাড় করবি?' আমি তখন মদনের বালিশে মাথা রেখে তার পাশে শুয়ে পড়েছি।

মদন আমার পেটের ওপর হাত রাখে, তারপর আমার কাছে মুখ এনে কথাটা বলে। শুনে আমি চুপ করে থাকি। একটু ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলি, 'এমনি তো দেবে না ওরা, চুরি করে আনতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো—চুরি করব। স্বকুমারদের বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে বাগানের সব ফল আর মূলের চারা নিয়ে আসব। যেগুলো আনতে পারা যাবে না, ভেঙে মুচড়ে নষ্ট করে রেখে আসব।'

উত্তেজনায় মদন তখন উঠে বসেছে।

আমি ফিস্‌ফিস করে বললাম, 'চুরি করে ওসব আনলে মা রাগ করবে।'

'মাকে বলতে গেছি নাকি, চুরি করে এনেছি কি দেখিয়ে এনেছি?' মদন আমার পেটে চিমটি কাটল। 'রাত থাকতে উঠে আমরা বেরিয়ে পড়ব, কেমন?'

আমি ঘাড় নাড়ি। কি ভেবে একটু পরে বলি, 'স্বকুমারের ওপর তোর খুব রাগ, কেমন? ওর মা তোকে আর ও-বাড়ি রাখল না বলে?'

'বয়ে গেছে ও-বাড়ির কাজ করতে।' ভেংচি কেটে মদন আমার কথার উত্তর দেয়। একটু চুপ থেকে পরে: 'রাগ থাকবে না? রোজ ইস্কুলে যাবার সময় স্বকুমার পায়ের জুতোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলত, বুরুশ করে দে। লাটসাহেবের

ছেলের জুতো বুরুশ করতে করতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে যেত—আর আজ কিনা বলে এখানে তোর স্থবিধে হবে না, অন্য বাড়িতে কাজ পাস কিনা ছাখ্‌ গে।'

'স্থকুমারও বলেছে এ-কথা ?'

'তবে !'

যেন মদনের চোখে জল এসে পড়েছিল। আলো নিবিয়ে শুয়ে শুয়ে সেদিন স্থকুমারের চেহারাটা মনে করছিলাম। ব্যারিস্টারের ছেলে। ভাল জামা-জুতো পরে স্কুলে আসে। আমার সহপাঠী। কিন্তু তা হলে হবে কি—স্থকুমার আমার সঙ্গে ভাল করে মিশবে দূরে থাক, কথাই বলে না। আমার সঙ্গে না, হাবুলের সঙ্গে না, সনাতনের সঙ্গে না। ওর বন্ধু অংশু অনুপম নীহার, ওরা বড়লোক, আমরা গরিব। আমরা খালি পায়ে স্কুলে আসি, আমাদের জামা প্যাণ্ট ময়লা ছেঁড়া—

ভাল হবে, খুব ভাল হবে। মদনের প্রস্তাবটা মাথায় ঘুরছিল। ওদের বাগানের সব ফলের গাছ, ফুলের গাছ যদি ছিঁড়ে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে দেয়া যায়, বেশ হয়।

অন্ধকারে একসময় মদন আমার কানের কাছে মুখ সরিয়ে আনে।

'ঘুমিয়ে পড়লি ?'

'না।'

'স্থকুমারের বাবা রোজ বাড়িতে মদ খায়।'

'ধেৎ !' আমি অল্প হাসলাম।

'হ্যাঁ রে—ওদের টাকা-পয়সা থাকবে না। গাড়ি-বাড়ি সব বিক্রি হয়ে যাবে।' মদন থমথমে গলায় বলল, 'ওরা যদি আমাদের মতন গরিব হয়ে যায় তবে খুব মজা হয়, কেমন না ?'

অন্ধকারে মাথা নেড়ে আমি উত্তর করলাম, 'তা হয় বটে।'

দু'দিন আমরা চেষ্টা করলাম। কিন্তু দু'দিনই ব্যর্থ হলাম।

শেষ রাত্তিরের অন্ধকার টিপটিপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমরা স্থকুমারদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কি, অমনি মোটা লাঠি বাগিয়ে বাগানের মালী আমাদের তাড়া করেছে। আর স্থকুমারদের কুকুরটা ! বাঘের মতন লাফিয়ে মদনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কোনোরকমে ছুটে পালিয়ে এসেছি।

'কত বড় এক-একটা পেয়ারা, দেখলি তো !' বাড়ি ফিরে মদন আফসোসের গলায় বলত, 'একবার যদি পাঁচিলের ওপর উঠতে পারতাম, পাঁচ-সাতটা পেয়ারা

আনা যেত।'

'থাক গে—শেষে ধরা-টরা পড়ে—' আমি মদনকে সান্ত্বনা দিতাম। কিন্তু মদন চুপ থেকে যেন ও-বাড়ির বাগানের ডাঁশা পেয়ারাগুলোর কথা ভাবত। নর্দমার পাশে একটা মাধবীলতার চারা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। পেঁপে গাছের গুঁড়ি থেকে আধ হাত দূরে সরিয়ে চারাটা পুঁতলাম। মদনকে বললাম, 'তুই দু' মগ জল এনে ঢেলে দে। আমি একটা বাঁশের কঞ্চি কোথাও পাই কিনা দেখি। লতাটা তরতর করে বেয়ে উঠবে।'

বাঁশের কঞ্চি নিয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম মদন তেমনি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কি ভাবছে। ওদিকে মা মদনকে ডাকছে কয়লা ভেঙে দিতে। মদন নড়ছে না, সাড়া দিচ্ছে না। এক-পা এক-পা করে মা রান্নাঘরের পিছনে চলে আসে। 'বেলা হয়েছে, উনুন ধরাতে হবে, তোরা কি কেবল বাগানের পিছনে লেগে থাকবি।' কিন্তু মার কথা শুনে মদন মুখ তুলল না। 'তোর কি হয়েছে, ভূতে পেয়েছে?' মা হাসে।

হুট করে আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম মদন অসন্তুষ্ট হল আমার কথা শুনে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল একবার।

শুনে মা হাসছিল: 'ছিঃ, পরের জিনিসের ওপর লোভ করতে নেই? এমন একটা খুব ভাল জিনিস না পেয়ারা।'

তারপরও মদন মুখ নিচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। উঠোনে বাবার খড়মের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে মার কয়লা ভাঙতে গেছে।

না, পেয়ারা না, ভাবছিল সে ভূষণের কথা। সুকুমারদের বাগানের মালী। 'ওর সেবার জ্বর হয়েছিল, আমি নিজের হাতে কয়লা ভেঙে উনুন সাজিয়ে ওর উনুন ধরিয়ে দিলাম, সাগু জাল দিয়ে দিলাম। আর আজ শালা আমায় লাঠি নিয়ে তেড়ে মারতে আসে!'

আমি হাসি: তুই তো আর এখন ওদের চাকর নস—ও-বাড়ির কেউ না তুই —কাজেই।'

'বটে!' দাঁত কিড়মিড়িয়ে মদন ভেংচি কাটে। 'ওই শালা ভূষণের মাথাটা আমি ইঁট মেরে ভেঙে দেব।'

'না না ওসব করতে যাবি নে, খামোকা একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি।' আমি মদনকে বুঝিয়ে বললাম, 'জানতে পারলে বাবা রাগ করবে। বাবা গণ্ডগোল পছন্দ করে না। সাদাসিধে মানুষ, নিরিবিলি থাকতে চায়।' বলে আমি স্কুলে চলে গেলাম। কিন্তু মদন আমার কথা শুনল কি? যেন ও-বাড়ির ওপর তার আক্রোশের আর শেষ ছিল না। হ্যাঁ, তখন বিকেল, বেশ জোরে বৃষ্টি হয়ে

গেছে দুপুরে, রাস্তায় জল জমেছে। আমরা স্কুল থেকে ফিরছি। আমি হাবুল সনাতন পিছনে হাঁটছি। আগে আগে চলেছে সুকুমার আর তার বন্ধুরা। হঠাৎ দেখলাম বিপরীত দিক থেকে আমাদের মদন সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। সম্ভবত মা মুদি-দোকানে কিছু কিনতে পাঠিয়েছে ওকে। মদন নিশ্চয় সুকুমারদের এড়িয়ে আমার সঙ্গে হাবুলের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে তবে দোকানের দিকে যাবে। চিন্তা করলাম। কিন্তু চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী ব্যাপার ঘটল। ইচ্ছা করেই মদন এটা করল, সবাই বুঝল। পা দিয়ে রাস্তার জল ছিটিয়ে সুকুমারের সাদা ধবধবে সাটিনের শার্ট প্যাণ্ট নোংরা করে দিয়ে মদন ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু যাবে কোথায়। সুকুমারকে দেখেশুনে বাড়ি নিয়ে যেতে একটু দূরে দূরে যে ভূষণ মালীও হাঁটছিল, মদন নিশ্চয় দেখতে পায়নি। ছুটে গিয়ে ভূষণ মদনকে ধরে ফেলল। সুকুমার আর তার বন্ধুরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। মদনকে হিডহিড করে ভূষণ সুকুমারদের বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি আর আমার বন্ধুরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখলাম।

কথাটা মা শুনল। আফিস থেকে ফিরে বাবা শুনল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর রাত। রাত আটটা পর্যন্ত বাবা আমাদের বাড়ির সামনে বড় কাঁটাল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল।

বাবা একসময় ঘরে ফিরতে মা বলল, 'তুমি কি একবার যাবে ও বাড়ি? নিশ্চয় ছেলেটাকে বেঁধেটেঁধে রেখেছে। এখন পর্যন্ত ফেরার নাম নেই।'

'রাখুক বেঁধে।' বাবা গম্ভীর গলায় বলল, 'যেমন কর্ম করেছে তার ফল ভোগ করুক। কেন হারামজাদা কাদা ছিটোতে গেল।'

'আহা, ছেলেমানুষ, না হয় একটা অপরাধ করেছে.—আর কী তেমন অপরাধ। হয়তো ছুটে যাচ্ছিল বলে—'

আমি মার কথায় সায় দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল।

'বড়মানুষের বাড়ি গিয়ে আমার চাকরের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার—আমারও সম্মানে বাধে। ওদের কাছে ওরা বড—কিন্তু আমিও শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান। আমিও—' বুঝলাম মদনকে এতটা রাত অবধি আটকে রাখা হয়েছে বলে ভিতরে ভিতরে বাবা খুব উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ হয়ে আছে।

মা আর কথা বলল না। কাজকর্ম একলা হাতেই সব সারতে লাগল। বাবা বারান্দার অন্ধকারে বসে তামাক খাচ্ছিল আর ভাবছিল। আর আমি হ্যারিকেনের সামনে বই খুলে মদনের বিছানা, দেওয়ালের হুকে ঝোলানো তার

তালিমারা ময়লা হাফ্-প্যাণ্ট ও শার্টটা দেখছিলাম। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল।

সত্যিই মদন সে রাত্রে আর এল না।

সকালে চা খেতে খেতে বাবা ও মা ঠিক করল আমাকে একবার ও-বাড়ি পাঠানো হবে মদনের খোঁজ নিতে।

মা বলল, 'ময়লা প্যাণ্ট ছেড়ে ধোয়া প্যাণ্টটা পরে নে।'

বাবা বলল, 'অন্য কারো সঙ্গে কথা-টথা বলে লাভ নেই—কেবল সতীশবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবি, মদন কাল বাড়ি ফেরেনি কেন। শুধু জেনে আসবি। আর কিছু বলতে হবে না।'

'জিজ্ঞেস করলে বলবি বাবা পাঠিয়েছে।'

'না না না।' মার কথায় বাবা আবার প্রতিবাদ করে উঠল। 'বলবি মা পাঠিয়েছে। আমি কেন! আমি এ-ব্যাপারে নেই। হয়তো ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে, কি গেছে। কিন্তু বাড়ির কর্তা—মানে পুরুষমানুষ খোঁজখবর নিচ্ছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার অন্যরকম হয়ে দাড়াবে, জটিল হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মেয়েমানুষের মধ্যেই থাক এটা—বুঝলে না? সেজন্যেই তো আমি মিণ্টুকে সুকুমারের মার কাছে পাঠাচ্ছি।'

অল্প হেসে মা বলল, 'আচ্ছা।'

মানে, বাবা রাগ দুঃখ দুশ্চিন্তা অভিমান—মনে মনে যা-ই পোষণ করুক না কেন, বাইরে সব বিষয়ে নিরিবিলি মুক্ত থাকতে চায়। মদনের ব্যাপারে আর একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল, বুঝে মা আর উচ্চবাচ্য করল না।

কেবল আমি যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মা চিরুনি দিয়ে আমার মাথার চুলটা ঠিক করে দিল। বলল, 'সুকুমারের সঙ্গে কথা-টথা বলে কাজ নেই—কি বলতে কি বলে দিয়ে তুই আবার ঝগড়া-টগড়া বাধিয়ে আসবি।'

আমি বললাম, 'না, বলব না।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হল না। সুকুমারদের গেট-এর সামনে শিউলি গাছের তলায় আমি থমকে দাঁড়াই। মদনকে পেয়ে গেলাম। কিন্তু মদন খুব ব্যস্ত। বালতি করে ভিতরের চৌবাচ্চা থেকে জল বয়ে আনছে। সুকুমারদের গাড়ি ধোয়ানো হচ্ছে। ভূষণ গাড়ি ধোয়াচ্ছে। ড্রাইভার হারান দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে। বেশ বড় বালতি। গাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে বালতিটি নামিয়ে রেখে মদন হাঁপায়। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে,

ও ফিক করে হাসে।

'আমি এ বাড়ির কাজে লেগে গেছি।'

'কবে থেকে ?' বেশ আস্তে বললাম।

'ওই কাল বিকেল থেকেই।' হলদে দাঁত ক'টা বার করে মদন তেমনি হাসতে থাকে, 'আমায় কিচ্ছু বলল না গিন্নীমা—বরং ভূষণকে গালমন্দ করেছে। ছেলে-মানুষ ছুটতে গিয়ে জল ছিটিয়েছে—তা বলে—'

আমি ফিরে আসছিলাম।

মদন বলল, 'শোন। তোর মাকে বলবি, আর আমি তোদের বাড়ির কাজ করব না। এখানে লেগে গেছি। গিন্নীমা কাল রাতে বলল ওরা গরিব মানুষ। নিজেদেরই চলে না, তো ও-বাড়িতে তুই থাকবি কি।'

আমি ফিরে এলাম।

মা শুনল। বাবা শুনল।

শুনে তারা একটা কথাও বলল না।

আমি মুখ ভার করে রান্নাঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পেঁপে গাছ আরও দুটো নতুন পাতা মেলেছে। মদনের হাতের তৈরী ডুমুরের ডালের বেড়াটা দেখছিলাম, কিন্তু আমি কি তখন জানতাম, মদন গেছে—আমার পেঁপেচারাটাও আর থাকবে না।

তিন দিন পর শেষ রাত্রে আবার জোর বর্ষা নামল। সে কী বৃষ্টি! যেন জল ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না। কতক্ষণ আর ঘরে আটক থাকা যায়। সেই অন্ধকার থাকতে জেগে বিছানায় বসে ছিলাম। হ্যাঁ, তখন বেলা আটটা বেজে গেছে। বৃষ্টির জোরটা একটু কমেছে কি, আমি হুট্ করে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে সোজা রান্নাঘরের পিছনে চলে গেলাম। আমার বাগানের অবস্থা কি হয়েছে দেখতে ভীষণ মন কেমন করছিল। কেননা উঠোনে জল জমেছে। রান্না ঘরের পিছনটা ঢালু। সেখানে কত জল দাঁড়াল, পেঁপে গাছ মাধবী-চারা ডুবে গেল কিনা এবং যদি তা-ই হয়, জলটা সরাবার কি ব্যবস্থা করা যায় ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে আমি বৃষ্টি মাথায় করে ডুমুরতলায় ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাগানের চেহারা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। পেঁপেচারাটা নেই। মাধবী-লতাটা জলে কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে। ডুমুরের ডালের বেড়াটা ভেঙে তছনছ হয়ে আছে। আমার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হল। বারান্দা থেকে মা ডাকছিল, বাবা ডাকছিল: 'ভিজিসনে, জ্বর হবে, চলে আয়, চলে আয়।'

'আমার পেঁপে গাছটা নেই।' চিৎকার করে উঠলাম।

'জলে ভাসিয়ে নিল কি ?' মা বলল, 'উঠানের সব জল তো নদীর স্রোত

হয়ে ঘরের পিছনে ছুটছিল—'

'বেড়া ভেঙে গেছে। যেন কে ভেঙে দিয়ে গেল।' বলতে বলতে আমি বাগান ছেড়ে ঘরের পইঠায় উঠে এলাম।

'তাই বলো, বেড়াও ভাঙা, পেঁপেচারাও নেই।' বাবা গম্ভীর হয়ে মুখ থেকে হুঁকো সরিয়ে আমার দিকে না, মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই হারামজাদা গরুটা নিয়ে গেছে। শেষ রাত্তিরে একটা খচখচ শব্দ শুনলাম না রান্নাঘরের পিছনে ?'

'আমি শুনিনি শব্দ।' মা আমার দিকে মুখ ফিরাল, 'হবে হয়তো, যদি জলে ভাসিয়ে নিত এদিক-ওদিক কোথাও থাকত তো, এতবড় গাছটা তো অদৃশ্য হয়ে যেত না। ঐ গরুর কর্ম।'

'একেবারে গোড়াসুদ্ধ খেয়ে গেছে। যেন উপড়ে তুলে সবটা গাছ মুখে নিয়ে সরে পড়েছে।' আমি কান্নার সুরে বললাম, 'একটা শেকড় পর্যন্ত রেখে যায়নি।'

মা চুপ করে রইল। বাবা আবার মুখে হুঁকো তুলল।

'কত যত্ন করে গাছের সবটা ঘিরে মদন ডুমুরের ডাল পুঁতে বেড়া করে দিয়েছিল—' যেন নিজের মনে বললাম আমি। শুনে মা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। বাবা নির্বিকার। আমার ওই বাগানের সঙ্গে যে মদনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, মা তা স্বীকার করল। মার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দে তা বুঝলাম। কিন্তু বাবা যেন কথাটাকে তেমন আমল দিচ্ছিল না।

'যা যা এখন পড়তে যা—সামনে পরীক্ষা।'

বাবার ধমক খেয়ে গাছের শোক বুকে পুষে এক-পা এক-পা করে পড়ার ঘরে চলে এলাম।

হ্যাঁ, তারপর ছ'মাস গেছে। পরীক্ষা টরীক্ষা শেষ। শীতের দুপুর। হঠাৎ আবার কি করে যে সুকুমারের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল বলা শক্ত। আমার মনে হয় 'ডিটেকটিভ' গল্পের বইটা। আমার এক মামাতো ভাই বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসে বইটা আমাকে দিয়ে গেছে। কি করে যেন সুকুমার জানতে পেরেছিল। একদিন হুট্ করে গল্পের বই নিতে আমার পড়ার ঘরে এসে হাজির। একটু অবাক হলেও তৎক্ষণাৎ তাকে বইটা পড়তে দিলাম। তারপর আর কি। ও আমাদের বাড়িতে এল যখন আমাকেও ভদ্রতা রাখতে ওদের বাড়ি যেতে হল। এবং এটা সবাই স্বীকার করবে, দীর্ঘকাল ঝগড়াঝাঁটি চলার পর যখন ঐ বয়সের দুটি ছেলের মধ্যে ভাব হয় তখন তা দেখতে দেখতে বড় বেশি গাঢ় নিবিড় হয়ে ওঠে।

যেন সুকুমার আমাকে না দেখে থাকতে পারে না, আমি তাকে না দেখে শান্তি পাই না। ওর বাড়ির ঘরে বসে দু'জন গল্প করি, ওদের প্রকাণ্ড ছাদে উঠে বেড়াই,

কখনো আমরা বাগানে নেমে যাই।

হ্যাঁ, বাগানের মতো বাগান বটে!

একধারে ফুলের গাছ, একধারে ফলের গাছ।

পাচিলের এ-মাথা থেকে আরম্ভ করে ও-মাথা পর্যন্ত বাগানের আর শেষ নেই। কোন্‌টা কলমের চারা, কোন্‌টা বীজের গাছ, সুকুমার আমাকে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখায়।

তারপর দুজন একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়াই। দীর্ঘ কাণ্ড লম্বা ডাঁট, সতেজ সবুজ ছড়ানো পাতা নিয়ে একটা সুন্দর পেঁপে গাছ! ফলতে আরম্ভ করেছে। 'ওটা এনে লাগিয়েছে মদন—আমাদের চাকর—এইটুকুন গাছ ছিল, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল!' সুকুমার বলছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমি গাছটা দেখলাম। যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। সুকুমার আমার হাত ধরে বলল, 'চল এখন ও পাশটা ঘুরে দেখা যাক।'

বাগান দেখা শেষ করে গল্প করতে করতে দুজন যখন সুকুমারদের বাঁধানো উঠোন পার হয়ে ওর বাড়ির ঘরের দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম মদন চৌবাচ্চার ধারে বসে মাথা গুঁজে চায়ের কাপ প্লেট ধুচ্ছে। ও আমায় দেখতে পায়নি। যদি মুখ তুলে তাকাত আমি নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

বাড়ি ফিরে কথাটা মাকে বললাম না।

আমার মনে যে কষ্ট লেগে রইল, মাকে আর তার ভাগ দিয়ে কি হবে ভেবে চুপ করে রইলাম।

কেবল চাকরি না, আমাদের রান্নাঘরের পিছনের ছায়ায় ঢাকা স্যাঁতসেঁতে জমির চেয়ে ও-বাড়ির রোদালো বিশাল বাগানের মাটি ওর কাছে প্রিয় হবে, তাতে অবাক হবার কি আছে। কিন্তু অবাক লাগল নিজের কাছে, মদনের ওপর আমি এতটুকু রাগ করতে পারলাম না। কি, তারপর যখনই সুকুমারদের বাড়িতে গেছি আমি সরাসরি ছুটে গেছি ওদের বাগানে। সতেজ সবুজ যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত দীর্ঘছত্র পেঁপে গাছটা আমাকে বড বেশী টানতে লাগল। সকাল নেই বিকাল নেই সুকুমারের হাত ধরে পেঁপে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি,—এদিকে সুকুমারের সঙ্গে গল্প করি—কিন্তু আমার চোখ ওদিকে—যেন গাছটাকে দেখে দেখে আর আশ মিটত না!

একদিন দুপুরবেলা গাছটা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর কেমন ভয় ঢুকল। মাঝখানে গল্প থামিয়ে আমি সুকুমারকে বললাম, 'চলি রে।'

'কেন?' একটু অবাক হয়ে ও আমাকে দেখছিল। কিন্তু ওর দিকে আর না তাকিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলাম। তখনও বুকের ভয়টা ডেলা

পাকিয়ে আমার গলার কাছে ঠেকে ছিল। মদন পেঁপেচোরাটা চুরি করে নিয়ে যায়নি। আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপেচোরাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কেবল মদনকে না, আমাকেও, না হলে আমাদের ছোট উঠোন, টিনের ঘর, ছায়া-ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।

বাড়ি ফিরে মার পায়ের কাছে চুপ করে বসে রইলাম।

'কি হল।' মা প্রশ্ন করছিল।

আমার চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

'কাঁদছিস কেন!' ব্যস্ত হয়ে মা শুধোয়। আমি কথা বলি না। আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা কাপড় পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে গিয়ে ও-বাড়ির শাড়িগয়না-পরা প্রগল্‌ভ-স্বাস্থ্য সুকুমারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কখন তিনি সাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও সুকুমারকে আপেল আনারস কেটে দেবেন সেই সোনা-ঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি শুকিয়ে থাকতাম—থাকতে আরম্ভ করেছি।

আর কোনোদিন আমি ও-বাড়ি যাইনি।

নীল পেয়ালা

আকাশের নীল পেযালা উপচে পড়ছে উষ্ণ মধুর রোদ। রোদ ত না, পেয়ালা উপচে জাফরান রঙের চা ঝরে পড়ছে, যত খুশি পান করে নাও, শরীর চাঙা হবে, মন প্রফুল্ল হবে। আহা, শীতের সকালের রোদ। বৈদ্যনাথবাবু এমন দিনে কিছুতেই ঘরে বসে থাকতে পারেন না। ওভারকোট, মঙ্কি ক্যাপ, ডার্বি শু, দস্তানা, মোজার বর্ম এঁটে হাতির দাঁতের মাথাওয়ালা সুন্দর ছড়ি হাতে, যেন পৌষের পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে আকাশের পেযালা থেকে গড়িয়ে পড়া গরম চা প্রাণ-ভরে সকলের আগে খেযে নিতে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। অথচ তাঁর বাড়িতে তাঁর টেবিলে ততক্ষণে শৌখিন পেয়ালায় ধূমায়িত গরম চা এসে গেছে। কিন্তু বৈদ্যনাথের যেন সেই চায়ে রুচি নেই। ছেলেমানুষের মতন তিনি বাইরে ছুটে এসেছেন।

বস্তুত, বলতে কি, তিনি ছেলেমানুষই হয়ে গেছেন।

তিনি আজ তিপ্পান্নয পা দিযে সতেরো বছর বয়সের স্বপ্ন দেখছেন। বৈদ্যনাথের মনের এই অবস্থা কেন, তলিয়ে দেখতে গেলে খুব বেশী দূর হাতড়াতে হবে না, অনেকদিন ধরে যে এটা হয়েছে তা-ও না, পরশুর ঘটনা, এখানে এই ক্যানেলের ধারে বাঁকাচোরা পত্রহীন পাকুড় গাছটার নীচে দাঁড়িযে জলের ওপর শীতের সকালের রৌদ্রের অচঞ্চল প্রশান্ত হাসি দেখতে দেখতে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি ছোট হয়ে গেছেন, কিশোর হয়ে গেছেন, শুকনো খসখসে দাড়ির গালে হাত বুলোতে বুলোতে তাঁর মনে হয়েছিল ইচ্ছা করলে মানুষ তার বয়স কমিয়ে দিতে পারে। ইচ্ছা করলে বৈদ্যনাথ ওভারকোট জুতো দস্তানা ছেড়ে খালের জলে সাঁতার কাটতে পারেন, ইচ্ছা করলে তিনি তেলের পিপে বোঝাই লরীটার পিছনে ছুটতে পারেন। শরীরটা কিছু না; মন, মনের দিক থেকে আশ্চর্য এক তারুণ্যের উত্তাপ অনুভব করতে করতে বৈদ্যনাথ কেমন যেন অস্থির ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।

ছেলেটির পরনে সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বইছিল। যে ঠাণ্ডা হাওয়া অন্য যে-কোনো সময় বৈদ্যনাথকে কাবু করে ফেল্‌তে পারত, বিছানায় শুইয়ে দিতে পারত, সেদিন, যদিও তাঁর

নিজের গায়ে গরম জামাকাপড় ছিল, মনে হয়েছে, এগুলো কিছু না, বাহুল্য, ইচ্ছা করলে তিনিও ওর মতন উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে লম্বা পালক ঘেরা কালো বড় বড় চোখ দুটো জলের ওপর স্থির করে ধরে রেখে এই মুহূর্তে স্বপ্ন দেখতে পারেন।

স্বপ্ন। যেন ছেলেটির স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি বৈদ্যনাথকে এমন করে দিয়েছে। তিনি ভুলে আছেন তাঁর ছুটির আর তিনদিন বাকী আছে, তিনদিন পর আর তাঁর ক্যানেলের ধারে দাঁড়িয়ে, রৌদ্র ছায়ার খেলা, জলের কাঁপন দেখা হবে না, শুকনো পাকুড়ের ডালে কালো কুচকুচে কাকটার কা কা শোনা হবে না, তেলের পিপে বোঝাই ধাবমান লরীর দিকে চোখ রেখে ওটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা যায় কিনা—ভাবা হবে না। এ জি অফিসের এক প্রশস্ত কামরায় প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে বসে তাঁকে কলম পিষতে হবে। দশটা পাঁচটা। ট্রাম বাসের ভিড়। কোনোরকমে কাক-স্নান সেরে ভাত খেতে বসা। টিফিনের কৌটো। বৈদ্যনাথের বয়সের আর পাঁচটা পাকা খসখসে দাড়ির গাল, পাকা খেজুরের মতো শুকনো গায়ের চামড়া, মরা মাছের চোখের ফ্যাকাসে রং। সত্যি, তিনি সব ভুলে আছেন। কাল থেকে, পরশু থেকে। আজ তিনি একটু সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। ক্যানেলের ধারে পৌঁছে তিনি সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। পাজামা পাঞ্জাবি উস্কোখুস্কো চুল আপেলের মতো টনকো মসৃণ চামড়া লম্বা পালক ঘেরা কালো চোখ এবং হঠাৎ বিষণ্ণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠা সেই কিশোর তরুণ মূর্তি। কাছে দূরে আশে পাশে কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে বৈদ্যনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কেমন দমে গেলেন তিনি। তাঁর শীত করতে লাগল। যেন ক্যানেলের বুক থেকে ছুরির ফলার মতো ধারালো নিষ্ঠুর হাওয়াটা উঠে এসে বুকে বিঁধছিল। বৈদ্যনাথ সিগারেট বার করলেন। যদি ধূমপানে শরীর গরম হয়। দু তিনটা কাঠি নষ্ট হল। হাওয়ায় দেশলাই জ্বলছে না। একটু সরে গেলেন তিনি, ছাতু ছোলার দোকানের বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে আবার ফিরে এলেন। বৈদ্যনাথ এবার খুশি হলেন, সে এসে গেছে।

'এসো আমরা এখানটায় বসি।'

কালকের মতো ছেলেটি আজ হাসল না। গম্ভীর।

বৈদ্যনাথের কথামত ছেলেটি গাছের গুঁড়ির পাথরটার ওপর বসল।

'চা খেয়ে বেরিয়েছ ?' বৈদ্যনাথ প্রশ্ন করলেন।

ছেলেটি ঘাড় কাত করল এবং বৈদ্যনাথের হাতের সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে রইল। কাল বা পরশু এটা হয়নি। যেন আজ একটু সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাঁর সিগারেট খাওয়া দেখছে লক্ষ্য করে বৈদ্যনাথ ঠোঁট টিপে একটা চোরা হাসি

হাসলেন।

'ইস্ কান দুটো কেমন কসকস করছে।'

'ঠাণ্ডা হাওয়া।' বললেন বটে, কিন্তু বৈদ্যনাথ সেই সঙ্গে একটু অবাকও হলেন। কারণ হাওয়ার কথা হিমের কথা আজ এই প্রথম তিনি ছেলেটির মুখে শুনছেন। বৈদ্যনাথের এটা ভাল লাগল না। তবে কি তিনি তাঁর টুপি খুলে ওকে পরিয়ে দেবেন। বৈদ্যনাথ মনে মনে শিউরে উঠলেন। তার তিপ্পান্ন বছরের পাকা চুল ঢাকতে কুঁকড়ে যাওয়া শীর্ণ কান দুটো ঢাকতে এই টুপি ভাল। কিন্তু এমন সতেজ কালো কোঁকড়া চুলের ওপর এই টুপি কুৎসিত দেখাবে না! বিদঘুটে দেখাবে না।

'তা হলে চলো আমরা বেশ জোরে জোরে কিছুক্ষণ হাটি। শরীর গরম হবে।' বৈদ্যনাথ প্রস্তাব দিলেন। ছেলেটি মাথা নাড়ল।

'আমার হাঁটতে মোটেই ইচ্ছা করছে না।'

অথচ কাল তিনি ছেলেটির সঙ্গে প্রায় জলের ধারে নেমে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে ওধারের বড় গাধাবোটটার কাছে দুজনে চলে যান। ছেলেটি বলেছিল, সে এই বরফ জলে নেমে দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বৈদ্যনাথ কথার উত্তর দেননি।

'আজ তোমার মনটা খারাপ মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ তাই।'

বৈদ্যনাথ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে একটু সময় ভাবেন। এমনি সাধারণ পরিচয় হয়ে গেছে। বাবা মা কানপুরে থাকেন। বাবার জুতোর দোকান। গাড়ি বাড়ি আছে। ছেলেটি কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। বিবেকানন্দ রোডে থাকেন মামা। এবার ওর স্কুল ফাইন্যালের বছর। তা হলেও বছরে একবার দুবার কলকাতায় না এলে ভাল লাগে না। কলকাতার সিনেমা? ময়দানের সার্কাস? ক্রিকেট খেলা? কী তাকে এত টানছে? হেসে বৈদ্যনাথ কাল প্রশ্ন করেছিলেন। ছেলেটি উত্তর দেয়নি। মিটিমিটি হেসে গাধাবোটের কিনারে ঝাঁক বেঁধে বসা শালিকগুলোর দিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিল।

'হঠাৎ মন খারাপ কেন?' বৈদ্যনাথ আজ আস্তে প্রশ্ন করলেন।

ছেলেটি চুপ করে থেকে খড়ের নৌকাটা দেখছিল।

'আমাদের বয়সে তোমরা চাঁদে যাওয়া আসা করতে পারবে রকেটে চেপে।' বৈদ্যনাথ ক্ষীণ গলায় হাসলেন। কিন্তু তরুণ বন্ধুটি হাসল না। হাসল না, অবাকও হল না। এমন কি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালও না। জলের দিকে দৃষ্টি। একটা সাদা হাঁস সাঁতার কাটছে। অস্বস্তিবোধ করলেন বৈদ্যনাথ। অস্বস্তিবোধ করলেন

এই ভেবে, আজ কি তিনি এর কাছ থেকে দূরে সরে আছেন না! মনের দিক থেকে? অথচ কাল পর্যন্ত তিনি কিশোর বন্ধুটির কত কাছে কাছে ছিলেন, তার মনের, তার চাওয়ার, পছন্দ অপছন্দ, ভাল লাগা না-লাগার উত্তাপ শীতলতা উচ্ছ্বাস বিরক্তি বৈদ্যনাথ নিজের মন দিয়ে অনুভূতি দিয়ে সুন্দর স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। এবার তাদের কানপুরের গ্রীন-ক্লাবের ব্যাডমিণ্টন কম্পিটিশনে সে সকলকে হারিয়ে দিয়েছে, পিং-পং কম্পিটিশনে সে নাম দেয় নি, ওটা মেয়েদের খেলা; হুঁ, বাবার গাড়িটা সে দু তিনদিন চালাতে চেয়েছে বটে কিন্তু মোটর গাড়ির চেয়ে মোটরবাইক তার পছন্দ বেশি, কলেজে ঢুকলে সে একটা স্কুটার কিনবে ঠিক করে ফেলেছে; অদ্দূর হেঁটে ক্লাস করা পোষাবে না। না, মুর্গি পাঁটার মাংস তার ভাল লাগে না, মাটন্—ভেড়ার (ক্যানেলের ওপারে বৈদ্যনাথ কাল তাকে একটা রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গেছেন এবং দুজনে বসে চা ডিম রুটি খাচ্ছিলেন) মাংস সে ভালবাসে। সিনেমা? সিনেমা দেখতে কলকাতায় আসা? জলের ধারে বৈদ্যনাথ তাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সে গরম চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে। সিনেমা সে দেখে না, হিন্দি বাংলা কোনোটাই না, ইংরেজী টাজন ছবি যদি আসে তবে মাঝে মাঝে দেখে, কিন্তু তার জন্য কি আর কলকাতায় ছুটে আসতে হয়, ওখানেই—

কাল কথাটা বলার সময় বৈদ্যনাথের দিকে তাকিয়ে ও এমনভাবে হেসেছিল যেন বৈদ্যনাথকে সে অনুকম্পা করছিল। কিন্তু তাতে বৈদ্যনাথ রাগ করেননি, দুঃখ পাননি, তাঁর ভাল লাগছিল এই জন্য যে কিশোর বন্ধু কোনো কথাই তাঁর কাছে গোপন করছে না।

কিন্তু আজ? আজ এই ব্যবধান কেন। মেঘলা আকাশের মতো ওর মুখ। অথচ আজও আকাশের নীল পেয়ালা উপচে জাফরান রঙের রোদ খালের ঘোলা জল, জলের ধারে ধারে সবুজ ঘাসের ওপর, মাথার ওপর গাছের শুকনো ডালে, বৈদ্যনাথের হাঁটুর কাছে, ছেলেটির চিবুকের পাশে কানের কাছে ঝরে ঝরে পড়ছে, ওদিক থেকে শালিকগুলো ঝাঁক বেঁধে এদিকে উড়ে এসে কিচিরমিচির করছে, পাকুড়ের ডালে বসে কাকটা তারস্বরে ডাকছে, লোহার টুকরো বোঝাই হয়ে ভারী লরীটা মাটি কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে—চারিদিকের সব রঙ গতি সবই ঠিক আছে, কিন্তু বন্ধু এমন মনমরা হয়ে কেন। ভাবতে ভাবতে বৈদ্যনাথ এক সময় চমকে উঠলেন, তিনিই ভুল করছেন, ব্যবধানটা তিনিই রেখে দিয়েছেন; চিন্তা করে তিনি পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স ও দেশলাই তুললেন।

কিন্তু তাহলে হবে কি, তাঁর সংস্কারে আটকাল, বোধে বাধল। সতৃষ্ণ চোখে কিশোর তাঁর সিগারেট ধরানো দেখছে, কিন্তু তিনি তার হাতে একটা সিগারেট

তুলে দিয়ে বলতে পারলেন না, 'খাও, আমি কিছু মনে করব না।' আর বলতে না পারার দরুন বৈদ্যনাথ বুকের মধ্যে একটা কাঁটার খচ খচ অনুভব করতে লাগলেন।

'বুঝলে আমার বয়সে তুমি চাঁদে বেড়াতে যেতে পারবে।' আবহাওয়াটা তরল করতে বৈদ্যনাথ আবার বললেন।

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

'আমি তার আগেই মরে যাব।'

'কেন?' বৈদ্যনাথ কেমন যেন শিউরে উঠলেন, 'ছি, ছি ও কি বলছ। এখন মানুষ বেশিদিন বাঁচে, গড়পড়তা আয়ু বেড়ে গেছে।'

'তা বাড়ুক—আমার বাঁচা হবে না।'

'কেন, তোমার তো তেমন কিছু একটা অসুখবিসুখ আছে বলে মনে হয় না। আছে কি? নেই। তবে আর না বাঁচার হয়েছে কি।'

'তা হলেও আমি মরব, ইচ্ছা করেই মরব'। ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সিগারেটটা জ্বলছিল দু আঙুলের ফাঁকে, বৈদ্যনাথ টানতে ভুলে যান। এমন কি দুরন্ত অভিমান ও বুকে নিয়ে বসে আছে যে, ভয়ঙ্কর মৃত্যু-ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছে। গলার ভিতরটা কেমন তেতো ঠেকেছিল বৈদ্যনাথের। এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন সকাল তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠল।

'আমায় বল না, কি হয়েছে। তোমার মনের কষ্ট কি আমি জানতে পারি নে।'

'কি হবে জেনে।' ছেলেটি আস্তে আস্তে বলল।

'আমি যে শান্তি পাচ্ছি না।' করুণ গলায় বৈদ্যনাথ উত্তর করলেন। বস্তুত বৈদ্যনাথের চেহারায় যে বেদনার স্পর্শ লেগেছে বুঝতে তার কষ্ট হল না। কেমন করে, জানি হাসল ছেলেটি, যেন বৃদ্ধ বন্ধুকে প্রবোধ দিতে নরম গলায় ও বলল, 'আপনি জেনেও কিছু করতে পারবেন না, করার কিছু নেই।' ছেলেটি থামল, এদিক ওদিক তাকাল, তারপর অনেকটা নিজের মনে বলল, 'হয়তো আজই আমি মরব, আজ বা কাল, একটা চলন্ত লরীটরির সামনে ছুটি গিয়ে পড়ে যাব,—তা হলেই ওটা আমায় চাপা দিয়ে শেষ করে দেবে।'

এবার আর বিস্ময় না, রীতিমত ভয় পান বৈদ্যনাথ। ছেলেটির চোখ দেখেন। দীর্ঘপালক ঘেরা কালো চোখ দুটোতে কেমন একটা উদাস উদ্‌ভ্রান্ত ছবি ফুটে উঠেছে না!

'চলো এখানে আর না।' বৈদ্যনাথ হাত ধরে ওকে টেনে তুললেন। আকাশ জল ঘাস রোদে-মরা শুকনো গাছ কিছু না, কে জানে হয়তো আজ তিনদিন ধরে

প্রকৃতির এই উদাস ছবি কিশোরের মনে বৈরাগ্য এনে দিয়েছে। বৈদ্যনাথেরও জায়গাটা হঠাৎ খারাপ লাগল।

'কোথায় যাব ?' ছেলেটি আপত্তির সুর তুলল। 'আমি বরং ওদিকে চলে যাই, ওই তো রেললাইন দেখা যাচ্ছে না ? জায়গাটাও নির্জন, আমি ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিয়ে—' বৈদ্যনাথের চোখে চোখ রেখে ছেলেটি ফিক্ করে হাসল। 'তাহলে মরতে আধসেকেণ্ডও লাগবে না।' বৈদ্যনাথের বুকের ভিতর নড়ে উঠল। কিশোরের এই হাসি কান্নার নামান্তর। অতি কষ্টে একটা ঢোক গিললেন তিনি।

'আত্মহত্যা পাপ, তুমি কি জান না।' বৈদ্যনাথ মুঠো শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরেন। 'ঈশ্বর এমন সুন্দর করে তোমায় তৈরী করলেন, আর তুমি কিনা ইচ্ছা করে—'

'কি হবে মন, মন যদি মরে যায় শরীর থাকা না থাকা সমান। আমার মনটাই তো শেষ হয়ে গেছে, কাজেই এই শরীর রেখে—'

স্তম্ভিত হয়ে বৈদ্যনাথ দার্শনিক উক্তিটা শুনলেন। তিনি যত ছোটটি মনে করেন বন্ধুটিকে তত ছোট তো সে নয়। এর পর কী বলবেন বৈদ্যনাথ, কথা খুঁজে পান না। চিন্তা করেন। তারপর, যেন অনেকটা নিজের মনে বললেন, 'শুনেছি আত্মহত্যা করলে নরকে যেতে হয়। নরক বড় সাংঘাতিক জায়গা।'

'আমি স্বর্গেও যেতে চাই নে। শুনেছি সেখানে দেবতারা আছে, আর কেবল ফল, ফুলের দেশ। ফুল আর দেবতাদের কাছ থেকে আমার এমন কী সুখটা হবে।'

বৈদ্যনাথ করুণভাবে হাসলেন।

'আহা সে তো পরের কথা, এখনো অনেক দেরি তোমার সেখানে যেতে। তার আগে তো তুমি এখানে অনেক দিন থাকবে, এখানে কি কম সুখ, পৃথিবীটা কি কম সুন্দর।'

ছেলেটি নীরব।

'বলেছিলে কদিন পর কলেজে ঢুকবে, একটা স্কুটার কিনবে। বলেছিলে বড় হয়ে বাবার ব্যবসা দেখতে তুমি কানপুরে পড়ে থাকবে না, পৃথিবীর সব কটা দেশ দেখতে বেরোবে, বলেছিলে—'

'সে সব কালকের কথা পরশুর কথা—আজ তো আর বলছি নে।'

'আজ তোমার হয়েছে কি ?' ধৈর্যচ্যুতি ঘটল বৈদ্যনাথের; ধমকে উঠে ছেলেটির হাতে ঝাঁকুনি দেন। অসহায় চোখে কিশোর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকায়। তার চোখ দুটো এবার ছলছল করছে। বৈদ্যনাথ কষ্ট পান।

'এসো আমার সঙ্গে এসো।'

'কোথায় যাব ?'

'ঐ তো পার্ক। কত ছেলে মেয়ে এসেছে ওখানে বেড়াতে। তুমি দেখবে তোমার বয়সের একটি ছেলে মেয়েও এমন মুখ ভার করে নেই।' বৈদ্যনাথ তার সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে এগতে থাকেন। ছেলেটি হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছছে। বয়স্ক বৈদ্যনাথ কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না তাঁর তরুণ বন্ধু হঠাৎ এমন চুপসে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাচ্ছে চিন্তা করে বৈদ্যনাথের শীত করছিল, একবার মনে হল তাঁর ব্লাড প্রেসারটা বাড়ছে, একবার মনে হল তাঁর ব্যথাটা নতুন করে চাড়া দিয়ে উঠছে। এটা তো সত্য কথা, আকাশের রৌদ্রের মতো পাখির গানের মতো একটি নতুন জীবন তাঁর কাছে এসে তাঁকেও নতুন করে তুলছিল, এই দু দিন তিনি পুরোনো বৈদ্যনাথ ছিলেন না।

'দেখছ, তারা কেমন হাসছে কেমন ছুটছে।'

পার্কের একটা বেঞ্চিতে বৈদ্যনাথ বসলেন, ছেলেটিকে পাশে বসালেন। কিন্তু ছেলেটি মোটেই ওদের দিকে তাকাচ্ছে না, চোখ নামিয়ে ঘাস দেখছে। রঙিন ফ্রক পরা মেয়েগুলি বেণী দুলিয়ে স্কিপিং করছে। হাফ্ প্যাণ্ট পরা, ট্রাউজার্স পরা ছেলের দল ছুটোছুটি করছে, হি হি করে হাসছে।

'ওদের জিজ্ঞেস করো, ওরা কেউ মরতে চায় না।'

'ওদের প্রাণে সুখ আছে তাই বাঁচতে চাইছে।'

'তোমারই বা কি দুঃখ। বাবার এত পয়সা আছে, মা তোমায় খুব ভালবাসে, এখানে বেড়াতে এলে মামা মামীমা ভীষণ আদর করে, বলছিলে ফি বার কলকাতায় আসার সময় মা বেশি বেশি টাকা পকেটে গুঁজে দেন যাতে কলকাতার অনেক কিছু দেখতে পার কিনতে পার খেতে পার, তাই না ?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

'তা হলেও আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। আজ সকাল থেকে, আজ ঘুম থেকে উঠেই আমার ইচ্ছা করছে মরে যাই, আর যদি মরতে না পারি, যদি মরতে গিয়ে ভয় পাই তো এমন কোনো দেশে চলে যাব যে, কেউ আমায় খুঁজে পাবে না। আজও চলে যেতে পারি কালও চলে যেতে পারি।'

তার মানে তোমার ভিতরে কোনো কঠিন অসুখ সৃষ্টি হয়েছে, তার মানে তোমার মধ্যে কিছু ভাল লাগার কাউকে ভালবাসার বোধটাই দপ্ করে নিভে গেছে, তার মানে—ভেবে বৈদ্যনাথ যেন ছেলেটিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর যেন হঠাৎ মনে হল ছেলেটির সেই সুকুমার কান্তি আর নেই, হাতের গালের চামড়া কুঁকড়ে গেছে ; কুঁজো হয়ে বসে ও ঘাসের দিকে তাকিয়ে আছে, বৈদ্যনাথের মনে হল একটি ষাট বছরের বুড়ো তাঁর পাশে বসে আছে, ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে

কাঁপছে। বৈদ্যনাথ ভয় পান। বেঞ্চি ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। উঠে দাঁড়ান কিন্তু সরে যেতে পারেন না। ছেলেটি মুখ তুলল। চোখের কিনারে জলের দাগ, কিন্তু বৈদ্যনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ও ফিক্‌ করে হাসল। বৈদ্যনাথের মাথা গরম হয়ে গেল।

চেহারা বিকৃত করলেন বৈদ্যনাথ। পকেট থেকে সিগারেট বার করলেন। 'স্মোক করবে? অভ্যাস নেই তা হলেও একটাতেই অভ্যাস এসে যাবে। দেখবে মেজাজ কেমন খুলে গেছে।'

ছেলেটির মুখ লাল হয়ে উঠল। বৈদ্যনাথের হাত থেকে সিগারেট না নিয়ে সে আকাশ দেখতে লাগল।

চটে গিয়ে বৈদ্যনাথ নিজেরটাই ধরান। গলগল করে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন। এদিক ওদিক তাকান। তারপর বেঞ্চির দিকে চোখ ফেরান।

'তোমার বয়সে আমি কি করতাম জান?'

ছেলেটি হাঁ করে বৈদ্যনাথের কথা শোনে।

গলার একটা বিশ্রী শব্দ করে বৈদ্যনাথ হাতের ছড়িটা ঘাসের ওপর ঠুকলেন।

'ওই যে সবুজ ফ্রক পরা ফর্সা মেয়েটি লম্বা বেণী দুলিয়ে স্কিপিং-এর দড়ি ঘোরাচ্ছে, আমি ঠিক তার কাছে ছুটে যেতাম, ভাব করতাম!'

'তা হলে কী হত?' চোখ বড় করল ছেলেটি।

'পৃথিবীটা ভাল লাগত, মনে হত একটা স্বর্গ। মনে হত না এই আলোর ভুবন ছেড়ে এক দিনের জন্যও আমি অন্য কোথাও যাই।'

লম্বা নিশ্বাস ফেলল ছেলেটি।

'কথা বলছ না কেন।' বৈদ্যনাথ তার মাথায় হাত রাখেন, মনে মনে খুশি হন, হয়তো ওষুধে কাজ দিয়েছে, ভাবেন তিনি।

'আ, কী চল মেয়েটার কী সুন্দর গায়ের রং, পা দুটো কেমন লম্বা, হাত দুটোকে মনে হচ্ছে দুটো সোনার বর্শা।' বলতে যাচ্ছিলেন বৈদ্যনাথ, চমকে উঠলেন, দু হাতে মুখ ঢেকে ছেলেটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'কাঁদছ, বোকার মতো আবার কাঁদতে শুরু করলে!' ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে বৈদ্যনাথ নুয়ে ছেলেটির চুল ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে গেছেন, যেন ছেলেটি তাঁর চেয়েও বেশি ক্রুদ্ধ বিরক্ত হয়ে বৈদ্যনাথকে ধাক্কা মেরে দূরে ঠেলে দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। 'আপনি আর একবার আমায় মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, দ্বিতীয়বার মরতে তৈরী হতে বলছেন, যান, এখান থেকে সরে যান।'

বৈদ্যনাথ কিছু বুঝলেন কি বুঝলেন না, মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে গেট্ পার হয়ে পার্কের বাইরে এসে দাঁড়ান। যেন কেউ গলাধাক্কা দিয়ে তাঁকে রাস্তায়

বাব করে দিয়েছে। অপমানিত বোধ করেন তিনি।

হুয়ে ছেলেটির মাথা ধরে তিনি যখন ঝাঁকুনি দিতে গেছেন তখন ওর পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেটের বাক্সটা বৈদ্যনাথের চোখে পড়েছিল।

তাঁর দু চোখ ঝাপসা হয়ে এল, স্থির দৃষ্টি মেলে আকাশের নীল পেয়ালা থেকে উপচে পড়া শীতের রৌদ্র দেখতে লাগলেন।

আকাশটা সুন্দর ছিল। ভারি সুন্দর আকাশ। মেঘ ছিল। বকের পাখার মতন শাদা ধবধবে দু খণ্ড মেঘ পশ্চিম দিকে চুপ করে শুয়ে ছিল। আর সারা আকাশ জুড়ে গভীর নীল প্রশান্তি। আর কিছু ছিল না। একটা পাখিও না। দূরগামী উদাসী কোনো চিলের ক্ষীণতম চিহ্নও কোথাও ছিল না। ছিল শুধু ঝক্‌ঝকে রৌদ্র। অফুরন্ত নীল আর বকের পাখার মতন দুটুকরো শাদা মেঘের এক আশ্চর্য সকালে তার কথা আমার মনে পড়ল। সবুজ ঘাসের বুকে বিরল শিশিরবিন্দু কখনো সোনালী কখনো বেগুনী নীল দ্যুতি নিয়ে থেকে থেকে জ্বলছিল। আর সেই ঘাসের শিশির ঘিরে হলদে প্রজাপতিরা দল বেঁধে নাচছিল।

এমন দিনে তাকে আমার মনে পড়ল।

না মনে ছিল; বরং আকাশ যখন মেঘে মেঘে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, রৌদ্রহীন দিনের প্রহর মন্থর হয়ে ওঠে কি গভীর রাত্রে প্রবল বর্ষণের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় তখন তাকে আবার বেশী মনে পড়েছে। কিন্তু সেই মনে পড়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস কান্না ও বিষণ্ণতার এত বেশী যোগাযোগ থাকত যে তাকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা আমি জোর করে চেপে রাখতাম, মনকে শাসন করতাম। নিষ্ঠুর হয়ে একটি কান্নাভরা মুখকে ভুলে থেকেছি! কষ্ট হত সন্দেহ কি! কিন্তু আশা ছিল, নিশ্চই একটি প্রসন্ন সকাল আসবে—যেদিন শাদা মেঘ পরিচ্ছন্ন রৌদ্র হলুদ প্রজাপতি ও ঝলমলে শিশির ছাড়া আর কিছু চোখের সামনে থাকবে না। অন্তত মন খারাপ হওয়ার জন্য আমি এই আকাশ মেঘ, পৃথিবীর একটি তৃণ কি একটি পতঙ্গকেও দায়ী করব না। তারপর যদি মন খারাপ হয়? বুকের ভিতর একটা ভয়ের মেঘ গুরগুর করছিল সন্দেহ কি। কিন্তু তা হলেও এমন দিনে, নীল চোঁয়ানো, রৌদ্ররাঙ্গা, প্রজাপতি চঞ্চল সুন্দর দিনে তাকে কিছুটা উজ্জ্বল প্রফুল্ল স্বাভাবিক দেখতে পাব আশা ছিল।

নিজের দিক থেকে শোকের বিন্দু মাত্র লক্ষণ প্রকাশ না পায় সেজন্য ভাল করে সাজগোজ করতে হল; গরদের পাঞ্জাবি শান্তিপুরী ধুতি চকচকে জুতো সোনার বোতাম—সবই পরলাম সবই ধারণ করলাম, ঘড়ি আংটিটা পর্যন্ত।

আমি বেড়াতে এসেছি, তোমাকে দেখতে এলাম।

বন্ধুর জন্য শোক করতে, বন্ধু পত্নীকে সমবেদনা জানাতে বর্ষা পার করে শরতের এই নীল সোনাঝরা দিনে আমি আসব কেন! আমি চাইছি না তোমার বিষণ্ণতা, দীর্ঘশ্বাস, শোক-ম্লান গাঢ় ধূসর দৃষ্টি; যেন দেখা হওয়া মাত্র স্বচ্ছ হাসির আলোয় ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত করে তুলতে পারব আমি বিনু হাসবে।

'এতকাল আসনি কেন' বলবে না ও, বলবে 'এসো আশা করেছিলাম, তুমি আসবে।'

আমি চাইছিলাম না আমাদের মাঝখানে অপরেশ থাকবে।

যখন বাস চলতে সুরু করল তখন বুক দুরদুর করতে আরম্ভ করল। কি জানি যদি ও বিশ্বাস না করে; আমি বান্ধবীকে দেখতে আসিনি—এসেছি অপরেশের স্ত্রীকে দেখতে বন্ধু পত্নীকে দেখতে? আমি কি তখন মুখ ফুটে বলতে পারব, তোমার অভিযোগ ঠিক হল না বিনু, যদি তাই হত তো এই দেখতে আসার উপযুক্ত দিনক্ষণ অনেক দিন পার হয়ে গেছে, তখন আকাশে অনেক মেঘ ছিল ঝড়ো হাওয়া বইছিল, তোমাদের এই তল্লাটে আসার রাস্তাটা খারাপ ছিল, জলকাদার জন্য চুয়াত্তর নম্বর বাসটাও আর এগোতে পারেনি—বাকি পথটুকু হেটে আসতে হয়েছিল, জলকাদা লেগে জামাকাপড়ের যা অবস্থা হয়েছিল, দেখে তুমি আমায় চিনতে পারতে না, তোমাদের দোরগোড়ায় এসেও পরে ফিরে গেছি। কেননা শোক করতে ঝড়জলের মধ্যে পাগলের মতন অপরেশের বন্ধু ছুটে এসেছিল, সেদিন সেই দৃশ্য তুমি সহ্য করতে পারতে না। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে না চিন্তা করে এত প্রতীক্ষা, এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনেক মেঘ মাথার ওপর দিয়ে পার হয়েছে, তারপর আজ—

বলতে ভুলে গেছি সেজেগুজে বিনতাকে যেমন দেখতে চলেছি তেমনি ওর জন্য, চুলে পরুক কি টেবিলে রাখুক, দুটো লাল গোলাপ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। এমন সুন্দর দিন কেউ খালি হাতে বান্ধবীকে দেখতে যায়! গোলাপ সুখের প্রতীক, আনন্দের চিহ্ন। যদি ও বুঝতে পারে, আমি ওর সুখ কামনা করছি, শোকের অবসান দেখতে চাইছি একটি চব্বিশ বছরের জীবন।

মাঠের কাছে বাস্-টা দাঁড়াল।

সেদিন এতটা আসতে পারেনি। জল ছিল। আজ শুকনো মাঠ। সবুজ ঘাস। শিশির শুকিয়ে গেছে যদিও। রোদটা চড়ে গেল না এইটুকুন পথ আসতে আসতে। তা হলে ঘাসের ডগায় আগুন রঙের ফড়িং চুপ করে আছে। ছিল। আমার পায়ের শব্দে উড়ে গেল।

উঁচু বাদাম গাছ। দুটো গাছ পাশাপাশি। নীচে গোলমতন একটা দীঘি।

কতকালের এই দীঘি, কতকালের ওই দুটো পাশাপাশি গাছ কে জানে! অপরেশও জানত না।

তবে ওই গাছ ও গাছের নীচে গোল আয়নার মতন জলাশয় দেখে সে জায়গাটা তার পছন্দ হয়েছিল এবং দীঘির পাড়ের পাঁচকাঠা জমি কিনে বাড়ি করেছিল এটা আমি জানতাম। আমিও যে ছিলাম যখন জমি কেনা হয়। ইটের দেওয়াল, টালির ছাদ। তা হলেও বাড়ি। সুন্দর বাড়ি। ওই বাড়ির ভিত পত্তন থেকে আরম্ভ করে বিনতাকে নিয়ে বন্ধুর গৃহ-প্রবেশের দিন পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে ছিলাম।

ছিলাম না এক দিন।

এসেছিলাম। রাস্তায় জলকাদা ছিল। জামাকাপড় নোংরা করে পাগলের বেশ নিয়ে ও বাড়ি ঢুকতে পারিনি। ফিরে গেছি। বিনতার কান্না দেখতে আমার ভয় করছিল।

কেননা আমি যে কোনদিনই ওরা কান্না দেখিনি। আমাদের তিনজনের কলেজের চার বছরের জীবনে বিনতা কত কোটি বার হেসেছে তার হিসাব দিতে গেলে আজ বসে ভাবতে হয়। কমনরুমে, লাইব্রেরীতে, সিঁড়িতে, করিডোরে যতক্ষণ বিনতা আমার সঙ্গে থেকেছে মুক্তার মতো শাদা ছোট সুন্দর দাঁত ছড়িয়ে হেসেছে, যতক্ষণ অপরেশের সঙ্গে রয়েছে অনর্গল ও হেসে গেছে; বা যতক্ষণ আমাদের দুজনের সঙ্গে থাকত ঠোঁট টিপে টিপে ও হাসত কেবল; কনকচাঁপার পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট, ওপরদিকে ঈষৎ বাঁক খাওয়া; কাজেই যখন ও হাসত না তখনো মনে হয়েছে ঠোঁট বেঁকিয়ে থুতনি কাঁপিয়ে মুক্তার মত ঝকঝকে একপাটি দাঁত ছড়িয়ে এখনি ও হেসে ফেলল বুঝি। কারণে অকারণে।

বাদাম গাছের মাথার ওপর দিয়ে দমকা হাওয়া বয়ে গেল। লাল মতন দুটো শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে নীচে ঘাসের ওপর নেমে এল।

মাঠের রাস্তাটা লাল টালির বাড়ি ছুঁয়ে বেঁকে পূবদিকে চলে গেছে। আমি সদরের সামনে দাঁড়ালাম। কড়া নাড়তে হল না। যেন জানালা দিয়ে আমায় দেখতে পেয়ে ও দরজা খুলে দিল। বিনতার মুখ দেখে আমার বুক হাল্কা হয়ে গেল। হাসছে।

'এসো!'

বারান্দায় উঠলাম। আমার পাশে এসে দাঁড়াল ও। দুজন মাঠের দিকে তাকালাম। আরো দুটো শুকনো লালচে বাদাম পাতা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে ঘুরতে ঘুরতে ঘাসের বুকে নেমে এল। আগুন রংয়ের ফড়িংগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দুটো কালো রংয়ের ফড়িং কোথা থেকে এসে জুটল। সবাই একসঙ্গে

পাক খেয়ে ওড়াওড়ি করছে।

ততক্ষণে আমার দেওয়া লাল গোলাপের একটা ও চুলে গুঁজে নিয়েছে। আর একটা নাকের কাছে তুলে ধরে শুঁকছে। আমি তন্ময় হয়ে ওর বিশাল খোঁপাটা দেখছিলাম। গোলাপের জন্য খোঁপা সুন্দর লাগছিল বললে বিনতার চুলের ওপর অবিচার করা হত। ওর চুল আশ্চর্য্য কালো, আর অবিশ্বাস্যরকম দীর্ঘ, আর চুলের পরিমাণের দিক থেকেও অন্য কোনো মেয়ের মাথার সঙ্গে বুঝি তুলনাই চলত না। সেই কলেজের দিনে আমার ও অপরেশের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হত।

'ভিতরে এসো।'

দুজন ঘরে ঢুকলাম। আরাম কেদারায় বসলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল। যেন ইতস্তত করছিল কি করবে।

'দাঁড়াও এক সেকেণ্ড।' পাশের ঘরে ছুটে চলে গেল ও। পর্দাটা কাঁপছিল। পর্দা সরিয়ে কেউ ওপারে চলে গেলে তার গতির ব্যস্ততা পর্দার রঙিন ফুল লতা-পাতার ওপর ছড়িয়ে পড়ে। ফুল-লতাপাতা আঁকা পর্দাটা তাই এমন দুলছিল কাঁপছিল। সেদিকে চোখ রেখে কেমন চমকে উঠলাম। তারপর ভুল ভাঙ্গল। একবার মনে হয়েছিল ওই পর্দার কাপড় কিনতে অপবেশের সঙ্গে আমাকে এক দুপুরে কলেজ ষ্ট্রীটের দোকানে দোকানে হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছিল। না, ওটা ছিলো জাফরান রঙের ওপর শাদা ফুল শাদা লতা। এটা সবুজ। সবুজের ওপর গোলাপ ফুল গোলাপ পাতা। সূক্ষ্ম কাঁটাগুলোও আমার চোখে পড়ল। এই পর্দা খুব হালে কেনা হয়েছে, মনে হয় অপরেশ মারা যাবার পর কেনা হয়েছে।

'চুপ করে বসে আছ।'

'না কাগজটা দেখছিলাম।' ভাগ্যিস টেবিলে একটা কাগজ ছিল, আর তার ওপর হাত রেখে আমি চুপ করে ওদিকে তাকিয়ে ছিলাম। মৃদু হাসলাম।

'কি করছিলে।'

'একটু জল চাপিয়ে এলাম।' সামনের চেয়ারটায় বসল ও। অবশ্য ও বসবার আগেই, পর্দা সরিয়ে এ-ঘরে ঢোকামাত্র ওর চোখ দেখে টের পেলাম প্রসাধনের যেটুকু বাকি ছিল তা এখন সেরে এল। তখন মাথায় সগুরচিত ভ্রমর-কৃষ্ণ খোঁপা দেখেছিলাম শুধু, এখন দেখলাম কাজলপরা চোখ। কী নিপুন হাতে না বিনতা চোখে কাজল বুলোয়! আগেও দেখতাম। অপরেশ ও আমার মধ্যে এই নিয়ে কত কথা হয়েছে। সেদিন আমরা তিনজন একই কলেজে পড়তাম। তাই এত আলোচনা ছিল ওকে নিয়ে।

'তোমার শাশুড়ি কোথায়?'

'কাশীবাসিনী হয়েছেন মা।'

'কবে গেলেন তিনি কাশী?' একটা ঢোঁক গিললাম, একটু অবাকও হলাম।

'এই তো সেদিন।' অল্প হাসল ও। 'সবে গেছেন। ওখানে থাকবেন কিনা, বেনারসের জলবায়ু তাঁর আদৌ সহ্য হবে কিনা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।'

'পুত্রশোক বুড়িকে ঠেলে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছে।' গলার নীচে কথাটা খেলা করে গেল, মুখ বুজে চুপ করে রইলাম। আমি তাই চাইছিলাম। আমি চাইছিলাম না অপরেশের কথা এখন উঠুক এখানে উঠুক।

হাত দিয়ে ও খোঁপার গোলাপটা একবার ছুঁয়ে দেখল। আমার দুই চোখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

'তুমি আশা করেছিলে আজ আমি আসব।'

'হুঁ।' ঘাড় কাত করল ও। ঘাড়ের ফর্সা রংটা ধারালো হয়ে উঠল তীব্র হয়ে উঠল এক সেকেণ্ডের জন্য। ওই সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি অপরেশকে মুগ্ধ করত। একদিন কানে কানে বলেছিল সে, 'ওই সুন্দর ঘাড় গলা ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।' বিয়ের আগের কথা। তারপর তো স্বামী-স্ত্রীর জীবন আরম্ভ হল দুজনের।

'কদিন থেকে আশা করছি।' বিনতা উঠে দাঁড়াল। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। আমি ওর চোখের রং দেখছিলাম, কি জানি কদিনের বদলে একটা বিশেষ দিনের কথা বলে বসে কিনা। সেরকম কিছু ঘটল না। হাল্কা নিশ্বাস ফেললাম। গুন্‌গুনিয়ে গান গাইছে ও। সরে গিয়ে আলমারী থেকে পেয়ালা পিরিচ টেনে টেনে বার করছে। তারপর সব নিয়ে টেবিলের কাছে চলে এল।

'ও, চায়ের আয়োজন করছ।' ক্ষীণ হাসলাম।

'জলটা ফুটছে বোধ করি।' হাতের বাসনগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ও পাশের ঘরে চলে গেল। এখন আর গোলাপ ও গোলাপ-কাঁটা আঁকা পর্দাটা তেমন করে কাঁপল না। এখন ওর গতি শ্লথ। অপরেশ আমার কানে কানে বলত, 'ও যখন ধীরে ধীরে চলে, আস্তে হাঁটে ভারি অসহায় মনে হয়, কেন এমন মনে হয়?' সেদিন বন্ধুর কথার উত্তর দিই নি। দেবার দরকার ছিল না। বিনতার গতি তীব্র ছিল, চিরকাল ছুটে চলার অভ্যাস। ক্বচিৎ কখনো ক্লাস থেকে বেরোবার সময়, কি লাইব্রেরীর সিঁড়ি ভেঙ্গে যখন নীচে নামত খুব আস্তে হাঁটত ও। যেন হঠাৎ নিভে গেছে ফুরিয়ে গেছে, মনে হত। অপরেশের মতন আমিও তা ভাবতাম। কাজেই অপরেশের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি তার মনের অসহায় অবস্থাটাই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি সেদিন।

উজ্জ্বল রৌদ্রের দিনের মেয়ে, হাল্কা হাওয়া ছড়ানো দিনের মেয়ে; যেদিন প্রজাপতি চঞ্চল হয়, লতাপাতা কাঁপে, বোঁটার ফুল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশের আলো পান করে সেই অস্থির সুন্দর দিনেই বিনতাকে মানায়। এখন হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে অপরেশের কথাটা মনে পড়ল। কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলাম। টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে সত্যি সেটা চোখের সামনে এবার ছড়িয়ে ধরলাম। তবে কি সেই ভয়ংকর দিনের কথাটা তুলতে চেয়েছিল ও, চেপে গেল! না, সংগে সংগে দুশ্চিন্তা কাটল, গুন্‌গুনিয়ে গান গাইছিল বিনতা, এখনো গাইছে—পাশের ঘর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। কান পেতে রইলাম।

চা খেতে খেতে আমরা সুন্দর একটা প্রসঙ্গে চলে এলাম। অবশ্য প্রসঙ্গটা উঠল এভাবে:

'রমেশকে তো দেখছি না কোথায়? প্রশ্ন করলাম। অপরেশের ছোট ভাই। 'কলেজে গেছে বুঝি?'

বিনতা মাথা নাড়ল।

'কলেজে আর পড়ছে না।'

'কেন' প্রশ্নটা করে হঠাৎ থেমে গেলাম। উত্তরটা যে সংগে সংগে আমার মনে এসে গেছে এবং তাতেই চুপ করে গেছি বুদ্ধিমতী বুঝতে পারল।

'ঠাকুরপো এখন চাকরি করছে।' আস্তে বলল ও।

অপরেশের অবর্তমানে আর একজনের চাকরী না করলে যে এ-সংসার চলত না, বিনতা না বললেও আমার জানা ছিল। চুপ করে রইলাম।

'দাদার অফিসে ওকে নিয়ে নিয়েছে।' আবার বলল ও। দাঁতে দাঁত চেপে একদিকের দেওয়ালেব গায়ে চোখ রাখলাম। অপরেশ প্রায় এসে গেছে আলোচনার মধ্যে। কথাটা ও না বললেও পারত। রোড-অ্যাক্‌সিডেন্টে একটা লোক মারা গেছে, তার অফিস মৃতের পুষ্যিবর্গের কথা চিন্তা করে তার ছোট ভাইকে চাকরি দেবে খুবই স্বাভাবিক।

'অবশ্য ওর মত মাইনে তো আর ঠাকুরপোকে দেবে না, অনেক কম, কিন্তু তা হলেও—' বিনতা চুপ করল। আমার অন্যমনস্কতার দরুন ও থেমে গেল। স্বস্তিবোধ করলাম। বলতে কি, আমি তখন গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম বিনতাকে কি করে প্রসঙ্গটা থেকে অন্যত্র টেনে আনা যায়—সরিয়ে আনা যায়। দেখলাম, ও নিজে সরে আসতে পারল। চায়ের কাপগুলো সরিয়ে দিয়ে বিন্দু নতুন করে হাসল।

'শাশুড়ী নেই—ঠাকুরপো সারাদিনের জন্য বেরিয়ে যায়—বাড়ীতে একলা

আমি কী করি বলো তো ?'

আমার মুখেও নতুন হাসি ফুটল।

'পড়াশোনা ?'

'ধেৎ—বই দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে।'

'সেলাই !'

মাথা নাড়ল ও,—

'বোকার মতো কথা বলো না। কবে আমি ছুঁচ-স্থতোর কারবার করেছি যে আজ হঠাৎ—' বিনতা খিলখিল করে হাসল।

ঘরের চারদিকে তাকালাম। আশা করছিলাম সেতার এস্রাজ জাতীয় কিছু একটা দেখতে পাব, না কি ছবি আঁকছে, টেবিলটা দেখলাম ; না কি কবিতা লেখার চর্চা হচ্ছে, তাই আবারও ওপাশের ছোট টেবিলটা খুঁটিয়ে দেখলাম। খাতা কলম বা রং-তুলির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে অগত্যা ওর চোখে চোখ রাখলাম। এখন আর হাসছে না ও। কালো চোখ মেলে মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখছে।

'এসো—বাইরে এসো।' ও উঠে দাঁড়াল। আরামকেদারা ছেড়ে আমিও উঠলাম। ও আগে, আমি পিছনে। ডাইনে বারান্দা। দুজন বারান্দায় চলে এলাম। এ-বাড়ির ভিতরের উঠোন আমি আগেও দেখেছি। এখন নতুন করে দেখলাম। দেখে ওর চোখের দিকে তাকালাম।

'অবাক হচ্ছ !' আমার হাত ধরল।

'নিশ্চয়।' গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। 'লাউ কুমড়ো বেগুন লঙ্কা কিছুই আর নেই এখন। কেমন যেন রুদ্ধস্বরে বললাম। 'কেবল ফুল—এত ফুল !'

'এত ফুল।' আস্তে বলল ও। আমার হাত ছেড়ে দিল। 'সারাদিন ওই নিয়ে আছি।' সিঁড়ি ভেঙ্গে ও বাগানে নামল। আমিও। এখানে এসে এই প্রথম সোনালি ডোরাকাটা বেগুনি রঙের প্রজাপতি দেখলাম। বিনতার সূর্য্যমুখীর ঝাড়ের কাছে। ওরা মহা উৎসাহে ঘোরাফেরা করছে। অগ্নিবর্ণ ফুলের পাশে সোনালি ডোরাকাটা বেগুনি পতঙ্গ ! দৃশ্যটা চিরকাল মনে রাখার মতন।

'ওগুলো কি, লিলি না ?' আর একদিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

'কী অসম্ভব পরিচ্ছন্ন—কী ভয়ংকর শাদা !' গুচ্ছ গুচ্ছ প্রস্ফুটিত লিলির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম।

'অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে এই বাগানের জন্য।' বিনতা বলছিল।

'তাই তো দেখছি।' ওর মুখের দিকে তাকালাম। 'ফুল তোমার এত প্রিয় আমার জানা ছিল না।'

কথা না বলে ও হাসল। আমার কথাটা ভাল লেগেছে, তাই নীরব থেকে ঠোঁটের একটা কোণা তুলে ও হাসল; টের পেয়ে আস্তে ওর হাত ধরলাম। হাঁটতে হাঁটতে দুজন চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে এসে গেলাম। ঠিক তখন। ওর চুলের দিকে আমার নজর গেল। ফুলটা শুকিয়ে গেছে—রৌদ্রেব তেজে খোঁপার গোলাপ মজে এইটুকুন হয়ে গেছে। এখন আর ফুল বলে চেনা যায় না। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল।

এত ফুলের সমারোহ যেখানে, এইটুকুন একটা গোলাপ বয়ে আনার আমার দরকার ছিল কি। হয়তো খোঁপায় গোঁজা ফুলটার কথা এতক্ষণে ভুলে গেছে ও। তাই। আমি স্থিব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম দু পা এগিয়ে গিয়ে বোঁটাশুদ্ধ এত-বড একটা চন্দ্রমল্লিকা ছিঁড়ে ফেলল ও আর সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ফুলটা চুলের ভিতর গুঁজতে লাগল। অবশ্য ঘাড ঘুরিয়ে ও আমায়ও দেখছিল তখন, অপাঙ্গে আমায় দেখতে দেখতে ভুরু বেঁকিয়ে নীরবে হাসছিল। কেমন লাগছে, ফুলটা মানিয়েছে কেমন—নিঃশব্দ হাসি ও ভ্রূ-ভঙ্গির মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নই করছিল ও বুঝতে কষ্ট হয়নি। খোঁপার শুকনো গোলাপটা টুপ করে কখন নীচে ঘাসের ওপর খসে পডল, ও জানল না, দেখল না। আমি দেখলাম। কিন্তু সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকিনি। বরং পরিপূর্ণ হেসে আমি ওর আশ্চর্য্য কালো চুল ও চন্দ্রমল্লিকা দেখছিলাম। হাসির ভিতর দিয়ে খোঁপা ও ফুল—দুটোরই প্রশংসা করছিলাম। টের পেয়ে ও খুশি হল, আমার কাছে চলে এল। দুজন পাশাপাশি হয়ে আবার হাঁটি।

হাঁটতে হাঁটতে আবাব থমকে দাঁড়াই।

সবুজের বুকে ম্যাজেন্টার ছড়াছড়ি! যেন এত রং এক সঙ্গে কোনোদিন দেখিনি, যেন চোখ জ্বালা করে উঠল। যেন রঙের ধমক সহ্য করতে না পেরে ঘাড় তুলে তাড়াতাড়ি ওর কালো ঠাণ্ডা চোখের দিকে তাকালাম।

'কি ফুল বলো তো?' মাটির দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল ও।

'ঠিক মনে করতে পারছি না।' বললাম।

'এক সঙ্গে কতকগুলো ফুটছে!' বলল ও।

'তাই।'

'কত ছোট অথচ কী ভীষণ চড়া রং।'

'তাই।'

নুয়ে বোঁটাশুদ্ধ একটা ফুল আঙুলের মাথায় ও তুলে আনল।

'কিন্তু একটুক্ষণের আয়ু—এখনি শুকোতে আরম্ভ করবে।' লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল ও। 'কটা বাজে তোমার ঘড়িতে?'

'বারোটা।'

'তবে আর কি—এই বেলা সব মজে যাবে, মিইয়ে যাবে।'

'কেন ?'

'এর নাম ন'টা বারোটা—নাইন টুয়েল্‌ভ,' আঙুলের মাথায় ফুলটা ও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখত লাগল। 'ন'টায় ফোটে—বারোটায় শেষ।'

'কত অল্প সময়ের আয়ু!' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'তাতে কি, যতক্ষণ বাঁচল সুন্দর হয়ে বাঁচল।'

আর কিছু বললাম না। উক্তিটা সত্য, তাই কিছু বলার ছিল না। কিন্তু আর একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল তখন। ঠিক এখানটায়, এই জায়গাটায় অপরেশ একবার মটর গাছ লাগিয়েছিল। অজস্র নীল ফুল ফুটেছিল। চোখ ধাঁধানো রং না, ঠাণ্ডা নীল আভায় জায়গাটা ভরে উঠেছিল। কিন্তু মটরফুলের পরমায়ু কতক্ষণ, কতদিন ছিল মনে করতে পারছিলাম না।

'হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেলে!'

'না তো।' আমি ওর চোখ দেখলাম।

'মনে হয় কি খুব ভাবছ।' ছোট নিশ্বাস ফেলল ও।

'ন'টা বারোটা।' ছোট করে হাসলাম!

আর কিছু বলল না বিনতা। দুজন অপরাজিতার বেড়ার ধারে চলে এলাম। বাগানের শেষ। না কি বাগানের সব ফুল সব রং দেখা হয়ে গেল বলে আমার এমন দুর্মতি হল! অথচ এক সেকেণ্ড আগেও ভাবতে পারিনি, এমনভাবে আমি ওর কাছে ধরা পড়ে যাব। ধরা পড়ে গেলাম। তখন বারান্দায় উঠে এসেছি আমরা। স্থির চোখ মেলে বাইরেটা দেখছি।

আমার হাত ধরল ও।

'চুপ করে আছ!'

'তোমার সুন্দর বাগানের কথা ভাবছি।' গাঢ়স্বরে বললাম, 'আজ যদি অপরেশ এসে দেখত, উঠোনটা আর সে চিনতেই পারত না তাই না?'

চুপ করে রইল ও। চমকে উঠলাম। চোখ ফেরাতে দেখলাম ওর কালো চোখের মণি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

মুখের ভিতরটা কেমন তেতো তেতো লাগছিল।

'তুমি কি আর বসবে?' আস্তে বলল ও।

'না অনেকক্ষণ এসেছি, এইবেলা চলি।' কথাগুলি কেমন যেন মুখে জড়িয়ে আসছিল আমার। 'অনেক বেলা হল।'

'আবার কবে আসছ?' প্রশ্ন করল ও। দ্বিধাহীন প্রশ্ন।

'আবার'—আমতা আমতা করছিলাম : 'আবার কবে ঠিক—'

'না আর এসো না।' চোখে আঁচল চাপা দিল ও। আর দাঁড়াল না। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। খোঁপাটা আবার দেখলাম।

সবটুকু গরিমা নিয়ে চন্দ্রমল্লিকা সেখানে স্থির হয়ে আছে।

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে মাঠে নেমে পড়লাম। রৌদ্রের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল।

পার্বতীপুরের বিকেল

বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই ঘাস ভিজে ছিল। একটা মাঠের মতো জায়গায় আমরা এসে গেলাম। সুন্দর মাঠ। উজ্জ্বল সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছে কেউ, মনে হচ্ছিল। আর মাঠের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চার-পাঁচটা বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, চোখে পড়ল।

যেমন সবুজ নিচের ঘাসের রঙ তেমন আবার মিশমিশে কালো বাবলা গাছের কাণ্ডগুলি।

যেন মনে হচ্ছিল চার-পাঁচটা কালো রঙের মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মাঠটাকে পাহারা দিচ্ছে।

কেন পাহারা দিচ্ছে,—কি পাহারা দিচ্ছে; বিস্তৃত মাঠের আর কোথাও কোনো গাছ চোখে পড়ল না, কেবল ওখানে ওই ক'টা কালো গাছ সতর্ক প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে কেন চিন্তা করতে করতে আমরা যখন গাছগুলির কাছে এসে গেলাম, তখন কৌতূহলের অবসান হল।

আট-দশটা ইঁট জড়ো করে তার ওপর মাটি মাখিয়ে ছোট একটা বেদীর মতো তৈরি করা হয়েছে। মাটি এখনো কাঁচা। একদিকে বেদীর একটুখানি জায়গা এর মধ্যেই ভেঙে পড়েছে। কাঁচা বেদীর ওপর চার-পাঁচটা শাদা ফুল ছড়ানো রয়েছে। ছোট্ট একটা শাদা ফুলের মালাও চোখে পড়ল। বেদীর চূড়ায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কোনো মানুষ দেখলাম না। দুটো লাল ফড়িঙ উড়ে উড়ে ঘুরছে বেদীর ওপর। বাবলা গাছের ডাল-পাতার ভিতর থেকে একটা দাঁড়কাক নেমে এসে বেদীর কাঁচা মাটিতে দুটো বড় বড় ঠোকর মেরে আবার কা-কা শব্দ করে উড়ে গেল।

বন্ধু হাসল।

'কাকটা ভেবেছিল মাটির ঢিপির ভিতর কিছু খাবার-টাবার লুকোনো আছে—বোকা!'

আমি আর একবার বেদীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বন্ধুর চোখে চোখ রেখে হাসলাম।

'তুমি যত বোকা ঠাওরালে কাককে অত বোকা সে নয়—দেখছ না কাঁচা মাটির ভিতর থেকে কেঁচো বেরিয়ে আসছে—ওই খেতে কাক ঠোকর মেরেছিল।'

গম্ভীর হয়ে বন্ধু মাথা নাড়ল।

'তা হবে।' যেন কেঁচো দেখতে বেদীর ওপর শেষবারের মতো চোখ রেখে অবিনাশ বলল, 'এসো আর দেরি করাটা ঠিক না। ট্রেন ধরতে হবে।'

দুই বন্ধু আবার হাঁটি।

এবং কয়েক গজ এগোবার পর ছেলেটাকে পেয়ে গেলাম। ছোট ছেলে, এক হাতে পাঁচন। অন্য হাতে একটা আমআঁটির ভেঁপু। তাই বাজাতে বাজাতে গোরু নিয়ে মাঠের দিকে আসছে।

'গাঁয়ের নাম কি রে?' অবিনাশ ছেলেটাকে প্রশ্ন করল।

'পার্বতীপুর।'

'রেলস্টেশন কদ্দুর?' আমি প্রশ্ন করলাম।

ছেলেটা আমাদের দুজনের দিকে দুবার তাকিয়ে তারপর অন্যদিকে ঘাড় ফেরায়। মাথা নাড়ে।

'জানি নে।'

আট-দশ বছরের ছেলে। যদি রেলস্টেশনের পথ না জানে ওকে দোষ দেওয়া যায় না। তাই কিছু বললাম না। বস্তুত আমাদেরই এদিকে আসা ভুল হয়েছে চিন্তা করছিলাম। আবার পিছনের গাঁয়ে ফিরে যাব কি না এবং সেখান থেকে গোরুর গাড়ি চেপে রেলস্টেশনে চলে যাব কিনা দুই বন্ধু বলাবলি করতে লাগলাম। পিছনের গাঁয়ের কে যেন বলেছিল এদিক দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে গেলে আমরা একটা বড় সড়ক পেয়ে যাব। বাস চলে। বাসে চাপলে স্টেশন বেশি দূর না। ছেলেটা বাঁশি বাজিয়ে চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে অবিনাশ ডাকল, 'শোন্, এই ছেলে—'

ছেলেটা ঘুরে দাঁড়ায় এবং এক-এক-পা করে আমাদের কাছে আসে।

'বাসের রাস্তা কোন দিকে বলতে পারিস?'

বড় বড় চোখ দুটো অবিনাশের মুখের দিকে একটু সময় ধরে রেখে ছেলেটা আবার অন্য দিকে তাকায়। তারপর ঘাড় নাড়ে।

'জানি নে।'

আমি হাসলাম।

'তুই তবে কি জানিস।'

যেন অপ্রস্তুত হয়ে, কিছুটা লজ্জায়, ছেলেটা আমাদের দুজনের পায়ের জুতো দেখতে লাগল।

'এসো, এসো।' অবিনাশ আমার হাতে টান দেয়। 'দেখছ না দুধের বাচ্চা। মাঠে মাঠে গোরু নিয়ে থাকে। বাসের খবর ট্রেনের খবর রাখতে ওর বড় বয়ে গেছে কিনা—যা বাবা, তুই যা।'

ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতেও আবার কি মনে করে আমি ছেলেটাকে ডাকি, 'শোন্ এই ছেলে—'

ছেলেটাও ঘুরে দাঁড়ায়।

'ওখানে ওই বাবলা গাছের গুঁড়ির কাছে ওটা কিরে ?'

ছেলেটা আমার চোখ দেখল, ঘাড় ফিরিয়ে মাঠের বাবলাতলার বেদী দেখল, তারপর ঘাসের ওপর চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'শহীদ-বেদী ওটা।'

কিসের শহীদ, কে শহীদ হয়েছিল ইত্যাদি প্রশ্ন যে মনে না এল তা নয়, কিন্তু তার আগেই গোরুর পিঠে পাঁচনের গুঁতো লাগিয়ে ছেলেটা হাঁটতে থাকে।

বন্ধু বলল, 'চল, আর একটু তো এগোনো যাক।'

গাছের ছায়া বেশ লম্বা হয়ে গেছে। অবিনাশ ও আমার মাথার মাঝখান দিয়ে একটা হলদে রঙের পাখি উড়ে গেল। রোদের তেজ ছিল না। কচি ঘাসের নরম গন্ধ ছড়িয়ে মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়া বইতে শুরু করল। হাঁটতে আর আমাদের কষ্ট হচ্ছিল না।

এক থেকে দু-মিনিট পর অবিনাশ আমার হাত টিপল।

আমি তার মুখ দেখি। তখন আমরা একটা বনতুলসীর ঘন ঝোপের পাশ দিয়ে চলেছি। অবিনাশ ঝোপের মাথার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায় তারপর আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে ওঠে, 'কে একজন ওখানে দাঁড়িয়ে না!'

আমার চোখ জঙ্গলের ওপাশে চলে গেল। দেখলাম সত্যি কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে আমাদের দেখছে—আমাকে দেখছে, না মাঠ, মাঠের বাবলাগাছগুলি দেখছে বুঝতে পারলাম না।

অবিনাশ তেমনি ফিসফিসিয়ে বলল, 'মনে হয় ভদ্রলোক।'

পোষাকের একটা পরিচ্ছন্ন শাদা ঝলক পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের চোখে ঠেকছিল।

নিচু গলায় আমি বললাম, 'হতে পারে—হয়তো এই ভদ্রলোকই আমাদের ট্রেন-বাসের রাস্তা বলে দিতে পারেন।'

'দেখা যাক।' অবিনাশ উত্তর করল।

আর এক মিনিট হাঁটার পর আমরা বনতুলসীর ঝোপ পার হলাম। জানতাম না সেখানেই মাঠের শেষ। মাঠের উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ডান হাতে একটা মোটা মাথার বেতের ছড়ি। বাঁ-হাতে বর্মা চুরুট। পাকা

চুল। কিন্তু অত্যন্ত পরিপাটি করে আঁচড়ানো। শাদা রঙের বুশ শার্ট গায়ে। যেন একটু আগে পাট ভাঙা হয়েছে। কাপড়ের সূক্ষ্ম কালো পাড়ে কুঁচির সহস্র তরঙ্গ চোখে পড়ল। কোঁচাটা ঘুরিয়ে কোমরে গোঁজা হয়েছে। সাদা চটি। শার্টের বুক-পকেটে একটা কচি ঘাসরঙ রুমাল উঁকি দিয়ে আছে। সিল্কের রুমাল, কোনাটা দেখে মনে হল। আমরা দুই বন্ধু মনে মনে বললাম, 'বুড়ো হয়েও ইনি যথেষ্ট বিলাসী। কে ইনি?'

'নমস্কার।'

একটু অবাক হলাম। কেন না আমাদের দেখামাত্র তিনিই আগে দুটো হাত একত্র করার ভঙ্গি করে মাথা নাড়লেন। দু-হাত একত্র করতে পারলেন না যদিও, ডান হাতটা ভয়ংকর কাঁপছিল বাতের আক্রমণ হলে যেমন হয়। সেই সঙ্গে হাতের ছড়িটাও কাঁপছিল। হাত নামিয়ে ছড়িটা আবার মাটিতে ঠেকা দিয়ে দাঁড়ান তিনি। কাঁপুনি কমে। একটু সুস্থবোধ করেন।

হাত জড়ো করে আমরা প্রত্যভিবাদন জানালাম।

'স্টেশনে যাবার কি এই পথ, স্যার?' অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল। মাঠ-পারের অনতিপ্রশস্ত সড়কটাও সে হাত দিয়ে দেখাল।

ভদ্রলোক রাস্তার দিকে চোখ না ঘুরিযে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। বিশেষ করে অবিনাশের হাতের বন্দুকটা তিনি ভাল করে দেখেন।

অবিনাশ হয়তো আবার স্টেশনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করছিল, তিনি মৃদু হাসলেন।

'কোথায় এসেছিলেন, শিকার করতে নিশ্চয়?'

আমি ঘাড় কাত করলাম।

'হ্যাঁ স্যার। আপনি কি—'

তিনিও ঘাড় কাত করলেন।

'আমি এখানকার লোক, এই গাঁয়ের ছেলে।'

অমায়িক হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে তিনি আবার দুই বন্ধুকে দেখতে লাগলেন। আমরা দেখছিলাম গাঁয়ের ছেলের পাথরে-বাঁধানো দাঁত। বলিরেখামণ্ডিত চওড়া কপালের নিচে পাকা ভুরু দু'টি ক্লান্ত হয়ে চোখের ওপর ঝুলছে। কিন্তু তাঁর চোখের ভিতর তাকিয়ে দুজনেই অবাক হলাম। জরা ও বার্ধক্যের ক্লান্তি সেখানে ছিল না। পরিচ্ছন্ন কোমল দৃষ্টি কৌতূহলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—যে কৌতূহল একটি বালকের চোখে থাকে।

অবিনাশ আমার দিকে তাকাল, আমি ভদ্রলোকের পায়ের শাদা জুতো দেখছিলাম।

'আসুন না, একটু চা খেয়ে যাবেন?' ঐ তো আমার আস্তানা।' তিনি আবার সুন্দর করে হাসলেন। 'আপনাদের খুব একটা হাঁটতে হবে না।'

চোখ তুলে দেখলাম তিনি বাঁ হাত তুলে এবং থুতনি নেড়ে একটু দূরের একটা আতা গাছ দেখাচ্ছেন। গাছের ছায়ায় ছোট লাল টালি-ছাওয়া ঘর চোখে পড়ল। একখানা ঘর।

'আসুন, একটু বিশ্রাম করবেন।' তিনি আবার ডাকলেন। আপত্তি করা গেল না।

তাঁর অভিজাত সুন্দর হাসির সঙ্গে সায় দিয়ে আমরা হাসলাম। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হল আমাদের—চলুন।'

আর কিছু বললেন না তিনি। হাঁটতে থাকেন।

আমরাও নীরবে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

বাংলো প্যাটার্নের সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। তিন দিকেই ফুলের বাগান। আমরা অনুমান করলাম তা হলে ঘরের পিছনেও বাগান আছে। গোলাপ। গোলাপ আর যুঁই। লাল গোলাপ, শাদা গোলাপ, হলদে গোলাপ। আর গোলাপগুচ্ছের মাঝে মাঝে দুধের ফেনার মতো শাদা যুঁইফুলের স্তবক। একটু জঙ্গলের মতো হয়ে আছে বাগান। তা হলেও সুন্দর। অসংখ্য মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল ফুল থেকে ফুলে। চারদিকের নির্জনতায় মৌমাছিদের গুঞ্জন স্পষ্ট হয়ে আমাদের কানে ভেসে এল।

'বসুন, বারান্দায় বসুন, এখানে হাওয়া আছে।' বলেই তিনি ভিতরের দিকে মুখ করে ডাকলেন, 'মধু! মধু!'

মধু ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। তাঁর মতোই বৃদ্ধ। কিন্তু তিনি যেমন বেশ একটু জীর্ণ হয়ে পড়েছেন, মধু তা হয়নি। যেন এখনও একটু ছুটতে-টুটতে পারে, খাটতে পারে। বুঝলাম, তাঁর চাকর।

'চেয়ার এনে দে, চেয়ার এনে দে—আর ভালো করে চা তৈরি কর। আর ডিম আছে, আছে না?'

দন্তহীন মাড়ি বার করে মধু হাসল।

'আছে।'

আমরা আপত্তি করতে গেছলাম। কিন্তু তার আগেই তিনি বললেন, 'সুন্দর করে অমলেট তৈরি করে নিয়ে আয়। আর চা।'

ঘাড় কাত করে মধু ভিতরে চলে যায়। এবং তিনটে চেয়ার এনে সামনের বাগানের দিকে মুখ করে বসিয়ে দিয়ে আবার ভিতরে ছুটে গেল।

তিনি বসলেন। দুই বন্ধু বসলাম।

মৃদু হাওয়ায় তাঁর মাথার ফিনফিনে পাকা চুল নড়ছিল। চুরুটটা নিভে গেছে। চেয়ারের হাতলেব ওপর রাখলেন তিনি ওটা। ছড়িটা ডান হাত দিয়ে ধরে রাখেন, ওটা ছাড়েন না।

বাঁ হাত বাড়িয়ে তিনি অবিনাশের বন্দুকটা কোলের কাছে টেনে নেন। যেন আদর করার মতন বার বার ব্যাবেলেব ওপর হাত বুলান, হাত দিয়ে পালিশ অনুভব করেন, মুঠ কবে ধরেন। তাবপর এক সময অবিনাশের হাতে বন্দুক ফিরিয়ে দিয়ে বাগানের দিকে চোখ রেখে কি ভাবেন।

'এখানে বরাবর আছেন ?' অবিনাশ প্রশ্ন করল।

তিনি একটু গম্ভীরভাবেই কিছু ভাবছিলেন, তাই অবিনাশের প্রশ্নে কেমন চমকে ওঠেন। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানান নাইণ্টিন-ফরটি-টু থেকে তিনি গ্রামেই আছেন। একদিনের জন্যও তাঁব দেশের বাড়ি ছেড়ে যান নি। তার আগে ত্রিশ বছর তিনি কাটিয়ে এসেছেন বিহার ও উত্তর প্রদেশের দু' তিনটে বড বড ফরেস্টে। চাকরি নিয়ে জীবনের অনেকগুলি বছর তাঁর জঙ্গলে জঙ্গলে কাটল। তাই বন্দুক দেখলে আজও রক্ত চঞ্চল হযে ওঠে। বিগ গেম শিকার করতে তিনি যে কী আনন্দ পেতেন!

বুঝলাম এই জন্যই অবিনাশের হাতের রাইফেলের দিকে তাঁর এত মনোযোগ।

'—বাঘ, বাইসন, গণ্ডার, বুনো-মোষ আমি কত মেরেছি তা আপনাদের আজ কী করে বোঝাব!'

হাসলেন তিনি। বাঁধানো দাঁত হাসির ঠমকে কাঁপছিল। বালকের মতো সরল উজ্জ্বল দৃষ্টি হঠাৎ উত্তেজনায় বিদ্যুৎ-ঝলক হানল যেন।

বললাম, 'তা ওসব জঙ্গলে যখন এতকাল কাটিয়েছেন নিশ্চয়ই বাঘ, বাইসন, গণ্ডারের সঙ্গে আপনাকে অন্তত আত্মরক্ষাব জন্যও লড়তে হয়েছিল।'

'আজ বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছি—তাই তো রাইফেল জমা দিয়ে দিলাম—না হলে এই বুড়ো বয়সেও শিকাবের শখ মরে নি।'

শুনে দুই বন্ধু ক্ষীণকণ্ঠে হাসলাম। এক কালে তিনি শক্তিমান পুরুষ ছিলেন শরীরের কাঠামোটা তার সাক্ষী হয়ে আছে। চামড়া কুঁচকে গেছে। কিন্তু কব্জির হাড় কত চওড়া ছিল তাকিযে দেখছিলাম।

'উত্তরের বিলে গিয়েছিলেন বুঝি ?' তিনি প্রশ্ন করলেন। অবিনাশ ঘাড় নাড়ল। বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। দুটো বালিহাঁস মোটে ফেলতে পেরেছিল সারা সকাল ঘুরে। যার পরিচয়ে এ-অঞ্চলে শিকার করতে এসেছিল তাকে হাঁস দুটো দিয়ে এসেছে।

তিনি মাথা নাড়লেন।

'না এখন কিছু পাবেন না। আগস্ট মাস। পুরো বর্ষা। এখন তো হাঁস আসার সময় না। তা ছাড়া খুব বেশি আসেও না এই বিলে। শীতকালে তবু দু-চারটে —' একবার থামলেন তিনি, কি ভাবলেন, তারপর, 'যুদ্ধের সময় সাহেবগুলো ছিল। দিনরাত ওই বিলেই পড়ে থাকত। চব্বিশ ঘণ্টা ফায়ার করে করে ওরা কি আর কিছু রেখেছে। হাঁস-পানকৌড়ি-বক পর্যন্ত। মাছরাঙাটা দেখলেও ওদের খুন চেপে গেছে।' কথা শেষ করে তিনি শব্দ করে হাসলেন।

'তারপর থেকে বিলে হাঁসটাস আর বড় পড়ে না। সেই যে ভয় পেল।' তিনি না, তাঁর চাকর মধু কথা বলছিল। চোখ ফিরিয়ে দেখলাম মধু ট্রে হাতে করে বারান্দায় এসেছে। একটা টিপয় টেনে এনে আমাদের সামনে বসিয়ে দিল। গোলাপ ও যুঁইয়ের গন্ধ গরম ওমলেটের সুবাসে চাপা পড়ল। আমাদের রসনা সিক্ত হয়ে উঠল বৈকি!

'শালারা কাঁকড়া মারতে পর্যন্ত গুলি ছুঁড়েছে।' মধু বলল, 'কী কাণ্ডখানা যে করে গেছে গাঁয়ে।'

'এখানে মিলিটারী ক্যাম্প ছিল বুঝি?'

হ্যাঁ, যে-মাঠের ওপর দিয়ে এলেন—ওখানে ওদের একটা বড় গোডাউন ছিল।' চাকর না, এবার গৃহস্বামী কথা বললেন, 'আরম্ভ করুন।' আমরা চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিলাম। ডান হাত বাতে অসাড়, তিনি বাঁ-হাতে চামচ তুলে ওমলেট ভাঙলেন।

মধু ভিতরে চলে গেল।

'যাক গে—আপনাদের আসল কথাই বলা হয় নি—কি, বাসের রাস্তা? সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেলে সড়ক পাবেন—হুঁ, ওই যে মাঠপারের রাস্তাটা দেখে এলেন। আধ মাইলও হাঁটতে হবে না। তা নিয়ে ভাবতে হবে না। দরকার হলে আমি মধুকে সঙ্গে দেব। সে আপনাদের বাসে তুলে দিয়ে আসবে। বসুন। তাড়া কি—না বলছিলাম কি,—কটা বাজে এখন?' অবিনাশের রিস্টওয়াচ ছিল না, আমার হাতে ঘড়ি ছিল। তাই তিনি আমার দিকে তাকালেন।

ঘড়ি দেখে বললাম, 'সাড়ে পাঁচটা।'

'তবে আর কি।' তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হল। 'আগস্ট মাসে সাড়ে পাঁচটা আর তেমন কি একটা বেলা—সন্ধ্যের এখনো ঢের দেরি।'

রৌদ্রের রেখা সরু হয়ে গেছে। গোলাপ-যুঁইয়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কমলা রঙের সুন্দর রেখাগুলি তাঁর শাদা বুশ শার্টের ওপর, শাদা জুতোর ওপর এসে ঠিকরে পড়ে তির তির করে কাঁপছিল। জীবনের অপরাহ্নে পৌঁছেছেন তিনি,

ভাবছিলাম, তাই অপরাহ্নের কোমল রৌদ্র-ছায়া তাঁকে এমন সুন্দর করে দিয়েছে। কেমন অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম।

'ছটার সময় আনন্দ আসবে—মাঠে খেলতে গেছে—' তিনি বাঁ হাতের চায়ের বাটি নামিয়ে রাখলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। 'আমার আনন্দকে না দেখে তো আপনারা যেতে পারেন না। আনন্দকে দেখবেন বলেই তো আপনাদের ডেকে আনলাম।'

অবিনাশ একটু অবাক হয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকায়। আমিও। তিনি বাগানের দিকে চোখ রাখলেন।

'আমার ছেলে। এই তো এবার আঠারো বছরে পড়ল। ওর গায়ের রঙ দেখলে বুঝতে পারবেন যৌবনে আমার গায়ের রঙ কত সুন্দর ছিল। আর বুক—হাতের মাশল্। হ্যাঁ, ওই বয়সে আমি যেমন বেড়ে উঠেছিলাম, ও-ও বাড়ছে। ওর স্বাস্থ্যের দিকেই আমি বেশি নজর রাখছি—রাখতে হচ্ছে—ভাল স্বাস্থ্য না হলে জীবনে উন্নতি করবে কী করে, কি বলেন?'

'নিশ্চয়,' আমি খুশি হয়ে বললাম, 'যাক্, এসেছি যখন ওকে দেখেই যাব। পড়ছে?'

'হ্যাঁ, এবার ওর সেকেণ্ড ইয়ার, আসছে অঘ্রানে ফাইন্যাল দেবে।' তিনি থামলেন, বাগানের রাস্তার দিকে চোখ রেখে হঠাৎ কান দুটো খাড়া করে ধরলেন। আনন্দ কি এসে গেল! আমরা দুই বন্ধু ঘাড় ঘুরিয়ে বাগানের রাস্তার দিকে তাকালাম। একটা কাঠবিড়াল শুকনো পাতার ওপর দিয়ে চলে গেল।

মধু এসে কাপ-ডিস সরায়।

'হ্যাঁ রে মধু, আনন্দর জামা-কাপড় ধোপাটা দিয়ে গেল?'

'গেছে।' মধু মনিবের দিকে তাকায় না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম মধুর চেহারাটা যেন হঠাৎ কালো হয়ে গেছে। যেন কি নিয়ে ও অসন্তুষ্ট।

গৃহস্বামী ফের প্রশ্ন করেন, 'আনন্দর দুধ গরম করে রেখেছিস!'

'রেখেছি।' কাপ-ডিস তুলে মধু চলে যায়।

'ও এলেই গরম দুধটা আগে দিবি।' তিনি আমাদের দিকে চোখ ফেরান। 'আনন্দ বায়না ধরেছে এবার পরীক্ষা হয়ে গেলে কিছুদিন এসে গাঁয়ে থাকবে আমার সঙ্গে—গাঁয়ের মানুষগুলিকে ওর ভালো লেগেছে।'

তাঁর ক্ষীণ হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে অবিনাশ হাসল। 'কলকাতায় পড়ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, ওখানেই তো আমার সব—ওর মা, আমার বড় ছেলে। ওদের কিছুতেই ইচ্ছা নয় আমি গাঁয়ে থাকি—কিন্তু আমার দেশের ঘরবাড়ি ছেড়ে আমি

এক পা নড়তে চাই না। আনন্দকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব বলুন।' তাঁর গলার স্বরটা যেন কেমন কেঁপে উঠল।

আমরা চম্‌কে উঠলাম।

'তবে কি আনন্দ আর কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছে না—আর পড়বে না?' এক সঙ্গে দুজন প্রশ্ন করলাম।

কথা বললেন না তিনি। রুমাল দিয়ে আবার কপাল মোছেন। মধু এবার বেরিয়ে এসে টিপয়টা সরিয়ে নিয়ে যায়। তিনি আড়চোখে মধুকে দেখেন—দেখতে দেখতে হঠাৎ তাকে ডাকেন, 'শোন্—'

মধু ঘুরে দাঁড়ায়।

'ও তো এখনো এল না। একটু দেখবি—ওই মাঠে খেলছে বোধ করি।'

মুখ কালো করে মধু চুপ থাকে।

'যা না, তোর এই বয়সে এত আলস্য এসে গেছে শরীরে!'

'যাচ্ছি। দুধটা উনুনে আছে, ফুটছে। নামিয়ে রেখে যাব।' মধু ভিতরে চলে গেল।

গৃহস্বামী খুশি হন। আমাদের চোখ দেখেন।

'আচ্ছা আসুন, ইতিমধ্যে আপনাদের ঘরের ভিতরটা দেখিয়ে দিই।' তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকলাম। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো ভিতরটা।

'এটা ওর বিছানা।' তিনি আঙুল দিয়ে দেখান। 'এটা আমার।'

আমরা শব্দ না করে পিতা-পুত্রের বিছানা দেখি।

'এই হল ওর পড়ার টেবিল। দেখুন মধুর কী আলস্য! সকালের ফুল বাসি হয়ে গেছে। সরিয়ে এখন কিছু টাটকা ফুল এনে রাখবে তা না। মধু! মধু!' তারস্বরে তিনি মধুকে ডাকেন। ওদিকের রান্নাঘর থেকে মধু ছুটে আসে।

'তোকে কি রোজ এক কথা বলে দিতে হবে?' বাঁ হাতের প্রসারিত আঙুলটা টেবিলের দিকে ধরে রেখে তিনি চাকরকে ধমকান।

মুখ নিচু করে মধু বাসি ফুল সরিয়ে নেয়। এবং মুখ নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে চলে যায়। টাটকা ফুল আনতে গেল ও। আমরা অনুমান করলাম।

'এইবেলা দেখুন আমার আনন্দকে।' তিনি দেয়ালে টাঙানো একটা বড় ব্রোমাইড ফোটোর সামনে আমাদের দুজনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাসেন।

সুন্দর ছেলে। কালো কোঁকড়া চুল। বড় বড় চোখ। প্রশস্ত কপাল। উন্নত

নাক। প্রতিভামণ্ডিত তেজস্বী চেহারা।

দুই বন্ধু মুগ্ধ হয়ে আনন্দকে দেখলাম।

'চলুন বাইরে যাই, ও তো এখন এসেই পড়বে। কথা বললে আপনারা আরো খুশি হবেন।'

নিশ্চয়ই হব। আমরা মনে মনে বললাম, এমন চমৎকার ছেলের সঙ্গে কথা বলে সবাই খুশি হবে। হবার কথা।

বাইরে এসে আর চেয়ারে বসলাম না। তাঁর ডান হাতটা একটু বেশি কাঁপছিল যদিও। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন। রোদ প্রায় নেমে গেছে। গোলাপ ও যুঁইপাতাগুলি কালো-কালো ঠেকছে।

'কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি।' তিনি হঠাৎ অবিনাশের দিকে চোখ ফেরান। 'ও এসেই কিন্তু আপনার রাইফেলটা নিতে চাইবে।'

একটু চমকে উঠে অবিনাশ তাঁব চোখ দেখে। আমিও।

'তবে ইদানীং একটু কমেছে শিকাবেব শখ। ও নিজেই আজকাল বলে, বাবা, নিরীহ পাখীগুলোকে মেরে আনন্দ নেই—ওরা তো আমাদের অপকার করে না—ওরা মানুষের শত্রু নয়। হা হা।' তিনি টেনে টেনে হাসেন।

'তা তো বটেই, তা কথাটা একদিক থেকে সত্য।' যেন ঈষৎ লজ্জিত হয়ে অবিনাশ আড়চোখে হাতের বন্দুকটা দেখে। 'আমরা এসব অঞ্চলে বিগ গেমের দেখা না পেয়ে হাঁস-হরিয়াল-তিতির মেরে শিকাবের শখ মেটাই।'

'আর আমার আনন্দ বলে, বাবা, বিগ গেম্ এই অঞ্চলেই এখন বেশি দেখা দিয়েছে।' তিনি থামেন। আমরা তাঁর মুখ পরীক্ষা করি।

'আনন্দ বলছে যাবা গরিব চাষী মজুবকে ঠকিয়ে খায়, মাঠের ফসল তুলে নিয়ে কালোবাজারে চালান দেয়, চালে পাথর মেশাচ্ছে, তেলে আটায় ভেজাল দিচ্ছে এরা হল মানুষের শত্রু দেশের শত্রু।'

তিনি আমাদের চোখ পরীক্ষা করেন। আমি ও অবিনাশ মৃদু হাসলাম।

'তা হলে আনন্দ আজকাল পলিটিক্স করছে—এই জন্যই ও গাঁয়ে থেকে—' আমরা চুপ করলাম।

'না ঠিক তা নয়, এখনই আমি পলিটিক্স করতে দিচ্ছি না যদিও, তবে কমন্‌সেন্স থাকলে, চোখ-কান খোলা থাকলে একটি ছেলের যে-ধরনের ভাবনাচিন্তা হয় আনন্দরও তাই হচ্ছে—তাই মাঝে মাঝে এসব বলে আমাকে।'

তিনি হাসলেন। আমরাও হাসলাম।

'চলুন, আমরা একটু রাস্তার দিকে এগোই।'

'হ্যাঁ, ও তো ওই পথেই আসবে।' আমি বললাম, 'হয়তো রাস্তায় দেখা হবে।'

আমরা বাগানে নেমে পড়ি।

মধু বাগানে ফুল তুলছিল। ও এসে সামনে দাঁড়ায়।

'বাবু!' মধুর গলা কাঁপছিল। 'বাবু—'

তিনি রুষ্ট হয়ে চাকরের দিকে তাকান।

'কি ?'

'অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আপনি এখন বাইরে যাবেন না।'

'বাইরে যাবেন না!' মুখ বিকৃত করলেন তিনি। 'আনন্দ বাইবে রয়ে গেল—ওকে আনতে হবে না!' বলে তিনি এগোন।

আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। মধু কি ফুল তুলছিল? ওর হাতে ফুল দেখলাম না। যেন ব্যস্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁটে। তার বিষণ্ণ ক্লান্ত চোখ দু'টি মনিবের ওপর। মনিব তার ওপর চটে আছেন। এর আগেই আনন্দকে ডাকতে তার চলে যাওয়া উচিত ছিল। যেন বুঝতে পেরে মধু অপরাধীর মতো সকলের সঙ্গে এগোয়।

আমরা সেই বনতুলসীর ঝোপের কাছে চলে এলাম। সেই মাঠ। নির্জন মাঠের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে-থাকা পাঁচটা বাবলা গাছ। অন্ধকার নামছে মাঠে।

'গাছের নিচে ওটা—' অবিনাশ হঠাৎ প্রশ্ন করছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, ওই তো, ওই তো আনন্দ—আশ্চর্য এখনও খেলা শেষ হল না ওর—এই ছেলে, এই আনন্দ—'

আমাদের হতচকিত করে দিয়ে তিনি যেন কাঁপতে কাঁপতে মাঠে নেমে যাচ্ছিলেন। মধু ধরে ফেলল। 'বাবু! বাবু!' মধুর গলা কাঁপছিল।

'না না না, ওর এভাবে শেষ হওয়া উচিত না। বিগ গেম অনেক এসে গেল, এগুলো মারবে কে—আনন্দ! আনন্দ!' প্রায় ধস্তাধস্তি করে মধু তাঁকে ধরে রাখতে চাইছিল। ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠ বাঘের মতো কেমন গর্জন করে উঠছিল শুনলাম আমরা। তারপর চুপ। মধু আমাদের দিকে তাকাল। আমরাও তাঁকে ধরলাম। সংজ্ঞাহীন দেহটা তিনজনে তুলে নিলাম।

আলো জ্বলছিল ঘরে। তিনি তাঁর পরিচ্ছন্ন শয্যায় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। গলার

একটা বিশ্রী শব্দ হচ্ছিল। টেবিল থেকে একটা শিশি তুলে শাদা মতন কি একটা ট্যাবলেট বার করে জলে গুলে মধু খাইয়ে দিয়েছে পরে আর বিশ্রী শব্দটা হয় নি। অবিনাশ ঘড়ি দেখল। আটটা বেজে গেছে।

চোখ মুছে মধু বলল, 'ফি বছর এমন দিনেই অসুখটা হয়। এই দিনেই খোকাবাবু মারা যান কিনা। সারাদিন কর্তা মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে বাবলা গাছ-গুলোর দিকে চেয়ে থাকেন। আর কেবল বলেন, আনন্দ আসবে, আনন্দ আসছে। খোকা সেপাইর গুলিতে মরে নি। ও বেঁচে আছে।'

'শহীদ-বেদীতে ফুল দিতে যান নি তিনি আজ?' অবিনাশ প্রশ্ন করল।

মধু মাথা নাড়ল।

'গাঁয়ের দু' তিনজন দিয়ে গেছে ফুল। বরং ওরা যখন এই বাগান থেকে ফুল নিতে এল কর্তা লাঠি তুলে যেন মারতে গেছেন। না না, একটা ফুল পাবে না, কাকে ফুল দিতে চাইছ তোমরা। আমার আনন্দ তো মরে নি। ও যদি মরবে তো মুনাফাখোর ভেজালওয়ালাদের মারবে কে? ও আছে, ও আরো কত কি করে দেখবে।'

অবিনাশ ও আমি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওযি করলাম।

'তারপর গাঁয়ের লোক চলে গেছে। অন্য জায়গা থেকে ফুল যোগাড় করে শহীদ-বেদীর ওপর রেখে গেছে তারা। আর তিনি সারাদিন আমায় বলছেন, আনন্দর জামাকাপড় ধুয়ে এল? ওর দুধ গরম হল?'

'সেই বিয়াল্লিশ সাল থেকে কি এরকম—' প্রশ্ন করতে করতে আমি থেমে যাই।

'হাঁ বাবু। বছরের এই একটা দিন যে আমার কী করে কাটে! একলা বাবুকে সামাল দেওয়া কষ্ট হয়। অথচ কিছুতেই তো তিনি কলকাতায় যাবেন না। বড়বাবুর চিঠি এলে, মা ঠাকরুনের চিঠি এলে বলেন, 'আমার খোকাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব—কোথাও না।' মধু থামল। যেন বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। গোলাপ ও যুঁইয়ের গন্ধ ভিজে বাতাসে আরও নরম হয়ে, মিষ্টি হয়ে বাগান থেকে উঠে চুপি চুপি ঘরে ঢুকছিল।

যেন দেয়ালে দাঁড়-করানো অবিনাশের বন্দুকটার দিকে চোখ পড়তে কথাটা মধুর মনে পড়ল।

'তার পরদিনই পুলিস এসে বাবুর বন্দুক নিয়ে গেল। বাতের জন্য হাত কাঁপে, বন্দুক ছুঁড়তে পারেন না, তাই ওটা জমা দিয়েছেন,—এটা বাজে কথা।' ক্ষীণ গলায় মধু একটু হাসলও।

'তা তো বলবেনই, তা ছাড়া আর তিনি কী বলতে পারেন।' অবিনাশ ঘাড়

ফিরিয়ে বৃদ্ধের ঘুমন্ত সুন্দর গম্ভীর বিষণ্ন মুখখানা দেখতে লাগল।

আমি চোখ তুলে দেখছিলাম ব্রোমাইড ফটোটা। মধু শুধু টেবিলের ওপর টাটকা ফুল এনে জড়ো করে নি। একটা মালা তৈরি করছিল বসে বসে যুঁই-ফুলের। মালাটা শেষ করে ফটোর গায়ে জড়িয়ে দিতে এবার ও উঠে দাঁড়াল।

খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর

নতুন কংক্রিটের পোল তৈরী হওয়ার পর জায়গাটার চেহারা বদলে গেছে। এধারের খালটাকে আর চেনা যায় না। চিনতে কষ্ট হ'ত না, যদি ওপরের ডালপালা ছড়ান প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটা কাটা না পড়ত। কিন্তু যারা পোল তৈরী করতে এসেছিল, তারা গাছটাকে রক্ষা করতে পারেনি।

গাছ গেছে তাই আকাশ বড় হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে খালের পুরোনো জংলী চেহারা পাল্টে গিয়ে শহুরে শ্রী ফুটে উঠেছে। কারোর ভাল লাগে, কারোর লাগে না। শিরীষ গাছের ছায়ায় ছায়ায় কাঁটানটে আর কচুর জঙ্গল ছড়িয়ে থাকত কত! পাখির কিচিরমিচির শোনা গেছে সকাল-সন্ধ্যা। ফড়িং দেখা গেছে, প্রজাপতি দেখা গেছে। এখন সব শেষ। যেন সাদা নতুন চুনকাম করা বিশালকায় সেতু এপারের কালো চকচকে পীচের রাস্তার সঙ্গে ওপারের কাঁচা মাটির পথের মিতালি পাতিয়ে হা-হা করে সারাদিন হাসছে। এমন কি পোলের সাদা ছায়া পড়ে খালের শ্যাওলা রঙের জলটাও আর আগের মতো নেই। বুনো বুনো ভাবটা চলে গেছে। কেমন একটা ফ্যাকাশে রং ধরেছে। যেন গাঁয়ের মেয়ে সবুজ ধনেখালি শাড়ি ছেড়ে সাটিনের ফ্রক চড়িয়েছে, কারোর ভাল লাগে, কারোর লাগে না।

হ্যাঁ, খালপোল মিতালি পাতিয়েছে এপারের সঙ্গে ওপারের। তাই কোনোদিন যাদের দেখা যায়নি, সেই সব জেলে ডোম বাগ্দীর ছেলেমেয়েরা ওপারের ধুলো বালি কাদা জঙ্গল আর মাটির সঙ্গে নুয়ে পড়া পাতার ঘর হোগলার ডেরা ছেড়ে এখন হুটহাট পোলের ওপর চলে আসে। হাঁটু পর্যন্ত ধুলা, ময়লা কাপড় লালচে রুক্ষ চুল, শুকনা মুখ নিয়ে ওরা পোলের ঝকঝকে কার্নিশের ওপর হাত রেখে নিচের জল দেখে হি-হি করে হাসে। ওরা খুশী। ওদের ভাল লাগছে এই পোল। ঠেলাগাড়ির ওপর কচু কুমড়ো ডাব কলা লাউশাকের আঁটি চাপিয়ে চাষীরা দিব্যি পোলের ওপর দিয়ে গড়গড় করে এপারের পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে মেটালড করা রাস্তায় নেমে আসে, তারপর ভাল ভাল বাজারগুলো যেদিকে আছে সেদিকে ছুটে যায়। যেন রাতারাতি ওরা জেনে ফেলেছে এপারের কোন বাজারে তাদের ডাব মোচা কি কচু লাউশাক চড়া দামে বিক্রী হবে। ওদের মুখে

এখন হাসি।

আবার মুখ কালো করে পোলের ওপর এসে দাঁড়ায়, ভুরু কুঁচকে সূর্যাস্তের লাল রং দেখতে দেখতে অপ্রসন্ন চোখে ময়লা কাপড় পরা ওপারের নোংরা মুখগুলিকে পাশে দেখে অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এমন মানুষও আছে। তারা এপারের বাসিন্দা। তাদের গায়ে ভাল জামা, পায়ে দামী জুতো। বিকেলের হাওয়া খেতে বেড়াতে বেড়াতে এখানে আসে। কিন্তু এদের সকলেই কিছু অসুখী নয়। নিজের গাড়ি আছে এমন সব সুখী মানুষেরা পোলের ভিড় পিছনে রেখে সোঁ করে ওপারের মাটির রাস্তায় নেমে যায়। প্রচুর ধুলো উড়িয়ে গাড়ি আরো দূরে চলে যায়। তারপর আর দেখা যায় না। হয়তো সবুজ বিকেল দেখতে পাখির কিচিরমিচির শুনতে ওরা বাগ্দীপাড়া জেলেপাড়া পার হয়ে বনের দিকে চলে গেল। পোলটাকে ওরা ধন্যবাদ জানায়।

কদিন পর্যন্ত পোলটাই একটা বিস্ময়, নতুনত্ব হয়ে রইল ওপারের মানুষ আর এপারের মানুষদের কাছে। তারপর সেই নতুনত্ব যখন সকলের চোখে আস্তে আস্তে সয়ে গেল, স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন একদিন সবাই অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল এক অদৃশ্য শিল্পীর হাতের আঁকা নানা চিত্র পোলের গায়ে ফুটে উঠেছে। ফুল লতাপাতা মাছ পাখি। পোলের ঢালুর দিকের চুনকামকরা সাদা অংশটায় শিল্পী ভারি যত্ন করে এসব এঁকে রেখেছে। এ পাশের ঢালুর দিকেও লতাপাতা ফুল মাছ পাখির চিত্র আঁকা রয়েছে। ইঁটের গুঁড়ো নয়তো কাঠকয়লা ঘষে ঘষে চিত্রাঙ্কন করে গেছে শিল্পী। বোঝা যায় তার তুলি নেই, দোকান থেকে রং কিনে আনার সামর্থ্য নেই। কিন্তু সেটা বড় কথা না। অঙ্কনটাই আসল নয় চিত্রগুলিই এখানে বড়। তাছাড়া ইটের রংও রং, কয়লার রংও রং।

এপারের ভাল কাপড় জামা পরা মানুষেরা মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল, 'একটা জিনিয়স। হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। হয়তো অনাদরে অবহেলায় থেকে নিজেকে তেমন করে প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু তাতে কি, মহৎ শিল্পীর প্রতিভা নিয়ে যে লোকটার জন্ম হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আহা কী চমৎকার হাত!'

ওপারের ময়লা কাপড় পরা নোংরা চেহারার মানুষগুলি পোলের গায়ে বিচিত্র সব ছবি দেখে হি-হি করে হাসল, 'পাগলা, মাথায় ছিট আছে বেটার। সারারাত কয়লা আর ইঁটের টুকরো ঘষে ঘষে এই সব কর্ম করে গেছে। খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না—দুনিয়ায় কত রকমের জীব আছে রে বাবা।'

জীবকে তারা দেখতে পায় না। গুণগ্রাহী বুদ্ধিমান শহুরে দর্শকদের কাছেও

মহৎ শিল্পী অজ্ঞাত থেকে গেল। বেড়াতে এসে, কি ব্রীজ পার হবার সময় তারা দু দণ্ড দাঁড়িয়ে গাছ লতাপাতা ফুল পাখি মাছ দেখে।

তিনদিন পর পোলের আর এক পাশে চিত্র ফুটে উঠল। এবার আর গাছ ফুল পাখি মাছ না। চন্দ্র সূর্য পর্বত সমুদ্র ঝরনা নদী। ওপারের মানুষগুলি আবার দাঁত বের করে হি-হি করে হাসল। 'পাগলা বেড়ে কাজ পেয়েছে। সারা পোলটাই চিত্তির করে ফেলবে দেখছি!'

এপারের শহুরে মানুষেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে কাঠকয়লা ইঁটের টুকরো দিয়ে আঁকা চন্দ্র সূর্য সমুদ্র পর্বত দেখতে দেখতে আদিম সৃষ্টির কথা চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আহা যদি একবার দেখতে পেতাম।' যেন দেখা পাওয়া মাত্র তারা তাকে বরণ করে নিত, সভা কবে, তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিত, তার খাওয়া পরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে জনসাধারণেব কাছ থেকে চাঁদা তোলার ধুম পড়ে যেত, সবকাবী সাহায্যের জন্য আবেদন নিবেদন আরম্ভ হয়ে যেত।

'কিন্তু পাগলা দেখা দেবে না।' ওপাবের অশিক্ষিত মানুষগুলি হি-হি করে হাসে। 'পাগলা জেনে ফেলেছে, গা ঢাকা দিয়ে যতদিন চলা যায় ভাল। না হলে শহুরে বাবুর দল তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যেয়ে বলবে এটা আঁক ওটা এঁকে দে। ফাই-ফরমাজ করে বেটার প্রাণ চিট কবে দেবে। নিজের মর্জিগত অমন চমৎকার চাঁদ ফুল সূয্যি চিত্রি করতে পারবে না। ওপারের নোংরা চেহারার মানুষগুলির এরকম একটা আশঙ্কা করবার কাবণ আছে। কেননা তারা চোখেব ওপর দেখছে পোলের গাযের চন্দ্র সূর্য মাছ পাখি দেখতে বাবুদের মধ্যে হিড়িক পড়ে গেছে। ক্রমেই বাবুব সংখ্যা বাড়ছে, গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে, কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে কাগজওয়ালারা এসে যখন-তখন ফটো তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সেদিন একটা লম্বা কালো গাড়ি চেপে ফ্রক পরা বেণী দোলানো এক ঝাঁক স্কুলের মেয়ে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চিত্রগুলি দেখে গেল।

'লোকটা কখন এসব আঁকে রে?' একটি আর একটিকে বলছিল। 'অথচ আজ পর্যন্ত শুনছি কেউ ওকে দেখতেই পেলে না!'

'রাত্তিরে।' গম্ভীর হয়ে আর একটি মেয়ে বলছিল। 'আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, সব মানুষে যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন এসে এঁকে যায়।'

'তা হবে।' চোখ তুলে আর একজন পোলের চার কোণার উঁচু থামগুলি। দেখল। গম্বুজের মতো চারটে থামের মাথায় বালব ঝুলছে। 'সারা রাত আলো জ্বলে। আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ও ছবি আঁকে।'

'আলো না থাকলেও ও ঠিক এঁকে যেত। এই শিল্পী সাধারণ মানুষ না।

ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন কোনো পুরুষ হবে।' কথাটা বলছিলেন এক বৃদ্ধ। মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। পুরু চশমা নাকে ঝুলিয়ে স্কুলের মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছবি দেখছিলেন।

মেয়েরা তাঁর কথা শুনে চুপ করে গেল।

বৃদ্ধ হাত ঘুরিয়ে বক্তৃতা করলেন, 'আমাদেব এই সমাজ কি আর সমাজ আছে। সভ্যতার সংস্কৃতির বডাই করে মরছি। অথচ যেদিকে তাকাবে দুর্নীতি ছাড়া কিছু দেখতে পাবে না। সত্যিকাবের জ্ঞানী গুণী—বিশেষ তিনি যদি শিল্পী হন এই অধঃপতিত সমাজে নিজেকে ধরে রাখতে লজ্জাবোধ কবেন। উহুঁ, এই সমাজের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসাযী প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওযাতে পারেন না। আমার তো মনে হয এই শিল্পী ও শুদ্ধচরিত্রের উন্নতমনা কোনো পুরুষ-ঋষিতুল্য ব্যক্তি—হয়তো তাঁর খাওয়া পরায় কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তা হলেও তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেই নিজেব শিল্পীসত্তাকে বাঁচিযে রাখতে চাইছেন।'

'আমার মনে হয আধুনিক সমাজ আধুনিক সভ্যতাকে ব্যঙ্গ কবতে শিল্পী ইঁট কাঠকয়লা দিযে ব্রীজের গাযে এসব ছবি এঁকে রাখছে। আমরা কৃত্রিম হযে গেছি, আমাদের সভ্যতাটা মেকী। সূর্য পাখি ফুল এঁকে শিল্পী বোঝাতে চাইছে আমরা প্রকৃতি থেকে দূরে সবে যাচ্ছি বলে আমাদের দুঃখ কষ্ট ও দিন দিন বাডছে, আমরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।' একটি যুবক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছিল। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, লোকটি সাধক যোগী—বস্তুত সত্যিকারেব শিল্পী তাই হয়। কেবল ছবি আঁকা গান গাওয়া নয় ছবি ও গানের ভিতর দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিতে মাঝে মাঝে এঁরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।'

'তা হবে।' বৃদ্ধ মাথা নাডলেন। 'কেবল আর্টিস্ট বললে এঁদেব অপমান করা হয়। এঁরা প্রফেট।'

স্কুলের মেয়েবা কথাগুলির অর্ধেক বুঝল, অর্ধেক বুঝল না। ছবি দেখা শেষ করে আবার তারা দল বেঁধে লম্বা কালো গাড়িতে গিয়ে চাপল। বৃদ্ধ পোল পার হয়ে অপেক্ষাকৃত মুক্ত নির্মল বায়ুসেবনের আশায় ওপারের দিকে হাঁটতে থাকেন। যুবকটি শহরের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। ততক্ষণে নতুন দর্শকরা এসে পোলের ওপর ভিড করে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এটা কি হল। দিন পাঁচ ছয় পর এক সকালে দেখা যায় লতাপাতা ফুল পাখি চন্দ্র সূর্য সমুদ্র পাহাড মুছে দিয়ে অদৃশ্য চিত্রকর পোলের দু পাশটায় সাপ ব্যাঙ বিছা টিকটিকি আরশোলার ছবি এঁকে ভবে রেখেছে। ওপারের অশিক্ষিত মানুষগুলি আবার দাঁত বার করে হাসল। কেননা তারাই আগে

দেখল ছবিগুলি। ডাব কুমড়ো লাউশাকের আঁটি বোঝাই ঠেলা গাড়ি নিয়ে সূর্য ওঠার আগে তারা পোলের ওপর ছুটে আসে। ঠেলা থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্ত ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। কেননা ছবিগুলি নতুন। পাখি চাঁদ ফুল সমুদ্র ওদের চোখে পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। সে সব দেখতে ইদানীং তারা বড একটা গ্রাহ্য করেনি। সঙ্গের ছোট ছেলেটা তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে এক দুই করে গুণতে শুরু করে দেয়, তারপর ঠেলার কাছে ছুটে এসে চেঁচাতে থাকে, 'মামা, চৌদ্দটা সাপ, আটাশটা ব্যাঙ, তিনকুড়ি আরশোলা, বাইশটা টিকটিকি হি-হি।' তার হাসির সঙ্গে বডরাও যোগ দেয। 'বাবুদের ভিড বাডছে, তাই ব্যাটা মজা করতে সাপ ব্যাঙ চিত্তির করে রেখেছে, এবার কাগুজে ছোঁডারা এসে ফটোক তুলে নিয়ে যাক হা-হা।'

খালের ওধারের বাগ্দীপাডার ছেলেমেয়েরা দিনভর পোলের এ মাথা ও মাথা ঘুরে সাপ ব্যাঙ আরশোলার ছবি দেখল। 'পাগলা কাল রেতে গাঁজা টেনেছিল। না হলে গণ্ডায গণ্ডায় হেলে সাপ চিত্তিব করবে কেনে। আর সব কিনা কোলা ব্যাঙ, থপাস করে ছুটছে রে দিদি হি-হি।'

কিন্তু এবারও শহরেব ভদ্রপাডার মানুষেরা শিল্পীর নতুন সৃষ্টি দেখতে পোলের ওপর ভিড করতে ভুল করল না।

'মর্জি, শিল্পীর নতুন খেয়াল।' ছবি দেখে তারা মন্তব্য করল।

'সাধক শিল্পী—প্রকৃতির আর একটা দিক আমাদের চোখের সামনে উন্মোচন করে ধরল।' সাদা চুল মাথার সেই বৃদ্ধের দিকে তাকিযে সেদিনের যুবকটি মন্তব্য করল।

বৃদ্ধ মাথা নাডলেন। চশমার পুরু লেন্স ভাল করে মুছে নিয়ে ফের সেটা নাকে তুলে দিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। 'মানে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, আণবিক সভ্যতার বডাই করে আমরা যতই লাফালাফি করি না কেন, ধ্বংসের মুখে এসে পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে। শিল্পী বলতে চাইছে, দু পায়ের ওপর দাঁডানো মানুষের দিন শেষ হতে আর দেরী নেই, ওরা আবার আসছে, আসছে, আবার বুকের ওপর ভর দিয়ে চলা জীবদের রাজত্ব চলবে কয়েক কোটি বছর।'

কথা শুনে স্কুলের মেয়েগুলি গম্ভীর হয়ে গেল। এতক্ষণ ওরা বেশ মজা পাচ্ছিল সাপ ব্যাঙ টিকটিকি আরশোলা বিছার ছবি দেখে। যেন আনাজ-ওয়ালাদের সঙ্গের সেই ছোট ছেলেটার মতো এক দুই করে কটা ব্যাঙ কটা টিকটিকি গুণতে আরম্ভ করেছিল। আবহাওয়াটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতে ওরা সরে গেল। তবে তাদের আশা রইল আর একদিন হয়তো এসে দেখতে পাবে

পোলের গায়ে বাঘ সিংহ গণ্ডার বাইসন হাঙর কুমীর আঁকা রয়েছে।

ফাল্গুনের শেষ। এক রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়ে গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল বৃষ্টির জলে ধোয়ামোছা হয়ে নতুন ব্রীজটা আগের মতো তকতকে ঝকঝকে হয়ে আছে। একটু আঁচড় নেই, একটু দাগ নেই কোথাও। কেউ কোনোদিন পোলের গায়ে চিত্রকর্ম করেছিল কে বলবে। কাজেই আর ভিড় নেই। ওপারের মানুষেরা এপারে এল। বাস দেখল রিকশা দেখল দোকানপাট দেখল, ঝকঝকে পোশাকের শহুরে মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এপারের কিছু মানুষ ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে খালের ঘোলা জল দেখল, খড় বোঝাই নৌকা দেখল, আকাশ দেখল—কিছু মানুষ ব্রীজ পার হয়ে পাখি দেখল, তারপর আবার শহরের দিকে ফিরে এল। পোল দেখতে, পোলের গায়ের বিচিত্র ছবি দেখতে আজ কেউ দাঁড়ায় না। যেন হাজার বছরের পুরোনো এই সেতু—এর আবার নতুনত্ব কি এর দিকে তাকাবার আছে কি। দুপুরের গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে নিঃসঙ্গ ব্রীজটা মানুষের স্বভাবের কথা চিন্তা করে ঠোট টিপে হাসছিল হয়তো।

অবশ্য পরদিনই সকালবেলা আবার সকলকে চোখ তুলে পোলের দিকে তাকাতে হল। সাপ ব্যাঙ না, হাঙর কুমীর বাঘ বাইসন না—আনাজওয়ালাদের সেই ছেলেটা গুণে গুণে দেখল এধারে কুড়িটা ওধারে কুড়িটা মানুষের মুখ এঁকে রেখে গেছে কে। 'উঁহুঁ, একটাও পুরুষের মুখ না, সব মেয়েমানুষের মুখ হা-হা।'

ওপারের বাগ্দী আর জেলেপাড়ায় ছেলেমেয়েরা হেসে লুটোপুটি।

'বেটার বৌ পালিয়েছে, তাই না মনের দুঃখে ওই কর্ম করছে। রাতভর মেয়েছেলের মুখ চিত্তির করে গেছে, হি-হি।'

যেন এতকাল পর লোকটা নিজেকে ধরা দিয়েছে, যেন আজ বোঝা গেছে কী দুঃখ বুকে নিয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। হুঁ, এ সব ব্যথা নিয়েই তো মানুষ কবিতা লেখে, গান গায়। বিরহী শিল্পীর ছবি আঁকাটাও তাই। তার ওপর কিনা—

চোখ বড় করে এপারের সুশ্রী চেহারার সুন্দর পোশাকের মানুষগুলি এপাশে কুড়িটা মুখ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। নারীমুখ ছাড়া আর কি? বলয়াকৃতি, পূর্ণ চাঁদের আকৃতি, ডিমের আকৃতি, শঙ্খের আকৃতি। নরম রেখার সব মুখ পর পর সাজান।

'দেখছেন না, ওদের চোখে তৃষ্ণা, অধরে কামনা।' পক্ককেশ বৃদ্ধের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সেই যুবক মৃদু মৃদু হাসে। 'আমার মনে হয়, আমার তো ধারণা হচ্ছে লোকটা ব্যর্থ প্রেমিক। সংসার ভাল লাগল না। এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে—'

কথা শেষ করতে দেন না বৃদ্ধ। যেন তিনি আজ ক্ষুব্ধ, ব্যথিত।

'কিন্তু তা হলেও এতগুলি নারীমুখ এমন প্রকাশ্য স্থানে এঁকে রাখার দরকার ছিল না। এটা অশোভন। এখনি হয়তো স্কুলের মেয়েরা ছুটে আসবে পোলের গায়ে আজ কি আঁকা রয়েছে দেখতে।'

'প্রেমে ব্যর্থ হয়ে লোকটা সিনিক হযে গেছে।' যুবক ঢোক গিলল, তারপর আস্তে বলল, 'আমার তো ধারণা শিল্পী বহু নারীর প্রেমপ্রার্থী হয়েছিল। কিন্তু একজনও একটি মেযেও তার ওপব সদয় হয়নি।'

'তা হবে, তা হওয়া আশ্চর্য না।' বৃদ্ধ মাথা নাডলেন। 'এবং এই কারণে যে লোকটার মাথার দোষ হয়েছে এটাও এখন বুঝতে পারছি।'

'আমাব তাই মনে হয। তাই সেদিন এতগুলি সাপ ব্যাঙ আবশোলা টিকটিকি এঁকে রেখেছিল, তাই সেদিন দেড হাজার ফুট লম্বা ব্রীজটা চন্দ্র সূর্য সমুদ্র পর্বত এঁকে ভরে রেখেছিল। পাগল।'

'এবং বিকৃতদর্শন।' বৃদ্ধ কঠিন গলায় মন্তব্য করলেন। 'তার দিকে কোনো রমণী মুখ তুলে তাকাতেও নিশ্চয লজ্জা পায়। আর—আর সেই রাগে দেখছেন না সব কটা মুখ লালসাবিকৃত করে আঁকা হযেছে—আমার তো ইচ্ছা কবছে সবগুলো মুখ মুছে ফেলা হোক।'

ভিড বাডছে। গুঞ্জন বাডছে। স্কুলের মেযেদের নিয়ে লম্বা কালো গাডিটাও এসে গেছে। কিন্তু তাবা আর গাডি থেকে নামল না। বৃদ্ধ গাডির দিকে ঘুরে দাঁডিয়ে হাতজোড করে নিষেধ করলেন, 'মা আজ তোমরা ফিরে যাও, এসব ছবি তোমাদের জন্য না।' কিন্তু তবু যেন দু একটি কৌতূহলী মুখ জানালাব বাইরে তাকাতে চেযেছিল। গাডি তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিতে যুবক তারস্বরে ড্রাইভারকে আদেশ করতে গাডি ব্রীজের নীচে নেমে গেল।

'তাই বলছিলাম ভাই, দুর্নীতি, চতুর্দিকে পাপ।' বৃদ্ধ ঘামছিলেন, উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। 'একটু হাওয়া খেতে ব্রীজের দিকে বেডাতে আসি। এখন দেখছি তাও বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে যদি পোলের গায়ে কেউ চিত্রবিদ্যা ফলাতে থাকে তো আমরা যাই কোথায়।'

'আপনার মশাই বাডাবাডি।' যেন বুডোমতো আর এক ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন। 'না হয় শখ করে কটা মুখ এঁকেছে—তাতে এমন কি আপত্তির—'

ভদ্রলোককে কথা শেষ করতে না দিয়ে যুবকটি চিৎকার করে উঠল। 'আপনি চুপ করুন, আপনি থামুন। আপত্তি করার যথেষ্ট কারণ আছে। একটা মুখ না, চল্লিশটা মেয়েমুখ যদি কেউ রাস্তার ওপর, একটা পোলের গায়ে ইঁট কাঠকয়লা দিয়ে এঁকে রাখে তো বুঝতে হবে, যে এসব এঁকেছে কেবল তারই রুচি বা

মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেনি—জনসাধারণের মধ্যে এই বিকৃতির চালান দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে রাত জেগে সে এসব কাজ করে গেছে।'

ভদ্রলোক চুপ। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে রুমাল বার করলেন, যুবকটিও বার করল। তারপর দুজনে লেগে গেলেন ছবিগুলি মুছে দিতে। 'এটা আমার একলার না, সকলের দায়িত্ব।' বৃদ্ধ থেকে থেকে ঘাড় ফিরিয়ে উপস্থিত শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, 'সুতরাং সকলেরই দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন আর কোনোদিন এখানে এসব মুখ আঁকা না হয়।'

দুজনের দেখাদেখি আরও কয়েকজন রুমাল বার করে ওপাশের মুখগুলি মুছতে লেগে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে পোল খালি করে দিয়ে দর্শকের দল সরে যায়। পড়ন্ত রোদের আভা গায়ে নিয়ে ব্রীজটা যেন আলস্যের হাই তোলে। আজ আবার তার দিকে কেউ তাকাবার নেই। ঘোলা জলের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে খালপোল খালের বুকের কাঠবোঝাই নৌকাটার মন্থর গতি দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে ওঠে।

একটানা তিনদিন এভাবে কাটল। কোনো ছবি নেই, কোনো দর্শক নেই, কোনো উত্তেজনা নেই। আনাজের গাড়িগুলি গড়গড় করে পোল পার হয়ে শহরের পীচের রাস্তায় নেমে যায়। পোলের ওপর তারা কোনোদিন দাঁড়িয়েছিল মনে করতে পারে না। জেলে আর বাগ্দীপাড়ার মানুষগুলি শহরের আলো দেখে গাড়ি দেখে—সময় সময় গুটিগুটি পোল পার হয়ে এধারের সিনেমাঘরের দেয়ালে আটকান রঙ্গিন ছবিগুলির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাবুরা হাওয়া খেতে পোলের ওপর উঠে জল দেখেন, আকাশ দেখেন। যাদের গাড়ি আছে, তারা ব্রীজ পিছনে রেখে ওপারের ঠাণ্ডা নরম মাটির রাস্তায় নেমে যান। গাঁয়ের বিকেল, বনের পাখির ডাক তাদের প্রিয়। খালপোল না।

রাত্রে বিশাল চাঁদ দেখা দিল আকাশে। চার কোণার গম্বুজের মাথায় ইলেকট্রিক বালবগুলিও পোলের গায়ে কম আলো ছড়াল না। কিন্তু আজ কি আর লোকটা ছবি আঁকবে। কেউ কেউ ভাবল, নিশ্চয় তার এমন যত্ন করে আঁকা চিত্র মুছে দেওয়াতে শিল্পী অপমান বোধ করছে। অভিমানে সে আর এদিক মাড়াবে না। কে জানে হয়তো অন্য কোথাও আর কোনো পোলের গায়ে কি বাড়ির দেয়ালে সে ছবি আঁকছে।

কেউ কেউ ভাবল, কিন্তু তাদের সেই ধারণা যে কত ভুল সকালে লাউ কুমড়োর গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে পোলের ওপর উঠে গাঁয়ের মানুষগুলি সকলের আগে তার প্রমাণ পেল। চিত্রগুলির ওপর চোখ পড়তে তারা চোখ ফিরিয়ে নিল। সঙ্গের ছোট ছেলেটা হেসে ফেলেছিল, বড়দের ধমক খেয়ে বেচারা চুপ করে গেল।

'শালাব কাণ্ডখানা দেখ—ইস্ কী কুচ্ছিত চিত্তির কবে গেছে সাবাটা পোলের গায়ে।' যেন তাবা নিজেবাই লজ্জা পেল ছবিগুলির দিকে তাকাতে। ঠেলা চা'লিযে তাডাতাডি তাবা পোল থেকে নেমে গেল। তারা নেমে গেল, কিন্তু অশ্লীল ছবিব দিকে হা কবে তাকিযে থেকে সে সব উপভোগ করাব মানুষের অভাব হল কি।

জেলে আব বাগ্দীপাডাব মানুষগুলি হেসে কুটিকুটি।

এপাবেব বিডিব দোকান পানেব দোকানেব মানুষগুলি হেসে এ ওব গায়ে লুটিযে পডল।

'কালকেব শোধ তুলতে পাগল এসব এঁকে বেখেছে। হি হি।'

যেন খববটা বাতাসে ছডিযে পডে। অশ্লীল ছবিব গন্ধ পেযে মাছিব ঝাঁকেব মতো মানুষ পোলেব ওপব এসে ভিড কবতে লাগল। পোলেব দু পাশে, দু দিকেব ঢালু থেকে আবম্ভ কবে উলঙ্গ নবনাবীব মিছিল দেখকে ভদ্র অভদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষেব মধ্যে বীতিমত ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি আবম্ভ হয়ে গেল। কেউ ঠোঁট টিপে হাসল—ছোকবাব দল হাততালি দিযে শিস দিযে মুখে আঙুল দিয়ে সিটি মেবে উল্লাস প্রকাশ কবল। 'এতকাল পব ছবির মতো ছবি এঁকে গেছে বেটা। তাব গলায মেডেল ঝুলিযে দিতে হয। আহা, যদি একবাব দেখা পেতাম চিত্রকবেব।'

'মেডেল না, জুতোব মালা।'

উত্তেজিত কণ্ঠস্বব শুনে সকলে ঘাড ফেবাল। যুবকেব সঙ্গী সেই বৃদ্ধ এসে পৌছায়নি। তাব আসতে বিকেল। বস্তুত এসব দেখে বুডোমানুষটা কি কববে অনেকে বলাবলি কবছিল। ইতিমধ্যে যুবকটি পকেট থেকে রুমাল বেব করে ফেলেছে। কিন্তু কবলে হবে কি, চাযেব দোকান বিডির দোকানেব মানুষগুলি হৈ হৈ কবে উঠল, 'মশাই সবুব করুন সবুব করুন, এখনি সব মুছে ফেলা কেন—এমন চমৎকাব চিত্র, আব একটু দেখে নি। আপনিও চোখ ভবে দেখে নিন। আপনাব ক্ষমতায কুলোবে আঁকবাব।'

তাবা দলে ভাবি। রুমালটা পকেটে পুবে যুবক চুপ কবে দাঁডিযে বইল, যেন কতক্ষণে পুরু চশমা চোখে পাকা চুল মাথায় সেই বৃদ্ধ এসে যাবেন, তাব অপেক্ষা কবতে লাগল, আব অশ্লীল ছবিগুলিব ওপব চোখ না পডে এমনভাবে ঘুরিয়ে, দাঁড়িয়ে খালের জল দেখতে লাগল। এদিকে হাসি শিস অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ঠেলাঠেলি বেডেই চলেছে। বেডে চলত। হঠাৎ সব থেমে গেল, সবাই অন্তত দু মিনিটের জন্য চুপ কবে থেকে লোকটাকে দেখল। পাগল? দার্শনিক? সাধক? ভণ্ড? মাথায় ধুলোবালি মাখা ঝাঁকডা চুল, কোটরগত চক্ষু, কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক

উজ্জ্বল, পরনে ছেঁড়া চট, আর বগল থেকে আরম্ভ করে কব্জি পর্যন্ত দুটো হাতে লাল সাদা নীল হলুদ ন্যাকড়ার টুকরো জড়ানো। হাতে একটা টিনের কৌটো। যার সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে, তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে আর হাতের কৌটাটা নেড়ে বিড়বিড় করছে, 'হেল্‌প, হেল্‌প।'

ব্যাপার কি? শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্র অভদ্র, সকল শ্রেণীর দর্শকের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। কে ও?

'কে, বুঝতে পারছেন না?' একজন আঙুল দিয়ে লোকটার খালি খোলা পাঁজর-বের-হওয়া শীর্ণ বুকটা দেখিয়ে দেয়। উল্কি করা উলঙ্গ এক নারীমূর্তি। 'বুঝতে পারছেন না, এই তো সেই ব্যর্থ প্রেমিক—লুকিয়ে থেকে, লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে চাঁদ সূর্য ফুল পাখি আর নারীমূর্তি এঁকে এঁকে যে বুকের জ্বালা কমাতে চাইছে। তার বুকেও সেই ছবি আঁকা রয়েছে। আর কি প্রমাণ চান।'

যেন সকলে একসঙ্গে ঢোক গিলল, অবাক হল, উত্তেজিত হল, ক্রুদ্ধ হল, খুশী হল প্রেমিক শিল্পীর দর্শন পেয়ে।

'ও আজ হঠাৎ দেখা দিলে বড? কি চাইছে ও?'

'আজ শেষ দিন, সে জানে এখানে আর তার ছবি আঁকা হবে না, নীতি-বাগীশের দল এখনি সব ছবি মুছে, হয়ত কাল থেকে এখানে পাহারা বসাবে, পুলিস মোতায়েন করা হবে—আজ এসেছে সাহায্য চাইতে, তার শ্রমের মূল্য, দক্ষিণা—শিল্পীর প্রেমের ক্ষুধা আমরা মেটাতে পারি না, কিন্তু পেটের ক্ষুধা তো মেটাতে পারি, আর সেই দায়িত্ব আমাদের দিন, সকলে দু-চার আনা করে—

'হেল্‌প, হেল্‌প'—উন্মাদ শিল্পী কৌটো নাড়ছে আর মিটিমিটি হাসছে। পোলের এমাথা থেকে ওমাথার দিকে সে এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে।

'উহুঁ, সাহায্য-টাহায্য পরে হবে!' সেই যুবক চেঁচিয়ে উঠল। আগে জানা দরকার কোথায় সে থাকে, কি পরিচয়, আর এসব অশ্লীল চিত্র আঁকার উদ্দেশ্য কি—পোলটা তো তার ঘরবাড়ি নয়, স্টুডিও নয় যে, যা খুশি এঁকে রাখলে চলবে, দশটা পুরুষকে, দশটা মেয়েছেলেকে এই ব্রীজের ওপর দিয়ে এপার-ওপার করতে হয়।'

'আচ্ছা, শিল্পীর আবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা কেন।'

একজন একটু রুষ্ট গলায় বলল, 'শিল্পই তার পরিচয়। বরং প্রশ্ন করুন, এতকাল কোথায় ছিল, যদি এখানে থাকে আর ছবি আঁকতে দেওয়া না হয় তো এর পর কোথায় গিয়ে শিল্পচর্চা করার ইচ্ছা রাখে।' কথাটার মধ্যে একটু খোঁচাও ছিল।

যুবক ক্রুদ্ধ হয়।

'কেন, লেংটা মেয়েমানুষের ছবি দেখতে আপনিও সেখানে ছুটে যাবেন নাকি।'

'তা না-হয় গেলাম। ছবি দেখতে দোষ কি—এ তো জলজ্যান্ত কোনো মেয়েছেলে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না। কেন, আপনি যে বড় ক্ষেপে যাচ্ছেন, পুরীর মন্দিরে গিয়ে দেখুন না, কত উলঙ্গ ছবি চারদিকে আঁকা রয়েছে।'

'সেটা মন্দিরে মঠে চলে, কলকাতার রাস্তায় চলে না।'

'কোথাও চলে না, যে-যুগে মঠে মন্দিরে ওসব আঁকা হ'ত, সেটা এ-যুগ নয়, আজ কোনো মন্দিবের গাযে এসব চিত্র আঁকতে গেলে মানুষ আপত্তি জানাবে। কেন, এক সমযে তো মানুষ উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত, এখন কি তা চলে ? বলুন, আমার কথার উত্তর দিন।'

সবাই চমকে ওঠে। সেই পক্ককেশ স্খলিতদন্ত বৃদ্ধ। যেন কার কাছে খবর পেয়ে দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে ছুটে এসেছে। উত্তেজনায় কাঁপছে। 'বলুন, আমার কথার উত্তর দিন। যে-রাস্তায় এসব চিত্র থাকে, আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়ের হাত ধরে সে-রাস্তা কী করে পার হবেন ? চুপ করে আছেন কেন সব এখন ?'

একটা চাপা গুঞ্জন উঠল।

'না, না, বেটাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দিন—ভবিষ্যতে যাতে আর—' একজন বলল, 'এখনি হয়তো স্কুলের মেযেদের নিয়ে গাড়িটা এসে যাবে। ছি-ছি, কী লজ্জার কথা!'

'বটে, এখন কত বড় বড় মেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়ছে!' আর একজন সায় দেয়। 'এখনি ছবিগুলো মুছে ফেলা হোক।'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে—আর বেটাকে ভাল করে শিক্ষা দেযা হোক, যাতে আর কোনোদিন এপথে পা না বাড়ায়।' একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বোঝা গেল, এ-পক্ষ এখন দলে ভারি। যারা হাসছিল, শিস দিচ্ছিল, অশ্লীল ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ততোধিক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছিল, তারা চুপ, যেন লজ্জায় তারা অধোবদন হয়ে আছে। দু-একজন ইতিমধ্যে সরে গেছে।

'এই, তুই কোথায় থাকিস ?' বৃদ্ধের সঙ্গী সেই যুবক, পাগলের মতো দেখতে, অজ্ঞাতপরিচয় শিল্পীর একটা হাত চেপে ধরল। 'কোথায় তোর আস্তানা ?'

'হি-হি—' পাগলের মতো লোকটা হাসে। হাত তুলে আকাশ দেখায়। যেন আকাশে তার ঘরবাড়ী।

বৃদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ল।

'এই বেটা, পাগলামি রাখ্‌—তুই কোথায় থাকিস ?'

'হেল্‌প, হেল্‌প।'

'তোমার দাঁত ভেঙে দেব।' যুবক থাবা মেরে তার হাতের কৌটোটা ফেলে দেয়।

'হেল্‌প, হেল্‌প।'

'একটা চাঁটি মারুন না।' পিছন থেকে আর একজন গর্জন করে উঠল। 'বদ্ধ উন্মাদ।'

'আমার তো মনে হয়, পাগলটাকে যেন পোলের ওপারে একদিন দেখেছিলাম।' একজন হঠাৎ বলে উঠল।

'হ্যাঁ, আমিও যেন দেখেছিলাম।' আর-একজন।

'না, না, ও কথা বলবেন না বাবুরা।' পোলের ওপারের মানুষগুলি সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। 'শহুরে পাগল; শহুরে পাগল ছাড়া ওরকম চিত্তির করবে কে।'

'না গো কর্তা, আমরা লেখাপড়া জানি না, আমাদের পাড়ার কোনো মানুষ ছবি আঁকতে জানে না।' জেলে পাড়ার বাগ্দী পাড়ার পুরুষ নারী কলরব করে উঠল।

'ছবি আঁকতে লেখাপড়া জানতে হয় না।' অশিক্ষিত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ভেংচি কাটেন। 'পাথরের গায়ে, গাছ খুদে আদিম মানুষেরা নানা চিত্র করে গেছে—জংলী বর্বর ছাড়া এসব প্রকাশ্য জায়গায় এসব আর আঁকবে কে—নির্ঘাৎ এ তোদের লোক।'

'উঁহু, উঁহু—শহুরে মানুষ।' ওরা হৈ-হৈ করে উঠল।

এদিকে সেই যুবক উন্মাদ শিল্পীর মাথায় চাঁটি মেরেছে। দাঁড়িয়ে থাকলে আরো মার খেতে হবে, ভয় পেয়ে লোকটা পোলের ওদিকে ছুটে যাচ্ছিল। জেলে আর বাগ্দীরা পথ ঘুরে দাঁড়াল। 'এই এই শালা?'

ওদিকে বাধা পেয়ে লোকটা এদিকে ছুটে আসে। শহরের সব মানুষে একসঙ্গে বাধা দেয়, 'খবরদার এদিকে পা বাড়ালে মাথা ভেঙে দেব।'

পাগল আবার ওদিকে ছোটে, তার শীর্ণ পা দুটো কাঁপছে, চকচকে চোখ দুটো কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চাপা আর্তনাদের মতো একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

'এই বেটা!' বাগ্দীদের একজন লোকটার কোমরে লাথি মারল। হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে গেল। ঠোঁট কাটল। ঠোঁটের রক্তে বুকের উল্কি-করা নারী মূর্তি লাল হয়ে উঠল। কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে পাগল আবার ছোটে। এদিকে ছুটে আসে। যেন বাবুদের দিকেই হঠাৎ সরু মতন একটা রাস্তা

আবিষ্কার করে সে বোঁ করে দৌড় দিয়ে ঢালু বেয়ে খালের ভিতরে নেমে যায়, তারপর জলে ঝাঁপ দেয়। আর দেখা যায় না পাগলকে। ডুব দিয়ে ও কোন্-দিকে গেল, কে জানে। যেন জানার দরকার নেই। ততক্ষণে পুলিশ এসে গেছে। বৃদ্ধের সঙ্গী সেই যুবক হাত নেড়ে পুলিসকে কি বোঝায়। আঙুল দিয়ে পোলের গায়ের অশ্লীল চিত্র দেখায়। 'পাগলা—মাথা খারাপ আছে।' হাতের লাঠি ঠুকে ঠুকে পুলিসটা দাঁত বের করে হাসে আর পোলের গায়ে চিত্র-করা উলঙ্গ নরনারীর মিছিল দেখে। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে পায় না। বাবুরা রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে দশ মিনিটের মধ্যে সব ছবি মুছে দিল। জেলে আর বাগ্দী পাড়ার মানুষেরা কি যেন বলাবলি করতে করতে পোলের ওপারে নেমে গেল। বাবুরা নেমে এলেন শহরের দিকে।

খালপোল আবার শূন্য নীরব। কিন্তু পোলটা আজ আর দুপুরের রোদ-লাগা খালের জল বা জলের ওপর কাঠ বোঝাই বিশাল নৌকোটার মন্থরগতির দিকে তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি আর-একটু-দূরে—খালের এপারের পীচ-ঢালা একটা সরু গলির মুখে নিমগাছের ছায়ায় ঢাকা টিনের ঘরের দিকে। কেননা, নিচু চালের টিনের ঘরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উমেশও নির্নিমেষ চোখে পোলটাকে দেখছে। বলা চলে উমেশের সঙ্গে খালপোলের একটা চোরা দৃষ্টি বিনিময় হল।

উমেশ ঠোঁট টিপে হাসল। কিন্তু পোল হাসে না। গম্ভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। উমেশ অবশ্য তাতে দুঃখ পায় না। জানালা থেকে সরে গিয়ে তক্তপোশের তলা থেকে জংধরা পুরোনো টিনের সুটকেসটা টেনে বার করে।

'বেরোচ্ছ নাকি ?' বৌ শুধোয়।

'হুঁ।' উমেশ উত্তর করে।

'আজ বেচতে পারবে এক-আধটা ?'

'মনে হয়, একটা ভাল বাজার পেয়ে গেছি।' বৌয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে উমেশ হাসে। বৌ চিবুক নাড়ে।

'তা বলে আগেই মেয়েটেয়ের ছবিগুলো বের করো না।'

'না, না,' উমেশ মাথা নাড়ে। 'আগে কালী দুর্গা, বা পরমহংস-টংস যা আঁকা আছে ঝুলিয়ে দেব, তারপর কিছু ল্যাণ্ডস্কেপ, তারপর না-হয়—' চোরা চোখে পোলটা একবার দেখে নিয়ে উমেশ ঢোক গিলল। বৌ ঢোক গিলল। তারপর অস্পষ্ট অস্ফুট গলায় বলল, 'দেখা যাক।'

রোদটা এখনও চড়া। একটু ছায়া, একটু বিকেলের জন্য উমেশ অপেক্ষা করতে থাকে যদিও।

পতঙ্গ

[পলাশের ডাইরী এখানে তুলে দিচ্ছি। কবে কখনও বসে বসে এসব লিখত আমি জানি না। কেন লিখেছিল, কাকে নিয়ে লিখেছিল আপনারা পড়লে বুঝবেন। যখন এই ডাইরী আমার হাতে এসেছে তখন আলীপুর জেলের একটা অন্ধকার সেল্-এ পলাশের দিন কাটছে—বাবা]

'পলাশ, খ্যাখো তো জলটা গরম হয়েছে কি না।'

'হয়েছে বৌদি।' আমি চমকে উঠে মুখ তুলি। তোয়ালে সাবান হাতে রূপা টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ায়। 'কোথাকার মেয়ে ওটা পলাশ, ভারী সুন্দর তো!' আমার মাথার উপর দিয়ে রূপা ঝুঁকে পড়ে জর্নালের ওপর চোখ রাখে।

'পোলিশ মেয়ে।' হাসি। 'পোল্যাণ্ডের সুন্দরী।'

রূপা বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে নতুন জর্নালের পাতা ওল্টায়।

'না আর নেই, ওই একটিই মেয়ে'—অল্প হাসি: 'আর সবটা কাগজ জুড়ে ওদের ইণ্ডাস্ট্রীর খবর, অ্যাগ্রিকালচার, ইরিগেশান আর রিভার ভ্যালী প্রোজেক্টের ইতিবৃত্ত।'

যেন রূপা আমার কথা শুনল না, কি শুনল, ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। আমি তো আর চোখ দেখছিলাম না ওর। শুধু নিশ্বাসের মৃদু শব্দ কানে এল। আর অনুভব করলাম আমার মাথার পেছনে রূপার শরীরের মৃদু চাপ। নরম এবং ঈষৎ উষ্ণ। গলা না বুক না। মনে হল বুক ও তলপেটের মাঝামাঝি একটা অংশ আমার মাথার ওদিকটায় চেপে ধরে রূপা পোলিশ সুন্দরীকে আর একবার মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। তখনই অবশ্য দেখা হয়ে গেল আর তখনই রূপা আমার শরীর থেকে আলগা হয়ে দাঁড়াল। যেন তখন আমি সাহস পেলাম ঘুরে বসতে, চোখ তুলে তাকাতে। ভাল করে রূপাকে দেখি। 'তোমার গরম জল হয়ে গেছে, কেটলির বাজনা শোনা যায়।' হাসি। রূপা হাসে না। মাঝে মাঝে এমন হয় ওর। গম্ভীর ঠিক বলা যায় না বা গভীর কোনো ভাবনায় মগ্ন তা-ও না। ভাবনা ও কথা বলার মাঝামাঝি একটা অবস্থা মনের। আর ঠিক তখনই আমার মনে হয় ওর মন, ওর এই সংক্ষিপ্ত সময়ের চেতনাটুকু একটা

মধুর উষ্ণতার কোমলতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার মনে হল ওর এই চেতনার সঙ্গে শরীরের, এই মুহূর্তে আমি যার স্পর্শ অনুভব করলাম, বুক ও তলপেটের অংশটুকুর আশ্চর্য মিল আছে। রূপার শরীরের মধ্যে দিয়ে আমি ওর চেতনাকে ছুঁয়ে এলাম না?

'কি দেখছ?'

'কিছু না তো!'

গায়ে ব্লাউজ নেই, স্নানের জন্য তৈরী হয়ে আছে ও, সায়ার ওপর কোন রকমে শাড়িটা জড়ানো, আঁচলটা গলা ঘুরিয়ে বুকের উপর নামিয়ে দিয়ে হ্রস্ব আবরণ করা হয়েছে যদিও। আমি ওর অনাবৃত দুটো বাহু ও বুকের সুন্দর পাঁজর দেখছিলাম। মাংসের নীচে স্তিমিত তরঙ্গমালা স্থির হয়ে আছে। জানি না যদি ও পরের ফাল্গুন পর্যন্ত বেঁচে থাকত কি তার পরের ফাল্গুন, কতটা মেদ জমত এই শরীরে, আর সব কটা পাঁজর চোখের আড়াল হত কিনা।

'আমি বাথরুমে যাচ্ছি, কেটলিটা নিয়ে এসো।'

রূপা ঘুরে দাঁড়াল।

আমি ওর অনাবৃত পিঠ দেখলাম। মেরুদাঁড়া। কাঁধ থেকে সায়ার কুঁচি পর্যন্ত বিলম্বিত ঋজু মজবুত রেখা। কি? বুকের পাঁজর দেখে রূপাকে যতটা অসহায় কোমল মনে হয় পিঠ দেখলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। করত না। মনে হত তখন ও ভয়ঙ্কর জেদী শক্ত নিষ্ঠুর আর, আর—হ্যাঁ, অত্যাচারী। অত্যাচারী তো ও ছিলই।

তাই ওর পিঠের ওপর চোখ রেখে আমি একটা ভীরু নিশ্বাস ফেললাম আর তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিজের হাতের নখগুলি দেখেছি।

হ্যাঁ, ফাল্গুনের প্রথম সেটা। ডক্টর চক্রবর্তীর সি আই টি রোডের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের সবুজ মাঠে গোলমোহর ফুলের গাছ থেকে দিনরাত অশ্রান্ত সোনা ঝরছে। কিন্তু সেই সোনা-ঝরা—কোকিলের কূজন-মুখর আশ্চর্য সকাল বিকাল-গুলি আমি ক'বার আর চক্রবর্তীদের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। অথচ দেখার ছিল। শহরের উপান্তে—বাইরেই এক রকম বলা যায়, কলকাতার পূব দিকটা যেখানে ভীষণ ফাঁকা হয়ে গেছে নতুন করে ঘরবাড়ি উঠবে বলে, আর তারই প্রস্তুতি হিসাবে নতুন নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছিল, তেমনি এক নতুন রাস্তার ওপর তিনদিক খোলা নিয়ে নতুন সি আই টি বিল্ডিং-এর এক তিন-কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া করে চক্রবর্তীরা—ডক্টর অঞ্জন চক্রবর্তী আর তাঁর পত্নী রূপা সুখে ছিলেন। রূপার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরেটা চোখ বুলিয়ে নেবার মতন শুধু সুন্দর না,

চোখ জুড়িয়ে দেবার মতন শান্ত পরিচ্ছন্ন অপরূপ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কদিন আমি আর ওদের জানালার বাইরে চোখ রাখতে পারলাম। পারিনি। গোলমোহরের সোনাকে পিতল করে দিয়ে রূপা হাসির মুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছে জানালার এপারে, যখন তখন। জানালার ওপারে ফাল্গুনের দিনগুলি কার জন্য আসতো আমি বলতে পারিনি। অন্তত আমার জন্য তো নয়ই, রূপার জন্যও না। চক্রবর্তীর জন্য ? হয়তো তা-ও না। কেননা যতটা সময় তিনি ঘরে থাকতেন রূপার ভুরুর বাঁক, চিবুকের গোল, চোখের রং, গ্রীবা ও কোমরের মোচড় খাওয়া মোচড় দেওয়াগুলি দেখতেন। আমি লক্ষ্য করেছি। ইতিহাসের নোট লিখতে বসে কলম থামিয়ে, কে জানে, হয়তো অত্যাচারী তৈমুর কি তোঘলকের রক্তক্ষরা কীর্তি কাহিনী কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে চেয়ে অঞ্জন স্থির মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে রূপার পিঠময় ছড়ানো চুলের অরণ্য দেখেছেন, অরণ্য-মর্মর শুনেছেন। আমিও দেখছিলাম, শুনছিলাম। কাজেই বাইরেটা আমাদের কাছে অদৃশ্য ছিল অশ্রুত ছিল। এখন ঠিক তাই হল। অধ্যাপক বাইরে গেছেন। বিষ্যুৎবার তাঁর ক্লাস থাকে না। কোন এক মন্ত্রীর ছেলেকে গিয়ে বাড়িতে পড়াতে হয় সেই দুপুরটা। ছাত্র শিষ্য, যাই বলুন, আমি অঞ্জনের অত্যন্ত প্রিয়। সেই সুবাদে এই ফ্ল্যাটে আমার অবাধ গতি। তা ছাড়া যখন তখন চাইলে একটি ছেলেকে হাতের কাছে পাওয়ার কত সুবিধে চক্রবর্তী যতটা বুঝতেন তার হাজারগুণ বেশি বুঝেছিলেন অধ্যাপক-গিন্নী রূপা। এই তো কিছুক্ষণ আগে আমাকে কলেজ স্ট্রীট গিয়ে রূপার প্রিয় মাসিক ও পাক্ষিক কাগজগুলো, একটা মাথার তেল ও টুকিটাকি আরো কিছু জিনিস কিনে আনতে হয়েছে। এনে সবে আমি পোলিশ ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছি অমনি ফরমায়েশ হ'ল গরম জলের কেটলিটা বাথরুমের দরজায় এগিয়ে দিতে। খুব ভারী একটা কাজ না যদিও। কিন্তু তা হলেও রূপার পিঠ দেখা শেষ করে আমি আমার হাতের নখ দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা কথা চিন্তা করছিলাম। কেননা আমার সতেরো বছরের জীবনে দুমিনিট আগে এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার আঙুলের পাতলা স্বচ্ছ নখগুলি যেন আয়নার কাজ দিচ্ছিল। আয়নার ভিতর আমি আমার মৃতা মার মুখ দেখলাম, ছোট বোন টুনিকে দেখলাম, আর দেখলাম আমাদের দেশের গাঁয়ের সাদাসিধে আটপৌরে চেহারার পোস্টমাস্টার আমার বাবার মুখ। না, আর দুজনকে দেখলাম। যাদের বাড়িতে থেকে আমি কলকাতার কলেজে পড়াশোনা করছি। শ্যামপুকুরের রেশন সপ্-এর মালিক নিবারণ মাইতি অর্থাৎ আমার মামাকে। মামীমার মুখও দেখলাম, মোটা জমির লালপেড়ে শাড়ি পরে তখন সকালবেলা তাড়াহুড়া

করে আমার কলেজের ভাত নামিয়ে দিচ্ছিলেন। আজ আমি কি দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছি? বেগুন-ইলিশের ঝোল আর মসুর ডাল। আমার মনে পড়ল, মনে পড়ছিল এসব কথা," কিন্তু রূপার তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, চিৎকার করছে, 'বা রে! তুমি বসে বসে সুন্দর মেয়েটাকে দেখছ, আমার গরম জলের কি করলে।'

আমি উঠে দাঁড়াই। কেননা রূপা যখন রাগ করে তখন তার দিকে তাকানো যায় না। কী ভীষণ চেহারা করে রাখে আমি এই দু মাসে দেখে রেখেছি। আমার সঙ্গে অবশ্য আজ পর্যন্ত তেমন রাগা-রাগির কারণ ঘটেনি। কিন্তু চক্রবর্তীর সঙ্গে কোঁদল করতে কয়েকবারই দেখেছি। কোনায় ইলেকট্রিক স্টোভটা জ্বলছিল। কেটলি নামিযে স্টোভ নিভিয়ে দিলাম। কেটলি হাতে ঝুলিয়ে আমি মন্থর পায়ে বাথরুমের দিকে এগোই। কি আমার তখন নতুন একটা ভাবনা উপস্থিত হয়েছে। বোধকরি একটু আগের ঘটনাটার জন্য আমি নতুন করে ভয় পাচ্ছিলাম। গরম জলের কেটলি কি বাথরুমের ভিতর পৌঁছে দিতে হবে আমাকে। না দোরগোড়ায় রেখে দিয়ে রূপাকে ডেকে বলব, 'এই নাও তোমার জল, বৌদি।' এবং কেটলিটা সেখানে পৌঁছে দিয়েই কি আমি চলে আসতে পারব? মানে রূপা কি স্নান করতে করতে আর কিছুর ফরমাযেশ করবে না।

'এই নাও তোমার গরম জল।' বাথরুমের দরজার বাইরে ঠুক্ করে কেটলিটা মেঝের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে ডাকলাম, 'বৌদি!'

'ঠিক আছে, নিচ্ছি।' ভিতর থেকে রূপার ঠাণ্ডা গলার স্বর ভেসে এল। নিশ্চিন্ত হলাম। এক পা এক পা করে আমি রূপার শোবার ঘরের সেই টেবিলের কাছে আবার সরে আসি। কিন্তু আশ্চর্য, এসে আমার মনে হ'ল যেন রূপা আমাকে আবার ডাকল। ডাকল কি? কান খাড়া রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। এক সেকেণ্ড দু সেকেণ্ড। আর এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন সির্‌সিরে একটা কান্নার স্রোত বয়ে গেল। কেন এমন হ'ল! কেন এটা হচ্ছে! রূপা আর আমায় ডাকছে না বলে কি। কেননা কান খাড়া রেখে আমি টের পেলাম, না, ক্ষীণতম কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে না রূপার। তবে কি বাথরুমের মধ্যে ঢুকতে পারছি না বলে আমার এই কান্না। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরলাম। আর ভাবলাম ফিরে যাই ওর স্নানের ঘরের দরজার কাছে। গিয়ে ডাকি—'বৌদি, তোমার আর কিছুর দরকার হবে?'

কিন্তু এটা উচিত হবে না হয়তো। হয়তো রূপা রাগ করবে না। কিন্তু যদি তেমনি দরজা বন্ধ রেখে ভিতর থেকে ও উত্তর করে, না আর কিছু লাগবে না।

তবে কি আমার আরো বেশি কান্না পাবে না। চেয়ারে বসে পড়লাম। গালে হাত ঠেকিয়ে অঞ্জন চক্রবর্তীর ফ্ল্যাটের বাইরে রাস্তার ওপারের গোলমোহর ফুলের গাছটা দেখি। কিন্তু ফুলের সেই সোনা-রং কই! আমার মনে হ'ল যেন সব ফুল সিটিয়ে কালো হয়ে আছে। একটু হাসলাম। বসন্তের আগুন-ঝরা দুপুরে গোলমোহর হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে ওঠার কারণ বুঝতে বাকি রইল না। রূপার হাসি ফুলের সোনা-রংকে আমার চোখে পিতল বানিয়ে রাখে। এখন ওর অনুপস্থিতি—আমার ও ওর মধ্যে বাথরুমের ছিটকিনি তোলা বন্ধ দরজাটা যখন ব্যবধান রচনা করে আছে সেই সময়টায় পৃথিবীর সব রঙীন ফুলই এমন কালো হয়ে উঠবে। রাগ হ'ল, দুঃখ হ'ল, আক্রোশ হ'ল। চেয়ারের পিছনে মাথাটা এলিয়ে দিলাম। যেন আমার পিছনে রূপা দাঁড়িয়ে যেন আমার মাথার পিছনটা আবার ও চেপে ধরেছে। ওর শরীরের কোমল উষ্ণতা আমার মগজের মধ্যে ঢুকছে, আমার রক্তের মধ্যে। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। শরীরটা ঝিমঝিম করছিল। এমন আর কোনোদিন হয়নি। এই দুমাসের ভিতর। একটু আগে যা হয়ে গেল।

তাই সেদিন স্নান সেরে ও যখন আবার ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়ায় আমি কটমট করে তাকিয়ে দেখছিলাম ওর চিবুক গলা বুক কোমর। গোলমোহর ফুলের রঙের একটা সায়া পরনে। ভাঁজ করা সাদা তোয়ালেটা বুকের ওপর রাখা। আর কোনো আবরণ নেই। আবার ওর বুকের দু পাশের কুড়ি বছরের পুরোনো (দুজনের বয়স নিয়ে চক্রবর্তী আর রূপা একদিন হিসাব করছিল বলে রূপার বয়স জেনে ফেলেছিলাম, হাঁ, কুড়ি ওর আর চক্রবর্তীর বত্রিশ) পাঁজর কটা চোখে পড়ল। আর সায়ার কুঁচির ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে থাকা বেলফুলের কুঁড়ির আকৃতির ছোট নাভিটা। কি, আমার কেমন ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল নখ দিয়ে ওর নাভিটা খুঁটে দিই। তা হলে বুঝি অনেকগুলি পাপড়ি ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বে। বেলফুলের কুঁড়ির ভিতরের অগুনতি কচি কচি পাপড়ির মতো।

'এমন অসভ্যের মতো তাকিয়ে আছ যে!'

রূপার ধমক খেয়ে আমি চোখ নামিয়ে নিজের আঙুলের নখ দেখি। ধমক দিয়ে রূপা তৎক্ষণাৎ হাসছে তা-ও কানে এল। হাসছে আর ব্র্যাকেটের সামনে দাঁড়িয়ে কোঁচানো শাড়িগুলি দেখছে। যেন ঠিক করতে পারছে না কোন্‌টা পরবে—কোন্ শাড়িতে এই বসন্তের দুপুরে ওকে মানাবে।

তারপর বুঝি একটা পছন্দ করে ও গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে।

তখন আমি চোখ তুলতে পারলাম।

টকটকে লাল শাড়ি আর আকাশ রং ব্লাউজ।

'রাগ করলে নাকি?'

'না তো।' হাসলাম।

রূপা হাসল।

দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্প করলাম।

কিন্তু তেমন যেন জমল না। যেমন অন্য এক একটা দুপুরে জমত। সেদিন বিকেল হবার আগে চক্রবর্তীর ফ্ল্যাট থেকে আমি বেবিয়ে সোজা বাড়ি চলে গেছি। যেন আমার একটা কিছু অসুখ করেছে মনে হ'ল। রাত্রে আলোর সামনে বই নিয়ে বসলাম। পড়া হয়নি। আমি চুপ করে তাকিয়ে আমার হাতের নখগুলি দেখছিলাম। আর প্রত্যেকটা নখের আয়নায় একটি, শুধু একজনের মুখই দেখতে পেলাম। রূপার। বাবার না টুনির না মার না। এমন কি চক্রবর্তীর মুখও না।

মামী খেতে ডাকল। মাথা ধরেছে বলে খেতে গেলাম না। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমার শবীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। যেন আমার শরীরটা একটা গরম কেটলি। তখন রূপার স্টোভের ওপর চাপানো কেটলির জল যেমন ফুটছিল আমার চামড়ার নিচের রক্তও সেভাবে শব্দ করে ফুটছিল। কপালের ওপর হাত রাখলাম, বুকের ওপর হাত রাখলাম। বুক থেকে হাত সরিয়ে নাভির কাছে নিয়ে গেলাম। আমি পায়জামা পরে শুই। পায়জামার ফিতেটা ঢিলে করে দিয়ে নাভিটাকে ধরতে পেলাম। নাভিটা নখ দিয়ে খুঁটতে আরম্ভ করলাম। একটু সময় নাভি খুঁটে হাতটা তলপেটের ওপর রাখলাম। তলপেটটাও গরম হয়ে আছে। হাতের তেলো দিয়ে নিজের পেটের গরম অনুভব করে পরে হাতটা দুই উরুর ভিতর গুঁজে দিয়ে আমি মরার মতো পড়ে রইলাম।

পরদিন। সেই দুপুর। স্টোভের ওপর বসানো কেটলির জল শব্দ করছে। চক্রবর্তী কলেজে গেছে। আমি কলেজ কামাই করলাম।

'কি হয়েছে?'

'জ্বর।'

রূপা হাতের পিঠ দিয়ে আমার কপাল ছুঁয়ে দেখল। ওর পিঠময় ছড়ানো চুল। চুলে তেল দিচ্ছিল রূপা। তেলের সুগন্ধ হাতে লেগে আছে। যখন ও আমার কপালে হাত রাখল গন্ধটা নাকে লাগল। কিন্তু তেলের চমৎকার গন্ধে আমি ততটা অভিভূত হইনি যতটা হলাম ওর নিশ্বাসের গন্ধে। বস্তুত হাত দিয়ে কপাল পরীক্ষা করতে এত কাছে ও মুখ সরিয়ে এনেছিল যে ওর নিশ্বাসের ঝলক আমার চোখে মুখে ঠোঁটে এসে লাগল। সব মানুষের নিশ্বাস এমন মদির গন্ধ ছড়াতে পারে কিনা চিন্তা করছিলাম। হাত সরিয়ে নিয়ে রূপা আবার চুলে তেল ঘষছে। বাঁ হাতে তেলের শিশি। আমি ওর ডান হাত দেখছি, সুন্দর আঙুল,

সুঠাম কনুই। আঙুল নড়ছে, কনুই থরথর কাঁপছে। মসৃণ নিরাবরণ হাতটাকে মনে হচ্ছিল রাজহাঁসের গলা। আর হাঁসের গলার মতো হাতের তলায় ওর ছোট্ট বগলটাকে মনে হচ্ছিল হাঁসের মুখ, মুখের ছোট্ট লালচে গর্ত। হাঁস হাঁ করে আছে। চট করে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম।

'কি খেয়েছ ?'

'পাঁউরুটি।'

'ও এমনি একটু গা গরম—থাকবে না।'

রূপা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের শিশি দেয়ালের তাকের ওপর তুলে রাখে। আমি কেটলির অবস্থা দেখি।

'জল গরম হলে আমি ডাকব।'

'আচ্ছা।' রূপার দিকে না তাকিয়ে আমি ঘাড় নাড়ি।

তোয়ালে সাবান হাতে নিয়ে আর একটু সময় দাঁড়িয়ে রূপা কি যেন ভাবে। আমি ওর পায়ের নখ দেখি। যেন শখ করে কাল আলতা পরেছিল। রূপা তো আলতা পরে না। কিন্তু সেকথা নয়—কাল কখন পরল। বিকেলে। ভাবলাম বিকেল হবার আগে আমি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

আশ্চর্য, রূপার এই সাধারণ প্রসাধনটুকু কাল আমার অবর্তমানে হ'ল বলে হঠাৎ আমার মন খারাপ হয়ে গেল। একটু ঈর্ষা হ'ল। কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা আমার পক্ষে এখন শোভন হবে কি ? ভাবলাম। যদি ও বলে বসে, কেন তুমি বিকেল অবধি রইলে না ? ছটফট করে হঠাৎ কেন বেরিয়ে গেলে ? তখন কি জবাব দেব ? চিন্তা করে চুপ রইলাম।

রূপা হেলে দুলে বাথরুমের দিকে এগোয়।

আমি ওর আলতার ছোপ লাগা গোড়ালি দুটো দেখি। দেখছিলাম। ঠিক এমন সময় ও দাঁড়িয়ে পড়লো। আমার দৃষ্টি স্থানচ্যুত হ'ল। চোখ তুলে দেখলাম চক্রবর্তী দরজায় দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতে দুটো বই, ডান হাত দিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে পর্দাটা তখনো ধরে আছে।

আমায় দেখছিল না চক্রবর্তী, রূপাকে দেখছে।

'হঠাৎ ?' ঠোঁট ছড়িয়ে রূপা হাসে।

চক্রবর্তী গম্ভীর। পর্দা ছেড়ে দিয়ে ভিতরে ঢোকে। হাতের বই টেবিলে রাখে। রূপা এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে আছে। একটা অবাক হাসি ওর ঠোঁটে, অস্বস্তিকর কৌতূহল ওর চোখে। আমি এক সঙ্গে অঞ্জন চক্রবর্তী ও রূপাদেবীকে দেখলাম।

চক্রবর্তী ঘাড় ফেরায়।

'পলাশ কতক্ষণ ?'

'এই তো।'

'কলেজে যাওনি ?'

'শরীর খারাপ।'

'না, শরীর খারাপ থাকলে যাবে না।'

চুপ করে কি ভাবল চক্রবর্তী। জানালার বাইরে গোলমোহর গাছ দেখল। তারপর আবার ঘাড় ফিরিয়ে রূপাকে দেখল। চক্রবর্তীর ভুরু কুঁচকে আছে লক্ষ্য করলাম।

'কাল বিকেলে নিশীথ এসেছিল ?'

'কই না তো।'

রূপার চোখমুখ লাল।

চক্রবর্তীর মুখ কালো।

আমার মতো নিশীথও চক্রবর্তীর ছাত্র। আমার ফার্স্ট ইয়ার, নিশীথের ফোর্থ ইয়ার। অনেকদিন ওকে এই ফ্ল্যাটে দেখছি। আজকাল আর দেখি না যদিও।

'কিন্তু আমি ইনফরমেশান পেলাম কাল নিশীথ এসেছিল।' চক্রবর্তী রূপার আপাদমস্তক দেখছিল। চক্রবর্তীর কালো মুখ কুটিল হয়ে গেছে।

রূপার দৃষ্টি স্থির, অপলক।

'আমি মিথ্যা বলছি ?'

'আমি মিথ্যা বলছি ?'

চক্রবর্তী এবার সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ায়।

রূপা চোখ নামায়।

'ও আসেনি—ও আর আসে না।'

চক্রবর্তী হঠাৎ আর কিছু বলল না। আবার টেবিলের দিকে ঘুরে গেছে। যেন হাত বাড়িয়ে আর একটা বই খোঁজে। খোঁজা অসমাপ্ত থেকে যায়। কেন না রূপা তখন বাথরুমের দিকে এগোয়। চক্রবর্তী সেদিকে ঘাড় ফিরায়।

'নিশীথ যেন কোনদিন এখানে না আসে।'

'না আসবে না।' বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর চক্রবর্তী যেন একটু স্বাভাবিক হয়। আমাকে দেখে। 'কতক্ষণ আছ ?'

'এই কিছুক্ষণ।' মাথা চুলকাই। চক্রবর্তীর দিকে সাময়িক তাকাতে ভয় করছিল।

'আচ্ছা, আমি আবার একটু বেরোচ্ছি—থেকো তুমি।'

ঘাড় কাত করলাম। ক্ষিপ্র চঞ্চল হাতে পর্দা সরিয়ে চক্রবর্তী বেরিয়ে গেল। কান খাড়া রাখলাম। সিঁড়ির জুতোর শব্দ ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

'পলাশ!'

'কি—যাচ্ছি।'

বাথরুমের রুদ্ধ কপাটের ওপর চোখ রেখে রূপার ডাকে সাড়া দিলাম। গলার ভিতরটা কেমন তেতো তেতো লাগছিল। যেন আমার তখন মনে হচ্ছিল বাইরেটাই সুন্দর। জানালার ওপারে সোনালী দুপুর ফাল্গুনের মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে। ঝুরঝুর করে গোলমোহরের সোনা ঝরছে।

'আশ্চর্য ছেলে তুমি!'

চমকে চোখ তুলে তাকাই।

রূপা দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দুহাতে চোখ ঢাকব কি? কিন্তু কী ক্ষমতা ছিল আমার!

'এসো, কেটলিটা নিয়ে এসো!' উত্তপ্ত অসহিষ্ণু কণ্ঠে রূপা ডাকছিল। আর, যেন এক সেকেণ্ডের জন্যও অন্যদিকে চোখ সরালে আমার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে যাবে, তেমনি অপলক অবাক চোখে ওকে দেখতে দেখতে কেমন করে জানি পিছনে হটে গিয়ে অনেকটা আন্দাজ করে স্টোভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কেটলিটা তুলে নিলাম।

'এসো, এসো!'

ও আমায় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। হাত ধরে টেনে বাথরুমের ভিতর নিয়ে গেল। তারপর দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। আমি কাঁপছিলাম ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। 'এসো এসো!' মুখে শব্দ ছিল না আর, ওর জলভরা দুই চোখে, নগ্ন নিষ্কম্প দেহে সেই আমন্ত্রণ লেখা ছিল। আমার মাথাটা ওর বুকের মধ্যে টেনে নিল রূপা।

'কাঁদছ?' ফিসফিসিয়ে উঠলাম। 'দুঃখ হয়েছে চক্রবর্তীর কথায়?'

রূপা মাথা নাড়ল।

'দুঃখে নয়। কাঁদছি আক্রোশে, ঘৃণায়।' পাখির মত লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো মুহূর্তকাল আমার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে ও পরে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে কেমন করে জানি হাসল: 'আর কাঁদছি অসহ্য সুখে।'

কেন জানি ট্যাপটা খুলে রেখেছিল ও। জলের মনে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তার একটানা শব্দ শুনলাম। কোনায় রাখা কেটলির গরম জল এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিছু কাজে লাগল না সেটা। কতক্ষণ দুজন বাথরুমের ঠাণ্ডা সিমেন্টের

ওপর শুয়েছিলাম খেয়াল ছিল না। রূপা এক সময় উঠে বসল। আমিও বসলাম।

'বাড়ি যাবে ?' বলছিল ও।

'হ্যাঁ', আমি হামাগুড়ি দিয়ে ট্যাপের নিচে গিয়ে আঁজলা করে জল খেলাম। ও আমার মুখ মুছে দিল। লক্ষ্য করলাম গোলমোহর রঙের সায়ার একটা কোনা তুলে তাই দিয়ে আমার মুখ মুছে দিল।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

'কাল দুপুরে এসো।' গলা বাড়িয়ে দিয়ে বলছিল ও।

কথা না কয়ে আমি শুধু ঘাড় কাত করেছি।

কিন্তু তখনি বাড়ি যাওয়া আমার হ'ল না। কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। গনগনে রৌদ্রে পৃথিবী ভরে আছে। সি-আই-টি-র নতুন রাস্তার পিচ আগুন হয়ে গেছে। গোলমোহর ফুলের গাছ পার হয়ে গেলাম। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। আমার পাশ কেটে পাথরের খোয়া ভর্তি একটা ট্রাক ছুটে গেল।

একটা ছোট চায়ের দোকান চোখে পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা দুআনি পেলাম। কাজেই দোকানে ঢুকতে বাধা রইল না।

হ্যাঁ, শুধু এক কাপ চা নিয়ে আমি কতক্ষণ একটা দোকানে বসে কাটাতে পারি যেন তার পরীক্ষা করতে লাগলাম। আর একলা এক কোনায় বসে আমি কী ভাবছিলাম, কাকে ভাবছিলাম তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারছেন।

দোকান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন ধিকিধিকি বেলা। ছায়া লম্বা হয়ে গেছে পাখি উড়ছে। রঙীন প্রজাপতি চোখে পড়ল, লাল টুকটুকে এক ঝাঁক ফড়িং দেখলাম মাঠের ঘাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামছে। এক পা এক পা করে গোলমোহরের গাছের তলা দিয়ে আবার সেই ফ্ল্যাটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমার নিয়তি যেন আমাকে আবার সেখানে টেনে নিয়ে গেল।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, 'না, এখন আর না। হয়তো চক্রবর্তী ফিরে এসেছে। হয়তো আবার তাদের সেই রাগারাগি চলছে। কী হবে এখন আবার সেই তিক্তকর পরিবেশের মধ্যে গিয়ে।'

ভাবলাম, অথচ সিঁড়ি ভেঙে ওপরেও উঠতে লাগলাম। ওদের দরজার চৌকাঠের কাছে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়াই। আমি পরিষ্কার শুনলাম রূপার গরম জলের কেটলি যেন আবার স্টোভে চাপানো হয়েছে, জল ফুটছে, ঢাকনাটা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। এই অবেলায় চান! ভাবলাম, ভেবে জামার হাত দিয়ে কপালের

ঘাম মুছতে গিয়ে হাতটা কেমন অনড় হয়ে গেল টের পেলাম, হাত আর উঠল না। রূপার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কানে এল।

'জল গরম হয়েছে, নিশীথ ?'

'হয়েছে।'

'কেটলিটা তুলে নিয়ে এসো।' রূপা বলল। আমার কানে ওই শেষ কণ্ঠস্বর বেজে রইল রূপার। তারপর আর তার গলা আমি কোনদিন শুনিনি।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—প্রায় কুড়ি মিনিট আমি চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর এক সময় নিশীথ আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে নীচে নেমে গেল। আমায় ও দেখেনি। আমায় ও দেখতে না পায় এভাবেই দেয়ালের অন্ধকার কোনার সঙ্গে মিশে থেকে নিশ্বাস বন্ধ করে ছিলাম। নিশীথ নেমে গেল আর আমিও চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। যেন তখনও বাথরুমের কাজ সারা হয়নি রূপার। যেন মন দিয়ে ও কি কাচছে। থুপথুপ শব্দ হচ্ছে। কাঁচুলি, ব্লাউজ, সায়া ? কী অত মনোযোগ দিয়ে ধোয়া হচ্ছে ? ভেবে নিজের মনে একটু হাসলাম। কিন্তু হেসে চুপ থাকলে আমার চলত কি ? আমার মাথার ভিতর তখন দপ্ দপ্ করে আগুন জ্বলছিল। রুদ্ধশ্বাস হয়ে আমি চক্রবর্তীর ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা কিছু খুঁজছিলাম। পেয়ে গেলাম। দেয়ালের তাকের ওপর পেয়ালা পিরিচের পাশে শুইয়ে রাখা পাঁউরুটি কাটা চওড়া ফলকের চকচকে ছুরিটা চোখ পড়তে হাত বাড়িয়ে টেনে নিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে রূপা বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও স্যুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিলাম। তখন অন্ধকার গেছে, আলো না জ্বাললে সায়ার কুঁচির ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে থাকা রূপার বেলফুলের কুঁড়ির মতো নিটোল ছোট্ট নাভিটা আমি দেখতে পেতাম না যে।

আশ্চর্য, একটা শব্দ করেনি ও ! কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল ও শেষ পর্যন্ত।

আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে নামছি তখন চক্রবর্তী উঠে আসছে। হয়তো ওঠার সময় চক্রবর্তী প্যাসেজের আলো জ্বেলে দিয়েছিল। তাই আমার জামার হাতায় রক্ত দেখতে পেয়ে অধ্যাপক বিড়বিড় করে উঠল, 'কি হ'ল ?'

খুব বেশি চমকে উঠেছিল কি অঞ্জন চক্রবর্তী ? ওঠেনি। তাই আমিও সহজ গলায় হেসে বলতে পেরেছিলাম, 'বৌদি মুর্গী খাবে, একটা মুর্গী কেটে দিয়ে এলাম।' বলা শেষ করে হন্‌হন্ করে নীচে নেমে এসে আমি শ্যামপুকুরের রাস্তা ধরতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলাম।

রেবার মুখ কালো হয়ে গেল।

মেয়েটার গলার শব্দ শুনতে রেবার ইচ্ছা হল আজই যদি সে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু তা তো আর হয় না। অনেক খোঁজাখুঁজি হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে এই বাড়ী যোগাড করতে। কিন্তু কে জানে উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে তার জন্যে এক শত্রু বাস করছে। শত্রু ছাড়া কি! মেয়েটাকে দেখলেই রেবার কেমন গা জ্বলতে থাকে।

না, রেবার চেয়ে ওর গায়ের রং অনেক বেশি ফরসা, নাকটা উঁচু, দেখতে লম্বা, চোখ ত্নটো বড এবং ভুরু ত্নটো টান টান বলে যে রেবা ওকে ঈর্ষা করে সে একটা কথাই নয়। ঢের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ইস্কুলে বন্ধুত্ব করে এসেছে রেবা।' কৈ, ওদের দেখলে ওদের সঙ্গে কথা বললে কখনও তো রেবার মনে ঈর্ষা হিংসা জাগত না।

আসলে এই মেয়েটাকে, উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের জলধর বাবুর মেজো মেয়ে কুন্দকে ভাল না বাসার, ওকে ভাল না লাগার সবচেযে বড কারণ হল মেয়েটা ভীষণ বাজে বকে। যতক্ষণ এ-ঘরে থাকবে রেবাকে জ্বালাতন করে মারবে। এই প্রশ্ন সেই প্রশ্ন। এক এক সময় এমন সব আলোচনায রেবাকে ও টেনে নিতে চায় যে রেবার ইচ্ছা করে মেয়েটাকে তখনি ঘাড ধরে বার করে দেয়।

কিন্তু, রেবা নিজেও অবাক হয়, তা সে পারে না কেন! ঘাড ধরে ঘর থেকে বার করে দেবে দূরে থাক, একদিন, আজ এই এক বছরের মধ্যে রেবা বেশ কডা করে একটা কথাও তো ওকে বলতে পারল না। যেন ও সামনে এসে দাঁডালে রেবা কেমন হয়ে যায়, ওর রসালো ঠাট্টা ইয়ার্কি মজাদার সব গল্প রেবা অদ্ভুত মনোযোগ সহকারে শুনে যায়, সহ্য করে, এমন কি হেসে পর্যন্ত একটা ত্নটো কথার উত্তর দেয়, একটা ত্নটো কথা নিজে থেকে যোগ করে।

কাজেই কুন্দ প্রশ্রয় পায়, দিন দিন ওর ঠাট্টা ইয়ার্কি মজাদার গল্পের পরিমাণ পরিধি বেড়ে চলেছে। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর ওর সুন্দর মুখ শরীর চাউনী এমনকি ভ্রূভঙ্গিটা পর্যন্ত রেবার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ? তারপর একটা কথা মনে পডতে রাগে বিতৃষ্ণায় বিদ্বেষে রেবার চুল থেকে পায়ের

নখ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিছুতেই সে ক্ষমা করতে পারে না জলধর বাবুর মেজো মেয়েকে। কেন পারবে? পারা উচিত নয়। রেবা কেন, কোন বিবাহিতা মেয়ের উচিত না ওর সঙ্গে মেশা, ওকে প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু উপায় কি, রেবা তো একদিনও ওকে ডাকে না। ও নিজে থেকে আসে। একবার না। দিনের মধ্যে হাজারবার।

রেবার নতুন বিয়ে হয়েছে। ছেলেপুলে হয়নি। স্বামী আর ওর ছোট্ট ছিমছাম সংসার। কাজ কম। ঘরে তৃতীয় আর একটি মানুষ নেই যে তার সঙ্গে একটা দুটো কথা বলবে রেবা। স্বামী কলেজে পড়াতে চলে গেলে সারাদিনের জন্য ওর অবসর। আর সেই অবসরের সুযোগ নিতে দরজায় এসে দর্শন দেয় রূপসী কুন্দ। 'বৌ কি হচ্ছে, বর বুঝি চলে গেল? আমি দেখলাম তোমার বর বাস ধরতে লাইটপোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। বোধ করি বাস আসতে দেরি দেখে হাতের বইটা খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, মাইরি। ওদিক থেকে যে একটা ষাঁড় শিং বাগিয়ে আসছিল তার কি খেয়াল ছিল পণ্ডিত মানুষটার! ভাগ্যিস চিনেবাদামওয়ালাটা চিৎকার করে উঠল। দ্যাখো ভাই কি কাণ্ড।'

ভয়ে বিস্ময়ে রেবার চোখ বড় হয়ে উঠে। রুদ্ধশ্বাস হয়ে এক মিনিটেরও বেশি সময় কুন্দকে দেখে কুন্দর কথা শোনে। তারপর প্রশ্ন করে, 'ওঁকে কিছু করতে পারেনি তো ষাঁড়টা, ও সরে যেতে পেরেছিল তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' এবার কুন্দ মুখ টিপে হাসে। 'ষাঁড় ওঁকে কিছু করতে পারল না, কিন্তু তিনি, তোমার পণ্ডিত মানুষটি চিনেবাদামওয়ালার টিনের কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। ফলে দুটো টাকা দণ্ড। অবিশ্যি ষাঁড়ের ভয়ে ছুটতে গিয়েই এমনটা হ'ল।'

এবার রেবা ঠোঁট টিপে হাসে।

'কখন হ'ল এমন কাণ্ড?'

'এই তো, এই মাত্তর! আমাদের জানালা থেকে ওধারের সবটা রাস্তা তো দেখা যায়, আমি বাবার চানের জল তুলে দিয়ে সবে গিয়ে দাঁড়িয়েছি একটু জানালায়। দেখলাম তোমার বিদ্বান লোকটি ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থেকে চমৎকার বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে আছেন, তারপর, তখনই তো এই কাণ্ড, হি হি হি।'

এবার আর রেবা হাসল না।

কিন্তু তাতে কি আর সেই মেয়ে মুখ বুজে থাকে।

'হ্যাঁ ভাই, রাত্তিরে মানুষটাকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিও। বাইরে রাস্তায় ঘাটে ও এমন বইয়ের ভেতর চোখ মুখ গুঁজে রাখলে কোনদিন না গাড়ী চাপা পড়বে। বলবে তুমি আমার দু চোখের মণি, আমার

মণি যদি গাড়ি চাপা পড়ে কেটে থেতলে যায় তো আমি চিরজীবনের জন্য অন্ধ হয়ে যাব। বলবে, বলতে পারবে না ?'

রেবা আবার হাসে। কিন্তু কথা বলে না।

'ওকি হাসছ যে কেবল,'—কুন্দ এবার থুতনি ধরে নাড়া দেয়, 'কি বলতে পারবে না আমি যেমনটি শিখিয়ে দিলাম ? পারবে না ? সত্যি পারবে না ? আমার গায়ে হাত রেখে বলো পারবে কি না ?'

'না, পারব না। তেমনটি, তেমন করে বলা যায় নাকি ?' রেবা এবার কথা বলল, 'তুমি তোমার বরকে বলো ভাই। আমি অত আহ্লাদ দেখাতে পারিনে।' শুনে কুন্দ হঠাৎ চুপ করে যায়। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কি একটু ভাবে। রেবা লক্ষ্য করে মেয়েটার কপালে ছোট্ট রেখা জেগেছে। দেখতে দেখতে রেখা মিলিয়ে যায়। পরমুহূর্তে কুন্দর মুখ চোখ হাসির আভায় ঝলসে ওঠে। 'হ্যাঁ ভাই, এমন সুন্দর করে খোঁপা বেঁধেছ। রাত্রে খোঁপা ঠিক থাকে ?'

'কখন ?' রেবা চমকে ওঠে। 'কেন থাকবে না।'

এবার কুন্দ মুখে আঁচল চাপা দেয়। কিন্তু তাতে হাসি বারণ মানে না। হাসতে হাসতে ও বসে পড়ে। মেঝেয় দেয়ালে গড়াগড়ি যায়।

'আমি ঠিক বলতে পারি, রাত্রে কক্ষনো মেয়েদের খোঁপা ঠিক থাকতে পারে না, ভেঙ্গে যায় খুলে যায় হি হি হি।'

রেবা একটু আগে পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে। ভোমরার চাকের মতন বিশাল সুন্দর খোঁপা করেছে একখানা। সেই খোঁপা হাত দিয়ে ছুঁয়ে রেবা জলধরবাবুর মেয়ের হাস্য বিচ্ছুরিত ঘাম চকচকে লাল মুখখানার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আর ভাবে রাত্রে খোঁপা ঠিক থাকবে না কেন ! ভাবতে ভাবতে এক সময় কি মনে হতে রেবার মুখখানাও লাল হয়ে ওঠে। এবার ও অন্যদিকে তাকাতে চেষ্টা করে। 'কেমন ঠিক কিনা,—আমার কথা,—ও কি, এদিকে তাকাও বৌ—'কুন্দ চেঁচায়। কিন্তু রেবা কাজের ছুতো করে টেবিলের কাছে সরে যায়। এটা ওটা গুছায়। আর মনে মনে ভাবে, কী নির্লজ্জ মেয়েটা, কেমন সব আলোচনা নিয়ে মেতে থাকতে ভালবাসে।

সেদিন ঘর থেকে ও বেরিয়ে যাবার পর রেবা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর ওকে এঘরে ঢুকতে দেবে না। মনে মনে বলেছিল, সত্যি মেয়েটা বাজে টাইপ। এবং পরক্ষণেই আর একটা কথা মনে পড়ে রাগে বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সত্যি তো ওকে এখানে আসতে দেওয়া রেবার অনুচিত। এসব মেয়ে যে-কোন সময় আগুন জ্বালাতে পারে, সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। না না—রেবার মনে পড়ে যায় পাশের ফ্ল্যাটের ঝি মিনার মা'র

মুখে কুন্দ সম্পর্কে যে কাহিনী সে এখানে এসেই শুনেছিল। ছি ছি! এই মেয়ের জীবনে এমন এক কলঙ্কের ইতিহাস লুকানো রয়েছে, আর রেবা কিনা ওর সঙ্গে, কেবল কথা না, এমন সব আলোচনায় যোগ দিচ্ছে, অথবা যোগ দিতে পা বাড়িয়েছে,—না আর একদিন না, কখনো না, আসুক, আর একবার এই দরজায় এসে উঁকি দিলে রেবা ওর মুখে থুথু ছিটিয়ে যদি না দেয়—

এত সব মনে মনে ঠিক করে রাখে রেবা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মনের কঠোর প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যায়।

'হ্যা ভাই, বৌ, ওকি এখনি উনুনে আঁচ—ও বুঝতে পারি, বুঝতে পারলাম। ছুটিতে বুঝি সিনেমায় যাওয়া হবে, রাত্তিরের শো?'

ধোঁয়া থেকে মুখ সরিয়ে এনে রেবা কুন্দর মুখের দিকে তাকায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তার বুক ধক্ করে ওঠে। কখন এসে পা টিপে ও রেবার পিছনে দাঁড়িয়েছে টের পেল না।

'অত সকাল সকাল রান্না—?'

'এমনি।' রেবা আবার উনুনের দিকে মুখ ফেরায়।

'আমি ভাবলাম সিনেমায় যাচ্ছ বুঝি—' কুন্দ মেঝের ওপর রেবার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। রেবা গম্ভীর হয়ে বলল, 'ও সিনেমা দেখে না, আমারও সিনেমা ভাল লাগে না।'

'তবে?' প্রশ্ন করতে করতে কুন্দ থেমে যায়। একটু ভেবে নিয়ে পরে বলল, 'ও এখন বুঝেছি, এখন বুঝেছি হি হি—'

'হাসছ বড়?' রেবা আবার মুখ ফেরায়।

কুন্দ মুখে আঁচল চাপা দেয়।

'কি হল?' কথাটা জানতে পারছে না বলে রেবা ছটফট করে। 'সকালে উনুনে আগুন দিলাম আর অমনি তোমার বুকে হাসির তুফান জাগল। শুনি না?'

'না ভাই, বললে তুমি রাগ করবে।'

'না না, রাগ করব কেন, কি ভাবছ?'

'এখন বুঝেছি হি হি।' হাসিটা এবার ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের রূপসী কুন্দ দুলতে থাকে কাঁপতে থাকে। দেয়ালের গায়ে পিঠ ছেড়ে দিয়ে শরীর সোজা রাখে। না হলে হাসির ধমকে আবার ও মেঝেয় গড়িয়ে পড়বে।

রেবা ভেবেই ঠিক করতে পারে না কোন্ কথা ওর বুকে রসের ফোয়ারা ছুটিয়েছে হাসির ঢেউ জাগিয়েছে। রেবা ছটফট করে। 'কি ভাই, কথা না কয়ে কেবল হাসছ?'

'হুঁ, ছোট রাত।' কুন্দ একটুখানি বলল।

রেবা বলল, 'হ্যাঁ, রাত ছোট, আষাঢ় মাস—'

কুন্দ বলল, 'বাতি নিভতে না নিভতে রাত ফরসা—কাক ডেকে উঠল।'

'সত্যি ভাই, চোখের ঘুম আর সরে না—এত ছোট রাত, সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না।'

'হি-হি-হি, সেই তো বলছি, সন্ধ্যাবাতি জ্বলতে খেয়েদেয়ে বিছানায় চলে যাও, তবু দু'ঘণ্টা হাতে পাওয়া যাবে, তাই না বেলাবেলি রান্নাবান্না শেষ।'

রেবা চুপ করে রইল।

'তাই কলে জল না আসতে উনুনে আগুন—হি হি হি—তাই বলছিলাম, মনে কি আর অন্য কিছু আছে, সিনেমা তো ছেলে ভুলানো ছড়া, এসময় সিনেমা সার্কাস কেউ দেখে? এখন কোনরকমে এদিকের কাজ মিটিয়ে ঘরের আলো নেভানো, তারপর বিছানায় ঢোকা, হি হি হি।'

রেবার দুকান এখন লাল হয়ে উঠল।

'কথা বলছ না কেন ভাই? আমার দিকে তাকাও,' কুন্দ রেবার পিঠে খোঁচা দেয়। 'মনের কথা বলে দিলাম কিনা?'

রেবার একবার ইচ্ছা হল বলে, 'তোমার কি এসব কথা ছাড়া আর কথা নেই মেয়ে?' কিন্তু বলতে পারল না। মিনার মা'র মুখে শোনা কথাটাই তার আজ বার বার মনে পড়ছিল। একবার ইচ্ছা হল জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ ভাই, বাপের বাড়ি আর কদিন কাটাবে—'; কিন্তু চিরকাল কাটাতে হবে এটা রেবার চেয়ে ও বেশি জানে, মনে হতে রেবা মুখ দিয়ে কথাটা বার করতে পারল না। মেয়েটার আপাদমস্তক করুণার দৃষ্টি বুলিয়ে রেবা নিজের কাজে মন দেয়।

'বৌ, শোন একটা কথা?'

'কি কথা?' রেবা ওর দিকে তাকায়।

'আমার কাছে এসো।'

'ওখান থেকে বলো, আমি শুনব।'

'না, কানে কানে বলতে হবে।' কুন্দ এবার শব্দ না করে হাসে। 'শুনলে তুমি অবাক হবে আকাশ থেকে পড়বে।'

—কৌতূহল মেয়েদের মজ্জাগত। রেবা ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। কুন্দ ওর কানের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে কথাটা বলে। শুনে রেবা সত্যি আকাশ থেকে পড়ল,—কথাটার জন্যে নয়, এমন কথা ও মুখ দিয়ে বার করল কি করে! ছি ছি ছি! লজ্জায় ঘৃণায় রেবার মরে যেতে ইচ্ছা হল। বোধ করি আজ এই প্রথম ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'তুমি আর আমার ঘরে এসো না ভাই, আমি পায়ে ধরে বলছি। আমি তোমার মতন মেয়ে নই, আমার রুচি

অন্যরকম।'

এবার কুন্দ আকাশ থেকে পড়ল।

কেননা পৃথিবীতে একমাত্র এই মানুষটি তাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে যখন তখন কথা বলে, রাগ করে না, বিরক্ত হয় না, চিন্তা করে কুন্দ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। এমন সঙ্গিনী পেয়ে চিরকাল বাপের বাড়ি কাটানোর দুঃখ সে ভুলে থাকতে পারবে মনে মনে ধরে রেখেছিল। আজ কিনা বৌটি এমন রূঢ় অপ্রিয় কথা শুনিয়ে দিল। কতক্ষণ গম্ভীর থেকে কুন্দ বলল, 'আমি তো ভাই আর কারোর কথা বলিনি, তোমার আর তোমার বরকে নিয়ে—'

'থাক থাক।' রেবা মুখ ঝামটা দিল। 'এসব কথায় তোমার দরকার কি, আমাদের প্রাইভেট ব্যাপারে কোন্ লজ্জায় তুমি নাক ঢোকাতে আস—যাক, অত কথায় কাজ নেই তুমি আর আমার ঘরে এসো না।

বিষণ্ণ ম্লান মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে সব কথা রেবা স্বামীকে বলল। অধ্যাপক শুনে হাসলেন। 'এই হয়। ওর অবদমিত কামনা আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ এগুলো। তোমার আমার গোপন কথা টেনে এনে নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছাকে রসিয়ে রাখতে চাইছে ও।'

রেবা বলল, 'আসলে মেয়েটা খারাপ। না হলে এমন বিদ্বান সুপুরুষ যার স্বামী তার কাছে ও থাকতে পারল না কেন। মিনার মা বলে বিয়ের ছ'মাস পরে ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক।'

অধ্যাপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'জানি না কে খারাপ কে মন্দ, আবার জলধরবাবুরা এই বলে দুঃখ করেন যে লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও লোকটা দুশ্চরিত্র মাতাল, বিনা দোষে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিলে।'

'আসলে মেয়েটাই খারাপ।' রেবা বলল, 'ওর কথাবার্তা শুনে শুনে আমার তো এই ধারণা হয়েছে। ছি ছি ছি! কেবল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওইসব জানাতে চাওয়া—

আজ আমার ইচ্ছা করছিল, ঘাড় ধরে ঘর থেকে ওটাকে বার করে দিই।'

অধ্যাপক কথা বললেন না। রেবা চুপ করে গেল। তারপর একসময়ে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব ভোরে রেবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানা থেকে নেমে সে মাটিতে পা দিয়েছে কি শিয়রের দিকের জানালার একটা পাল্লার খুট্ করে শব্দ হ'ল। রেবা চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ছুটে সে জানালার কাছে সরে গেল। তারপর? ঘৃণায় লজ্জায় রেবার মনের সে কি অবস্থা। কেমন যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এদিকের অন্ধকার কড়িডোর পার হয়ে মেয়েটা ওদিকের প্যাসেজের দিকে ছুটে

সরে গেল। কুন্দ। আবছা অন্ধকারে রেবার চিনতে কষ্ট হ'ল না।

কিন্তু এখন আর ঘুমন্ত স্বামীকে ডেকে কথাটা বলতে রেবার আটকাল। মনের রাগ মনে চেপে সে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

সারাদিন পার করে কুন্দ দেখা দিল বিকালের দিকে। মুখখানা মলিন। চোখের কোল বসে গেছে। ডান পায়ের গোড়ালি ব্যাণ্ডেজ করা।

দেখে রেবার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল।

কিন্তু কুন্দ যেন তা ভ্রূক্ষেপ করে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিতরে এসে ঢোকে তারপর বলা কওয়া নেই রেবার চিবুক ধরে সোহাগ করে 'ইস্—বেলা না পড়তে চুলটুল বেঁধে আলতা পরে পরী সেজে আছ বৌ!'

রেবা নিরুত্তর। বেহায়া নির্লজ্জ মেয়েটা আজ আবার কতটা অগ্রসর হয় তাই দেখতে সে ধৈর্য ধরে আছে।

কুন্দ বলল, 'সারাদিন আসতে পারিনি ভাই পা'টার যন্ত্রণায়, সকাল বেলা—'

বলতে বলতে হঠাৎ কুন্দ থামল।

রাগে রেবার মুখখানা থমথম করছে।

আরো কাছে সরে এসে কুন্দ ফিসফিসিয়ে বলল, 'যেমন চুরি করে দেখতে এসেছিলাম শাস্তিও পেয়েছি,—এতবড একটা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো বিঁধে পায়ের কি অবস্থা হয়েছে দেখ—'

তীব্র তাচ্ছিল্যে রেবা সরে যেতে চেয়েছিল। কুন্দ হাসল! 'আমি না হয় চুরি করে দেখতে এসে অপরাধ করেছিলাম ভাই, তোমার ও মস্ত ভুল হয়েছে, ঘুম ভেঙ্গে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় স্বামী-দেবতার পা ছুঁয়ে তবে মাটিতে পা দিতে হয়, বৌ, তা কি তোমার জানা নেই!'

রেবা চমকে উঠল।

কুন্দর ঠোঁটে ম্লান হাসির রেখা।

রেবা এই প্রথম বলল, 'বোস বোন।'

'না, পা টা কেমন যন্ত্রণা কচ্ছে, যাই একটু শুয়ে পড়িগে—' কুন্দ এবার আর হাসল না। সত্যি ওর পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝতে রেবার কষ্ট হল না। ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কাঁচটা বেরিয়ে এসেছে তো, আইডিন ফাইডিন কিছু লাগিয়েছিলে?'

'তা অত ভাবতে হবে না বৌ—সেরে যাবে। পায়ের কাটা-ঘা কদিন থাকে, ঘা শুকোয় না মনের।' বলতে বলতে কুন্দ ডান পাটা টেনে টেনে ঘর থেকে আস্তে বেরিয়ে গেল।

জ্বালা

এত বড় একটা হিমসাগর আম কামড়ে কামড়ে খেয়ে শেষ করল নীরা। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে নতুন করে সে কপাল গলা বুক পিঠ মুছতে বসল। কিন্তু তবু কি গরম কমে! সোঁ-সোঁ করে মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছে। যত জোরে পাখাটা ঘুরছে ঘরের হাওয়া তত যেন গরম হয়ে উঠছে। আর সেই গরম হাওয়া নীরার নাকের ভিতর কানের ভিতর চামড়া ফুঁড়ে শরীরের ভিতর ঢুকে পড়তে চাইছে। এ কী বিপদ! পাখা বন্ধ করে দেবে? একবার সে তা-ও করল। আর করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল হাওয়া বন্ধ হবার আগে তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে,' বন্ধ হয়ে গেছে; তাড়াতাড়ি জানালার পাল্লা দুটো খুলে দিল ও, আর পাগলা কুকুরের মতন হা-হা করে জ্যৈষ্ঠ দুপুরের আগুনের হলকা নীরার চোখের ওপর, মুখের ওপর, বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ পাল্লা দুটো সে ভেজিয়ে দিয়েছে। বস্তুত তার কান্না পাচ্ছিল এই দুঃসহ গরম, গরমের দীর্ঘ দুপুর কী করে কাটবে ভেবে। গায়ের জামাটামা অনেকক্ষণ আগে খুলে ফেলেছে ও, সারা পিঠে গলায় বুকে গাদাগাদা পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে। দিয়ে লাভ হল কি? এখন সেই পাউডার খড়ি-গোলা জল হয়ে গলা বেয়ে, পিঠে বেয়ে, বুক বেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। মানে অবস্থাটা আরো বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল। কী করা যায়—কী করতে পারে সে এখন, কী করলে একটু শান্তি পাবে, অস্থির হয়ে নীরা হাত-পা ছড়িয়ে খাটের ওপর শুতে যায়। তোশক চাদর বালিশ গরম হয়ে আছে মনে পড়তে আঁৎকে উঠে বিছানার কাছ থেকে সরে এসে মেঝের শক্ত সিমেন্টের ওপর গা এলিয়ে দেয়, চুপচাপ শুয়ে থেকে পাখাটার দিকে শূন্য চোখে কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর চোখ দুটো বুজে রাখে। হাওয়ায় তার মাথার চুল নড়ছে, আঁচল নড়ছে টের পায়। দেয়াল-ঘেরা টগবগে গরম হাওয়ায়।

বস্তুত গরমটা যত বাড়ছে, চারদিকের শব্দটব্দগুলো যেন তত কমে আসছে। এক সময় কান খাড়া করে রাখে নীরা। না, কোথাও আর কিছুর শব্দ শোনা যায় না। মানুষ হাঁটছে না বাইরে রাস্তায়, গাড়ি-ঘোড়া চলছে না, কোনো বাড়ির শিশু কাঁদছে না, রেডিও খুলছে না কেউ। ভয়ে? প্রচণ্ড গ্রীষ্ম রক্তচক্ষু মেলে

সব কিছু থামিয়ে দিয়েছে, সবাইকে শাসাচ্ছে, চুপ-চুপ-চুপ ! আমার প্রতাপ দেখ, আমার প্রতাপ দেখ। আমি কেমন নিষ্ঠুর, কত ভয়ংকর হতে পারি তোমরা টের পাও। বেশ টের পাচ্ছিল নীরা। আগুনের শিখা হয়ে জ্যৈষ্ঠের রোদ শিস দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, মানুষের ঘরের দেয়ালে, বারান্দায় রেলিং-এ, ছাদে, ছাদের কার্নিসে—ছাদ থেকে উঠে যাচ্ছে, আবার আকাশ থেকে আরো আগুন নিয়ে আসছে, আরো জ্বালা ?

কোথায় একটা চিল ডাকছে। দীর্ঘ অনুচ্চ মন্থর একঘেয়ে সেই শব্দ। আরো খারাপ লাগে। মনে হয় এই শব্দের সঙ্গে দীর্ঘ নিদাঘ মধ্যাহ্নের কোথায় যেন মিল আছে। মনে হয় চিলের ডাক এত রোদ নিয়ে এল, মনে হয় রৌদ্রদগ্ধ বিশাল আকাশ চিলটাকে ডেকে আনল। তার চেয়ে—

নীরা উঠে বসে। বসে বসে ভাবে, তার চেয়ে এখন যদি হঠাৎ বড় রকমের একটা শব্দ শোনা যেত রাস্তায় কি ধারে কাছের কোনো বাড়িতে, চিৎকার, হল্লা বা ঐরকম একটা কিছু, মারামারি, কাটাকাটি কি কোথাও আগুন লেগেছে শোনা যেত, তবু, যেন ভাল লাগত, শান্তি পাওয়া যেত, মনে হত গরমটা কম লাগছে, মনে হত না চিলের চাপা ডাক মেশানো এক জঘন্য জ্বালা অনন্তকাল ধরে মানুষকে পুড়িয়ে মারছে, মানুষের হাড়মাংস নিংড়ে—

ভাবছিল নীরা এসব। এমন সময় তার সাত বছরের মেয়ে পিণ্টুরানি পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

'মা, ও এসে গেছে।'

'কে রে, কে এল !' মেয়ের মুখের দিকে তাকাল নীরা। ঘাম টুসটুসে ছোট্ট মুখ পাকা করমচার মতো লাল হয়ে গেছে।

'তুই ছিলি কোথায় এতক্ষণ, এই রোদ !'

পিণ্টুরানি হাসে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল নড়ে ওঠে।

'না, না, রোদে ছিলাম না, আমাদের রকের কোণায় ছোট্ট ছায়া পড়ে—ওখানে দাঁড়িয়ে তো আমি দেখছিলাম—লোকটা এসেছে—'

'কে' নীরা প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল। না, চিলের ডাক না। দূরে ছিল তাই তেমন শোনা গেছে। 'ছুরি-কাঁচি-বঁটি শা—ন'— রুক্ষ কর্কশ বিকৃত কণ্ঠস্বর। যেন রাস্তার দিকের জানালার শার্সিগুলি ঝনঝন করে উঠল, দেয়ালটা কেঁপে উঠল। যেন একসঙ্গে অনেক ধারালো ছুরি-বঁটির শান লেগে সামনের রকটা কড়কড় হিস হিস কড়াৎ শব্দ করে উঠে হঠাৎ থামল। মানে লোকটা তাদের দরজার ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে এখন চুপ করল, নীরা অনুমান করতে পারে।

'তুই ডেকেছিলি ?' ফিসফিসিয়ে মেয়েকে প্রশ্ন করে, 'তুই ডেকে আনলি !'

হেসে পিণ্টুরানি ঘাড় কাত করে।

'বললে না সেদিন তুমি, আমাদের বঁটি-কাটারি দুটো ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই তো—'

'বলেছিলাম কি!' তেমনি ফিসফিসিয়ে কথা বলে নীরা, গলার স্বর স্বাভাবিক হচ্ছে না। যেন তখনো তার কানের কাছে হাওয়ার ছুরি কাঁচি বঁটির শান চলেছে। ধারালো বঁটি-কাটারিগুলো তার চোখের সামনে নাচছে। কী বিরাট আওয়াজ!

পিণ্টুরানি পর্দা সরিয়ে ফের চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। নীরা মেয়ের পিছনে থেকে চৌকাঠ ধরে বাইরে গলা বাড়িয়ে দেয়। রৌদ্রের ভয়ংকর মূর্তি দেখতে গিয়ে এক ভীষণদর্শন চেহারার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতে নীরা শিউরে উঠল, শক্ত করে চৌকাঠটা চেপে ধরল। 'এই পিণ্টু, সরে আয়।' চিৎকার না, ফিসফিসিয়ে মেয়েকে ডাকতে চেষ্টা করেও নীরা ডাকতে পারল না। গলার ভিতর হাওয়াটা ডেলা পাকিয়ে শক্ত হয়ে রইল।

কিন্তু, অবাক হল দেখে ও, মেয়েটার ভয়ডর কিছু নেই। দিব্যি লোকটার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। তার শান দেবার যন্ত্রটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। হাসছে।

'আমাদের বঁটি শান দেবে, শানওয়ালা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ তো আমার কাজ।' যন্ত্রের পাথরের চাকায় ফিতে পরিয়ে লোকটা একটা বাক্স থেকে লাল লাল ইটের টুকরো বার করে। টুকরোগুলো চাকার সঙ্গে ঠেকিয়ে দুটো কাঠের মাঝখানে ভাল করে বসিয়ে দিয়ে যন্ত্রের পা-দানিতে পা রাখে। একবার পা-দানি চেপে ধরে তখনি পাটা তুলে নেয়, আবার চেপে ধরে। কাঠের ফ্রেমের ভিতর বড় চাকা ঘোরে। বড চাকার ফিতের টানে উপরের কালো ছোট্ট পাথরের চাকা ঘোরে। হিস হিস শব্দ হয়। পাথরের ঘষায় লাল ইটের ধুলো ওড়ে। যেন একমুঠো আবিরের মেঘ। উড়ে এসে পিণ্টুর চুল ভুরু রাঙিয়ে দেয়। মেয়েটা এবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

'কই, আন, বঁটি কাটারি ছুরি কাঁচি নরুন জাঁতির ধার তুলে দিই।' পিণ্টুর দিকে না, ভাঁটার মতো লাল চোখ দুটো তুলে লোকটা নীরার দিকে তাকায়। নীরা আর একবার শিউরে ওঠে। বস্তুত একটা মানুষের চেহারা যে কতখানি কুৎসিত, কত ভয়ংকর হতে পারে, নীরার আগে জানা ছিল না। এখন জানল, দেখল। কপালে এত বড় একটা কাটা দাগ চুল থেকে চোখ পর্যন্ত নেমে এসেছে। কদম ফুলের মতো ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। কাঁধ দুটো এককালে কেমন উঁচু শক্ত ছিল বোঝা যায়। এখন বসে গেছে। বাঁ কাঁধে আর একটা কাটা

দাগ। লোক্‌টা কি খুনে না ডাকাত! মনে হয় যেন এইমাত্র কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এল। ভেবে সত্যি নীরা চোখ ছোট করে যন্ত্রের ওপর ধরে রাখা কালো কুঁকড়ে যাওয়া শিরাবহুল হাত দুটো পরীক্ষা করে হাতকড়ার দাগ আছে কিনা লক্ষ্য করে।

'মা, আমাদের বঁটি-কাটারি বার করে দাও।' পিণ্টুরানি মার দিকে ঘুরে তাকায়।

'ঘর থেকে নিয়ে আয়।' নীরা নড়ল না। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে পিশাচের মতো চেহারার মানুষটাকে দেখে।

পিণ্টুরানি বঁটি-কাটারি বার করে আনে।

'এই নাও শানওয়ালা খু-ব ধার তুলে দেবে।'

'শান দিতে ক পয়সা নেওয়া হয়?' এই প্রথম নীরা লোকটাকে প্রশ্ন করে।

'ছ পয়সা।' দন্তহীন নোংরা মাড়ি দুটো মেলে ধরে লোকটা নীরার চোখে চোখ রেখে হাসে। 'বেশি লিব না।'

'না-না, চার পয়সার বেশি হবে না দা পিছু।' নীরা নিষ্ঠুর হয়ে মাথা নাড়ে। 'চার পয়সায় পার তো করে দাও।'

কথা না কয়ে শানওয়ালা কাটারিটা তুলে যন্ত্রের ওপর বাগিয়ে ধরে। শন্ শন্ শব্দ। লাল আবিরের মেঘ ওড়ে। মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকায়। পাথরের ঘষায় ধাতুর আগুন তারার গুঁড়ো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পিণ্টু-রানির চোখের পলক পড়ে না। রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে যন্ত্র দেখে। আর নীরা। তারও চোখের পলক পড়ছে না। শ্বাস পড়ছে না। পাথর থেকে এক একবার কাটারিটা আলগা করে এনে লোকটা আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে যখন ধার পরীক্ষা করছিল নীরা দেখছিল ভাঁটার মতন চোখ দুটো কেমন জ্বলে জ্বলে উঠছে। যেন পৃথিবীতে এই একটা কাজই সে বেছে নিয়েছে। আর কিছুতে উৎসাহ নেই। বঁটি কাটারি ক্ষুর ছুরির ধার তোলা ধার পরীক্ষা করা আর ধারালো সব অস্ত্র মানুষের হাতে তুলে দেওয়া। নীরার বুক কেঁপে উঠল। তার জং-ধরা ভোঁতা কাটারিটা কেমন চকচক করছে। দায়ের কড়া ধার উঠেছে দেখে পিশাচ ঠোঁট দুটো বাঁকা করে হাসছে। পিণ্টুর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। কে জানে, কাটারির ধার পরীক্ষা করতে শয়তান না তার সাত বছরের মেয়ের নরম গলায় ওটা বসিয়ে দেয়। 'অত গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর হয়েছে কি।'

কিন্তু পিণ্টুরানির ভ্রূক্ষেপ নেই। শানওয়ালার সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছে। তোমার দেশ কোথায় শানওয়ালা। তোমার এই যন্ত্রের দাম কত। সারাদিন রাস্তায় ঘোর! কত হয়? মোটে বারো আনা? এক টাকা! এই

রোজগারে তোমার চলে ? এক ঝলক হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে মাকে দেখে মেয়ে ফের শানওয়ালার মুখ দেখে। 'আমার বাবা রোজ পঁচিশ টাকা ত্রিশ টাকা পকেটে করে আনে। আমাদের কুকুরটা রোজ এক টাকার মাংস খায়।'

'এঁচড়ে পাকা মেয়ে দুষ্টু মেয়ে!' পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে নীরা মেয়েকে ধমকায়। 'এই পিণ্টু! এই হতভাগী—' কিন্তু লোকটা যে এইটুকুন মেয়ের মুখে ওর বাপের রোজগারের বহর শুনে ঈর্ষা করল রাগ করল নীরার তা মনে হল না। বরং যখনই ওর সঙ্গে কথা বলছে কথার উত্তর দিচ্ছে লাল কটমটে চোখ নরম হয়ে যাচ্ছে, ঠোঁটের বাঁকা হাসিটা সহজ হচ্ছে—ততটা শয়তান শয়তান লাগছে না তখন। নীরা স্বস্তিবোধ করে।

'তুমি বুঝি খোলার ঘরে থাক ?'

শানওয়ালা ঘাড় কাত করে।

'তোমার আর আছে কে ?'

'কেউ না।'

'কেউ। না ? ধ্যে!' ফিক করে হেসে পিণ্টুরানি মার দিকে মুখ ফেরায়। 'মানুষের আবার কে—উ থাকে না হয় নাকি! বাজে কথা মিছা কথা বলছে।' পিণ্টু মার দিকে তাকিয়ে হাসছে, লোকটাও ঘাড় তুলে নীরাকে দেখছে। আবার ভাঁটার মতো চোখ দুটো কটমট করছে জ্বলছে। আবার নীরা অস্বস্তিবোধ করে। শয়তান—সত্যি লোকটা পাপী, নিষ্ঠুর। পাকা ভুরুর নিচ থেকে ঠিকরে আসা দৃষ্টির জ্বালা সারা গা দিয়ে অনুভব করল নীরা। তার চেয়ে, তার মনে হয়, রাস্তার রোদ অনেক নরম অনেক ঠাণ্ডা।

কাটারির ধার তোলা হয়ে গেছে। এবার শানওয়ালা পিণ্টুর বঁটি তুলে নেয়। ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে মেয়ে বলে, 'খু-ব ধার তুলে দেবে কিন্তু।'

'খু-উ-ব।' পাকা মাথা নেড়ে শয়তানটা সায় দেয়। 'বঁটি দিয়ে কি কাটবে খোঁকি ?'

'কেন, আলু কাটব—পটল।'

'আর ?'

'কুমড়ো বেগুন।'

'আর ?'

'মাছ।'

ফিক করে হাসে পিণ্টু। এসব প্রশ্ন করে তার মেয়েকে ঠকাবে ? এক পলকা হাসি নীরার ঠোঁটের কিনারেও উঁকি দিয়েছে তখন।

বস্তুত যদি এ বাড়ির দোতলা থেকে থাকে আর ওপর থেকে নিচের দিকে

কেউ তাকায়, দেখবে ঝড়ের বাড়ি খাওয়া পুরনো একটা শ্যাওড়া গাছের সামনে একটা টগরফুলের কুড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কুঁড়ির পিছনে এতবড় একটা লাল টগর। লাল টুকটুকে ফ্রক লাল শাড়ি, পাউডারের ছোপ লাগানো নরম তুলতুলে মাখন-রং শরীর আর মা ও মেয়ের মাথার কালো কুচকুচে আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন চুলের সামনে ময়লা গামছা পরা হাড় ও শিরাবহুল রুক্ষ শরীর কুৎসিত দৃষ্টির মানুষটার এ-ছাড়া যেন অন্য তুলনা ছিল না। আর জ্যৈষ্ঠ দুপুরের প্রতপ্ত আকাশের নিচে দাঁড়ানো ঐ পুরানো জীর্ণ গাছ আর দুটি তাজা ফুল ও কুঁড়ির সঙ্গে এই শহরের সম্পর্ক আছে প্রমাণ করতে যেন গরম অ্যাশফল্ট কাঁপিয়ে খানিকটা পোড়া পেট্রলের গন্ধ ছড়িয়ে একটু আগে একটা ট্যাক্সি ছুটে গেছে। আর কেউ নেই চারদিকে, আর কিছু ছিল না। কেবল বঁটি শানের ধাতব কঠিন শন্ শন্ শব্দ আর আগুনের ফুল্‌কি আর—

'তুমি কুড়ালের ধার তুলতে পার শানওয়ালা ?'

'হুঁ।'

'আর ?'

'করাত।'

'আর ?'

'খড়্গা।'

শুনে পিন্টুর দু চোখ বড় হয়ে যায়। ভয় ও খুশীমাখা দৃষ্টি মার মুখের ওপর বুলিয়ে তৎক্ষণাৎ শানওয়ালার দিকে তাকায়।

'সেই মা-কালীর হাতের খড়্গা পাঁটা-কাটা খড়্গা!'

'হাঁ—হাঁ—' বিরাট শব্দ করে লোকটা হেসে উঠল। একটা বুড়ো মানুষ গলায় এত জোর কি করে পায় নীরা সেই প্রথম 'ছুরি কাঁচি শা—ন' চিৎকার শুনে ভেবেছিল, এখন আবার ভাবল।

কিন্তু পিন্টু কি ভয় পাবার মেয়ে! লোকটার হাসির ধমক কমতে আবার ও ফিক্ ফিক্ হাসে। কথা বলে। পিন্টুর বাবার খড়্গা নেই। দেশে তার বড়-মামার একটা খড়্গা আছে। মামা ওটা দিয়ে এক কোপে পাঁটা কাটে। খড়্গা ভোঁতা হয়ে গেলে ওটা কলকাতায় নিয়ে আসতে ও মামাকে চিঠি লিখে দেবে ঠিক।

'পারবে না খুব ধার তুলে দিতে, শানওয়ালা ?'

'হাঁ হাঁ, খু-উ-ব—এই লাও তোমার বঁটি।'

'হয়ে গেল হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, দেখ না কেমন চকমকে করে দিলুম।' মরা নখের শুকনো আঙুলটা বঁটির পেটে ঘষে এবারও সে ধার পরীক্ষা করতে; নীরা অনুমান করছিল—কিন্তু

কিন্তু—

'এই তুমি কী করছ।' ছিটকে চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় নীরা। পিন্টুর নাকের সামনে বঁটিটা বাড়িয়ে দিয়ে শয়তান হাসছে। 'লেগে যাবে—' চিৎকার করে উঠত নীরা, তার আগেই অবশ্য খুকির হাতে বঁটি তুলে দিয়ে শানওয়ালা কপালের ঘাম মুছতে থাকে। নীরা আঁচল দিয়ে গলার ঘাম মোছে।

'চমৎকার ধার উঠেছে, মা।'

মেয়ের কথায় মন দিতে পারছিল না ও, বুকের ভিতর একটা ত্রাস তখনও ধকধক করছিল, ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল নীরার।

'খোঁকি, আমার পয়সা দাও।' যন্ত্র গুটোতে ব্যস্ত হয় শানওয়ালা কিন্তু চোখ দুটো নীরার দিকে। দুটো রক্তপিণ্ড দুটো আগুনের ডেলা। যেন তাকে দিয়ে অহেতুক ভয় ও আশঙ্কা করে নীরা ওভাবে ছুটে গেছে বলে রাগ হিংসা আক্রোশ না কি দুরন্ত ঘৃণা পাকা ভুরুর তলা থেকে ছুটে এসে নীরাকে বিদ্ধ করছে।

'মা, ওর পয়সা দিয়ে দাও।'

পয়সা আনতে নীরা ঘরে চলে এল তারপর পয়সা নিয়ে ও যখন ফের চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় শোনে পিন্টু আবার গল্প জুড়ে দিয়েছে। এত কথা বলতে পারে তার সাত বছরের মেয়ে!

'তোমার বঁটি আছে শানওয়ালা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল একটা বঁটি—এখন নেই, আগে ছিল।'

'কত বড়?'

'হেই এ—ত বড়।' দু'হাত শূন্যে ছড়িয়ে লোকটা তার বঁটির আকৃতি দেখায়।

পিন্টুর চোখ আবার বড় হয়ে ওঠে।

'ও-তো খড়্গ—এত বড় দা ছিল তোমার!'

'হ্যাঁ।'

'কি কাটতে?'

'আলু বেগুন।'

'আর?'

'কুমড়া কচু।'

'আর?'

'বৌ—কেটে জলে ভাসিয়ে দিলাম।

দম বন্ধ হবার মতো কথা হৃদপিণ্ড থেমে যাওয়ার মতো উত্তর। নীরা দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। কিন্তু পিন্টু বিশ্বাস করছে না, হাসছে।

'ধ্যেৎ, বৌকে আবার কেউ কাটে নাকি!' চকিতে 'মার চোখ দুটো দেখে

পিণ্টু ফের শানওয়ালার দিকে মুখ ঘোরায়।

'কেন, তোমার বৌ কালো ছিল কুচ্ছিত ছিল?'

'না, না, খুব সোন্দরী ছিল।'

'ইস্! তবে কাটলে কেন।' যেন চটে গেছে পিণ্টু। 'আমার চেয়ে সুন্দর ছিল বৌটা?'

'হ্যাঁ, তা হবে—আরো বেশি।' পিণ্টু না, নীরার দিকে কটমট চোখে তাকায়, শয়তান। যেন খুঁকি না, তার সঙ্গে কথা বলছে। তাকে এসব শোনাচ্ছে দুষ্ট। ঘৃণা ও বিদ্বেষের একটা তিক্ত জ্বালা গলার কাছে অনুভব করল নীরা। তবু যদি ও চুপ থাকত, কিছু না বলত। কিন্তু তা আর পারল কৈ। আশ্চর্য সুন্দর হেসে নীরা খোঁচা দিল: 'কেন, স্বভাব খারাপ ছিল বুঝি বৌয়ের, চরিত্র ভাল ছিল না।'

'এঁ্যা!' চমকে ওঠার ভান করে কালো মাড়ি দেখিয়ে লোকটা হাসে। 'ন্—নাঃ খেতে দিতে পারিনি, খেতে দিতে না পারলে অত সোন্দরী বৌ ঘরে রেখে করতাম কি—তাই তো—'

যন্ত্র কাঁধে তুলে শানওয়ালা রাস্তায় নেমে গেল। আর দাঁড়িয়ে হাঁ করে নীরা শয়তানটাকে দেখে। তারপর এক সময় মেয়ের হাত ধরে ধরে এসে ঢোকে। যেন কানের ভিতর গরম শীসা ঢেলে গেল পাজীটা। তাই কি? ঠাট্টা করতে, তাকে অপমান করতে শেষের ঐ কথাগুলিও বলে গেল না! নীরা বুঝতে পারছিল না। বুঝতে না পেরে রাগে দুঃখে ও যখন প্রায় ঠোঁট কামড়াতে গেছে তখন পিণ্টুরানি ধারালো বঁটির পেটে আঙুল ঘষতে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে।

সামনে চামেলি

সেই একটা রাস্তা। ভারি সুন্দর। আপনারা দেখেছেন কি! খুব নির্জন। হয়তো দেখেছেন, মনে নেই। তার মানে যতটা মন দিয়ে দেখার দরকার ততটা মন ছিল না। যেজন্য রাস্তাটা ভুলে গেছেন। এই হয়।

কেননা চলতে চলতে দেখা, আর দেখবার জন্য থমকে দাঁড়ান এক কথা নয়।

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার মুখে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। বৈশাখ মাস; তাই বোধ করি সবটা রাস্তার দুপাশে খুব রাধাচূড়া ফুটেছিল। আর ঐ যে হলদে ছোট ছোট ফুল। মে-ফ্লাওয়ার? সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তা কলকাতা শহরে সূর্যডোবার দৃশ্য আর কোথায় চোখে পড়ে। অন্ধকারই দেখা যায়।

পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে আর তখুনি রাস্তায় বাড়িতে নিওন ফ্লোরেসেণ্ট আলো দপদপ জ্বলে ওঠে। যেজন্য হঠাৎ কেমন কিম্ভূতকিমাকার মনে হতে থাকে শহরটা। কিন্তু সেদিনকার রাস্তাটা ভারি সুন্দর ছিল। খুঁটির মাথায় মাথায় নীলাভ রূপালি আলো, গাছে গাছে অজস্র ফুল তার ওপর গাঢ় নির্জনতা। অথচ দু পাশে সারি সারি বাড়ি। গ্রীল দেওয়া চমৎকার সব ব্যালকনি। কিন্তু কেমন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকার মতন অবস্থা। এক ফোঁটা শব্দ নেই কোথাও। শব্দ ছিল। কাদের একটা প্রেসার কুকার থেকে থেকে হিসহিস করে উঠে থেমে যাচ্ছে। একটা কুকুর, যেন চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, গুরুগম্ভীর স্বরে ডেকে উঠে তখুনি আবার চুপ করে যাচ্ছে। মৃদু লয়ে কোথাও একটা রেডিওতে সেতারে আলাপ চলছিল, একটু পরে অবশ্য সেটা বন্ধ হয়ে যায়। সিমেণ্টের ওপর দিয়ে কখনো জুতো পায়ে হেঁটে যাওয়ার একটা-দুটো বিরল শব্দ বা সোঁ করে এক-আধটা গাড়ি ছুটে যাওয়ার চমক যে না ছিল তা নয়, কিন্তু এইরকম টুকটাক কাটা-কাটা শব্দ বা চমক রাস্তার দামী নির্জনতা ও গাম্ভীর্যকে একটুও নষ্ট করতে পারছিল না। যে জন্য তার ভাল লাগছিল।

সে ভাবতেই পারেনি·কলকাতা শহরে এমন একটা জায়গা, এমন সুন্দর ভীষণ-রকম নির্জন কোনো রাস্তা আছে, রাস্তার দু' পাশে গ্রীল দেওয়া সুন্দর ব্যালকনি বারান্দা সিঁড়ি নিয়ে উঁচু উঁচু বাড়ি, অথচ কাউকে তুমি দেখছ না।. কেবল যতটা

চোখ যায় রাস্তার দু ধারে রাধাচূড়া আর মে-ফ্লাওয়ার গাছের সারি। সন্ধ্যার মুখে আলো জ্বলে উঠতে পেভমেণ্টের ওপর চিকরিকাটা ছায়ার আলপনা সৃষ্টি করে। এলে রাস্তাটা আরো রহস্যময় মনে হয়.। একটু একটু করে ফুলের গন্ধ আসে। হয়তো কোনো ব্যালকনিতেই জুঁই লতিয়ে উঠেছে।

বৈশাখের এলোমেলো হাওয়ায় তার গন্ধ। কিন্তু জুঁইয়ের গন্ধ বেশিক্ষণ থাকে কি! ঐ যে একটা রঙিন কাচের গেলাস ঝন্ করে ভেঙে দেওয়ার মতন রাস্তার নিটোল স্তব্ধতা গুঁড়িয়ে দিয়ে এক-আধটা গাড়ি ছুটে যায়, তৎক্ষণাৎ পেট্রল-পোড়া গন্ধ ফুলের গন্ধকে নষ্ট করে দেয়। একটু পরে অবশ্য তেল-পোড়া গন্ধটা থাকে না, সেতারের মৃদু আলাপের মতন রিন্‌রিন্ করে চমৎকার সেণ্টের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কাউকে তুমি চোখে দেখছ না। সে দেখেনি। আমি দেখিনি। হুঁ, আমিই সে। ঘুরতে ঘুরতে এই রাস্তায় এসে গেছি। আমার সামনে দিয়ে অশরীরী কেউ চলে গেল। ঠুকঠুক জুতোর শব্দ শুনলাম—ব্যস, এই পর্যন্ত, আর টের পেলাম ল্যাভেণ্ডার ডিউ কি কিউটিকুরোর হাল্‌কা মেজাজী সৌরভ। কানে কানে কথা বলার মতন মূল্যবান গন্ধটুকু নাকে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়েও গেল।

অবশ্য এভাবে হুট করে যদি ডেটল কি ফিনাইলের গন্ধ তার নাকে লাগত সে বিস্মিত হ'ত না। আমি বিস্মিত হইনি। আমার বিস্ময় কেবল এই নির্জন চওড়া রাস্তাটা, রাস্তার দু'পাশের সারি সারি রাধাচূড়া ও মে-ফ্লাওয়ার গাছ, আর, একটু পর পর প্রেসার কুকারের হিসহিস শব্দটা, যেন কেউ খুব কতক্ষণ জোরে কারো নাক চেপে ধরে, তারপর নাকটা ছেড়ে দিতে লোকটা জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে আরম্ভ করে। আবার এক সময় শ্বাসটা বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ কেউ নাকটা টিপে ধরে—আর ঠিক তখন শোনা গেল চেন বাঁধা একটা অ্যালসেসিয়ানের গম্ভীর ভয়ংকর ডাক। সেই ডাক শুনে হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগে। অবশ্য তখনি জুঁইয়ের নরম গন্ধ নাকে লাগে। মনে পড়ে যায় বৈশাখ মাস। সমুদ্রতীরে না গিয়েও বৈশাখ সন্ধ্যার প্রচুর দক্ষিণা বাতাস তোমার গায়ে লাগছে, ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়, গা সিরসির করে। জুঁইয়ের গন্ধটা উপরি পাওনা।

না, রাস্তার নাম বলব না। যদি আপনারা কেউ এই রাস্তায় কখনো এসে গিয়ে থাকেন ভাল, আমার বর্ণনা শুনে আপনাদের এখন নামটা মনে পড়তে পারে, হয়তো ছবিটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অবশ্য যদি কোনোদিন মনোযোগ দিয়ে রাস্তাটা দেখে থাকেন। চলতে চলতে দেখা নয়, আমার মতন থমকে দাঁড়িয়ে দেখা।

আর যদি তা না করে থাকেন তো সব দেখাই যেমন আমরা এক সময় ভুলে

যাই, আপনিও এই রাস্তা একেবারে ভুলে গেছেন। ভাল ক'রে না দেখলে কোন্ জিনিসই বা আমরা মনে রাখতে পারি। গাড়ি বাড়ি মানুষ রাস্তা মাঠ গাছ, কিছুই মনে দাগ কাটে না। বিশেষ করে এত বড় একটা শহরে।

সুতরাং এই অবস্থায় আমার বর্ণনা শুনে আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমার বর্ণনা শুনে একটা ছবি আপনাকে চোখের সামনে দাঁড় করাতে হবে। এ ছাড়া উপায় কি। এবার শুনুন:

ক্রাচ ভর দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়। হুঁ, আমাকে। যেজন্য আমার হাঁটা খুব মন্থর। দুটো সুস্থ পা নিয়ে আপনারা যত তাড়াতাড়ি চলতে পারেন, আমি পারি না। আস্তে আস্তে আমাকে রাস্তা পার হতে হয়, গাড়িঘোড়া আসছে কিনা দেখে খুব সাবধানে এগোতে হয়। এবং ফুটপাথ ধরে যখন হাঁটি—তখন অবশ্য গাড়ি-ঘোড়ার ভয় থাকে না, কিন্তু ভিড় থাকে, কলকাতা শহরের কোন্ রাস্তায় পথচারীর ভিড় নেই বলুন, চলতে গেলে এর ওর গায়ের ধাক্কা লাগবেই, সর্বদাই লাগছে—সেই অবস্থায় আপনারা, যাদের পায়ে জোর আছে, দুটো পা-ই শক্ত সমর্থ, ধাক্কাটাক্কা সামলাতে পারেন, ভিড়ের ভিতর দিয়েই অনায়াসে চলতে পারেন, কিন্তু ক্রাচ ভর করে আমার পক্ষে এভাবে পথ চলা কি সম্ভব। একটুখানি এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি, ভিড়টা কমে গেলে আবার এগোই। কাজেই যে রাস্তায় ভিড় নেই, খুঁজে খুঁজে তেমন রাস্তা ধরেই আমি হাঁটি; হাঁটতে ভালবাসি। একদিন হ্যারিসন রোডের ফুটপাথ ধরে সাহস করে ভিড়ের মধ্যে চলতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারি হয়েছিল! এক ভদ্রলোক, মানুষটা বেশ জোয়ান, হনহন করে হেঁটে উল্টো দিক থেকে আসছিলেন, পেণ্ডুলামের মতন হাত দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটছিলেন তিনি। তাঁর একটা হাত হঠাৎ আমার বাঁ হাতের ক্রাচের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে ক্রাচটা নড়ে গেল, তৎক্ষণাৎ ব্যালেন্স হারিয়ে ফুটপাথ থেকে ছিটকে কাত হয়ে আমি রাস্তায় পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস একটা দাঁড় করান রিকশা সামনে ছিল। তা না হলে যেভাবে একটা ট্যাক্সি ছুটে আসছিল।

আমার বেশভূষা মলিন। চেহারাও তাই। ম্লান বিষণ্ণ। যেমন আমার স্বাস্থ্য। দুর্বল নিস্তেজ—আমাকে দেখলেই আপনারা চট করে বুঝতে পারবেন লোকটা রক্তশূন্যতায় ভুগছে। মানুষ হিসাবেও আমি নগণ্য, খুবই সাধারণ। একটা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক—সুতরাং অসাধারণ কিছু যে হবো না এটা এমনিও বোঝা যায়।

এই হল আমার বাইরের পরিচয়, ওপর থেকে আমাকে দেখলে যা সকলের চোখে পড়ে। কিন্তু ভিতরের দিক থেকেও যে সে নিঃস্ব, ভয়ানক রকম রিক্ত আপনাদের তা বুঝবার কথা নয়। তার মতন জীর্ণ মলিন বেশবাস ও রুগ্নস্বাস্থ্য

বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে হয়তো এভাবে ক্রাচ ভর করেও কেউ কেউ হাঁটে, লক্ষ মানুষ কলকাতা শহরে চলাফেরা করে—আপনারা রোজ দেখেন। আমিও দেখি। কিন্তু আমি মনে করি আমি সবচেয়ে দুঃখী। দুঃখী বঞ্চিত ব্যর্থ—সেই সঙ্গে আশাতীত রকম ভীরু, এবং অনাবশ্যক রকম লাজুকও বটে। পুরুষ হলে হবে কি, তুলনায়, আমি মনে করি, আজকের একটি মেয়ে অনেক বেশি প্রগল্ভ নিঃসঙ্কোচ। কমপ্লেক্স—নানারকম হীনমন্যতায় ভুগছি বলে যে আমার এই সমস্ত সঙ্কোচ দ্বিধা ভয় লজ্জা এটা বেশ বুঝতে পারি। একটা মানুষের চোখের দিকে তাকাতে পারি না, দুটি মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখলে অন্যদিকে 'চলে যাই। এইজন্যই নির্জনতা—ফাঁকা রাস্তা আমার প্রিয়। ভিড নেই, গায়ে ধাক্কা লাগে না, ক্রাচে ভর করে আস্তে আস্তে হাঁটবার সুবিধে হয়। তার চেয়েও বড় কথা—মানুষজন নেই বলে কারো চোখের দিকে তাকাবার দরকার পড়ে না, কারো সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে ছোট নিঃস্ব অপদার্থ চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় না। নিজের মতন করে আমি চলতে পারি, ভাবতে পারি।

তা ছাড়া, যে রাস্তাটার কথা এইমাত্র বললাম, মহৎ কিছু অসামান্য কিছু বলে আমার মনে হয়েছিল। খুব চওডা এবং নির্জন বলে ? না কি দু পাশের ছায়া ছড়ান গাছগুলির জন্য ? ফুল ফুটছে, অবিশ্রাম ফুল ঝরে পডছে—না কি উঁচু উঁচু বাডিগুলির জন্য।

কাউকে তুমি দেখছ না, অথচ দামী ক্রীম পাউডার শ্যাম্পুর গন্ধ তোমার নাকে লাগছে ? কাউকে দেখছ না, তবু বিলাতী কুকুর ডাকে, প্রেসার কুকারের হিসহিস শুনতে পাও। বিদ্যুচ্চমকের মতন এক-আধটা গাডি ছুটে গেলে পোডা পেট্রলের গন্ধ নাকে লাগে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকি। ক্রাচে ভর দিয়ে একটা গাছের নিচে দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে দেখি। অবশ্য সেই সঙ্গে আমার বিশ্রামও হয় খানিকটা। ক্রাচ পরে হাঁটার কষ্ট কি—আপনারা, যারা সুস্থ, সম্পূর্ণ দুটো পা নিয়ে চলাফেরা করেন, ধারণা করতে পারবেন না।

হুঁ, মে-ফ্লাওয়ার ও রাধাচুডা গাছগুলি বৈশাখী হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাসের মতন শব্দ করে। মেয়েদের মুচকি হাসির মতন একটু সময়ের জন্য ঠাণ্ডা পরিচ্ছন্ন জুঁইয়ের গন্ধও টের পাই। বলতে কি, সবটাই আমার কাছে ভীষণ রোমান্টিক মনে হয়। বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মৃদু হয়ে আসে। আমার চোখে প্রায় জল এসে যায়। আমি খুশি হই, আমার এত ভাল লাগে, ঘুরতে ঘুরতে যখন এই রাস্তায় চলে আসি।

আপনারা নিশ্চয় হাসছেন। তুমি এখানকার কেউ না কিছু না। এই শহরের কোথায় কোন্ ঘিঞ্জি পাড়ায় ধোঁয়া কালি গোলমালের মধ্যে কোনো

নোংরা বস্তিতে থাক। যেমন তোমার জামাকাপড়, চেহারা স্বাস্থ্য, তার ওপর একটা পা কাটা—এই বনেদী রাস্তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? সন্ধ্যার মুখে এখানে উঁচু উঁচু থামের মাথায় বেগুনি রুপালি আলো জ্বলে ওঠে, সারি সারি গাছের মাথায় সেই আলো ঝরে পড়ে পরিচ্ছন্ন পেভমেণ্টে ছায়ার আলপনা এঁকে দেয়। দক্ষিণা বাতাসে ছায়াগুলি নিজের মনে থিরথির কাঁপে। এসব দেখে তোমার উৎসাহিত পুলকিত হবার কোনো কারণ আছে কি?

নেই। আমিও বুঝি কোনো কারণ থাকা উচিত নয়। আমি অত্যন্ত সাধারণ, খুবই নগণ্য, আপনাদের বলেছি। পাঁচ টাকা দামের একটা জেলজেলে ছিটের শার্ট আমার গায়ে। কলারটা ছিঁড়ে গেছে, তেমনি পরনের ধুতিখানা। ধুতি জামা দুটোই এমন জীর্ণ মলিন দশায় এসে পৌছেছে, এই পোশাক পরে এমন এমন একটা দামী রাস্তায় আসা যায় না।

আমার বাবা হোমিওপ্যাথির ডাক্তার ছিল। কোনোদিন পসার জমাতে পারেনি। ডিসপেনসারীর টেবিল চেয়ারে চিরকাল ধুলো জমেছে। এখন বুড়ো বাতে শয্যাশায়ী। কাজেই আমরা দরিদ্র। আমি? হুঁ আমার ওপর অনেকটা আশা ছিল। বাড়ির বড় ছেলে। লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাতে পারব। হল না। পারলাম না। লেখাপড়াই আর হয়নি। কলেজে ভর্তি হওয়ার এক মাসের মধ্যে একটা পা কাটা গেল। এই কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ি। এক বন্ধুর মায়ের অসুখে ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলাম। ডাক্তার মানে আবার বাবা হোমিওপ্যাথকে নয়, বড় এলোপ্যাথ ডাক্তার। বন্ধুর বাবা বড়লোক। প্রায় দেড় বছর আমাকে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হয়।

এখন আমার সেই বন্ধু ওয়েস্ট জার্মানীতে। আমি ক্রাচ পরে হাঁটি। বন্ধুর বাবা প্রভাবশালী মানুষ। দুবার কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হন। তিনিও বুড়ো হয়েছেন। তাঁর চেষ্টায় কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারীটা পেয়ে গেছি। তা-ও ছ-সাত বছর হয়ে গেল। এখন আমার বয়স সাতাশ, আমার মাইনে আজ একশ কুড়ি টাকায় দাঁড়িয়ে। বুড়ো বাবা মা ও তিন ভাইবোন নিয়ে সংসারে মোট ছজন খাইয়ে। এই টাকায় কুলোয় না। দু বেলা দুটো টুইশনি করতে হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াই।

ছোট ছেলেমেয়েদের আমি পছন্দ করি। ক্রাচ ঠুকঠুক করে প্রায় আড়াই মাইল রাস্তা হেঁটে আমাকে স্কুলে যেতে হয়। ট্রামে বাসে চলা সম্ভব নয়। আমার স্কুলে তো বটেই, রাস্তায়ও দেখেছি, ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টির মধ্যে একটা কোমলতা, ব্যথা, বেশ একটা সহানুভূতির ভাব ফুটে ওঠে। 'স্যারের এভাবে চলাফেরা করতে খুব কষ্ট

হয়।' ক্লাসে বাচ্চা ছাত্রছাত্রীদের আমি বলতে শুনেছি। একদিন একটি আর-একটিকে বলছিল, 'স্যার বেশিদিন বাঁচবে না, ভীষণ রোগা হয়ে গেছে।' আর একদিন, ঘণ্টা পড়তে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, নিচু গলায় তারা পিছন থেকে বলাবলি করছিল, 'স্যার বিয়ে করেনি, কাটা পা নিয়ে কোনোদিন বিয়ে করতে পারবে না।' এত হাসি পাচ্ছিল শুনে। তার মানে এখন পর্যন্ত তাদের মন কত নরম, কত সরল। আমি জানি, আর একটু বড হলেই তাদের এই মন থাকবে না। ভাগ্যিস বড় ছেলেমেয়েদের আমি কোনোদিন পডাব না। পডাতে গেলে মুশকিল ছিল। আমার কাটা পা দেখে তারা হাসত টিটকিরি দিত। প্রশ্নপত্র কঠিন হলে আমার ক্রাচ কেড়ে নিত, আমাকে মারতে আসত।

যাক, এসব খুব বেশি বলার দরকার নেই। বরং যা বলছিলাম : সুন্দর রাস্তা সুন্দর বাড়ি গাছপালা ফুল পাখি দেখতে সে চিরকাল ভালবাসে। হুঁ আমি। ছেলেবেলা থেকে আমার মনটা রোমান্টিক। আপনারা শুনে হাসবেন, যে-বছর কলেজে ঢুকি—না, তার আগের বছরই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। সাত-আটটা কবিতা যেন লিখেও ফেলেছিলাম। পরে আর সেসব হয়নি। তারপর থেকে, শুনলেন তো, একটানা দুঃখ—দুর্ধর্ষ জীবন-সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই স্বাস্থ্য ভাল নয়। ভাল খাওয়া-দাওয়া কোনো-কালে তো জোটেনি। তবে পা কাটা যাবার পর থেকেই শরীরটা বেশি খারাপ হতে থাকে। প্রচুর রক্তপাতের জন্য যে এটা হয়েছে বোঝা যায়। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময়, মনে আছে, ডাক্তারবাবুরা পইপই করে বলে দিয়েছিলেন নিয়ম করে দুবেলা দু কাপ করে দুধ খেতে, রোজ একটু মাছ বা মাংস এবং মাল্টি-ভিটামিন বডি খেতে। কিছুই খাওয়া হয়নি। যেজন্য আজ শরীরের এই দশা। ঐ যে বলেছি, বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও বুঝতে পারে সাংঘাতিক রকম অপুষ্টিতে ভুগছি আমি, দিন দিন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছি, শরীরে রক্ত নেই, হাতপা-গুলি—পা অবশ্য এখন একটাই, শুকিয়ে কাঠির মতন হয়ে যাচ্ছে।

তা হলে হবে কি, আমি আমার স্বাস্থ্য বুঝি। এই নিয়ে সর্বদাই ভাবি, আমার দরকার এখন প্রচুর বিশ্রাম, পুষ্টিকর আহার—কিন্তু ঐ যে, আমার মধ্যে একটি 'সে আছে, ভীষণ একরোখা, অতিমাত্রায় রোমান্টিক, খারাপ স্বাস্থ্য, অতিরিক্ত খাটুনি—কিছুই ভ্রূক্ষেপ নেই, যতক্ষণ ছেলে পডাল, পড়াল, যতক্ষণ স্কুলে থাকল থাকল, বাকি সময়টা ক্রাচ ঠুকে ঠুকে হাঁটছে হাঁটছে, সুন্দর কিছু খুঁজছে সে সুন্দর পরিচ্ছন্ন মার্জিত—তাই এই নির্জন বিশাল রাস্তাটায় এসে স্থির হয়ে দাঁডায়। তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় সারা জীবন সে যে-সব স্বপ্ন দেখেছে এখানে প্রায় তার সবকিছুই ছবি হয়ে চুপ করে আছে।

আপনারা জানেন না, কালও সে এসেছিল। এক নম্বর রাধাচূড়া গাছটার নিচে একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে পরে ফিরে গেছে।

আজ আবার এসেছে। আজ আর একটু ভিতরের দিকে ঢুকেছে। অর্থাৎ দু নম্বর মে-ফ্লাওয়ার গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছে।

তবে একটা কথা, ঐ যে মনোহর মার্জিত কিছু খুঁজছে সে, এই খোঁজা তার সেই ছেলেবেলা থেকে। যখন ন-দশ বছর বয়স। একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আশার মতন। ভাল কিছু দেখব, সুন্দর কিছু পাব, হাত বাড়ালেই পাব। পরিচ্ছন্ন নয়নাভিরাম শ্রীসম্পন্ন কোনোও জগতে একদিন গিয়ে আমি দাঁড়াব—দাঁড়াতে পারব। মনে মনে হেসেছি আমি। কেননা আমি জানতাম, তখন থেকেই জেনে গেছি—এটা তার দুরাকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা কোনোদিনই পূরণ হবার নয়। এবং হয়ওনি আজ সাতাশ বছর বয়সে এসেও তাই দেখছি। কিন্তু আমার কথা শোনেনি সে। চোখ রাঙিয়েছি। কিছু ফল হয়নি। আজ যেমন করছে, ছেলেবেলায়ও তাই করত।

শৌখীন মেজাজী কিছু দেখলে আহ্লাদে উত্তেজনায় তার চোখ গোল হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ হওয়ার মতন কিছু চোখে পড়লে তার হৃৎপিণ্ডের নড়াচড়া প্রায় থেমে গেছে। একটা সুঘ্রাণ নাকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে নাকের ছিদ্র দুটো বড় হয়ে গেছে। হয়তো গন্ধটা আরও কিছুক্ষণ পাবার লোভে কুকুরের মত নাকটা শূন্যে উঁচু করে ধরে জোরে জোরে শ্বাস টেনেছে।

দেখে আমার দুঃখ হ'ত। এত হ্যাংলা কেন! ছেঁড়া চটি পায়ে, গায়ে ময়লা জামা-কাপড়, না-খাওয়া চেহারা, একটা ঘিঞ্জি গলির নোংরা ঘরে বাস, আর, সেই ছেলে কিনা—ছেলেবেলার দু-একটা ঘটনা থেকেই আপনারা বুঝবেন কত অবুঝ সে। একদিন এক ভদ্রলোকের হাতে একটা গোলাপের তোড়া দেখে প্রায় এক মাইল পথ পাগলের মতন মানুষটার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছিল। অথচ তখন স্কুলে যাচ্ছিল সে। স্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। ভেবেছিল চাইলেই ভদ্রলোক বুঝি একটা গোলাপ ফুল তাকে দিয়ে দেবে। দেয়নি। বরং অনেকটা রাস্তা এগোবার পর সংকোচ-টংকোচ কাটিয়ে যখন সে চাইতে গেল ভদ্রলোক তাকে বেশ করে ধমক লাগল : বই-খাতা বগলে স্কুলে যাচ্ছ, ফুল নিয়ে তুমি এখন করবে কী হে ছোঁড়া, তাছাড়া আমি একজনকে তোড়াটা প্রেজেণ্ট করব—উপহার দেব—এ থেকে ফুল চাইছ কোন লজ্জায়! মুখটা চুন করে সে স্কুলে ফিরে যায়। এবং প্রায় কুড়ি মিনিট দেরি করে ক্লাসে ঢোকার দরুন মাস্টার মশাইয়ের বেতের বাড়ি খায়।

আর একদিন বুঝি দোকান থেকে কি একটা জিনিস কিনে আনতে পাঠিয়েছিল মা। রাস্তায় কাদের একটা ময়ূর দেখে অর্ধেকটা দুপুর সে সেখানে

কাটিয়ে আসে। অর্থাৎ জিনিস কেনার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ ময়ূরের পেখম ধরা দেখল।

হুঁ, সুন্দর জিনিস ময়ূর। পৃথিবীর সেরা ফুল লাল গোলাপ। সাধারণ, এক হিসাবে খুবই সাধারণ। কিন্তু এই সাধারণ চাওয়া সাধারণ আকাঙ্ক্ষা থেকেই অসাধারণ কিছু দেখা অসাধারণ কোনো কোনো স্বপ্ন ও বাসনা তার বুকে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে। তখন তার বয়স কত? তেরো থেকে চৌদ্দ! একদিন বিকেলে খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। আচমকা বুনো ফুলের গন্ধের মতন অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ নাকে লাগতে রাস্তার এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় ফেরাতে একরাশ রঙের ঝলক তার চোখে লাগল। হুঁ, বুনো ফুলই বটে। গাড়িটা বোঝাই হয়ে আছে। রাস্তার পাশে একটা লাইটপোস্টের নিচে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। এক মিনিট কি আর একটু বেশি সময় গাড়িটা ছিল। তারপর একদিকে ছুটে চলে গেছে। চকচকে কালো লম্বামতন গাড়ি। মেয়ে-স্কুলের গাড়ির মতন। কিন্তু এক নজর দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল স্কুলের গাড়ি নয়। এক রঙের পোশাকও নয় ওদের। রঙবেরঙের জামা গায়ে। লাল বেগুনি হলদে সোনালি। নানা রঙের রীবন চুলে। নানা ছাঁদের বেণী। ফুলের মতন টাটকা ঝকঝকে কটি মুখ। তাড়াতাড়ি গুনতে পারেনি, তবে তার মনে হল এক ডজনের বেশি। যেন ফুলের পাপড়ির চেয়েও নরম মসৃণ এক-একটির গায়ের চামড়া। ঘাড় গলা পিঠ বুক ও বাহু অর্থাৎ শরীরের যেসব খোলা অংশ একটু সময়ের মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিল, এক মিনিটের মধ্যে অনেক কিছু সে দেখতে চেয়েছিল সত্য, তার চোখের পলক পড়ছিল না তখন, শ্বাস ফেলতে পারেনি, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গিয়েছিল—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন—যেহেতু এমন একটা জায়গা, যেটা তার অত্যন্ত পরিচিত, বাড়ি ফেরার রাস্তা, বাড়ির কাছাকাছি কোনো জায়গা, এমন জায়গায় এই গাড়ি কোথা থেকে আসবে, কেন এসেছিল, কেনই বা দাঁড়াল, কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না, বোকা হয়ে গিয়েছিল সে এবং গাড়িটা চলে যাবার পর তার দু চোখ ছলছল করে ওঠে। এত ঘিঞ্জির মধ্যে, 'চারদিকে যেখানে কেবল ময়লা মাছি ধুলো ধোঁয়া হৈ-হল্লা—ফুলের মতন এতগুলি সুন্দর মুখ এল ও চকিতে অদৃশ্য হল—ভীষণ একটা ধাক্কা লেগেছিল তার বুকে! বিচ্ছেদের আঘাত? কেননা তারপর প্রায় একটা মাস, রোজ বিকেল পড়তে, ঠিক ঐ সময়টায় রাস্তার সেই লাইটপোস্টের নিচে গিয়ে সে দাঁড়াত। উদাস চোখ মেলে এদিক ওদিক দেখত। কিছু খুঁজত।

হা রে মূঢ়। তার অবস্থা দেখে আমার হাসি পেত, কান্না পেত। সুন্দরের পিপাসা, রূপের তৃষ্ণা, পরিচ্ছন্নতার মোহ। যেন সে ভেবেছিল গাড়িটা একদিন

ফিরে আসবে, আর ঐ ময়লা ঘিঞ্জির মধ্যে থেকেও একলাই সে এতগুলি রূপসী মেয়ের অধীশ্বর হতে পারবে। পাগলামি শুনুন!

তারপর অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু সে শিখেছে বুঝেছে। ঐ যে বললাম, আজ তার সাতাশ বছর বয়স হল। বয়স বেড়েছে বলেই স্কুলে দুটি বাচ্চা পড়ুয়ার কথা শুনে একদিন নিজের মনে হাসতেও পারল। অর্থাৎ কথাটা শুনে হাসতে পারার মতন বুকটা শক্ত হয়েছে সবল হয়েছে। বুঝে গেছে সে, অনেক স্বপ্নই তার সফল হবার নয়, পৃথিবীর অনেক বাসনাই কোনো কোনো মানুষকে বর্জন করে চলতে হয়। 'কাটা পা নিয়ে স্যার কোনোদিন বিয়ে করতে পারবে না।'

কিন্তু তা হলে হবে কি, আমি বলব, কিছু কিছু মূঢ়তা, ছেলেমানুষি এখনও সে কাটাতে পারেনি।

গায়ে সস্তা জেলজেলে ছিটের শার্ট, ময়লা ধুতি, স্কুলের একশ কুড়ি ও দুটো প্রাইভেট টুইশানির চল্লিশ নিয়ে মোট একশ ষাট টাকা যার মাসিক রোজগার, ক্রাচ ভর করে যে হাঁটে, কোটরগত চক্ষু, ফ্যাকাশে জীর্ণ শরীর, এই অবস্থায়—

আমি হতভম্ব হয়ে গেছি তার কাণ্ড দেখে। বনেদী রাস্তার জমকালো বাড়ি নিবিড় গাছপালা অপরিমেয় নির্জনতা জুঁইয়ের গন্ধ কিউটিকুরার চকিত সৌরভ মেঘের মন্দ্রের মতন দামী কুকুরের ডাক?

বেশ তো, কাল একবার দেখে গেছে শুনে গেছে, আজ আবার কেন? কী করুণ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তোমাকে ঐ গাছতলাটায় ভাবতে পার! চল, ফিরে চল, চাপা গলায় তাকে ডাকলাম, ধমকালাম।

শুনল না, আমার নিষেধ গ্রাহ্য করল না। দু নম্বর মে-ফ্লাওয়ার গাছটা পিছনে রেখে ক্রাচ ঠুকে তিন নম্বর রাধাচূড়া গাছটার নিচে গিয়ে সে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সেই অপার্থিব রাস্তার প্রগাঢ় স্তব্ধতায় সঙ্গে, প্রেসারকুকারের বিদঘুটে আওয়াজ বা সেতারের সুমিষ্ট আলাপের আরও গভীরে সে ক্রমশ লীন হয়ে যেতে চাইছে। আমার তাই মনে হল।

লাভ? কী লাভ! এত মায়া লাগছে তোমাকে দেখে। ভীরু লাজুক বঞ্চিত দুঃখী পা-কাটা মানুষ। কানে কানে হিসহিস করে বললাম, তোমার জায়গায় তুমি ফিরে চল, তোমার পরিচিত জগতে। থাক না সেখানে হৈ-হট্টগোল ময়লা দুর্গন্ধ, ন্যাংটো হয়ে ছেলেরা ফেরিওয়ালার পিছনে লাগে! রাস্তার কলে লাইন দিয়ে মেয়েরা জল তোলে? সারাক্ষণ ধোঁয়া আর ধুলো! ভিড় ও অনটন? থাকলই বা; আমি বলব তুমি সেখানেই স্বাভাবিক, সক্ষম এবং সর্বদিক থেকে সঙ্গত। এখানে তুমি ভীষণরকম অসঙ্গত, অসহায়।

আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল, ঠুকঠুক করে আরও এগোচ্ছে সে।

তিন নম্বর রাধাচূড়া গাছটার পরে চার নম্বর গাছটা কিন্তু মে-ফ্লাওয়ার নয়। ইউক্যালিপটাস। সে ভেবেছিল রাধাচূড়া মে-ফ্লাওয়ার তারপর আবার রাধাচূড়া এভাবে পর পর গাছগুলি সাজানো আছে। কিন্তু রাস্তার খানিকটা ঝকমকে আলো লেগে শুকনো সাদা হাড়ের মতন ডুটো শাখা ও কাণ্ডটা দেখে গাছটা সে চিনল। স্থির হয়ে দাঁড়াল। বগলের কাঠ ডুটোর ওপর শরীরের ভর রাখল। পকেটে রুমাল নেই। জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছল। বাতাস আছে। তা হলেও বৈশাখের গরমে সে ঘামছে। ক্রাচ ভর করে হাঁটার মেহনত কি কম!

মাথার ওপর গ্রীল দেওয়া অপরূপ ব্যালকনি। জুঁই নয, এখানে মাধবীলতা। যেমন প্রথম ব্যালকনিটা বিউগনভিলায় মোড়া ছিল।

ঘাড় বেঁকিয়ে থুতনি তুলে সে ওপরের দিকে তাকাতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

তৃষ্ণা! এই বয়সে! সব কামনা বাসনা লোভ স্বপ্ন শুকিয়ে গেছে না তোমার। আজ আবার হঠাৎ নতুন করে—

আমাকে কথাটা শেষ করতে দিল না সে। চুপ! চিতায় না ওঠা পর্যন্ত কোনো সাধ স্বপ্ন পিপাসা ক্ষুধা মরতে দেয় না মানুষ, তুমি কি জান না মূর্খ। পাল্টা ধমক লাগাল সে। আমার তো মোটে সাতাশ, আশী বছরেও শুকনো পাঁজরের নিচে সব সে লুকিয়ে রাখে। কিছুই শুকোতে দেয় না—শেষ হতে দেয় না।

ভাল! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

এই অবস্থায় আমার ভিতরের অবুঝ একরোখাকে অনুকম্পা করা ছাড়া আর কী করতে পারতাম বলুন। আপনারা গোড়া থেকে সব শুনছেন।

তারপর শুনুন—

কুকুরটা আর একবার গর্জন করে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ দম বন্ধ অবস্থায় কাটাবার পর কুকুরটা আর একবার হিসহিস শব্দ করে উঠল। তারপর সেটাও থামল।

পাকা ভেড়ার মাংস সেদ্ধ হচ্ছে—অর্থাৎ সেইরকম একটা মিঠে মিঠে গন্ধ নাকে লাগতে গভীর করে সে শ্বাস টানল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধ মিলিয়ে গিয়ে ফুলের গন্ধ, উঁহু জুঁই নয়, মাধবীও নয়, হাস্নুহানার চড়া গন্ধে বাতাস ভরে উঠল।

এত খুশি হল সে! বুঝতে পারল তার মাথার ওপরের ব্যালকনিতে মাধবী লতিয়ে উঠেছে সত্য কিন্তু সামনের কোনো ব্যালকনির নিচে নিশ্চয়

হাস্নুহানার ঝোপে হেনা ফুটেছে। হয়তো তার পরের ব্যালকনির টবে বেল ফুটেছে, আর একটু এগিয়ে গেলে চাঁপা কি বকুলের গন্ধ তুমি টের পেতে পার, ভাবল সে। অর্থাৎ বৈশাখের সব কটা ফুলের নাম ঝপ করে তার মনে পড়ল। মানে ছেলেবেলায় বাল্যশিক্ষায় যা পড়েছিল মুখস্থ করেছিল, তা না হলে এত ফুলের নাম সে জানবে কেমন করে, ঘিঞ্জিপাড়ায় মানুষ, ফুল দেখে নি, বাগান দেখে নি, জন্ম থেকে বিস্তর দোকান দেখেছে। আর ঐ যে, রাস্তার কলে মেয়েরা লাইন দিয়ে জলে ধরে, উদোম গায়ে ছেলের দল ফেরিওয়ালার পিছনে—

কথাটা মনে হতে সে নিজে-নিজে হাসল। ফুল চেনা হয় নি, এই জীবনে ভাল করে ফুল দেখা হয় নি—কিন্তু কোন্‌টা জুঁইয়ের গন্ধ কোন্‌টা বা হেনার টের পাচ্ছি কেমন করে! চিন্তা করার বিষয় যে!

তখনি অবশ্য তার নিজের কাছে সমস্যাটার সমাধানও হয়ে যায়। আসলে একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়ার সঙ্গে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কতগুলি স্বাভাবিক শক্তি জাগিয়ে দেয়। আমরা টের পাই, পরিষ্কার বুঝতে পারি কোন্‌টা হেনা কোন্‌টা জুঁইয়ের সৌরভ। ভাল করে না-ই বা ফুল দুটোকে কোনোদিন দেখলাম চিনলাম।

ভেবে সে তৃপ্তি পেল।

এই ফাল্গুনে ছাব্বিশ পূর্ণ করে আমি সাতাশে পা দিয়েছি। সুতরাং ঈশ্বর—উঁহু, খোঁড়া লাজুক গরিব ভীরু একটা কথা নয়, আমি যুবক। আমাকে এমন কতগুলি স্বাভাবিক সহজ ক্ষমতা ঈশ্বর দান করেছে যা আর দশটি যুবকের মধ্যেও তুমি দেখতে পাবে। আর দশটি যুবক থেকে আমি আলাদা কিছু নই। এই জন্যই তো ঈশ্বরকে দয়াময় বলা হয়।

বস্তুত ঈশ্বরের দয়া এবং নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনোদিন সে এত বেশি চিন্তা করেনি। হয়তো দু'পাশের চমৎকার ছবির মতন সব বাড়ি, সারিবদ্ধ ফুলের গাছ, ঝকমকে আলো ও সেই সঙ্গে গভীর ছায়া ও নির্জনতায় ভরা এমন একটা প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাস্তায় এসে সে এই সূক্ষ্ম জিনিসগুলি ভাবতে পারল। স্থান-মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে না! ছোট জায়গায় নোংরা পরিবেশে এ-ধরনের কোনো চিন্তা মাথায় ঢোকে কি!

যুবজনোচিত ক্ষমতা, পুষ্প না দেখে তার গন্ধ বলে দেওয়া, একটা পাকাপোক্ত প্রত্যয় নিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে সে অগাধ তৃপ্তি পেল ঠিকই, আবার মেয়েদের মতন ঠোঁট টিপে হাসলও। ক্রাচ দুটোর উপর বগলের ভর রেখে ইউক্যালিপটাস গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে একা একা রোমাঞ্চিতও কম হল না।

রোমাঞ্চিত হয়ে ঘাড়টা বেঁকিয়ে মাধবীলতায় মোড়া ব্যালকনিটার দিকে আর

একবার চোখ দুটো তুলে দিল। এবারও সঙ্গে সঙ্গে তার দু' চোখ বুজে আসার অবস্থা হল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেল। তাব মনে হল জায়গাটা বড বেশি নির্জন, অতিরিক্ত নিঃসঙ্গ সে, চতুর্দিকের স্তব্ধতার কোনো তুলনা হয় না। হাঁপিয়ে উঠল সে। তাব গলা শুকিয়ে গেল।

সে চাইছিল চেন্ বাঁধা কুকুরটা ভীষণ রেগে গিয়ে গর্জন করে উঠুক। প্রেসার-কুকারটা আর একবাব জোরে হিসহিস করে উঠুক। বা অন্তত একটা গাড়ি দু'পাশের গাছপালা কাঁপিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে যাক।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সেসব কিছুই হল না। অন্তত কোনো গাছেব ডালে একটা পাখির ডানার ঝটপট যদি শোনা যেত। অর্থাৎ ক্ষীণতম একটা শব্দ। হুঁ, ক্ষীণতম শব্দ।

তা হলে ঐ এক ফোঁটা শব্দকে আডাল করে সে দাঁডাতে পাবত। স্বস্তি পেত।

এত রূপ, এত স্পষ্ট, এত কাছাকাছি!

যেজন্য, আমি চোখ বুজলাম না ঠিকই, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে হাতের আঙুলগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম।

পাতার ছায়া ও রাস্তার আলো এক সঙ্গে চুঁইয়ে পড়ে আমার শুকনো ফ্যাকাশে নখগুলিকে চিত্রিত করে তুলেছে, যেন তখনকার মতন একটা ভযংকর কৌতুকাবহ ব্যাপার, খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করলে নয়, কাজেই নখ নিয়ে ব্যস্ত হযে পডলাম।

অর্থাৎ এভাবে যেমন-তেমন একটা আডাল খুঁজলাম।

তার একটা কারণ রয়েছে। আজ আমি তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোর নই। এবং আমার ওপর ব্যালকনির রেলিং ঘেঁষে যে দাঁড়িয়ে তার গায়েও কিছু স্কুলে-পড়া মেয়েদের ফ্রক নেই বা চডা রঙের রিবন বাঁধা একটা বেণী ঝুলছে না পিঠে।

আঁটোসাঁটো বিস্ফারিত খোঁপা। দীর্ঘাঙ্গী। তা ছাডা এতটা ঝুঁকে দাঁডিয়েছে যুবতী, রেলিং এর লতা ঝোপ ডিঙিয়ে তার নয়নাভিরাম শাডির আঁচল প্রায় আমার মাথা ছোঁবে বলে মনে হচ্ছিল।

কাজেই চারিদিকের অপার নিঃশব্দতা ও নির্জনতা নিয়ে হঠাৎ আমি কেমন বিব্রত সংকুচিত হয়ে পডতে পাবি একবার অনুমান করুন। এত প্রত্যক্ষ, এত নিকটবর্তিনী!

ঐ যে বললাম, সেদিন আমাদের ঘিঞ্জি পাডার ধুলো ময়লা ভিড ও বিচিত্র কলরবের মধ্যে বালক হয়েও কিনা রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে দাঁডান একটা গাড়ির ভিতর যে-কটি সুন্দর মুখ দেখেছিলাম তাদের প্রত্যেকটিকে একদা

আমি লাভ করব এমন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতে আমার একটুও বাধে নি। গাড়িটা চলে যেতে আমার চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

আজ? যেন ঠিক এই জিনিসের পরীক্ষা দিতে কাটা-পা নিয়ে ক্রাচ ঠুকে ঠুকে এই আশ্চর্য সুন্দর জগতে চলে এসেছি।

বলে কিনা চোখ ছলছল করবে, চোখ তুলে যেখানে আমি তাকাতে পারছিলাম না। আড়ষ্ট হয়ে ঘাড় গুঁজে কেবল হাতের নখ দেখছি।

এভাবে পুরো একটা মিনিট কাটল।

তারপর আবার আগের মতন শব্দটব্দ আরম্ভ হল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল, মনে হল এবার একসঙ্গে দু'বাড়িতে দুটো প্রেসারকুকার হিসহিস করছে। জোরে হাওয়া ছেড়েছে। রাস্তার দু' পাশের অগুনতি রাধাচূড়া মে-ফ্লাওয়ার ও মাথার ওপর ইউক্যালিপটাস গাছটার পাতার ঝরঝর শোনা গেল। স্বস্তিবোধ করলাম এবং কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারলাম। এবং ঠিক তখনই কানে এল ওপর থেকে কেউ যেন একটা-দুটো মুদ্রা, দু' নয়া পাঁচ নয়া বা, অনুমান করলাম বনেদী পাড়া, সিকি আধুলি হতে ক্ষতি কি, পেভমেণ্টের ওপর ছুঁড়ে দিলে। ঠন করে দুটো শব্দ হল। কাজেই অধিকতর নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার সাহস বাড়ল। বুঝতে পারলাম এত বড রাস্তাটায় আমি একেবারে নিঃসঙ্গ নই, আর কেউ না থাক অন্তত এক-আধজন ভিখিরি কোনো গাছতলার অন্ধকারে নিশ্চয় বসে আছে। কোথায় বসে আছে. পয়সা দুটো হতভাগা কুড়িয়ে পেল কিনা আমার দেখার দরকার ছিল না। আমার সঙ্কোচ কেটে গেছে এটাই যথেষ্ট, তৎক্ষণাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকালাম। কিন্তু দেখলাম ব্যালকনি থেকে যুবতী তখন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমি হতাশ ক্ষুব্ধ হতে পারতাম। আমার পক্ষে তাই স্বাভাবিক ছিল, শোভনও হ'ত। কিন্তু ঐ যে, আমার মধ্যে একটা মূর্খ, একগুঁয়ে—

অসীম ধৈর্য তার, পর্বতপ্রমাণ প্রত্যাশা।

সামনে আরও ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে, সারি সারি বাড়ি, যেমন একটার পর একটা রাধাচূড়া মে-ফ্লাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে একটা-দুটো মনোরম ইউক্যালিপটাস বা অন্তত দেবদারু বৃক্ষ থাকতে বাধা কি, ভাবল সে, সুতরাং এগোও, এগিয়ে চলো।

রাগে আমার গা জ্বলছিল। অপদার্থ বাউণ্ডুলেটাকে গালিগালাজ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপনারা চিন্তা করুন, সেই কখন স্কুলের ছুটির পর একটা চায়ের দোকানে ঢুকে একটু আলুর ঝোল দিয়ে দু' স্লাইস পাউরুটি খেয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে। স্বপ্ন খুঁজছে, শুকনো পাঁজরের নিচে রমণীর আশা নিয়ে এই

মসৃণ চকচকে রাস্তায় চলে এসেছে। পাগল আর কাকে বলে।

ক্রাচ ঠুকে সত্যি সে আরও এগোচ্ছিল।

'এই যে—' পিছন থেকে একজন ডাকল।

'কি হল!' ক্রাচ দুটো বেঁকিয়ে কষ্ট করে সে ঘুরে দাঁড়ায়। 'আমায় কিছু বলছ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে—দিদিমণি পয়সা ছুঁড়ে দিল তুমি নিলে না, চলে যাচ্ছ!'

বোকা-বোকা চোখ করে লোকটার মুখেব দিকে তাকাল সে।

'তুমি কে?'

'আমি এ বাড়ির চাকর।' আঙুল তুলে লোকটা মাধবীলতায় মোড়া ব্যালকনিটা দেখাল। 'ওই দ্যাখো দিদিমণি আবাব এসে দাঁড়িযেছে—জিজ্ঞেস করছিল যদি পয়সা না নাও, পুরোনো শার্ট পাঞ্জাবি আছে, নেবে কি?'

নির্লজ্জ বেহায়া। হেসে মাথা নাডল। অর্থাৎ পুবোনো জামায় তাব দরকার নেই। শরীরটা ঘুরিযে নিযে, যেন সামনে কোথাও চামেলি ফুটেছে, গন্ধ পাচ্ছে, ঠুকঠুক করে ঠিক এগোতে লাগল।

গাছ

একটা গাছ। অনেকদিনের গাছ। গাছটা সুন্দর কি অসুন্দর কেউ প্রশ্ন তোলেনি।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রয়োজন আছে কি নেই তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না।

যেমন মানুষ মাথার ওপর আকাশ দেখে মেঘ দেখে, পায়ের নিচে ধুলো দেখে ঘাস দেখে, তেমনি তারা চোখের সামনে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখছে। সন্ধ্যায় দেখছে দুপুরে দেখছে সকালে দেখছে! কেবল চোখ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুভূতি দিয়ে দেখা নয়, বোঝা নয়।

বা এমন করে একটা গাছকে বুঝতে হবে কেউ কোনদিন চিন্তাও করে না।

দিনের পর দিন যায়, ঋতুর পর ঋতু কাটে, বছরের পর বছর যায় আসে—গাছের জায়গায় গাছ দাঁড়িয়ে।

বর্ষায় পাতাগুলি বড হয় পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ সেই সবুজ-কালো গভীর ধূসর হয়ে ওঠে তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নিরক্ত প্রস্থতির পাণ্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। গাছ রিক্ত হয়।

তখনও গাছ গাছই থাকে।

গাছের চেহারা তখন শুধু কাঠের চেহারা হয়।

ছোট কাঠ বড় কাঠ চিলতে কাঠ সরু কাঠ পাতলা চিকন—মানুষের আঙুলের মত টুকরো টুকরো অজস্র কাঠ কাঠির একটা জবরজং কাঠামো হয়ে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু তা বলে কি মানুষ তখন তার ওপর রাগ করে? করে না। কারণ মেঘ-মেদুর আকাশের নিচে অরণ্যের চেহারা ধরে গাছ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তাকে যে চোখে দেখে শীতের শুকনো আকাশের নিচে সরু মোটা কতকগুলি কাঠ কাঠির বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেও মানুষ তাকে সেই চোখে দেখে। তাই বলছিলাম ওপর ওপর দেখা। মন দিয়ে দেখা নয় বোঝা নয়। তাহলে ফাল্গুনে লালে সবুজে মেশানো নতুন পাতার সমারোহ দেখে মানুষ নাচত অথবা বৈশাখ পড়তে অজস্র মঞ্জুরী মাথায় নিয়ে গাছটা আশ্চর্য গোলাপী আভায় আকাশ

আলো করে তুলেছে দেখে আনন্দে চিৎকার করত। তা কেউ কবে না, এ পর্যন্ত করে নি।

দু-তিনটা বাড়ির মাঝখানে এক ফালি পড়ো জমির ওপর একটা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাদেব একটু স্নবিধা হয, এই শুধু তারা জানে। এ-বাড়ির মানুষ জানে ও-বাড়িব মানুষ জানে, আশেপাশেব আবো গোটা দু-তিন বাড়ির মানুষগুলিও একটু-আধটু স্নবিধা আদায কবতে গাছেব কাছে আসে বৈ কি, যেমন সকাল হতে খবব কাগজ হাতে করে দু-চারজন প্রৌঢ় বুড়ো গাছতলায় একত্র হয়ে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি আলোচনা কমে, যেমন দুপুবেব দিকে এবাড়ির বুড়ি ও বাড়ির বুড়ি, এবাড়িব বৌ ও বাড়ির মেযেকে গাছেব নিচে সবুজ গালিচার মতন ঘাসেব ওপর পা ছড়িয়ে বসে রান্নার কথা সেলাইয়ের কথা ছেলে হওয়ার কথা ছেলে না হওযাব কথা বলে সময় কাটায় আর বিকেল পড়তে ছুটে আসে ছেলে-ছোকরার দল। গাছটাকে ঘিবে হৈ হল্লা ছুটোছুটি, গাছে উঠে ডাল ভাঙা পাতা ছেঁড়া, বা কোনদিন গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া।

বা শীতের দুপুবে গাছের ছাযায় মাথা বেখে শবীরটা বৌদ্রে ছড়িয়ে দিয়ে কারো কারো গল্পের বই পড়া। আবার গ্রীষ্মের রাত্রে ঠিক এই গাছের তলায় শীতল পাটি বিছিয়ে হ্যারিকেন জ্বেলে পাড়াব পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে তাস খেলছে এই দৃশ্যও চোখে পড়ে।

যখন মানুষ থাকে না তখন গাছতলায় ছাগলটাকে গরুটাকে মাথা গুঁজে মনের আনন্দে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখা গেছে।

আর ওপরে নানাজাতের পাখির কিচির-মিচিব কলরব, ডানা ঝাপটান, ঠোঁট ঘসার শব্দ।

আর মাঝে মাঝে হাওয়ায় পাতা নড়ে, ডাল দুলে ওঠে।

বা এমনও এক-একটা সময় আসে যখন পাখি থাকে না, বাতাস নেই। গাছ স্থির স্তব্ধ। পড়ো জমিতে নিবিড় ছায়াটুকু ফেলে অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গ গাছ যেন যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বা মনে হয় কোন দার্শনিক। নীরব থেকে অবিচল থেকে জগতটাকে দেখছে। সংসারের উত্থান-পতন লক্ষ্য করছে। পাপের জয় পুণ্যের পরাজয় দেখে বিমূঢ় বিস্মিত হয়ে আছে।

চিন্তাশীল মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয। চিন্তাশীল মানুষ যেমন চুপ করে থাকে। সত্যি গাছটাকে সময় সময় এমন একটি মানুষ বলে কল্পনা করা যায়। তখন তার ধারেকাছে অন্য মানুষ পশু-পাখি হাওয়ার চাপল্য কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

হয়তো এমন করে কেউ গাছটাকে দেখছিল গাছটাকে নিয়ে ভাবছিল। এতদিন জানা যায় নি, এতদিন বোঝা যাচ্ছিল না। কে জানে হয়তো গাছটার

সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল, গাছ বুঝতে পারছিল পুবদিকের একটা বাড়ির সবুজ জানলায় বসে একজন তাকে গভীরভাবে দেখছে লক্ষ্য করছে। না, আগে হয়তো সে আর দশটি মানুষের মতো সাদা চোখে গাছের পাতা ঝরা দেখত নতুন পাতা গজানো দেখত। এখন আর তার চোখ সাদা নেই। কাজল পরে গভীর কালো হয়েছে। এখন আর হাল্কা বেণী ঝুলিয়ে ফ্রক উড়িয়ে সে ছটফট করছে না যে, বাড়ির সামনের পড়ো জমিতে একটা গাছ আছে কি বাঁশের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে ওপর ওপর দেখে শেষ করবে! এখন সে শান্ত গম্ভীর, মাথায় দৃঢ়বদ্ধ সংযত কঠিন খোঁপার মতো তার মনও বুঝি সতর্ক সুসংবদ্ধ স্থির ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। আর সেই নিবিড় মন সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সারাক্ষণ সে গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। গাছটাকে নিয়ে ভাবছে। যেন ভাবতে ভাবতে একদিন তার দৃষ্টি কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। চোখের কালো পালকগুলি আর নড়ছে না, কালো মনি দুটি পাথরের মতো স্থির কঠিন হয়ে আছে। গাছ বুঝতে পারল একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে, ওই কালো পালক ঘেরা চোখ দুটোর তাকানোর মধ্যে কেবল ভয় না বিদ্বেষও যেন মিশে আছে। গাছ ভয় পেল, দেখল, কেবল দিনের আলোয় না রাত্রির গভীর অন্ধকারেও দুটি চোখ জানালায় জেগে আছে। নিরাকার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হয়ে রাত্রির গাঢ় তমসায় লুকিয়ে থেকেও যেন গাছ ওই দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। আতঙ্কের সঙ্গে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণা ছুঁড়ে দিচ্ছে একজন তার দিকে।

তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। বুঝি সবুজ জানালার ওই মানুষটি সকলকে জানিয়ে দিল।

এই গাছ দুষ্ট। এই গাছ শয়তান। একে এখান থেকে সরিয়ে দাও।

পড়ো জমির আশে-পাশের মানুষগুলি সজাগ হয়ে উঠল।

মানুষের মতো শয়তান হয়ে একটা গাছ মানুষের মধ্যে মিশে থাকতে পারে তারা এই প্রথম শুনল, জানল।

তাইতো, সকলে ভাবতে আরম্ভ করল, বুড়োর দল গাছের নিচে বসে পলিটিকস আলোচনা করে, বুড়িরা যুবতীদের সঙ্গে বসে ছেলে হওয়া না হওয়ার গল্প করে, ছেলে-ছোকরার দল গাছের কাছে এসে খেলা করে এখন গাছটা যদি ভাল না হয়, যদি তার মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে তবে তো—

কেটে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে দিতে হবে, মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেললে সবচেয়ে ভাল হয়। সাদা ফুলের মালা জড়ানো স্ফীত শক্ত খোঁপা নেড়ে জানালার মানুষটি বলল, তা না হলে এই গাছ কখন কি বিপদ ঘটায় বলা যায় না।

সবাই শুনল সবাই জানল।

শিশুরা খেলা করে। এই গাছের একটা বড ডাল তাদের মাথায় ভেঙে পড়তে কতক্ষণ। বজ্রপাত হতে পারে এই গাছের মাথায়। আর তার নিচে তখন যে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে তার অবধারিত মৃত্যু। অর্থাৎ গাছই বজ্রকে ডেকে আনবে। শয়তান কী না পারে! শুনে মানুষগুলির চোখ বড হয়ে গেল।

কিন্তু সেই সবুজ জানালার মানুষটি চুপ করে থাকল না। গাছ সম্বন্ধে এত-কাল যারা উদাসীন ছিল তারা আরো ভয়ংকর কথা শুনল।

কেবল বজ্র কেন, শয়তান মধ্যরাত্রে যে কোন একটি মানুষকে ডেকে নিজের কাছে আনতে পারে।

হুঁ, সকালে উঠে সবাই দেখবে সেই মানুষ ওই গাছের কোন না কোন একটা ডালে ঝুলছে।

গলায় দড়ি দেবার পথে গাছের ডাল যে একটি চমৎকার অবলম্বন কথাটা নতুন করে সকলের মনে পড়ে গেল।

ওই গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, সম্ভব হলে মূলসুদ্ধ।

হয়তো গাছের জানা ছিল না, পড়ো জমির পশ্চিম দিকের আর একটা বাড়ির লাল রঙের জানালায় বসে আর একজন তাকে গভীরভাবে দেখছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়তে গাছ চমকে উঠল। এবং খুশি হল। লাল রঙের জানালার মানুষটির চোখ দুটি বড সুন্দর। সেই চোখে ভয় আতঙ্ক ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই নেই। আছে স্নেহ প্রেম মমতা সহানুভূতি। দেখে গাছ বিস্মিত হল। কেননা কদিন আগেও মানুষটির দৃষ্টি অশান্ত ছিল চলায় বলায় চাপল্য ছিল। হাফ প্যাণ্ট পরে সময়ে অসময়ে তার কাছে ছুটে এসেছে, ঢিল ছুঁড়েছে ডালপাতা লক্ষ্য করে, পাতার আড়ালে পাখির বাসা খুঁজে বার করে ভেঙে দিয়েছে আর যখন-তখন দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছে। আজ সে মার্জিত ভদ্র স্নিগ্ধ সুন্দর। আদ্দির পাঞ্জাবির হাত দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে দু হাতের তেলোয় চিবুক রেখে জানালার ধারের টেবিলের কাছে বসে গাছের দিকে গাঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। গাছটাকে নিয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ নাকের কাছে তুলে ঘরে গন্ধ শোঁকে, যেন গাছটাকে যত দেখছে যত ভাবছে তত সে পরিতৃপ্ত হচ্ছে আনন্দিত হচ্ছে। যেন গাছকে নিয়ে ভাবনার সঙ্গে গোলাপের গন্ধের একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে। বুঝি গাছ তার কাছে গোলাপের মতো সুন্দর।

গাছ নিশ্চিন্ত হল আশ্বস্ত হল। লাল জানালার মানুষটার মুখে সবাই অন্য কথা শুনল।

এই গাছ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একে

বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই গাছের নিচে সকালে বিকালে মানুষগুলি একত্র হয়। একটি মানুষকে আর একটি মানুষের মনের কাছে টেনে আনছে গাছটা। তার অর্থ আমাদের সামাজিক হতে শেখাচ্ছে। গাছটা আছে বলে ছেলেরা খেলাধুলা করতে পারে। মায়ের মতো শিশুদের স্নেহ ও আনন্দ বিতরণ করছে মাঠের ওই বনস্পতি।

সত্যি সে সুন্দর।

তার ছায়া সুন্দর, ডাল সুন্দর। তাই না নিরীহ সুন্দর পাখিগুলি তাকে আশ্রয় করে সারাক্ষণ কূজন গুঞ্জন করছে। প্রজাপতি ছুটে আসছে।

পাড়ার মানুষগুলি নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল।

পশ্চিমের লাল জানালার সুন্দর মানুষটি সেইখানেই চুপ করে থাকল না।

ইঁট, লোহা, সিমেণ্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। আমরা যে এখনো পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাইনি মিথ্যা হয়ে যাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটা কবিতার মতো।

তবে কি লাল জানালার মানুষটি কবি? গাছ ভাবল। রাত্রে জানালার ধারে টেবিলে বসে মানুষটি কাগজ কলম নিয়ে কি যেন লেখে যখন লেখে না চুপ করে বাইরে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মন্দ কথা শুনে মানুষ যেমন বিচলিত হয় তেমনি ভাল কথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হয় খুশি হয়।

তাই একজন গাছটাকে মন্দ বলতে মানুষগুলি যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, আবার আর একজন গাছ তাদের অনেক উপকার করছে শুনে শান্ত হল।

তাই তারা গাছ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু পুবের জানালার মানুষটি চুপ থাকল না। গাছ শুনল, দাঁতে দাঁত ঘসে সে প্রতিজ্ঞা করছে, যদি আর কেউ তাকে সাহায্য না করে তো সে নিজেই কুড়ুল চালিয়ে গাছটাকে শেষ করে দেবে। এই গাছ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। শয়তানকে চোখের সামনে থেকে যেভাবে হোক দূর করবে।

গাছ শুনে দুঃখ পেল, আবার মনে মনে হাসল। যেন পুবের জানালার মানুষটিকে তার ডেকে বলতে ইচ্ছে হল, তোমার খোঁপায় ফুলের মালা শোভা পায়, তোমার চোখের কাজল, কপালের কুমকুমটি চমৎকার, তোমার হাতের আঙুলগুলি চাঁপার কলির মতো সুন্দর। সুন্দর ও নরম-এই হাতে কুড়ুল ধরতে

পারবে কি ?

যেন পশ্চিমের জানালার মানুষটির কানেও কথাটা গেল। তার সুন্দর আঙুল-গুলি কঠিন হয়ে উঠল। গাছের বেশ জানা আছে ওই হাত, হাতের আঙুল দরকার হলে ইস্পাতের মতো দৃঢ় দৃপ্ত হতে জানে। আজ ওই হাত দিয়ে—সে কবিতা লিখছে বটে, গোলাপ ফুলকে আদর করছে—একদিন ঐ হাতে ঢিল ছুঁড়ে সে অনেক পাখির বাসা তছনছ করে দিয়েছে, গাছের ডাল ভেঙেছে, পাতা ছিঁড়েছে আর রুদ্রের মতো হাতের দুটো মুঠো কঠিন করে দোলনার দড়ি আঁকড়ে ধরে দানব শিশুর মতো দোল খেয়েছে। তাই বুঝি আজ বজ্রমুষ্টি শূন্যে তুলে সে প্রতিজ্ঞা করল, এই গাছকে যেমন করে হোক রক্ষা করবে। যদি কেউ এই গাছ নষ্ট করতে আসে তাকে ক্ষমা করবে না। জীবন থেকে কবিতাকে নির্বাসন দেওয়া চলে না। যদি কেউ গাছের গায়ে হাত তুলতে আসে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে তাকে প্রতিহত করবে। গাছের গায়ে আঁচড়টি পড়তে দেবে না।

গাছ নতুন করে ভয় পেল! তাকে কেন্দ্র করে পুবে ও পশ্চিমের জানালার দুটি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে না তো!

সেদিন দুপুর গড়িয়ে গেল। দুটো বাচ্চা নিয়ে একটা ছাগল নিচের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে ঘাস খেল। বিকেল পড়তে শিশুর দল হুটোপাটি করল। অগুন্তি পাখি কিচিরমিচির করে উঠে তারপর এক সময় চুপ হয়ে গেল। রাত্রি নামল। নির্মেঘ কালো আকাশে অসংখ্য তারা ফুটল। হাওয়া ছিল। গাছের পাতায় সরসর শব্দ হচ্ছিল। রোজ যেমন হয়। পড়ো মাঠের চারপাশের বাড়িগুলিতে নানারকম শব্দ হচ্ছিল, আলো জলছিল। ক্রমে রাত যত বাড়তে লাগল এক একটি বাড়ি চুপ হয়ে যেতে লাগল, আলো নিভল। তারপর চারদিক নিঃসীম অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকার আর অমেয় স্তব্ধতা। মাথার ওপর কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় হাওয়াটাও মরে গেল। গাছের একটি পাতাও আর নড়ছিল না।

এমন সময়।

নিরন্ধ্র অন্ধকারে দিনের আলোর মতো গাছ সব কিছু দেখতে পায়। গাছ দেখল পুবদিক থেকে সে আসছে। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে বেঁধেছে। মালাটা খোঁপা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছে। যেন যুদ্ধ করতে আসছে। এখন আর ফুলের মালা নয়। হাতে ধারালো কুঠার। গাছ শিউরে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে মানুষের পায়ের শব্দ হল। গাছ সেদিকে চোখ ফেরাল। এবার গাছ নিশ্চিন্ত হল। সে এসে গেছে। পশ্চিমের জানালার

সেই মানুষ এসে গেছে। তার হাতে এখন কলম নেই। হাতকাটা গেঞ্জি। তার চোয়াল শক্ত। দৃষ্টি নির্মল। যেন এখনি সে বজ্রের হুঙ্কার ছাড়বে।

গাছ কান পেতে রইল।

বিষণ্ণ স্তব্ধতা। অনিশ্চিত মুহূর্ত।

গাছের মাথায় একটা পাখির ছানা কিচমিচ শব্দ করে উঠল। যেন কোন দিক থেকে একটা নাম না জানা ফুলের গন্ধ ভেসে এল। আকাশের এক প্রান্তের একটা তারার কাছে ছুটে গেল। একটু হাওয়া উঠল বৈ কি। নরম শাখাগুলি দুলতে লাগল।

—যেন ভিতরে ভিতরে গাছ এমনটা আশা করেছিল। তাই খুব একটা অবাক হল না।

শাড়ি জড়ানো মানুষটির অধরে হাসি ফুটেছে।

পশ্চিমের জানালার মানুষের শক্ত চোয়াল নরম হয়েছে। বজ্র নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে না।

একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের মাঝখানের ব্যবধান এত কম যে গাঢ় অন্ধকারেও তারা পরস্পরের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। যেন একজন আর একজনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছিল।

'হাতে কুড়ুল কেন?'

'গাছটাকে কাটব।'

'লাভ কি?'

'গাছটা শয়তান।'

'গাছটা দেবতা।'

'শয়তানকে যে দেবতা মনে করে সে মূর্খ।'

'দেবতাকে যে শয়তানের মতন দেখে সে পাপী। তার মনে পাপ তার হৃদয়ে হিংসা। তাই সাদাকে কালো দেখে—আলো থাকলেও তার চোখে সব কিছু অন্ধকার।'

'তবে কি পৃথিবীতে অন্ধকার বলতে কিছু নেই? কালো বলতে কিছু নেই?'

'নেই।'

'এ কেমন করে সম্ভব।' হাত থেকে কুড়ুলটা খসে পড়ল ওর। ভাবতে লাগল। গাছ খুশি হল। গাছ দেখল একজন কুড়ুল ফেলে দিতে আর একজন হাতের লাঠি ফেলে দিল। 'এ কেমন করে হয়!' ভাবতে ভাবতে পুবের জানালার মানুষটি মুখ তুলে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তারার ঝিকমিকি দেখতে লাগল। তারপর এক সময় বিড়বিড় করে বলল, 'সব আলো সব সুন্দর—কিছু

কালো নেই কোথাও অন্ধকার নেই এমন কখন হয় !'

'নিজের ভিতরে যখন আলো জাগে।'

'সেই আলো কী ?'

'প্রেম'।

মেয়েটির চোখের পাতা কেঁপে উঠল। গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তার গলার স্বর করুণ হয়ে গেল।

'আমার মধ্যে কি প্রেম জাগবে না ?'

'অভ্যাস করতে হবে, চর্চা করতে হবে।' ছেলেটি সুন্দর করে হাসল। 'ভাল-বাসতে শিখতে হবে।'

'তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।'

গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারে নি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।